

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

জীবন-চরিত

(অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা সম্বলিত)

যোগীন্দ্ৰনাথ বসু, বি. এ.

প্রণীত

“কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, মনেছ নাট, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা
কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। * *
কবিতা কবির কীর্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই
বুঝিব। কিন্তু, যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন,
তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া
গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।”

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অশোক পুস্তকালয়

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড্,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :

শ্রীঅশোককুমার বার্নিক

সহায়দা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬০

মুদ্রক :

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

বাণীকুপা প্রেস

কলিকাতা-৭০০ ০০৪

ও

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

প্রিয়ার প্রেস

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ পত্র

যাহার উৎসাহ, অমুরাগ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে

এ গ্রন্থ রচিত হইত না,

এবং

পরলোকগত স্বহৃদের প্রতি আজীবনব্যাপী অমুরাগের জ্ঞাত

যিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র,

মধুসূদনের সেই চিরনিষ্ঠ, অকৃত্রিম স্বহৃদ

বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়কে

মধুসূদনের এই জীবন-চরিত

সমাদরে

উপহার অর্পিত হইল।

প্রস্তাবনা .

মেঘনাদবধ-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর এই বিংশতি বৎসর পরে তাঁহার জীবন চরিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল। জীবন-চরিত-রচনা-প্রথা আমাদের দেশে এখনও নূতন। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে জীবন-চরিত গ্রন্থ সাধারণের প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা এদেশে এখনও সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হয় নাই। আমি আমার প্রস্তে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তাহা উল্লেখ করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনাই যদিও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি, সেই সঙ্গে, তাঁহার সমকালবর্তী দেশ, কাল ও পাত্রগণের অবস্থাও আমি বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল অল্পকূল অবস্থা প্রতিকূল ঘটনায় মধুসূদনের জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষায় এবং সংসর্গগুণে তাঁহার প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিসমৃদ্ধ ক্ষুতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া আমি তাঁহার জীবনের বিকাশ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইলে, তাঁহার নিজের কথায় তাঁহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জানা সম্ভব নয় বলিয়া, তাঁহার লিখিত মূল বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থই গ্রন্থকারের জীবন; মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী ইহাতেই তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবরণ বিদ্যুৎ করিলে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর মর্ম ও সমালোচনাও ইহাতে প্রদান করিয়াছি। মধুসূদনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার নানাবিধ ভ্রম হওয়া সম্ভব। যাহারা তাঁহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, মধুসূদনের প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদিগের লিখিত মন্তব্যগুলি গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদান করিয়াছি। কিরূপ উপাদান ইহাতে আমি এই গ্রন্থ সকলন করিয়াছি, সেই সকল মন্তব্য ইহাতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মধুসূদনের রচিত অনেক ইংরাজী বাঙ্গালা কবিতা, অপ্রকাশিত অবস্থায়, ক্রমশঃ, বিলুপ্ত হইতেছিল দেখিয়া, তাহার কতকগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছি।

যে অবস্থায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমি ইহার সকলন এবং রচনা সম্বন্ধে অনেকের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার প্রথম এ

প্রধান রুতজ্ঞতা মধুসূদনের বাল্যের সহাধ্যায়ী এবং স্বহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বশাক, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, এই তিনজনের নিকট। মধুসূদনের একখানি জীবনচরিত রচনা করাইবার জ্ঞা, অনেক দিন হইতে তাঁহাদিগের বাসনা ছিল এবং তজ্জ্ঞা তাঁহারা কিছু কিছু উপাদানও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতি আমার অচুরাগ দর্শন করিয়া, তাঁহারা আমাকে এ কার্যে নির্বাচিত করেন। নানা বিষয়ে আমি তাঁহাদিগের তিন জনের, বিশেষতঃ বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, বর্ণনা দ্বারা তাহা অস্ত্রের হৃদয়ঙ্গম করাইবার শক্তি আমার নাই। প্রধানতঃ, তাঁহারই বহু যত্নশ্রুতি উপাদান হইতে আমি এষ্ট গ্রন্থ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছি। বুদ্ধ হইয়াও তিনি, আমার জ্ঞা, তরুণের জ্ঞায় পরিশ্রম করিয়াছেন এবং নিজের সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিয়া, নানা স্থান হইতে আমার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মধুসূদনের সহিত তাঁহার সখ্য অচ্ছেদ্য। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, সম্পদে, বিপদে, কুত্রাপি তিনি তাঁহার প্রিয়তম স্বহৃদের স্নেহে, দুঃখে উদাসীন প্রকাশ করেন নাই। যে দিন মধুসূদনের স্বদেশীয়গণ, স্বগীয় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচন্দ্র প্রবর্তনের জ্ঞা, মধুসূদনকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন; আর যে দিন বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ, মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেদিনও তিনি, সেই স্থান-ভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া, অশ্রুতর্পণ করিয়াছিলেন। পরলোকগত স্বহৃদের প্রতি তাঁহার জ্ঞায় চিরনিষ্ঠতা আমি আর কাহারও প্রকৃতিতে দর্শন করি নাই। তাঁহাকে এষ্ট গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া, আমি আমার হৃদয়ের রুতজ্ঞতা অতি অল্পমাত্রাই ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি প্রার্থনা করি, টেনিসনের নামের সঙ্গে আর্থার হালামের নামের জ্ঞায়, মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহারও নাম চিরগ্রথিত থাকুক।

গৌরদাস বাবু, ভূদেব বাবু এবং রাজনারায়ণ বাবুর পরেই, শ্রীযুক্ত সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিকট আমি রুতজ্ঞ। মহারাজা সর্বদাই নানা কার্যে ব্যাপ্ত। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, তিনি সহিষ্ণুতার সহিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেক স্থল শ্রবণ করিয়াছেন; নিজের লিখিত পত্রগুলির প্রফ্ স্বয়ং সংশোধন করিয়াছেন এবং মধুসূদনের জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যখন যে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তৎবিষয়ে, উপযুক্ত পরামর্শ দান করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রের ব্যয়ও তিনি নিজে প্রদান করিয়াছেন; আমি তাঁহার নিকট, এই সকলের জ্ঞা, আন্তরিক রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহারাজার জায় স্বর্গীয় পূজাপাদ বিভাগাগর মহাশয়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদনের সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, স্বর্গীয় বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি আরও অনেকের নিকট আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সম্বন্ধে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, তাঁহাদিগের কুলক্রমাগত উদারতার সহিত আমার উত্তমে আন্তরিক সহায়ভূতি প্রকাশ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। তিনি এবং স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, উভয়েই, স্ব স্ব ব্যয়ে তাঁহাদিগের নিজ নিজ পিতাঠাকুরের চিত্র আমায় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদিগের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, মধুসূদনের নিকট অবস্থান কালে, তাঁহার গ্রন্থের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অংশসকল কবির পবিত্র চিতাভস্মের জায়, সম্বন্ধে, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি মধুসূদনের জীবন-চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সেগুলি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। যদি এ গ্রন্থে প্রশংসাযোগ্য কিছু থাকে, তবে তাহা এইরূপ বহুজনের সমবেত সাহায্যের এবং উদ্যোগের ফল। আমি ইহাদিগের প্রত্যেকের নিকট, এজ্ঞা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার সর্বশেষ রুতজ্ঞতা মধুসূদনের স্বদেশীয় এবং স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট। গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভ হইতে আমি তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহায়ভূতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। মধুসূদনের ভ্রাতৃপুত্রী, “কাব্য কুম্মাঙ্কলি” রচয়িত্রী, শ্রীমতী মানকুমারী এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আমায় আন্তরিক সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তাঁহারই প্রদত্ত উপকরণে রচিত। যে শোণিত মধুসূদনের দেহে প্রবাহিত হইত, তাহা যেমন তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই যে দেবদুর্লভ শক্তিতে মধুসূদন অল্পপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাতে বর্তমান আছে। তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া আমি উপরূত এবং তাঁহার স্নেহে ও আশ্রয়ে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি।

মধুসূদনের জন্মভূমি ও পৈতৃক বাস-ভবন দর্শনের জন্ত যে দিন আমি সাগরদাঁড়ীতে অবস্থান করি, সে দিনের স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। মধুসূদনে পৈতৃক বাসভবন এখনও বর্তমান আছে। কালের করাল আক্রমণে সেই বিশাল অট্টালিকা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের বংশীয়গণের আর সেই পূর্ব প্রায়ব, পূর্ব সম্পদ নাই। যে গৃহে পিতামাতার ক্রোড়ে মধুসূদনের স্বর্গের শৈশব

অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়াছে। যে দেবীমণ্ডপে উৎসব দিনে, উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, বালক মধুসূদন বিজয়াগীতি শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেন, উৎসবানন্দ এক্ষণে সে মণ্ডপ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। পারাবত ও চর্মচটিকা এক্ষণে সেখানে বিহার করিতেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সকলই পরিবর্তিত হইয়াছে, কেবল মধুসূদনের বাল্যের সেই প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর পরিবর্তন নাই। নির্মল সলিলরাশি বহন করিয়া, এখনও তাহা, “দুগ্ধ-স্রোতের” গায়, যুহু কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষীর কূলের সেই দূর-প্রসারিত প্রাস্তর, নিদাঘসন্ধ্যার সেই স্নানিধ্ব সমীরণ, অর্ধশুট সেই মধুর জ্যোৎস্নালোক, মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের সেই কথোপকথন এবং সর্বোপরি মেঘনাদবধ রচয়িতার স্মৃতি, সম্মিলিত হইয়া, সে দিন হৃদয়ে যে ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নয়। মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের একান্ত বাসনা যে, তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুসূদন অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের বাসনা যে এতদিনে পূর্ণ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গসমাজ স্বদেশীয় মহা-পুরুষদিগের সম্মান রক্ষা করিতে শিথিলে তাঁহাদিগের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

মধুসূদন যে প্রতিভা এবং যে বিজ্ঞা, বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কতদূর তাহার গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না। তবে যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ে যাহা সম্ভব, আমি তাহার কৃতি করি নাই। জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থের কোন কোন অংশ মুদ্রিত হইবার পরও নূতন নূতন উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মুদ্রিত অংশ সম্বন্ধে দুই একটি ক্রটি লক্ষিত হইয়াছে। মধুসূদনের সহিত ষাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকে এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা এবং সাধারণ পাঠকবর্গ, যদি এই গ্রন্থের কোন স্থলে কোন ভ্রম বা অপূর্ণতা দর্শন করেন, তবে অল্পগ্রন্থ পূর্বক নির্দেশ করিয়া দিলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব ; বাঙ্গালা ভাষায় যে মেঘনাদবধ রচয়িতার একখানি জীবন-চরিত নাই, ইহা আমাদের একটি জাতীয় অভাব ; নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াও, সেই অভাব বিমোচনের জন্ত, আমি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি, বঙ্গভাষাসুসাগরগণ তাহার বিচার করিবেন।

বৈষ্ণনাথ দেওদর

প্রচ্ছদকার

ভাদ্র, ১৩০০

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন

সম্বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণের কোন কোন স্থল এবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাক্ষন কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইলে মধুসূদনের অন্ততম স্তম্ভদ্বয় এবং বেলগাছিয়া থিয়েটারের শিক্ষাগুরু ও সর্বপ্রধান অভিনেতা, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট মধুসূদনের লিখিত যে সমস্ত পত্র ছিল, তিনি আমাকে তাহা ব্যবহার করিবার জ্ঞাত প্রদান করেন এবং অষ্টম অধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি ত্রুটি নির্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রাক্ষন কার্য তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, এবার তাঁহার প্রদত্ত পত্রগুলি যথাস্থলে সন্নিবেশ করিতে ও নির্দিষ্ট ভ্রমগুলি সংশোধন করিতে পারিলাম না। কেশববাবু মধুসূদনের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণের এবং তাঁহার চিত্রসম্বন্ধে সাহায্যের জ্ঞাত, আমি কেশববাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতির শ্রায়, মধুসূদনের প্রতিভার অন্ততম উৎসাহদাতা, মহাভারতের লক্ষপ্রতিষ্ঠ অমৃতবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও চিত্র এবার প্রদত্ত হইল। এই চিত্র সম্বন্ধে সাহায্যের জ্ঞাত কালীপ্রসন্ন বাবুর শ্রদ্ধেয়া জননীর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিজয়চন্দ্র সিংহের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহকার্ধে আমি যাহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, গতবारे, অনবধানতাবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম নামক একটি উৎসাহী যুবকের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া, আমি অপরাধী হইয়া আছি। তাঁহার এবং সাহিত্যের স্বযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের যত্নেই মধুসূদনের সমাদৃষ্টস্তের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি ইহাদিগের উভয়ের নিকট এজ্ঞাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

বৈষ্ণবনাথ দেওঘর

ফাল্গুন, ১৩০১

}

প্রণয়কার



যোগীন্দ্রনাথ বসু, কবিভূষণ।

তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হইল। মধুসূদনের লিখিত অনেকগুলি নূতন পত্র ও পত্রাংশ এবার ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে এবং পূর্ব দুই সংস্করণে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি ছিল, তাহা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব প্রকাশিত চিত্রগুলির সঙ্গে মধুসূদনের শিক্ষক, প্রাচীন হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপক, কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের এবং মধুসূদনের প্রিয় নন্দী কপোতাক্ষীর এবং তাঁহার পৈতৃক ভবনের চিত্রও এবার ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত চিত্র দুইখানি, আশাত্মরূপ সূন্দর না হইলেও, বিষয় বিবেচনায়, বঙ্গ ভাষান্তরানুগীর্ণের নিকট সমাদর লাভ করিবে, ভরসা করি।

পূর্ব দুই সংস্করণে পূজ্যপাদ বিত্তাসাগর মহাশয়ের চিত্রখানি তাদৃশ সূন্দর ছিল না দেখিয়া স্বনামখ্যাত বাবসায়ী, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দে মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, আমার পরম প্রীতিভাজন সূর্যদেব, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে, দ্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত বিত্তাসাগর মহাশয়ের চিত্রখানি ইংলও হইতে নিজব্যয়ে ছাপাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্ত তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগই তাঁহাকে একাধে প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সাহায্যের জন্ত আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থখানি যাগাতে ভাষা, ভাব, মুদ্রাস্থন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ব দুই সংস্করণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে বিবেচিত হইলে সন্মত হইব। ইতি—

কলিকাতা

পৌষ, ১৩১২

গ্রন্থকার

চতুর্থ সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন

মধুসূদনের জীবনচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দিষ্ট হওয়ায় বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার কোন পরিবর্তন করা হয় নাই,—তৃতীয় সংস্করণই অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্তগণ যে গ্রন্থখানিকে সমাদরযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ইতি

কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩১৪

গ্রন্থকার।

সম্পাদকের নিবেদন

দীর্ঘকাল পরে আবার যোগীন্দ্রনাথ বসু লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত’ প্রকাশিত হল। মধুসূদনের জীবনীগ্রন্থ এ পর্যন্ত অনেক রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রামাণিকতা ও পূর্ণাঙ্গতার দিক দিয়ে এ বইটির সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। কেউ কেউ নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধুস্মৃতি’-কে এই বইয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, কিন্তু এই ধারণা তাঁদের ইতিহাস-সচেতনতার অভাব প্রমাণ করে। যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের বন্ধুদের কাছ থেকে, তাঁর চিঠিপত্র থেকে ও অন্যান্য প্রামাণিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বই লিখেছেন মধুসূদনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই। ঐ সব সূত্রকেও তিনি গ্রন্থের মধ্যে বা পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম যখন বই লেখেন (১৯২১ সাল)—তখন মধুসূদনের মৃত্যুর পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত খুব অল্প লোকই তখন জীবিত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্বন্ধে অনেক নতুন কাহিনী সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই সূত্র উল্লেখ করেন নি; ফলে ঐ নতুন কাহিনীগুলিকে কিংবদন্তীর চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথের ইতিহাস-নিষ্ঠা যে ছিল না, তা নয়—কিন্তু কল্পনার সাহায্য নিয়ে তথ্যের ফাঁক ভরাট করার দিকে তাঁর একটা কোঁক ছিল; তার নিদর্শন মেলে মধুসূদনের কাজের অজ্ঞাতনামী জীষ্ঠান কুমারীকে কৃষ্ণমোহনের কন্যা “দেবকী” বলে চালানোর মধ্যে এবং রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের “পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন” (divorce) হয়েছিল বলার মধ্যে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের ভক্ত হলেও মধুসূদনের দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রকৃত জীবনীকার ও ঐতিহাসিকের কর্তব্য তা-ই। ভক্তিতে গদগদ হয়ে মধুসূদনের আদর্শায়িত বিগ্রহ রচনা করলে তিনি কর্তব্যচ্যুত হতেন। মধুসূদনের দুঃখকষ্টের জ্ঞান তিনি নিজেই দায়ী—এ কথা বলতে যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হননি। এর প্রতিবাদ করে (‘মধুস্মৃতি’, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৩৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য) নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন, “যুগপ্রবর্তকের কার্যের উপর আবার মন্তব্য প্রকাশ কি?” কিন্তু যুগপ্রবর্তকও মানুষ, তাঁর জীবনও মানব-জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই চালিত হয়; তাই তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্টের মূল্য তাঁর চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে কিনা, তার অনুসন্ধান করা-অসম্ভব নয়। বায়রণ, শেলি প্রভৃতি মহাকাবিদের জীবনী খঁজা প্লচনা করেছেন, তাঁরাও এ বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, “মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন ; এই ‘ওরিজিনাল সিন’ হইতেই মধুসূদনের কাব্যের সব অপূর্ণতা ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশার উদ্ভব—ইহা প্রমাণ করাই যেন (যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। মাইকেলের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের এত সহজ সমাধান করিলে চলিবে না।” (‘মাইকেল মধুসূদন’, ভূমিকা) এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, “তাঁহার (মধুসূদনের) সর্বনাশের বীজ পঠদশাতেই (অর্থাৎ খ্রীষ্টান হবার আগেই) তাঁহার চরিত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল।” এ বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ এইসব কারণকে দায়ী করেছেন, (১) মধুসূদনের আত্মসংযম ও স্ত্রীনাতিপরায়ণতার অভাব, (২) তাঁর প্রতি পিতামাতার আদরের আধিক্য ও শাসনের অভাব, (৩) মধুসূদনের নিজের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছায় বিসর্জন দেবার শিক্ষা না পাওয়া। যত্নসহকারে মধুসূদনের জীবনী বিশ্লেষণ করে যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে তাঁর দুঃখদুর্দশার জন্ত দায়ী করেননি বা মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের কোন “সহজ সমাধান”-ও করেননি। “সহজ সমাধান” বরং প্রমথনাথ বিশী মহোদয়ই করেছেন একদিকে কাব্য-অল্পপ্রেরণা, অপর দিকে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা—জীবনের “এই দুই কোটির” মধ্যে সমন্বয় করতে না পেরে মধুসূদনের সাধনা ব্যর্থ হল বলে এবং তাঁর এই নিজস্ব মতের হাঁচে মধুসূদনের সমগ্র জীবনকে ঢালবার চেষ্টা করে।

এই বইয়ের বর্তমান সংস্করণের নানা পাদটীকায় ও সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে আমি যোগীন্দ্রনাথের কোন-কোন উক্তিকে খণ্ডন বা মণ্ডন করেছি, কিছু-কিছু নতুন তথ্যও সন্নিবেশ করেছি। বইটি ছাপা হবার সময়ে কিছুদিন আমি বিদেশে ছিলাম—ফলে এর অনেক অংশের প্রুফ দেখতে পারি নি। তার জন্ত এই সংস্করণে কিছু কিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে। আমি একটি গুরুতর ভুলের উল্লেখ করছি। মূল বইয়ের পরিশিষ্টের ঐ দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে বইয়ের নাম ছাপা না হয়ে “REMINISCENCES OF MICHAEL M. S. DUTTA” ছাপা হয়েছে। এইসব ত্রুটির জন্ত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (জীবনী)

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুন, বাঙালীর ভাগ্যাকাশে যে অশনি-পাত হয় তাতে সারা বাংলাদেশে যে শোকের শ্রোত বয়ে যায়, তার কোনো নজির নেই। সেই শোক আজও বাঙালী ভুলতে পারেনি, পারবেও না। সেই শোক হচ্ছে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু। মধুসূদনের অগণিত বান্ধবগণ মধুকবির একটি অনন্ত-সাধারণ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় দিকপাল ব্যক্তি। গত শতাব্দীর শেষ দিকে সাঁওতাল পরগণার দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবাগত যোগীন্দ্রনাথ বসুর। যোগীন্দ্রনাথ সাহিত্য-প্রাণ ছিলেন। তাঁকে সুযোগ্য ব্যক্তি বিবেচনায়, রাজনারায়ণ বসু তাঁর উপর মধুসূদন-জীবনী লেখবার ভার দিলেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ কার্য-পদ্ধতিও দেখিয়ে দিলেন।

যোগীন্দ্রনাথের তখন যৌবনাবস্থা। তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করলেন। আর একটি ঘটনার সংঘাতে তিনি এই জীবনীগ্রন্থ রচনার একটি অভাবিত সুবিধা পেয়ে গেলেন তাঁর জীবনের এক দুঃখময় পরিস্থিতিতে।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের এক ক্রান্তি-কাল। এই সময় বাংলাদেশে বহু মনীষীর উদ্ভব হয়। মধুকবির জীবনী-কার যোগীন্দ্রনাথকেও এই পর্যায়ে গণ্য করা যায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-ধারার মধ্যে দেখা যায় তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেওঘরের স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানে অবস্থানকালে 'সুরভি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এই সুরভিতে কয়েকটি লেখা প্রকাশ ব্যাপারে, তিনি রাজরোষে পড়লেন; শীঘ্রই তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটল ও দেওঘর থেকে রাজআদেশ বলে বিতাড়িত হলেন।

কলকাতা ফিরে তিনি মধুসূদন-জীবনী-গ্রন্থ লেখার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জ্ঞাত্য পেয়ে গেলেন এক অভিজাত ধনীপরিবারে পারিবারিক গৃহ-শিক্ষকের কাজ। রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর পিতৃহীন পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জ্ঞাত্য তাঁকে আহ্বান করলেন এবং সর্বতোভাবে যোগীন্দ্রনাথকে সহায়তা করলেন।

যোগীন্দ্রনাথ কবি ও প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। শেষ জীবনে কলকাতার উত্তর-অঞ্চল গোয়াবাগানে তিনি স্বগৃহে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন ও প্রচার করেছিলেন :

১. অমর কীর্তি অথবা ফাদার দামেয়েলের জীবন-চরিত।

১২৯৭ সাল।

২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত। ১৩০০ সাল।

৩. অহল্যাবাই। ১৩০২ সাল।

৪. তুকারাম চরিত। ১৩০৪ সাল।

৫. পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য। ১৩২২ সাল।

৬. শিবাজী মহাকাব্য। ১৩২৫ সাল।

এই কালজয়ী গ্রন্থগুলির রচনা ছাড়াও অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থ এবং কৃষ্টিবাসের রামায়ণের ও মধুসূদন-জীবন-চরিতের বাল্যপাঠ্য সংস্করণ সঙ্কলন করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয়, যোগীন্দ্রনাথ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' গ্রন্থের জ্ঞাত্য মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে অমরতা লাভ করেছেন।

সূচীপত্র

প্রথম	অধ্যায় : বাল্যজীবন [১৮২৪ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]	১-১২ পৃষ্ঠা
দ্বিতীয়	অধ্যায় : মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে হিন্দুকলেজের এবং বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা	২০-৬৪
তৃতীয়	অধ্যায় : হিন্দুকলেজ—শিক্ষাবস্থা [১৮৩৭—১৮৪০]	৩৫-৫৬ „
চতুর্থ	অধ্যায় : শিক্ষাবস্থা-কবিতা রচনার অভ্যাস [১৮৪১—১৮৪২]	৫৭-৯০ „
পঞ্চম	অধ্যায় : খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিশাল কলেজে অধ্যয়ন [১৮৪৩—১৮৪৭]	৯১-১০৭ „
ষষ্ঠ	অধ্যায় : মাদ্রাজ-প্রবাস [১৮৪৮—১৮৫৬]	১০৮-১৪৬ „
সপ্তম	অধ্যায় : মাদ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা	১৪৭-১৬১ „
অষ্টম	অধ্যায় : বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ [১৮৫৭—১৮৫৮]	১৬২-১৭৫ „
নবম	অধ্যায় : শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা—প্রাচ্য কবিদের প্রভাবকাল—[১৮৫৮—১৮৫৯]	১৭৬-১৯৮ „
দশম	অধ্যায় : প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল—বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য [১৮৬০]	১৯৯-২৩১ „
একাদশ	অধ্যায় : গ্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া [১৮৫৯-১৮৬০]	২৩২-২৬১ „
দ্বাদশ	অধ্যায় : পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাবকাল—মেঘনাদবধ কাব্য [১৮৬১]	২৬২-৩৩১ „
ত্রয়োদশ	অধ্যায় : ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক [১৮৬১]	৩৩২-৩৮৮ „
চতুর্দশ	অধ্যায় : বীরাঙ্গনা কাব্য [১৮৬২]	৩৮৯-৪১৬ „
পঞ্চদশ	অধ্যায় : যুরোপ প্রবাস—চতুর্দশপদী কবিতাবলী । [১৮৬২-১৮৬৬]	৪১৭-৪৬৪ „
ষোড়শ	অধ্যায় : শেষজীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেক্টরবধ ও মায়াকানন [১৮৬৭—১৮৭৩]	৪৬৫-৪৮৭ „
উপসংহার—	৪৮৮-৫০০ „

বিষয় নিরূপণ

প্রথম অধ্যায়

বাল্যজীবন

[১৮২৪—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

সূচনা—জন্মভূমি—পিতৃপুরুষগণ ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান—পিতা ও পিতৃব্যগণ—বংশ বিবরণ—কুলক্রমাগত দোষগুণ—পিতা ও পিতৃব্যের প্রকৃতি—পিতার দোষগুণ—মাতা ও বিমাতাগণ—জন্ম-বৎসর—বাল্যকথা—মাতার প্রকৃতি—বাল্য স্বভাব—বিদ্যারম্ভ—উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যাহারাগ—কাব্যাহুরক্তি—রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অহুরাগ—রামায়ণ, মহাভারত পাঠের ফল—শৈশব শিক্ষা—সঙ্গীতপ্রিয়তা—জন্মভূমির সৌন্দর্য—জন্মভূমির প্রতি অহুরাগ—শৈশব-শিক্ষার ফল—সাধারণ প্রকৃতি—শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন। ১—১২ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে হিন্দুকলেজের

এবং বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

হিন্দু কলেজ—মধুসূদনের কাব্যের দোষ—দোষের কারণ—বিপ্লব কাল—ডিরোজিয়ার প্রদত্ত শিক্ষার ফল—ডিরোজিয়ার প্রদত্ত শিক্ষার গুণ—ডিরোজিয়ার ছাত্রগণ—ডিরোজিয়ার শিক্ষার বিশেষত্ব—ডিরোজিয়ার প্রদত্ত শিক্ষার দোষ—ডিরোজিয়ার ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও যেচ্ছাচারিতা—ডিরোজিয়ার শিক্ষার সমকালীন ঘটনাবলী—ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ফল—বিপ্লবকালের উপকারিতা—ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রম—বঙ্গভাষার উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব—মধুসূদনের সম্বন্ধে হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার ফল—জাতীয় ভাব ও সাহেবিদ্যানা—সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ ২০—৩৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুকলেজ—শিক্ষাবস্থা।

[১৮৩৭—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

হিন্দুকলেজ ও ইহার শিক্ষকগণ—কলেজীয় শিক্ষা ও গৌরব লাভ—সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রগণ—শিক্ষাবিবরণ—গণিত ও সাহিত্য—ইংরাজী রচনার অভ্যাস—শ্রেয়প্রবণতা—বাল্যবন্ধুগণ—ছাত্রাবস্থায় লিখিত পত্র—বায়রণ ও মধুসূদন—আত্মসংযমের ও সুনীতির অভাব—কথাচার ও কদম্যাস—গৃহ ও বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার অভাব—বায়রণকে আদর্শ করিবার ফল। ৩৫—৫৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়

শিকাবহা—কবিতা রচনার অভ্যাস ।

[১৮৪১—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্ডসন—ডিরোজিয়ো-র ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষার পার্থক্য—উভয় প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন ফল—রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা—বায়রণ, স্কট, মুর এবং ডিরোজিয়োর প্রভাব—কবিতা-কৌড়া—প্রথম বাঙ্গালা কবিতা—বাঙ্গাল ভাষার তৎকালীন অবস্থা—ইংরাজী-রচনায় উৎসাহ লাভ—স্ট্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ—নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস—ইংলণ্ডে গমনের জ্ঞাত আকাজক্ষা—অন্তর্নিহিত স্বদেশাত্মরাগ—হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার নির্যাস । ৫৭-৯০ পৃষ্ঠা ।

পঞ্চম অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন ।

[১৮৪৩—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ—হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতিকূলতা—খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন—অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব—মনোনীত-পত্নী লাভের ও ইংলণ্ডগমনের আশা—পিতৃ-গৃহ ত্যাগ ও কল্লায় অবস্থান—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ—পিতামাতার ব্যবহার—বিশপ্স কলেজে প্রবেশ—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফল—বাবহারিক—সামাজিক—সাহিত্যিক—বিশপ্স কলেজে শিক্ষার ফল, ভাষা-শিক্ষায় অগ্রগতি—বিশপ্স কলেজে অবস্থানকালীন ব্যবহার—উচ্ছ্বলতা ও তজ্জনিত অশান্তি—মাদ্রাজ গমন । ৯১—১০৭ পৃষ্ঠা ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদ্রাজ-প্রবাস

[১৮৪৮—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

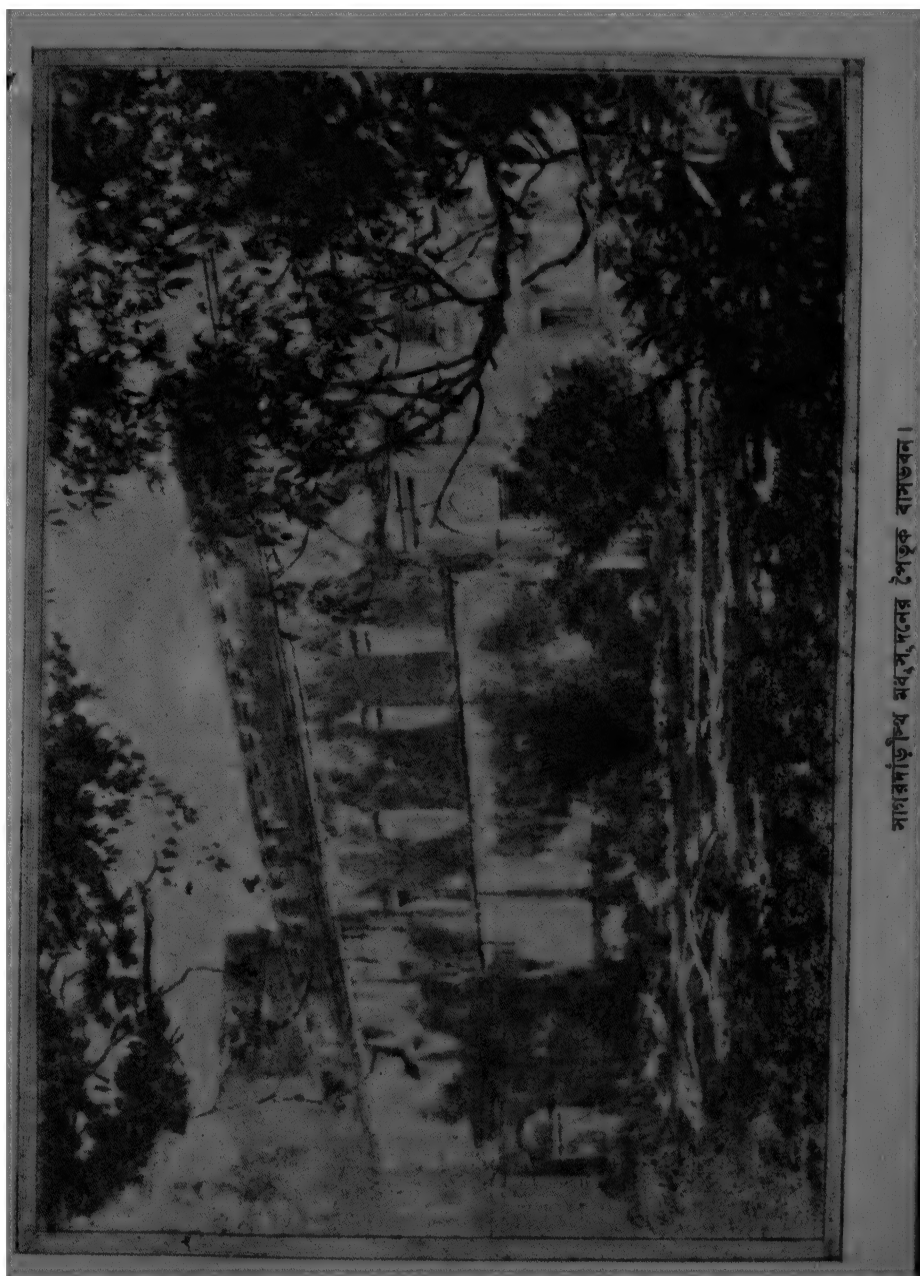
মাদ্রাজ বাসকালীন অবস্থা—সাহিত্য-সেবা—ক্যাপ্টিভ লেডী রচনা—ক্যাপ্টিভ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়—ক্যাপ্টিভ লেডীর ভাষা ও ভাব—ভিসক্স-অফ-দি-পাষ্ট ও তাহার অবলম্বিত বিষয়—সাংসারিক কথা-বিবাহ—পত্নী-ত্যাগ—গার্হস্থ্য-অশান্তি—মাদ্রাজে ক্যাপ্টিভ লেডীর সমাদর—কবির উল্লাস ও অবসাদ—কলিকাতায় ক্যাপ্টিভ লেডীর অনাদর—‘হরকরা’ পত্রিকার বক্রোক্তি—ক্যাপ্টিভ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব—বেথুনের উপদেশ ও পত্র—স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার তারতম্য—মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা—সাংসারিক অবস্থা—মাদ্রাজ ত্যাগ । ১০৮—১৪৬ পৃষ্ঠা ।

সপ্তম অধ্যায়

মাদ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—উৎকালীন

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা

স্বদেশে প্রত্যাগমন, পূর্বাভাসের পরিবর্তন—মধুসূদনের নিজের পরিবর্তন—সামাজিক পরিবর্তন—বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা ; বিভাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি—হেয়ার স্বরণার্থ সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা—ঈশ্বরচন্দ্র



সাগরদীপ্তি মাধুসূদনের গৈতুক বাসভবন।

গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর—তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ—মাসিক পত্রিকা—ইংরাজী শিক্ষিতগণের বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা—বাঙ্গালা গল্পের উন্নতি—বাঙ্গালা গল্পের অভাব—অভাব পূরণার্থ মধুসূদনের আবির্ভাব—বাঙ্গালা কবিতার বিভিন্ন যুগ—মধুসূদনের পূর্বে বাঙ্গালা কবিতার অবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—গুপ্ত-কবির শিষ্যগণ—গুপ্ত-কবির কবিতার বিশেষত্ব—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মধুসূদন—কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অবস্থা—নূতন পথে লক্ষ্য । ১৪৭—১৬১ পৃষ্ঠা ।

অষ্টম অধ্যায়

বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ

[১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংরাজাধিকারে নাট্যশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার—স্বাৰ্জ্জি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা—নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে বিজ্ঞানস্বৰ্ণকর নাটক অভিনয়—হিন্দু কলেজে কাণ্টেন রিচার্ডসনের এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে হার্মান জেক্সয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ফল—বাঙ্গালা নাটকের অভাবে ইংরাজী নাটকের অভিনয়—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার—কুলীন-কুল-সর্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহার এবং বিক্রমোর্বলী নাটক অভিনয়—স্থায়ী নাট্যশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব—বেলগাছিয়া নাট্যশালা—একতানবাদন সম্প্রদায় গঠন—রত্নাবলী নাটক—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ—রত্নাবলী-অভিনয়—রত্নাবলী অভিনয়ের কল—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের প্রশংসা—মধুসূদনের গম্ভীৰ্য্য পথপ্রাপ্তি । ১৬২—১৭৫ পৃষ্ঠা ।

নবম অধ্যায়

শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা—

প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল

[১৮৫৮—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]

বাঙ্গালা নাটক রচনার সংকল্প—প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শর্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে উপেক্ষা—শর্মিষ্ঠা অভিনয়—শর্মিষ্ঠার অবলম্বনীয় বিষয়—শর্মিষ্ঠার দোষ—শর্মিষ্ঠার গুণ—শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী—শর্মিষ্ঠার ভাষা—শর্মিষ্ঠার ও রত্নাবলীর সাদৃশ্য—শর্মিষ্ঠা রচনা ইহাতে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ—পদ্মাবতী ও তাহার অবলম্বনীয় বিষয়—পদ্মাবতীর দোষগুণ—পদ্মাবতীর ভাষা । ১৭৬—১৯৮ পৃষ্ঠা ।

দশম অধ্যায়

প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল—বাঙ্গালা ভাষায়

অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত কথোপকথন—তিলোত্তমা-সম্ভব রচনা—তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে মধুসূদনের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভবিষ্যৎ বাণী—তিলোত্তমা-সম্ভবের বর্ণনীয় বিষয়—কৈতব প্রসিদ্ধিত দেবরাজের হিমাচল শৃঙ্গে অবস্থিতি—শচীদেবীর আগমন—দেবদম্পতীর ব্রহ্মলোক গমন—দেবদম্পতি—ইন্দ্ৰ-

চরিত্র—যম—বায়ু—কার্তিকেয়—কুবের—বরুণ—তিলোত্তমার উৎপত্তি—তিলোত্তমার উপসংহার—তিলোত্তমাসম্ভবের দৌষগুণ—মধুসূদনের প্রথম রচিত গ্রন্থসমূহে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব—প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব—তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত—তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত—রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত—স্বারকনাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের মত । ১২২—২৩১ পৃষ্ঠা ।

একাদশ অধ্যায়

প্রহসন রচনা

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া

[১৮৫৯—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা—একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয়—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া—মধুসূদনের প্রহসন দ্বয়ের দৌষগুণ । ২৩২—২৬১ পৃষ্ঠা ।

দ্বাদশ অধ্যায়

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব-কাল—মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

মেঘনাদবধ রচনা—মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়—কাব্যের সর্গ-বিভাগ—রাক্ষস-রাজের সভা—রাক্ষসরাজের লক্ষাপুরী ও রণক্ষেত্র দর্শন—রাক্ষসরাজ ও চিত্রাঙ্গদা—চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের মৌলিকতা—রাক্ষসরাজের রণসজ্জা—বারুণী-চরিত্র—মেঘনাদ ও প্রমীলা—বৃত্ত ও রাক্ষসরাজ—মেঘনাদের অভিষেক—হরপার্বতী, জুপিটর ও জুনো—ইলিয়াড ও কুমারসম্ভবের ঘটনা সংমিশ্রণ—কুমারসম্ভবের উচ্চ আদর্শ—মেঘনাদবধে কুমারসম্ভবের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি—রাক্ষসদিগের সম্বন্ধে মহর্ষির ও মধুসূদনের ভিন্ন আদর্শ—প্রমীলা-চরিত্র—প্রমীলার রণসজ্জা ও লক্ষা প্রবেশ—প্রমীলার বিশেষত্ব—প্রমীলা-চরিত্রের উৎপত্তি—কাশী দাসের প্রমীলা—প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা—মেঘনাদবধের প্রধান দৌষ—সীতাচরিত্র—সীতাদেবীর দণ্ডকাবাস—মধুসূদনের সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব—লক্ষণের দেবীপূজা—মাতা ও পত্নীর নিকট মেঘনাদের বিদায়—গ্রহণ—মেঘনাদের চরিত্র—লক্ষণ ও মেঘনাদ—যজ্ঞাগারস্থিত-মেঘনাদ—লক্ষণ-চরিত্রের হীনতা—হীনতার কারণ—মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার—বীরভদ্রের আগমন—রাক্ষসরাজ ও মল্লোদরী—লক্ষণ ও রাক্ষসরাজ—রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতা—ইলিয়াডের ও রামায়ণের ঘটনাবলীর সংমিশ্রণ—স্বর্গ ও নরক কল্পনার কারণ—মধুসূদনের কল্পিত স্বর্গ ও নরক—মেঘনাদবধ কাব্যে করুণ-রসের প্রাধান্ত—মেঘনাদের প্রোতকৃত্য—রাক্ষসরাজের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তন—অশানস্থিতা প্রমীলা—কাব্যের সার্থকতা—মেঘনাদের ও প্রমীলার স্বর্গারোহণ—কাব্য-সমাপ্তি—মেঘনাদবধ কাব্যের দৌষ-গুণ—অনার্য প্রীতি—মেঘনাদবধ কোন শ্রেণীর কাব্য?—মেঘনাদবধের মৌলিকতা—মেঘনাদবধের ভাষা—মেঘনাদবধ কাব্যের সমাদর—কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অভিনন্দন । ২৬২—৩৩১ পৃষ্ঠা ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ব্রজবন্দ্য কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক [১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিতার পার্থক্য—ব্রজবন্দ্য মধুসূদনের আদর্শ—
রাধিকার দিব্যোন্মাদ—রাধিকার প্রকৃতিগত মাদুর্য—রাধিকার অভিমান—ব্রজবন্দ্য
বৈচিত্র্যের ভাব—ব্রজবন্দ্য ভাষা—কৃষ্ণকুমারী নাটক—বিজিয়া নাটক রচনার
সকল—কৃষ্ণকুমারীর উৎপত্তি—কৃষ্ণকুমারীর অবলম্বনীয় বিষয়—কৃষ্ণকুমারীর—
ঐতিহাসিক মূল্য—উদয়পুরের রাজপরিবারের অবস্থা—কৃষ্ণকুমারী—ভীমসিংহ—
কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু—বিলাসবতী ও ধনদাস—বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটক
সমূহের কার্য। ৩৩২—৩৮৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দশ অধ্যায় বীরবন্দ্য কাব্য [১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ]

পারিবারিক কথা—আত্মবিলাপ—বীরবন্দ্য কাব্যে গম্ভীর ও কোমল ভাবের
সম্মিলন—বীরবন্দ্যের আদর্শ—কাব্য-বিভাগ—প্রেম-পত্রিকা—প্রত্যাখ্যান-পত্রিকা—
প্রোবিতভর্তৃকার পত্রিকা—অভ্যুযোগ-পত্রিকা—বীরবন্দ্যের দোষ—বীরবন্দ্যের ভাষা—
সাংসারিক কথা—ইংলও-যাত্রা। ৩৮২—৪১৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায় মুরোপ প্রবাস—চতুর্দশপদী কবিতাবলী [১৮৬২—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংলও গমন—ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও গ্রেস ইন ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ—মুরোপ—
প্রবাসকালীন দূরবস্থা—ভাষাশিক্ষা—সীতা কাব্য—হুভদ্রাহরণ কাব্য—চতুর্দশপদী
কবিতাবলী—প্রবাস কাল সমাপ্তি। ৪১৭—৪৬৪ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায় শেষ জীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেক্টরবধ ও মায়াকানন [১৮৬৭—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

মুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়—সাহিত্য-সেবা—নীতি-
মূলক কবিতা—হেক্টর বধ—অস্তিম জীবনের কথা—অর্থাত্তাব ও উদারতা—মানসিক
যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা—শারীরিক অবস্থা—পঞ্চকোটের রাজার অধীনে
কার্য—সাংসারিক অবস্থা—মায়াকানন—পীড়িতাবস্থায় শেষ সাহায্য—উত্তরপাড়ায়
বাস—পীড়াকালীন দূরবস্থা—আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন—হেনরিয়েরটার
মৃত্যু—মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন—অস্তিম অপরাধ স্বীকার ও
প্রার্থনা—পরলোক গমন। ৪৬৫—৪৮৭ পৃষ্ঠা।

উপসংহার

মধুসূদনের গ্রন্থের ও জীবনের সৌন্দর্য—বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য—
মধুসূদনের প্রতিভার বিশেষত্ব—আকৃতি ও প্রকৃতি—ধর্মবিশ্বাস—মধুসূদনের জীবনের
উপদেশ—মধুসূদনের পুত্র-কন্ডাগণের কথা—মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণের
কার্য—মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা। ৪৮৮—৫০০ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট

বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	১-২১ পৃষ্ঠা
„ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	২১-২৬ „
„ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	২৬-২৮ „
মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	২৯-৩১ „
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	৩১-৩২ „
বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	৩২-৪০ „
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	৪০-৪৪ „
„ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য ।	৪৫-৫২ „

সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট :

মধুসূদন ও হেনরিয়েটা	৫৩-৫৪ „
মধুসূদন-কাস্তিত ঈষ্টান কুমারী কে ?	৫৪ „
মধুসূদন ও ‘দেবকী’	৫৫-৬১ „
হেনরিয়েটা কি বাংলা জানতেন ?	৬১-৬২ „
মধুসূদন কি মায়াকামন সম্পূর্ণ করেছিলেন ?	৬২ „
নির্দেশিকা	৬৩-৭২ „

চিত্রশৃংখলা

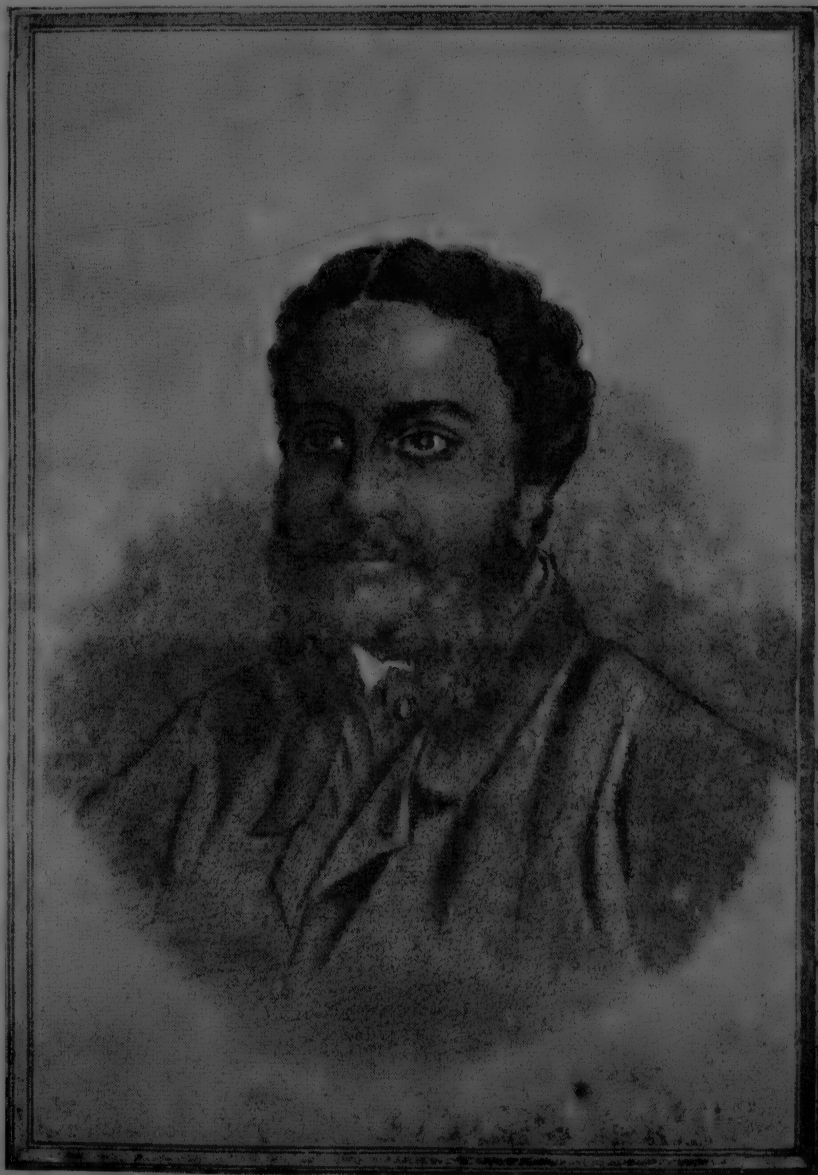
১। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ।	
২। সাগরদাঁড়ীস্থ মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবন।	প্রারম্ভ পত্র
৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।	১ পৃষ্ঠা
৪। কপোতাক্ষীর ও সাগরদাঁড়ীর দৃশ্য।	১৬ ”
৫। স্বর্গীয় গৌরদাস বশাক।	৪০ ”
৬। কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন।	৫৭
৭। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, C. I. E.	১৩৭
৮। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।	১৬১
৯। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।	১৬৮
১০। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, K. C. S. I.	২০০
১১। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।	২৪০ ”
১২। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।	৩৪৫
১৩। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।	৩৫৩
১৪। মধুসূদনের হস্তলিপির প্রতিক্রম।	৪২৪
১৫। পণ্ডিতবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	৪৮৮
১৬। মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ।	৪৯৯

সমাধি স্তম্ভ

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বক্ষে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

ଆଇକେଲ ଅଧୁନୁଦ୍ୟ ନୂତନ
ଜୀବନ-ଚନ୍ଦ୍ରିତ ।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাল্য-জীবন

(১৮২৪--১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)

১

প্রতাপাদিত্যের জননী, প্রাচীন যশোহর ভূমি, একদিন বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক যশোহর প্রাচীন যশোহর হইতে বিভিন্ন। দেশ, কালের পরিবর্তনে আধুনিক যশোহর সেই পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহার “যশোহর” নাম অত্যাধিক নিরর্থক হয় নাই। বিধাতা ইহাকে এক অভিনব সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। কবি-জননী বলিয়া ইহার, এখনও, বঙ্গের অনেক স্থানের উপর, স্পর্ধা করিবার সূচনা--জন্মভূমি।

অধিকার আছে।* আধুনিক যশোহরের অন্তর্গত সাগর-দাঁড়ী গ্রাম মেঘনাদ বধ-রচয়িতা মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। সাগরদাঁড়ী, যশোহর নগর হইতে আটশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিন দিক বেঠন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সংসারে তাহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান, তাঁহাদিগের জনক-জননীর নামের সঙ্গে তাঁহাদিগের জন্মভূমির নামও অমরতা লাভ করে। ভক্ত-কবি জয়দেবের স্মৃতি কেন্দুবিষ ও অজয়কে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে ; মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর এবং তাঁহার প্রিয়নদী কপোতাক্ষীর নামও বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

সাগরদাঁড়ী মধুসূদনের পূর্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান। প্রপিতামহ, রামকিশোর দত্ত, খুলনা জিলার অন্তর্গত তালাগ্রামে বাস করিতেন। রামকিশোরের তিন পুত্র, প্রথম রামনিধি, দ্বিতীয় দয়্যারাম, এবং তৃতীয় মানিকরাম। পিতৃবিয়োগের পর রামনিধি, কনিষ্ঠদ্বিগকে সঙ্গে লইয়া তালাগ্রাম পরিত্যাগ-পূর্বক, সাগরদাঁড়ীতে মাতামহাশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সাগরদাঁড়ী সেই সময় হইতে দত্তবংশীয়দিগের বাসস্থান হইয়াছে। রামনিধির চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন, মধ্যম মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। মধুসূদন রাজনারায়ণের পুত্র।

* প্রতাপাদিত্যের “যশোহর” এক্ষণে অন্নগাওঁতে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐযবে ঐযবে পৌড়ের যশ হরণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহা যশোহর নাম লাভ করিয়াছিল।

মধুসূদনের পিতা ও পিতৃবাগণ সকলেই বুদ্ধিমান, উপাঙ্গনকম এবং স্বধর্মী-স্বমোদিত ক্রিয়া-কর্মে একান্ত অন্তরকৃত ছিলেন। সে সময়ে বেক্রপ বিস্তার সমাদর ও প্রচলন ছিল, তাঁহারা কেহই তাহার উপাঙ্গনে ক্রটি করেন নাই।

দানশীলতা, সৌজন্য এবং অতিথি, অভ্যাগতের সেবা পিতা ও পিতৃবাগণ।

প্রভৃতি যে সকল সদগুণের জন্ত, সাগরদাঁড়ীস্থ দত্ত পরিবার, এখনও, তাঁহাদিগের স্বদেশীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগের চারি ভাতার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা তাঁহাদিগের পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়া-ছিল। কিন্তু এই সকল সদগুণের সঙ্গে তাঁহাদিগের চরিত্রে দুই একটি গুরুতর দোষও বর্তমান ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও, বিশেষতঃ, মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণের, মিতব্যয়িতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে দৃষ্টি ছিল না।

মধুসূদনের পিতামহ রামনিধি দত্তের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত হইতেই তাঁহাদিগের বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। রাধামোহন তৎকাল-সমাদৃত পারস্ত-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় অর্থোপাঙ্গন সম্বন্ধে যত্ন প্রকাশ না করিয়া, পল্লীগ্রামস্থ, পরিশ্রম-কাতর অনেক যুবকের ত্রায়, আলস্বে ও ঐদাস্বে দিনপাত করিতেন। বুদ্ধ রামনিধি একদিন এইজন্য পুত্রকে কঠোর তিরস্কার করিলে রাধামোহন অভিমানে গৃহত্যাগ করেন এবং “উদরায়ের সংস্থান করিতে না পারিলে আর গৃহে ফিরিব না,”—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যশোহরে গমন করেন। তিনি যখন, যশোহরে কোন কোন আত্মীয়ের আলায়ে অবস্থান-পূর্বক, বিষয়-কর্মের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়, একদিন

কল-বিবরণ।
জিলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পারস্ত-ভাষায় লিখিত একখানি রিপোর্ট আসে। যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাহা পাঠ করিতে পারেন নাই। যুবক রাধামোহন, ঘটনাক্রমে, সে সময়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রিপোর্টখানি চাহিয়া লইয়া, সুন্দররূপে পাঠ করাতে সাহেব, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপনার অধীনে একটি কর্ম দিলেন। সেই হইতে দত্ত বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। যুবক রাধামোহন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিগুণে, অল্প দিনের মধ্যে, প্রভূর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং ক্রমে, ক্রমে আদালতের সর্বোচ্চপদ সেরেস্তাদারিতে উন্নীত হইলেন। রাধামোহনের উন্নতির সঙ্গে তাহার অপর ভ্রাতাপুত্রেরও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার মধ্যম মনমোহন প্রথমে যশোচরের মীর-মুল্লি এবং পরে, কুমারখালির মুজফ নিযুক্ত হইলেন। তৃতীয়

দেবীপ্রসাদ যশোহরের ও সর্বকনিষ্ঠ রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইলেন। চারি ভ্রাতাই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ ও দানাদি দ্বারা দত্তবংশ, এই সময় হইতে, যশোহর-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল।*

কুলক্রমাগত প্রকৃতি অল্পসারে মধুসূদন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারিতেন। ধূলিমুষ্টি ও অর্থ উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিকট অধিক ইতরবিশেষ ছিল না। এই ব্যয়শীলতার জ্ঞায় কবিশক্তিও তিনি, কিয়ৎপরিমাণে, পিতৃপুরুষগণের প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পিতৃমাতৃ-কুলক্রমাগত দোষগুণ।

বংশীয়গণের মধ্যে প্রকৃত কবি নামের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি, কখনও, জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকই কবিতানুরাগী ছিলেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার খুল্পিতামহ, মাণিকরাম দত্ত, পারশ্র-ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মাণিকরাম কোন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মুসলমানের অধীনে কর্ম করিতেন এবং প্রতিদিন প্রভুকে পারশ্র-ভাষায় স্বরচিত এক একটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা এরূপ সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী হইত যে, মুসলমান জমিদারের তরুণবয়স্ক কুমারী, শুনিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। মাণিকরামের প্রভু, কত্তার মনোগত ভাব অবগত হইয়া, মাণিকরামকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিকরাম কিছুতেই স্বধর্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি মুসলমান জমিদারের কাঁধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যে তিনি, সংসারাত্মক পরিত্যাগপূর্বক, সম্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আকস্মিক বৈরাগ্যের জন্ত কেহ, কেহ অস্বাভাবিক করেন যে, প্রভু-কত্তার অনুরাগের প্রতিদান করিতে না পারিয়াই, মাণিকরাম অশান্ত হৃদয়ে, সাংসারিক হৃথের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।‡

* দত্তবংশের ব্যয়শীলতা সঘণ্টে একটি বৃত্তান্ত নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। প্রথম চাকুরীর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য, রাধামোহন দত্ত, পুত্রের কল্যাণোদ্দেশে, ১০৮ কালী দেবীর পূজা করেন। তাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেঘ, ১০৮টি ছাগ একসঙ্গে বলি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং ১০৮টি হুবর্ণনির্মিত জবাপুষ্প অঞ্জলি অর্পিত হইয়াছিল। সাগরদাঁড়ীর প্রাচীন ব্যক্তিগণ, এখনও, এই পূজার বিষয় সগৌরবে কীর্তন করিয়া থাকেন।

‡ আমার সম্মানভাজন মৃত্যু বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর নিকট দত্তবংশীয়দিগের পরিচিত কোন ব্যক্তি মাণিকরামের বৃত্তান্তটি অলীক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মধুসূদনের ভ্রাতৃপুত্রী বঙ্গ সাহিত্যে কথিনী, ঐশ্বরী মানকুমারী ইহা সমূলক বলার আমি তাহা প্রত্যাশ করিয়াছি।

মধুসূদনের তৃতীয় পিতৃব্য, দেবীপ্রসাদ দত্তও, কিয়ৎপরিমাণে, কবিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। সামান্য, সামান্য অনেক কথা তিনি পড়ে মিলাইয়া বলিতে পারিতেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, স্বয়ং কবিত্ববান না হইলেও,

একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা, পিতা ও পিতৃবোর সঙ্গীত, এবং শিল্প প্রভৃতি স্বকুমার কলায় তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতি।

অসুরাগ ছিল। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে আনন্দবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পুরাণাদিগের মধ্যে বাঁহারা শিল্পকাণ্ডে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন, তিনি, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, অনেক সময়, পুরস্কার দান করিতেন। যে সৌন্দর্যোপাসনা মধুসূদনের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত, জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের বড়ই আদরের ছিলেন, এবং সেইজন্য বাল্য হইতেই বিলাসিতায় ও ভোগ-সুখে পিতার দোষগুণ।

অভ্যাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসস্পৃহ ছিলেন বলিয়া তিনি, কখনও, বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। পারস্ত-ভাষায় তাঁহার অতি সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং সেইজন্য তিনি পরে মুন্সী রাজনারায়ণ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধামোহনের ন্যায় তিনিও, অভিমানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, আন্দামানিয়ার আশায়, কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি-বলে পরিণামে, সদর দেওয়ানী-আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী উকীল সদর-দেওয়ানী আদালতে অতি অল্পই ছিলেন। অপর ভ্রাতাগণের ন্যায় তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন এবং মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন। দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। যে সরস বাক্পটুতাগুণে মধুসূদন সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিতে পারিতেন, তাহা তিনি তাঁহার পিতারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্র, পিতার দোষগুণ উভয়েরই অধিকারী হইয়া থাকেন; মধুসূদনেও এ নিয়মের অন্তথা হয় নাই। পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, এবং বাক্পটুতা প্রভৃতি সদগুণের সহিত বিলাসিতা, অপরিমিতব্যয়িতা, আত্মলাগা প্রভৃতি দোষও তিনি পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলেন। আত্মসংযমেই যে প্রকৃত মনুষ্য, পিতা, পুত্র কাহারও সে জ্ঞান ছিল না।

মধুসূদনের পিতার চারি বিবাহ। প্রথমা পত্নীর জীবদ্দশাতেই রাজনারায়ণ দত্ত আর তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। মধুসূদন প্রথমার গর্ভসম্প্রসূত। তাঁহার

দত্তবংশের জায় মাতৃবংশও, এক সময়ে যশোহর সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ছিল। তাঁহার মাতা জাহ্নবীদাসী বর্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত কাটপাড়ার জমিদার গোঁরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। মধুসূদনের মাতা ও বিমাতাগণ।

বিমাতাগণের মধ্যে প্রথমার নাম শিবসুন্দরী, দ্বিতীয়ার নাম প্রসন্নময়ী, এবং তৃতীয়ার নাম হরকামিনী। মধুসূদনের জননী জাহ্নবীদাসী ও শিবসুন্দরী স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন; অপর দুইজন বিববাবস্থায় কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

মধুসূদন বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। মেটে বৎসর বঙ্গদেশের আরও একটি সুসন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন বঙ্গীয় কাব্য সম্পক্ষে এক নবযুগ প্রবর্তিত কবিতা গিয়াছেন, তিনিও তেমনই বাঙ্গালীর জন্ম-বৎসর।

সম্পাদিত সংবাদপত্র সম্পক্ষে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু পেট্রিট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও যশস্বী সম্পাদক, স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার কবিতায় ও বঙ্গীয় সংবাদপত্রে নবযুগ প্রবর্তনের জন্ত মধুসূদন ও হরিশ্চন্দ্রের জন্ম বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হইবে।*

মধুসূদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন দত্তবংশের বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা; স্ততরাং তাঁহার জাতকর্মাদি অতি সমারোহের সহিত বাল্যকথা।

বলিয়া তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার জন্ম-গ্রহণের চারি বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে তাঁহার আরও দুইটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের এক বৎসর ও মহেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। দুইটি ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতা, ভগ্নীর অভাবে

* মধুসূদনের জন্ম বৎসর সম্পক্ষে প্রায় সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভেও তাঁহার জন্ম-বৎসর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা সালের সঙ্গে ১৯৩ বোণ করিলে, ইংরাজী অব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানুয়ারি মাসে ইংরাজী নূতন বৎসর প্রবর্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালা সাল তখনও আরম্ভ হয় না। সেই জন্ত জানুয়ারি হইতে মার্চ পর্যন্ত গণনায় ১৯৪ বোণ করা আবশ্যিক। মধুসূদনের জন্মবৎসর বাঙ্গালা ১২৩০ সালের সঙ্গে ১৯৩ বোণ না করিয়া, যে ১৯৩ বোণ করা কর্তব্য ছিল, তাহা, বোধ হয়, সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতৃগণের অরণ্য হয় নাই।

মধুসূদন পিতা, মাতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও, বোধ হয়, সেরূপ হয় না।* তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জ্ঞান, তাঁহাকে দোষ দিতে প্ররুতি হয় না। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ গুরুজনেরা তাঁহাকে সকল কার্যেই প্রসন্ন দান করিতেন। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তিনি তখন তাহাই করিতেন; বিশেষ অন্তায় কাৰ্য করিলেও কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতেন না। শৈশবে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রসন্নদানের ফল এই হইয়াছিল যে, বাল্য হইতেই, মধুসূদন স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন : এবং সেইজন্ত উত্তরকালে যে কাজ তাঁহার ভাল বোধ হইত, সঙ্গতই হউক, আর অনঙ্গতই হউক, সহস্র নিবারণ সত্ত্বেও, তিনি তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। অন্যান্য অনেক সদগুণের ত্রায় আত্মসংযমও, বাল্য হইতে শিক্ষা না করিলে, পরিণত বয়সে শিক্ষা করা দুৰূহ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, পিতামাতার ও আত্মীয়গণের অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ, মধুসূদন শৈশবে আত্মসংযম শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

সজ্জনতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ মধুসূদন ধেমন্ তাঁহার পিতৃপ্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক সরল, উদার মন ও প্রেম-প্রবণ, কোমল-হৃদয় তিনি তেমনই তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতি হইতে লাভ মাতার প্রকৃতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার ত্রায় স্নেহপরায়ণ ও পরদুঃখকাতরা রমনী, স্বভাব-কোমলা বঙ্গ-মহিলাদিগেরও মধ্যে, অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর ত্রায় তিনিও মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং আমোদ, আশ্লাদে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। স্বামিসেবা তিনি পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেন না। তাঁহার জীবদ্দশাতে রাজনারায়ণ দত্ত যদিও আর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি কখনও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। মধুসূদন মাদ্রাজে গমন করিলে রাজনারায়ণ দত্ত, পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা

* কিরূপ আদরে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ দুই-একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি স্নানার্থ গমন করিলে, কি জানি যদি তাঁহার কিরিয় আসিতে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় একেবারে ৭৭টি চুলীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুলীর অন্ন সর্বাংশে ক্ষয় হইত, তিনি তাহা আহার করিতেন।

করিয়া, তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন ; “দেখ আমাদিগের পুত্রটি ত আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, তোমার আর সম্ভান হইবার আশা নাই, আমাদিগের জলপিণ্ডের উপায় কি হইবে ?” জাহ্নবীদাসী, শুনিয়া, অগ্নানমুখে বলিয়াছিলেন ; “তুমি পুনরায় বিবাহ কর, তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল ; যদি তোমার পুত্র জন্মে, তুমিও স্বর্গ-লাভের অধিকারী হইবে, আমিও হইব।” বহুপত্নীক হইলেও রাজনারায়ণ দত্ত, এই সকল কারণে, জাহ্নবীদাসীকেই সর্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। মধুসূদন স্বীকৃতি গ্রহণ করিলে তিনি, তাঁহাবই অল্পরোধে, মধুসূদনকে বহুদিন প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত সাগরদাঁড়ীর বাটিতে থাকিয়া, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। জাহ্নবীদাসী সে সময় কলিকাতায় ছিলেন। বিবাহের পর তিনি পত্নীকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন : “আমি যে কুকার্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ ; যদি ইহাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীতে দুইটিমাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়। এক জননী, অপর সহধর্মিণী ; আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্তই আমি সংসারাত্মমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব * * * *। তোমার জন্ত যে একটি সেবিকা আনা হইয়াছে, কাল তাহাকে পিড়ালয়ে পাঠাইতে হইবে।” রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবীদাসীকে কিরূপ আদর করিতেন, তাহা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীকে সেবিকা বলিয়া উল্লেখ করাতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকও স্বামীর স্নেহের উপর জাহ্নবীদাসীর একরূপ একাধিপত্য ছিল যে, তাঁহার সপত্নীগণ তাঁহার নিকট সেবিকারই ন্যায় থাকিতেন। স্বামীর আদেশক্রমে তাঁহারা তাঁহাকে প্রভু-পত্নীর ন্যায় ভয় ও সম্মান করিতেন, এবং তিনি, অল্পগ্রহপূর্বক, তাঁহাদিগকে যাহা কিছু বস্ত্রালঙ্কার দিতেন, তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। পত্নীর প্রতি একরূপ সমাদর ও অহুসার সত্ত্বেও রাজনারায়ণ দত্ত যে পুনর্বীর বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। পত্নীসঙ্গে পুনর্বীর বিবাহ যে দৃশ্যীয়, সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা মনে করিতেন না। বিশেষতঃ দত্ত মহাশয়, বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত, একান্ত বিলাসী ও ভোগসুখ-নিরত ছিলেন। মধুসূদন ধর্মব্রত হওয়ার পিণ্ড-লোপের আশঙ্কাও তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তিনি, পত্নীসঙ্গে, পুনর্বীর একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। জাহ্নবী-

দাসীর প্রতি অনাদর বা অনুরাগের অভাব তাঁহার বহুপত্নীকতার কারণ নহে।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের দুইটি সহোদর অতি শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মৃত্যুর পর মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর প্রকৃতই গঞ্জলের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জাহ্নবীদাসী, সম্পূর্ণরূপ আশ্রয়দাতা হইয়াই, পুত্রকে ভালবাসিতেন এবং, এক দণ্ডেরও জ্ঞাত, তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধুসূদন পাঠশালায় যাইলে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনের ঔষ্টবর্ম গ্রহণের পর, তিনি প্রকৃতই জীবন্তুতা হইয়াছিলেন। সেই অবদি সামান্যিক কোন কাণ্ডেই তাঁহার আসক্তি ছিল না; যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রের চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় মধুসূদন মাদ্রাজে ছিলেন। জগের মত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্বে তিনি কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন;—“আমি জীবনে মরিয়া আছি; জলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি মরিয়াই বাঁচিব; কিন্তু আমার বাছা যে মাত সমুদ্রের পারে রহিয়াছে, তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।” মধুসূদনও যখন বাহাকে ভালবাসিতেন, এইরূপ প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিতেন। ভালবাসিবার এই প্রগতি এবং শক্তি তিনি মাতার প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যে মধুসূদন অতি অমায়িক-প্রকৃতি ছিলেন। নিজের বিজ্ঞাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটু আত্মাভিমান থাকিলেও, পনের ও সত্বরের গর্ব তাঁহার বাল্য স্বভাব।

প্রকৃতিতে কখনই ছিল না। যখন তিনি হিন্দু-কলেজে পাঠ করিতেন, তখন কলেজের অনেক ছাত্র অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় বালক-দিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু মধুসূদন, কখনও, কাহারও সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। বাল্যাবস্থায় দাস-দাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুরস্কারের জ্ঞাত হউক বা অজ্ঞাত কোন প্রয়োজনেই হউক, তাহার তাঁহাকেই আশ্রিয়া অনুরোধ জানাইত। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন চাপ জানাইলে তিনি, সাধ্যানুসারে, তাহা মোচন করিতে ক্রটি করিতেন না। তিনি পিতা-মাতার আদরের ধন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিত না। পূর্ণ বয়সে, নানা বিষয়ে, মধুসূদনের প্রকৃতির পরিবর্তন

ঘটিয়াছিল ; কিন্তু শৈশবাব্যক্তি অমায়িকতা, সজদয়তা এবং পরচুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই।

মধুসূদনের মাতা বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

তিনি, গিদিরপুরে, একটি বাটী ক্রয় করিয়া, সেখানে অবস্থান করিতেন, আর মধুসূদনের জননী, পুত্রকে লইয়া, সাগরদাঁড়ীর বাটিতে থাকিতেন। মধুসূদন মাতার নিকট থাকিয়া, গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পৃথিবীতে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শৈশবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব-লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। বালক নেপোলিয়নের এবং শিশু মিল্ অথবা মেকলে প্রভৃতির কথা অনেকেরই পরিচিত। আমরাদিগের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রবাদ আছে, নিজ্ঞানপ্রিয়, তীক্ষ্ণদী অক্ষয় কুমার দত্ত, পাঠশালায় ভূমি-পরিমাণ শিথিলার সময়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “পৃথিবী কত বড় ? পৃথিবীর কি পরিমাণ করা যায় না ?” অসাধারণ প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম বর্গশিক্ষার দিনেই, সমস্ত বর্ণমালা অভ্যাস কাঁবয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ঈহাদিগের ত্রায় বালক মধুসূদনেও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুই-একটি পূর্ব-লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ত্রায় যদিও তিনি, তিন বৎসর বয়সের সময়ে, কোন কবিতা রচনা করেন নাই,* তথাপি অন্যান্য অনেক বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ মহত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। অপর্যায়শক্তি ও কাব্যাত্মরাগই মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। বাল্য হইতেই এই দুইটি গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে লক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনিসন্তানদিগের, প্রায়ই, লেখাপড়ায় অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। তাহার উপর যে সকল বালক গুরুজনদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একবারেই অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন, ঈশ্বরশালী পিতার একমাত্র সন্তান, এবং গুরুজনদিগের অত্যধিক আদরের পাত্র হইয়াও, কখনও লেখাপড়ায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। বর্তমান সময়ের পাঠশালাসমূহ পৃথকালীন পাঠশালাসমূহ হইতে বিভিন্ন। সে সময়কার পাঠশালাসমূহের কথা শ্রবণ করিলে, অনেকেরই হৃৎকম্প জন্মিবে। বেণুদণ্ড ও বেত্রখণ্ড তখন ছাত্রপুষ্ঠে অজস্রধারে বসিত হইত। তৎকরকেও যে দণ্ড দেওয়া এখন লোকে অপ্রচলিত বিবেচনা করেন, ক্ষীরকণ্ঠ বালকদিগকেও তখনকার

* প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর বয়সের সময় কবিতার বলিয়াছিলেন,—“য়েতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।”

গুরুমহাশয়েরা সে দণ্ড দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। গুরুমহাশয়ের বেজাঘাতের চিহ্ন শরীরের কোন না কোন অংশে ধারণ না করিয়া লেখা-পড়া শিখিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা তখন পল্লীগ্রামে বিরল ছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও মধুসূদন পাঠশালায় ঘাইবার জ্ঞাত আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং সাধ্যানুসারে কখনও পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিতেন না। প্রাতঃকালে পাঠশালার ছুটি হইলে, অগ্ন্যস্ত্র বালকের গায়, মধুসূদনও, আহারের জ্ঞাত গৃহে আসিতেন। তাঁহার পুত্রবৎসলা জননী, তাঁহার জ্ঞাত নানা প্রকার উপদেশ থাগ প্রস্তুত করাইয়া, অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে স্বহস্তে, আহার না করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক বাটির অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য বস্তুর জ্ঞাত, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন, সেই সময়, শীঘ্র শীঘ্র কোনরূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক এক দিন, হয়তো, অসিদ্ধ ব্যঞ্জন পর্যন্ত আহার করিয়া, সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

উচ্চাভিলাষই মহত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম, অর্থ কোন বিষয়েই মহত্ব শ্রেষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয় না। মহত্ববীজ উচ্চাভিলাষ ও বিজ্ঞানভ্রম। এই উচ্চাভিলাষ, বাল্য হইতেই, মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণ বয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরন্তর হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার জননীর প্রদত্ত উৎসাহ-বাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক পুষ্টলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকূলের সম্মুখে এবং কৃত্তী স্বামীর ও প্রতিভাবান পুত্রের গোরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের গায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহত্বংশে জয়গ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মহত্বের হৃদয়ে, স্বভাবতঃ, উদ্ভিত হইয়া থাকে, জাহ্নবীদাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জ্ঞাত সর্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন প্রতিভাবান ব্যবহারজীবী

ছিলেন। পিতার সম্মত ও কৃতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্ত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেইজন্ম লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহাকে, কোনদিন, কাহারও তাড়না সহ করিতে হয় নাই। নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিজ্ঞানুরাগ গুণেই তিনি বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পাঠদশায়, কি শিক্ষকতা কার্যের সময়, কি ব্যারিষ্টারাবস্থায়, কখনই মধুসূদন বিজ্ঞাপার্সন সম্বন্ধে অস্বস্ত প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু-কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যন্ত্র-সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মাস্ত্রাজে শিক্ষকতা কার্য করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মাস্ত্রাজে থাকিতে তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার জন্ম তিনি দেহ, মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া, নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিভূপ্ত করিয়া ছিলেন। রোগ, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিষয় মস্তকের জ্ঞান-লালসা বিমুক্ত করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু নিত্যপ্রবহনশীল উৎসের জ্বায়া তাঁহার জ্ঞানার্জনস্পৃহা, সংসারের কঠোর নিদাঘতাপের মধ্যেও, তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং কাব্যাত্মরক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্বাস্ত বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

“এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে,

কার কর-পদ্য-স্পর্শে সারে সে বেদনা

বরদার দয়াসম? হাত ব্লাইলে,

জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?

একথা তোমার কাছে অবিলম্বিত নহে।”*

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত-হৃদয় যে বাগ্দেরবীর “কর-পদ্য-স্পর্শে” সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্ম-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্ফল, তাঁহার কাব্যাত্মরক্তি। নানা-দেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অমূল্যলীনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি, বঙ্গদেশে, বোধ হয়, এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের অন্তিম অনেক স্তরের জ্ঞান

* মধুসূদনের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে গৃহীত।

এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিজ্ঞাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবীদাসী, তৎকালেও, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ,

মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্য-কাব্যানুরক্তি-রামায়ণ সমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণ-ও মহাভারত পাঠে শক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পাঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি অনুরাগ।

মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট-দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ৫ বাটির অত্যন্ত প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কর্তৃপক্ষ করিতেন। কোন মন্দদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্নেহতত্ত্বের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও গর্বতা হয় নাই। পূর্ণ-বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান এবং ইতালীয়ান পৃথিবীর এই আটটি প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাঙ্গালী, হোমব, ভার্জিল, দান্তে প্রভৃতি মহাকাব্যদিগকে সুস্থদরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কালীরাম দাস ও কুন্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মামাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইরা, দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষায় এবং আহার, ব্যবহারে সাহেবের স্তায় থাকিতেন; স্তবরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তি করিয়া বলিলেন, “একি, সাহেব লোকের হাতে মহাভারত?”

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, “সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।”

মামাজে অবস্থান কালে, যখন, চর্চার অভাবে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি, কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া, যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে, বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ

করিতেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্ত নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অত্যাগের কল।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। যে মহাগ্রন্থদ্বয়, শত শত বৎসর অবধি, হিন্দু নরনারীদিগকে অমুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র, সহস্র ভারতসন্তান বাহা হইতে আপন, আপন ভাবী মহত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অমুপ্রাণিত করিয়াছিল। বালো পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কবিশক্তি বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ভারত-

রামায়ণ, মহাভারত
পাঠের কল।

সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয়
জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে,

আর কোন দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অমৃতপুঞ্জ হৃদয় ইহা হইতে শাস্তি লাভ করিতেছে; কত শোক-জীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্না প্রাপ্ত হইতেছে; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন; এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিত ইহা হইতে ঘোর অমৃতাপঘন্যায় মুক্তি পাইয়াছিলেন; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সহস্র, সহস্র কবি ইহা হইতে আপন, আপন কবিশক্তি পরিপোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অমূল্য করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ সহজে বাস্তবিক ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃতিবাস ও কালীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমবিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিষ্যের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য, এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কৃতিবাস এবং কালীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বাল্মীকির অনেক

হুলেই, সেইজন্ত, ঈহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে। মধুসূদনের, গ্রন্থাবলী সমালোচনার সময়ে আমরা তাহা নির্দেশ করিব।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিজ্ঞাভ্যাস করিতেন তিনি পারসীক শৈশব শিক্ষা।

ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও গুনিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীও অল্প, অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কথিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের নদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং সম-বয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারসী “গজল” গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটি কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্যকাল হইতে, কবিতার ছায়, গীতবাণের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃবাগণের ছায় তিনিও, আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে, শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ, একবার তাঁহার নিকট, একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্ত গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতি হৃদয় সঙ্গীত-প্রিয়তা।

“সখীসম্বাদ”* গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসম্বাদ শুনিবার জন্ত, ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকটে, ক্রমান্বয়ে, দশ-পনরটি সখীসম্বাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে, তাঁহার মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বৃত্তিতে হইলে তাঁহার শৈশব-সংস্কীর্ণ যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যিক, আমরা একে, একে তাহার আলোচনা

* বিরহ-কাতরা প্রিয়াদিকার প্রীতককে সখীদ্বারা প্রেরিত সম্বাদ “সখীসম্বাদ” নামে পরিচিত। ইহার কোন কোন সঙ্গীত অতি রসসম্পন্ন। শিক্ষা ও রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত

করিয়াছি। তাঁহার খুঁসি-তামহের কবিশক্তি, তাঁহার শিতার, শিতাব্যের এবং জননীর কাব্যাহুবাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতা-প্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে এবং সঙ্গীত জ্বলন্ত প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি

যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, জন্মভূমির সৌন্দর্য।

আমরা ক্রমে, ক্রমে তাহার সব কলগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল তাঁহার কপোতাক্ষী-সলিল-বিশোভা গ্রাম্য-সৌন্দর্যপূর্ণা জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্যনবীন মুখশ্রী যে, কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য, মধুসূদনের শৈশবের অন্ত্যস্ত অল্পকাল উপাদানের জায়, তাঁহার জন্মভূমির কথাও উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি স্বকোমল গ্রাম্যশোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর, এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। নির্মলসলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিনদিক বেষ্টিত করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তটে হইতে জলের রেখা পর্যন্ত, প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য মূর্তিতে সেখানে বিরাজিত। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরলীসমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবানিতাগণ, কলসীকক্ষে, নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখাল-বালকগণ, পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে, নগরের কোলাহল বিস্তৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া বাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্রামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটার; মধ্যে মধ্যে হুই একটি প্রাচীন বট বা অথথ বৃক্ষ। উদ্ভানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটি মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাণিনিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্বের জ্ঞান দিব্যরাজি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অমর-সুন্দর, তরুণতা, উদ্ভানজ, বৃক্ষরাজীর সঙ্গে

সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটিকে আরণ্যদেশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবনের অদূরবর্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে পাণিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তরু গ্রামটির এবং ধীর-বাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়; এবং গ্রামটিকে ঋকের ভাষায় “কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী” “Meet nurse for a poetic child” বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুষ্কশ্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

ঐষ্টধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগর-দাঁড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মৃতি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরুক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি

জন্মভূমির প্রতি
অমুরাগ।

ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার স্মৃষ্টিরূপ স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ীর রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটি অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে “মাইকেলোছান” নামক একটি উদ্যান নির্মাণ করাইয়া, সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অগ্রাগ্র সহস্র অভিলাষের ত্রায় ইহার কোনটিই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।” আর একদিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, “কপোতাক্ষ, যে তোমার তাঁরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।” স্বদূর করাসী ভূমি হইতে তিনি “কপোতাক্ষ”কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে

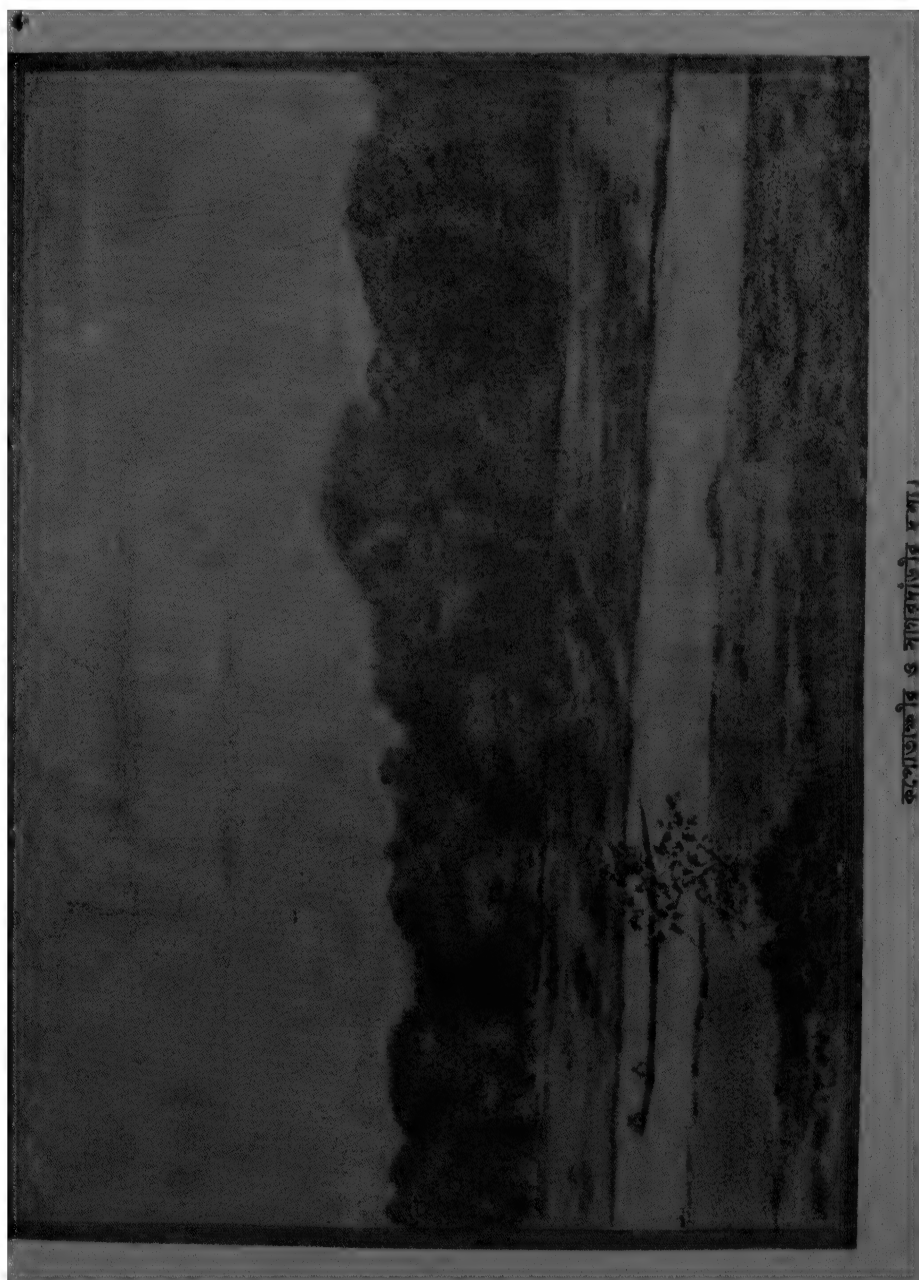
শোনে মায়্যা-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কাণ আমি প্রান্তির ছলনে।

বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?

দুষ্কশ্রোভোক্ত্রকশী ভূমি অমরভূমি-জনে।”



কপোতাক্ষীর ও সাগরমাতীর দৃশ্য।

জননী জন্মভূমির মোহিনীমূর্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সেইজন্তই আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্ত, তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় অগ্রাঙ্ক বিষয়ের সঙ্গে, তাঁহার জন্মভূমির কথাও উল্লেখ আবশ্যক।

মধুসূদন জননী প্রকৃতির নিকট যে অল্পকলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শৈশবে তাহার কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনা করিব। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে লোকের প্রতিভা-বিকাশের দিন দিন নূতন নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। এখন কত দ্বাদশবর্ষীয় বালকের শৈশবশিক্ষার ফল।

লিখিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু মধুসূদনের সময়ে দেশের সে অবস্থা ছিল না। যতদিন তিনি দেশে থাকিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন তাঁহার পক্ষে কবিতা রচনা দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদর্শন করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা অল্পরূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সঙ্গীতাত্মরাগের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং তিনি সঙ্গীত করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অভ্যস্ত গীতির ছুই একটি চরণ ভুলিয়া গেলে, তিনি নিজে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ছুই একটি গান রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন, এবং শিক্ষকের নিকট যে সকল পারসী কবিতা অভ্যাস করিতেন, বাঙ্গালায় তাহা অল্পকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল। তিনি নিজে গল্প রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন। পাছে, তাঁহার রচনা বলিয়া বুঝিলে সঙ্গীরা তাঁহার গল্প শুনিতে না চান, সেইজন্ত তিনি “ইহা অমকের নিকট শুনিয়াছি” এইরূপ বলিতেন। এই সকল গল্প এত শীঘ্র ও হৃন্দররূপে বলিতেন যে, তাঁহার সমবয়সীরা কিছুতেই তাহা তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। যে কল্পনা একদিন মেঘনাদ ও বীরাজনা প্রসব করিয়াছিল, এবং “বাহা অক্লান্ত-পক্ষ বিহগের শ্রায় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কোথাও বিচরণ করিতে ক্রটি করে নাই”* শৈশবে তাহা এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্ত তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় বাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, আমরা তাহার সবগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সাধারণ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্ত এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। পূর্ববর্ণনে মধুসূদন দারুণ উচ্ছ্বল হইয়া-

* রামধতি ভায়রবর প্রণীত সাহিত্য বিবরণ প্রভাব। ২৭১ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর স্থখের জন্য সামাজিক, নৈতিক কোন প্রকার শাসনই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অলোকসামান্য প্রতিভা লব্ধেও সাধারণ একুতি।

সেইজন্য, তাঁহার জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীন, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, ঘোর কদাচারী হইয়াও, তাঁহারা এমনই কৌশলে লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে পারিতেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও দেখিতে পাইতেন না। দোষই হউক বা গুণই হউক চক্ষুতে এইরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিবার শক্তি মধুসূদনের কোন কালেই ছিল না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। একবার তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া কোন প্রতিবেশীর গাছ হইতে খেজুর রস চুরি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। ছুইজনেই গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে বাহার গাছ সে জানিতে পারিয়া তাড়া দিল। মধুসূদনের পিতৃব্যপুত্র অনায়াসে পলাইয়া গেলেন; কিন্তু মধুসূদন গাছের উপর বসিয়া উঠে:স্বরে কাদিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে বাটির একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। পূর্ণবয়সেও তাঁহার কতজন সঙ্গী তাঁহাকে এইরূপে গাছে তুলিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের পলাইবার সামর্থ্য ছিল না; তিনি ধরা পড়িয়া কলকতাজন হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা অতি সামান্য, জীবন-চরিতে উল্লেখের অযোগ্য; কিন্তু একগাছি তৃণ উৎক্রেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি নির্ণীত হয়, তেমনই এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেও অনেক সময়ে মহত্বের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

মধুসূদনের ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতার আনিতে লঙ্ঘন করিলেন। “মহাবিদ্যালয়”* হিন্দু কলেজের গৌরব তখন দেশব্যাপী হইয়াছিল। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে সেই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে মধুসূদন কলিকাতার আসিলেন এবং অল্পদিন খিদিরপুরের কোন ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পর, আনুমানিক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন। নীতিবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, মহত্বের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের পক্ষে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র গৃহ, দ্বিতীয় বিদ্যালয়। গৃহে পিতা, মাতার এবং আত্মীয়গণের দৃষ্টান্ত দ্বারা

* প্রাচীন হিন্দুকলেজ “মহাবিদ্যালয়” নামেও অভিহিত হইত।

মধুসূদনের প্রকৃতির যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকদিগের এবং সহাধ্যায়ী-শিকার্ষ কলিকাতায় আগমন গণের আদর্শে তাহার অপর অংশ বেরূপ গঠিত হইয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রসিদ্ধ ইংরাজী সন্দর্ভ-লেখক আডিসন বলিয়াছেন, শিক্ষাগুণ হৃদয় এবং আকরস্বর প্রস্তর দুইই সমতুল্য। উপমাটি আরও একটু পরিষ্কৃত করিলে, বোধ হয়, বলা অসঙ্গত হইবে না যে, শিক্ষাগুণ হৃদয় প্রস্তর এবং বিদ্যামন্দির ভাস্করালয়। কত অসংস্কৃত প্রস্তর যে, এই ভাস্করালয় হইতে, দেবমূর্তি গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য আমরা মধুসূদনের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে যে কারু-গৃহে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার দোষ, গুণের ও পূর্বাপর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে হিন্দুকলেজের

এবং

বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

৯

মধুসূদন শিক্ষার জগৎ যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহার নাম এক্ষণে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাড্রেসই পবিচিত। কিন্তু যে হিন্দুকলেজ নামে এক্ষণে সুপরিচিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জগৎ অধিক কথা বলিবাব আবশ্যক করে না। হিন্দুকলেজই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল এবং বঙ্গদেশ আজ ঐহাদিগকে লইয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামগোপাল ঘোষ, বমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই হিন্দুকলেজের ছাত্র। ঈহার। ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বামতত্ত্ব লাহিড়ী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি আরও কতজন এই হিন্দুকলেজকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চরিত্রে ও বিজ্ঞায় ঈহার। বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। যে বিদ্যালয়ে বঙ্গভূমির এতগুলি সন্তান শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাব নাম যে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব অক্ষয়কুমার দত্ত এই তিনজনের কাষ ছাড়িয়া দেখিলে, বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্য-বিষয়ক যে কোন প্রকার উন্নতিই হউক, প্রধানতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগেরই দ্বারা অমুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনীতির আলোচনায় রামগোপালের এবং সাহিত্যে মধুসূদনের নাম এক্ষণে বঙ্গবাসীমাড্রেসের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ঈহাদিগের দুজনেরই প্রকৃতি দোষে-গুণে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের সহিত সঘর্ষ না থাকিলে তাঁহাদিগের জীবন বোধহয়, অন্তরূপ হইত। কাব্য কবির হৃদয়ের প্রতিবিম্বন মাত্র; মধুসূদন নিজে বাহ্য ছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেইজন্য, কাব্যে হউক বা চরিত্রে হউক, মধুসূদনকে বুঝিতে হইলে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার দোষ, গুণ এবং তৎকালিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা আবশ্যক।

বঙ্গীয় সমালোচকগণ মধুসূদনের কাব্যে যে সমস্ত দোষ নির্দেশ করেন, জাতীয় ভাবের প্রতি উপেক্ষা এবং বিজাতীয় ভাবের মধুসূদনের কাব্যের দোষ।

আধিক্যই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহারা বলেন, কবি রামচরিত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু রামচন্দ্রের অপেক্ষা রাক্ষস-পরিজনদিগেরই প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন; যে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র, আজ বহু সহস্র বৎসর অবধি, সমগ্র হিন্দু-জাতির ভ্রাতা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, জাতীয় ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তিনি তাহা কালিমাময় করিয়া গিয়াছেন। বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বথার্থই বলিয়াছেন যে, “মূল গ্রন্থে যে সমস্ত চরিত্র উন্নতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নতবর্ণে চিত্রিত করুন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে?” রামচরিত “কবির একমাত্র নিজের ধন নহে; তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি; তাহা লইয়া একরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ ধাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির-আরাধ্য দেবতা—সেই রাম, লক্ষ্মণকে একরূপ হীন বর্ণে চিত্রিত করা কি সঙ্গত জাতীয় কবির উচিত?”* বাস্তবিকও মধুসূদনের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ধর্মের প্রতি আন্তরিক আস্থা থাকিলে, তিনি রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই সেরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার কাব্যের অপর দোষ—বিজাতীয় ভাবের আধিক্য। যদিও রামায়ণ-বর্ণিত বিষয়ই মেঘনাদবধের অবলম্ব্য, তথাপি রামায়ণের পরিবর্তে ইহা ইলিয়াডেরই আদর্শে রচিত হইয়াছে। মেঘনাদবধের স্বর্গ, নরক, দেবদেবীগণ, এমন কি অনেক ঘটনাও, কবি অবিকল হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদনের কবিত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; “জাতীয় ভাব মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অল্প কোন বাঙালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে ‘কোট শেটুলান’ দেখা দেয়।”†

মধুসূদনের কাব্যে, জাতীয় ভাবের পরিবর্তে, বিজাতীয় ভাবের একরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল কেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। যে শিক্ষার দোষের কারণ।

তাঁহার কবিশক্তির ক্ষুদ্রতা হইয়াছিল, সেই শিক্ষাই তাঁহার কবিতায় একরূপ বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য উৎপাদন করিয়াছিল। মধুসূদন যে

সময়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে, এবং তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে বঙ্গদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ঘোরতর বিপ্লব চলিতেছিল। মধুসূদনের কবিতায় জাতীয়তার অভাব ও বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য সেই বিপ্লবেরই ফল। দুইটি কারণে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিপ্লব

উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ, হিন্দুকলেজের খ্যাত-

বিপ্লবকাল—ডিরো-
জিয়োর প্রদত্ত
শিক্ষার ফল।

নামা শিক্ষক ডিরোজিয়োর শিক্ষা প্রভাব; এবং দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও দর্শনের প্রবেশ। ডিরো-

জিয়োর নাম এখানকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই

অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অল্পমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিজ্ঞাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিজ্ঞাবুদ্ধির জন্ত ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্ত তিনি যে আন্তরিক

বড় করিয়াছিলেন, তাহারই জন্ত তাঁহার প্রশংসা। বোধ
ডিরোজিয়োর প্রদত্ত
শিক্ষার ফল।

বড় করিয়াছিলেন, তাহারই জন্ত তাঁহার প্রশংসা। বোধ হয়, এ সময়ে বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই

তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল

বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাটীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্ত্বদেবী মহাপুরুষদিগের বদেহ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপ-কথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে কলিকাতার অতি দূরবর্তী স্থান হইতেও ঝটিকা, বুটী ভেদ করিয়া এবং গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐক্সকালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি নিজে অতি অমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার “ককীর অক্ জজিরা” নামক খণ্ডকাব্য এবং নানা-বিষয়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে অতি আদরের সহিত পাঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি “হেম্পারন” (Hempden) এবং

মধুসূদনের পূর্বে হিন্দুকলেজের ও বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অবস্থা ২৩

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া “ইষ্ট ইণ্ডিয়ান” (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জগৎ সর্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “এনকোয়ারার” (Enquirer) এবং রসিকরুক্ষ মল্লিকের “জ্ঞানাস্বষণ”, ডিরোজিয়ারই প্রভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন স্থলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেরই সঙ্গের পরিচয়। ডিরোজিয়ার ছাত্র-দিগের জীবন পর্যালোচনা করিলেও একথা সপ্রমাণ হইতে ডিরোজিয়ার ছাত্রগণ।

পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অল্পপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্মশীল ও যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠ রামগোপাল ঘোষ, রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিক-রুক্ষ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ডিরোজিয়ার শিষ্য।* বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য ইহাদিগের দ্বারা অহুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডিরোজিয়ার তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবলই ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভে সাহায্য করিয়া নিরন্তর থাকিতেন না। বাহাতে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তজ্জগৎ ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে কিরিক্সি ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ কিরিক্সি সম্প্রদায়ের স্থায় তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারতবর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুর্বস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উজ্জ্বলিত হইত। কবিতায়, ছাত্রদিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, নানা প্রকারে, তিনি ভারতভূমি সম্বন্ধে তাঁহার অমুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত “ককীর অফ জঙ্গিরা” নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে, ভারতভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অমুরাগ ছিল, তাহা

* ইহারা ভিন্ন ডিরোজিয়ার আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাখানার শিকদার এবং অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন প্রধান। ইহারা আর সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি এবং উদারমূল্যবান সদ্ব্যবহারে জগৎ প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, পরিণামে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইয়া বশী হইয়াছিলেন।

স্বল্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।* ডিরোজিয়ো এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষক নামেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অমুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল

* Fakir of Jangeera কাব্য ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটি, বিলুপ্ত হওয়া উচিত নহে বিবেচনার, বাবু যিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অন্তবাদসহ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

My country ! In thy days of glory past
A beautiful halo circled round the brow,
And worshipped as a deity thou wast —
Where is that glory ; where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last ;
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish for thee.

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অন্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হার ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজা ছিলে এই ভবে ।
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
বল্লিগণ বিরচিত শীত উপহার
হৃৎধের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ঘ্যে হইয়া মগন
অধেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন ।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ।

এ ভ্রমের একমাত্র পুরস্কার গণি,
ভব স্তম্ভভাঙ্গার লোকে, অভাগা জননি !

মুরেশিনান কবির লিখিত ভারত-ভূমির স্বদেশে একপ কবিতা হুলস্থল নহে বলিয়াই, ইহা রক্ষিত
হইবার যোগ্য।

মধুসূদনের পূর্বে হিন্দুকলেজের ও বঙ্কর ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ২৫

এবং কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের মধ্যে যাহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্মসভা, না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা নিবারণ লইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিলোড়িত হইতেছিল।

ডিরোজিয়োও তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে ডিরোজিয়োর শিক্ষার বিশেষত্ব। যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক

কোন অল্পষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ, নীতি, এবং ধর্ম, বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসঙ্কোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। স্বলেগক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্লেটোর “একাডিমস্” (Academus) অথবা আরিষ্টটলের “লাইসিয়ামের” (Lyceum) ক্ষুদ্র অরুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* যাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উন্মেষ হইতে পারে, তজ্জন্ম ডিরোজিয়ো, প্লেটোর “একাডেমির” নামানুসারে, “একাডেমি” নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মানিকতলায়, সিংহবাড়িদিগের উচ্চানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন ছিল, সেইখানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, স্ক্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্ণর জেনেরেলের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ত্রায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। সভাস্থলেই হউক, বা বিদ্যালয়েই হউক; ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। যাহা পূর্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্থ, এবং যাহা

* The class of Derozio in the Hindoo College was not the dull and monotonous thing which a class in these days of “cram” is in the Indian colleges; it was, to compare small things with great, more like the *Academus* of Plato or *Lyceum* of Aristotle. There was free interchange of thought between the professor and the pupils; and young men were not so much crammed with information as taught to think and to judge”
---*Recollections of Alexander Duff*. P. 29.

নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূর করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চির-প্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রাভ্যুদয়শাসনের পরিবর্তে বাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সারমর্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অশ্রাস্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রাভ্যুদয়শাসনে যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্ত তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার, ব্যবহার তিনি স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেন। ডিরোজিয়ার শিক্ষাওণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোকপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা, একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়ার তত্ত্বাবধানে “পার্শ্বিন” (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; তাহাতে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, এরূপ আপত্তিজনক বিষয়সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্তৃপক্ষগণ অবশেষে, তাহার প্রচার নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়ার শিক্ষায় যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে ডিরোজিয়ার প্রদত্ত শিক্ষার দোষ। পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসন্তানগণ পুরুষাচ্ছক্রমে শাস্ত্রশাসন দ্বারা পরিচালিত; সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে, স্বাধীন করিবার পরিবর্তে, স্বৈচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়ার হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না; স্বতরাং, শাস্ত্রকারদিগের গৃহ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও প্রৌঢ় বয়সের গাভীর্ষ ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। যুগজনোচিত ঔদ্ধত্যের ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার কলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তি ও সহজ-জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া, তিনি একেবারে তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

মধুসূদনের পূর্বে হিন্দুকলেজের ও বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ২৭.

এরূপ শিক্ষার কল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়ার ছাত্রগণ, ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনের নামে, ঘোরতর উচ্ছ্বলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে খেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সম্মোংপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণ প্রথার গ্রাম কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কার-মূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গো-মাংস-ভক্ষণ, এবং যবনান্ন-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এই অভূত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন “গোখাদক” জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও “গোখাদক” না হইলে তাঁহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অভূত সংস্কার কার্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ক্রটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া, গোমাংস ভক্ষণপূর্বক, কখন কখন, প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপ সমাজবিরুদ্ধ তাহারই অমুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছ্বলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অস্বাস্ত্র স্থল, কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হলহুল পড়িয়া গেল এবং অনেক পিতা-মাতা সন্তান-দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।*

ডিরোজিয়ার শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অল্পকাল বায়বলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরোজিয়ার শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজীশিক্ষা প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বলিতেছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এদেশে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য; অপর দল বলিতেছিলেন,

* হিন্দুকলেজে ডিরোজিয়ার প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ভীত হইয়া, কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও নিতীবান পরিবারের ব্যক্তিগণ আপন সন্তানদিগকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠাইতেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, সেইজন্ম, অল্পদিনের মধ্যে সেল্প প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডিরোজিয়ার শিক্ষার সমকালে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে, উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও এদেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজান্ডার ডক্ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন, যথাক্রমে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়, পাশ্চাত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালীন ঘটনাবলী। রামকমল সেন প্রাচ্য ভাষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন।

উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, ভারত-বাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারই গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করা হইবে।

মহাত্মা বেষ্টিকের এই অবধারণ ভারত সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয়শত বৎসরের

ইংরাজী শিক্ষা
প্রচারের ফল।

অত্যাচারে ও নিধাতনেও যে পরিবর্তন করিতে পারেন

নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার

প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাব ও প্রবণতা সম্বন্ধে

তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়োর শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার, ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল;

গবর্ণমেন্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেইত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থাহুশীলনে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার উপর গবর্ণমেন্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইলে, সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে, সতীদাহ নিবারণ লইয়া,

ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাহারা সতীদাহ নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দু শাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম, প্রমাণ আছে, তাহার উল্লেখ করিতে জটিল করেন নাই। তাঁহাদিগের

জ্ঞান পাশ্চাত্য-ভাষা প্রচারার্থীগণও, সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরিক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত ও অশব্দ করিবার

মধুসূদনের পূর্বে হিন্দুকলেজের ও বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ২০
 জন্ম, তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিতে ক্রটি করিলেন না। তাঁহার স্বপক্ষীয়-
 দিগকে বুঝাইলেন যে, যে দেশের শাস্ত্রে সহমরণ প্রথাৱ জায় কুসংস্কার সমর্থন
 করে, এবং যে দেশের কাব্যে হনুমানের লাঙ্গুল বর্ণনা এবং দধি, দুগ্ধ ও স্নাত
 সমুজের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হয়, সে দেশের সাহিত্যের আলোচনা করা কেবল
 বিভ্রম মাত্র। সে সময়কার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ
 ইংরাজ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ, মেকলে সাহেব যখন বলিলেন যে,
 হিন্দুশাস্ত্র অসার এবং হিন্দুজাতি অতি অপদার্থ, তখন হিন্দুজীবনে যে কিছু
 অমূল্যকরীয় এবং হিন্দুশাস্ত্রে যে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে, তাহা চিন্তা
 করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসানুসার
 ভাষায় বলিলেন; *A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia.*
 অর্থাৎ কোন যুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারিও সমগ্র
 আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয়; তিনি অসঙ্কচিত
 চিত্তে বলিলেন;—“অন্ত ভাষার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য নর্মান ও
 স্যাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা, তবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। *I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors.* লর্ড মেকলের এরূপ
 মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিশ্চয়োজ্ঞন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিন্দুমাত্রও
 অধিকার ছিল না, তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধৃষ্টতার
 কার্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান
 কবি ফুর্সী, গজানী রাজসভা সঙ্ক্ষে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—“গজানী
 রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না।”
 আলেকজান্দর ডক্, ফুর্সীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া, বলিলেন; “প্রাচ্য
 ভাষাসমূহও সমুদ্রের জায় মহান, অতল, এবং অকূল, কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ
 করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।” ডকের ও মেকলের
 এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই উপদেশ বলিয়া
 বোধ হইল। তাঁহার সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয়
 কিছুই নাই; ইহা কেবলই কুশ ভূণের শুণাণ্ডে এবং স্নাত, দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের
 বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহার, রামায়ণ, মহাভারত এবং
 ভগবদ্গীতায় মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াদে, ইনিয়াডে এবং কিডিং-এর উপন্যাসে
 মুক্তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র,

এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় নিতান্ত নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক, এই তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা দবে থাকুক, সে সময়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্ননের উৎকর্ষতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপোত্র জিজ্ঞাসা করিলে নিবাক হইয়া থাকিতেন। মেন্সপিয়বেব বা মিন্টেনের গ্রন্থের কোন স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিজ্ঞাস্যে নিবাজ কবিত্ব, কিন্তু বনপর্বে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা কবিলে বিপদ বোধ করিতেন। বেদব্যাসের ও বাম্মৌকির ভাষ্যরই যখন এই দুর্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গাল ভাষার অবস্থা আর কি লিখিত ? হিন্দুকলেডের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিদ্বৎরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদ্ভিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ, মহাভারত নামে দুইখানি পণ্ডগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্তকবির “প্রভাকর” তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মতে যাহারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালাগ্রন্থ-সমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্বাসিত হইল, বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা কথা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা যাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

বিপ্লবকালের অনিষ্টকারিতা আমরা আত্মপূর্বিক বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু ইহার যে কোন উপকারিতা ছিল না, তাহা নয়। ইহা হইতে যে শুভকল উৎপন্ন হইয়াছে, এইবার তাহারও উল্লেখ করিব। আত্মসংযমের অভাবে ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ ঘোরতর উচ্ছ্বল হইয়াছিলেন এবং সংস্কারের নামে তাঁহারা সমাজের মূলোৎপাটন করিতে গিয়াছিলেন। এইজন্যই আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উচ্ছ্বল হইলেও তাঁহারা অনেক স্থলে যে মানসিক বল দেখাইয়াছিল, তাহা প্রকৃতই

মধুসূদনের পূর্বে হিন্দুকলেজের ও বঙ্কিম ইংরাজী-পাঠ্যকত সম্প্রদায়ের অবস্থা ৩১

প্রশংসনীয়। যদিও কোন মহান সংস্কার তাঁহাদিগের দ্বারা সাধিত হয় নাই,

তথাপি জীবনের দৈনিক কার্যের শত শত প্রয়োজনীয়

বিষয়কালেব

উপকাষিত।

সংস্কার তাঁহাদিগেবই চেষ্টার ফলে সাধিত হইয়াছে। এমন

একদিন ছিল, যখন মন্তকেব শিখাজ্জেদনে এব° ডাক্তাবী

ঔষধ সেবনেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। কলিকাতাব কোন সম্ভাস্ত পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে কঠোর তুলসী-মালা অপনয়নের জন্ত একদিন যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই পবিবারেব আব একজনকে, পবে বিববাবিবাহ দিয়া তাহার শতাংশেব এক অংশও ভোগ করিতে হয় নাই। ডিবোজ্জিযোব ছাত্রদিগকে উজ্জ্বল বলিয়া নিন্দা কবিলেও সমাজের এই অবস্থা পবিবর্তন কিয়ৎ পবিমাণে, যে তাঁহাদিগেবই চেষ্টাব ফলে হইয়াছে, তাহা অবজ্জই স্বীকাব করিতে হইবে। তাঁহাদিগের চবিত্তের এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, যাহা তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও ভীত হইতেন না, এবং যাহা তাঁহারা কুসংস্কাবমলক ও ভ্রমপ্রণোদিত বলিয়া মনে করিতেন, কখনও তাহা করিতেন না। বিশ্বালাভুরূপ কাৰ্য করিতে বাইয়া, নিষাতন, অত্যাচাব, উৎপীড়ন কিছুবট দিকে তাঁহারা ভ্রঞ্জেপ কবিতেন না। এই কপটতাব ও ভক্তি ধর্মভাবেব দিনে ইহা বড় সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়। স্বদেশীয় আচার, ব্যবহাবে আজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা একদিকে যেমন অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিয়াছিলেন, যে কঠিন নিগড়ে আমাদিগের সমাজ আবদ্ধ বহিয়াছে তাহা উন্মোচনেব চেষ্টা কবিয়াও তাঁহারা অপরাদিকে তেমনই সংসারস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সময়েব পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন অবজ্ঞ সম্পাদ। তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু উৎকট উৎসাহে তাঁহারা যে ভারত সমাজকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিণত কবিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছিল। ধীরতাব সহিত কাৰ্য করিলে তাঁহাদিগের উজ্জম প্রকৃত মঙ্গলগ্রস্থ হইত, সন্দেহ নাই।

সামাজিক আচাব ব্যবহাবেব ন্যায় ভাষা ও সাহিত্য লব্ধেও নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় গদ্য ও পদ্য

রচনা করিয়া প্রকৃত ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যে গণনীয়

ভাষা ও সাহিত্য লব্ধে
নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের
ভ্রম।

হইব, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই জ্বয়ে এই দুৰ্ব্বাকাজ্ঞা
জন্মিয়াছিল। আমাদিগের মাতৃভাষাকে ক্রমশঃ ইংরাজী

ভাষার সমকক্ষ করিয়া তুলিব, এ চিন্তা তখন তাঁহাদিগের

-মনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। সমাজ লব্ধে যেমন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন

যে, ভারতসমাজ ক্রমে য়ুরোপীয় সমাজে পরিণত হইবে, ভাষা সম্বন্ধেও তেমনই তাঁহার। ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজী ভাষাই একদিন সমস্ত ভারতবাসীর অন্ততঃ সমগ্র বাঙ্গালিজাতির ভাষা হইবে। সেইজন্য স্বগীয় কানীপ্রসাদ ঘোষের দ্বায় শক্তিশালী লেখক স্বদেশীয় সাহিত্য বিসর্জন দিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় যশোলাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অভিজ্ঞতার পর এখনও যখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় “কবিশঃপ্রার্থী” হইতে বিমুখ নহেন, তখন যে

সে সময়কার নব্যশিক্ষিতগণের দৃষ্টি তাহার নবোদ্ভিন্ন বঙ্গভাষার উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব।

সাহিত্য কিন্তু এক বিষয়ে এক মহত্বপূর্ণ কার্য করিয়াছিল ; ইহা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক অভিনব জগৎ অবতারণা করিয়াছিল। হোমর, ভার্জিল, দান্তে এবং মিল্টনের কাব্যে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ অনেক নূতন বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে এই শুভ কল উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমরা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই লাভ সামান্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের তুলনা করিয়া উভয়ের তারতম্য বিচার করিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই ; তবে একথা বলা অসম্ভব হইবে না যে, ইংরাজী সাহিত্য এদেশে প্রবেশ না করিলে, বাঙ্গালা ভাষার এই নবজাত শক্তি আসিত না। বাঙ্গালা গল্পের কথা বলা অতিরিক্ত ; ইংরাজীভিকারের পূর্বে তাহার ত অস্তিত্বই ছিল না। পণ্ড সম্বন্ধেও ইংরাজী সাহিত্য এক অভিনব ও শ্রেষ্ঠতর যুগ প্রবর্তিত করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য না আসিলে বৈষ্ণব-কবিগণের এবং ভারতচন্দ্রের প্ররতিত কবিতা-শ্রোত বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জে এখনও প্রবাহিত হইত। আমরা যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বায় কবিদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রবেশের ফল।

বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের যে অবস্থায় মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ

কার্য করিয়াছিল, এইবার তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।
মধুসূদনের সম্বন্ধে হিন্দু-
কলেজীয় শিক্ষার কথা।

মধুসূদন হিন্দুকলেজের ডিরোজিয়ার কালের ছাত্র নহেন। ডিরোজিয়ার কলেজ ত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু ডিরোজিয়ার নাম তখনও কলেজে সম্পূর্ণরূপে জাগরুক ছিল ; এবং কলেজের অনেক ছাত্র তখনও তাঁহার ছাত্রগণের আচার

ব্যবহারের অঙ্কুরণ করিতেন। স্বতন্ত্র ডিরোজিরায় ছাত্র না হইয়াও মধুসূদন তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। স্বদেশীয় সাহিত্যে অনান্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যে অঙ্ক অঙ্কুরাগ, স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা এবং পাশ্চাত্য আচার, ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব এইগুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনেরও চরিত্রে এই রকম দোষের প্রত্যেকটি পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রদিগের ত্রায় তিনিও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী ভাষায় কবিতা বচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশা করিয়াছিলেন। ঐষ্টম্বর্ষ গ্রহণেব পূর্বেই তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলেজে থাকিতেই সুরাপানে ও হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণ বয়সে অনেক বিষয়ে তাঁহার শৈশবাব্দিত সংস্কার পরিবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু বিপ্লবকালের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা উৎপাটিত করিতে পারেন নাই। একদিকে পুরুষ-পব্ধরাগত প্রাচ্য ভাব ও অপরদিকে কলেজীয় শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্য ভাব, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার অনেক কাব্য, সেই জন্ত, পরম্পর বিসম্বাদী হইত। পূর্ণ বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু পত্র লেখা লজ্জাজনক মনে করিতেন। পূজার দিন দেবীপ্রতিমা দর্শন করিয়া তিনি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু কেহ তাঁহাকে “মিষ্টারের” পরিষর্ভে “বাবু” বলিয়া পত্র লিখিলে তিনি বিবস্ত্র বোধ কবিতেন। কোজাগরী পূর্ণিমা ও বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার প্রাণ ভাবে গদগদ হইত, কিন্তু কবিরাজী মতে চিকিৎসা করাইলে তাঁহার সম্ব্রমের ত্রুটি হইবে, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতেন।

অন্তরে জাতীয় ভাব এবং বাহিরে সাহেবিয়ানা উভয়ের
জাতীয় ভাব ও সাহেবিয়ানা
সংমিশ্রণে তাঁহার প্রকৃতি, এইরূপে, এক বিচিত্র পদার্থে
পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার বচনাতেও তাঁহার প্রকৃতি
প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি রামায়ণ-বর্ণিত বিষয় অবলম্বন করিয়া
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যের ঘটনাবলীতেই তাহা

পূর্ণ করিয়াছেন। প্রথমার্জিত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া
সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ্য
তিনি, পূর্ণ বয়সেও, মিস্টনকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
কবি এবং ইলিয়াডকে রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য কবিদিগের লিখিত তুলনার
আবাদিগের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকে তিনি অতি নিম্নমানের বিবেচনা

করিতেন।* যে কালের ছাত্রেরা গায়ত্রী মন্ত্রের ও প্রণবের পরিবর্তে ইলিয়াডেব শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতেন, সে কালের কবির জীবনে রচিত কাব্যে যে জাতীয় ভাবের সঙ্গে বিজাতীয় ভাবের একরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। মধুসূদনের সংস্কার ভ্রমাত্মক কি না, তাহার বিচার নিম্নয়োজন। হিন্দুকলেজের একাদশ-ব্যাপিনী শিক্ষা না পাইলে এবং প্রথম যৌবনে ইংরাজী সাহিত্যেব সেই সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাইলে মধুসূদনের এই সকল সংস্কার স্থায়ী হইত কিনা সন্দেহ। ইংরাজী সাহিত্যের প্রবেশে আমরা যে যথেষ্টই উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শৈশব হইতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী সাহিত্যের অহুশীলনে, আমরা জাতীয়তা বিসর্জন দিতে বলিয়াছি। মধুসূদনের গ্রাম আরও কত প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুজাতীর জাতীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বক্ষা করিতে হইলে কেবলই ইংরাজী ভাষার অহুশীলন করিলে চলিবে না। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও অহুশীলন করিতে হইবে।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের চরিত্র গঠনে কিরূপ কাণ্ড করিয়াছিল, পাঠক এইবার, বোধহয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মধুসূদনের প্রকৃতি ও তাহার গ্রন্থাবলী বুঝিতে হইলে এই সকল কথা আলোচনা আবশ্যক। যে সময়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা বলা শেষ হইয়াছে; এইবার তাহার নিজের শিক্ষার কথা বলিব।

* হেষ্টিংস বধের উল্লেখপত্রের তিনি লিখিয়াছিলেন, ‘মহাকাব্য-রচয়িতা কুলের মধ্যে ইলিয়াড রচয়িতা কবি যে সর্বোপরি জ্যেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত-রামায়ণের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত রাজ্য।’ ব্যাস ঋষীকির ‘সংক্ষেপে বখন, তাঁহার এইরূপ সংস্কার ছিল, তখন কল্যাণ কবিদিগের কথা বলা নিম্নয়োজন।

হিন্দুকলেজ—শিক্ষাব্যবস্থা

[১৮৩৭—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

৩

মধুসূদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দুকলেজ তখন বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও

হিন্দুকলেজ ও ইহার
শিক্ষকগণ

ডিরোজিও সে সময় কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি
সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ রিজ, হালফোর্ড,
এবং ক্রিস্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ

ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। জোন্স সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বর্গীয় বামচন্দ্র মিত্র ও ব্রহ্মানন্দ রামতনু লাহিড়ী* প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এক এক বিষয়ে এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং মধুসূদন সে সময়ে এদেশের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

কলেজে প্রবেশ করিয়াই মধুসূদন একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন,

কলেজীয় শিক্ষা ও
গৌরব লাভ

এবং ঘাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অথবা
তাঁহাব পূর্বে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের
মধ্যেই তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে

আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, “বহু ও পবিত্রমণ্ডলে আমিও হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদের ভিতর ঐচ্ছল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির তায় ছিল”।† তাঁহার আর একজন সহাধ্যায়ী লিখিয়াছেন, “বয়সে মধুসূদন আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনই তাহার

* ব্রহ্মানন্দ লাহিড়ী মহাশয় এই সময়ে পাঠ সমাপনান্তে কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এক খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি, মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বের সময়ের, কলেজের ডিরোজিয়ার কালের, ছাত্র।

† “I was a very dull boy at the commencement, but by diligence and exertion became one of the stars of the College of which Madhu was the Jupiter.” মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাগ্মত্বের বহুবিহারী বঙ্গ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

বিজ্ঞা-বুদ্ধির জোব যে, আমাদের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, লন্ডে লন্ডে নিয়ন্ত্রণী সকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল।* মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত “সিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট” এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত “জুনিয়ার ডিপার্টমেন্ট” নামে অভিহিত হইত। যদিও সর্বশুদ্ধ অনেকগুলি শ্রেণী ছিল, তথাপি, উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা একবারে দুই তিন শ্রেণী উপরে উঠিতে পারিতেন বলিয়া, কাল বিলম্বের অসুবিধা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না, এবং সেই জন্যই মধুসূদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগ করেন। হিন্দুকলেজের সিনিয়ার বিভাগের বা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বর্তমান সময়ের বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষা নিকট হইবে না, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। সুতরাং মধুসূদন ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ পর্যন্ত ন্যূনাধিক এই ছয় বৎসরের মধ্যে যে প্রায় ইংরাজী বর্ণশিক্ষা হইতে বি. এ. শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্মৃতিশক্তি বুদ্ধির ও মেধাবিশেষের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি যে বৎসর হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বৎসব (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে) সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়ার বৃত্তি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন। মধুসূদন, পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেক ছাত্রকে অতিক্রম পূর্বক, বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যেমন অনেক

প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তেমনই সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রগণ। অনেক প্রতিভাবান ছাত্রও সেখানে অধ্যয়ন করিতেন।

তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্ন-কুমার সর্বাধিকারী, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু এবং ভোলালাল চন্দ্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের অনেক খ্যাতিমান ছাত্র এই সময় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং রাজদত্ত শরীর প্রভৃতির জন্য ইহাদিগের অনেকেরই নাম বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ

বাবুর ও ভূদেববাবুর নাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণেরও সুপরিচিত। বঙ্গভাষার ধর্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইহাদিগের লেখনী-প্রসূত। নানা বিষয়ে বঙ্গসমাজ ইহাদিগের নিকট যে ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বত হইবার নয়।

মধুসূদন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠাবান ছাত্রগণের মধ্যে “ঔজ্জল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির স্থান ছিলেন”, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার সময়ে শিক্ষাবিবরণ।

তাঁহার চরিত্রে যে সকল গুণ লক্ষিত হইত, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় তাহা সম্যক্রূপ পরিবর্ধিত হইয়াছিল। বিত্তোপার্জনে অহুরাগ ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি তাঁহার শৈশবের গুণসকল কলেজীয় শিক্ষায় আরও অধিক ক্ষুণ্ণিতলাভ করিয়াছিল। পাঠশালার কোন ছাত্র লেখাপড়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; কলেজেও যাহাতে তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি পরিশ্রম করিতে ক্রটি করিতেন না। কীটের স্থায় কেবলই গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অভ্যাস তাঁহার কোন কালেই ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি রহস্য-প্রিয় ছিলেন, এবং সহাধ্যায়ীগণের সহিত আমোদ, কৌতুক ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় করিতেন। কিন্তু লেখাপড়া করিতে বলিলে আমোদ, আহ্লাদ কিছুই তাঁহার মনে থাকিত না। বিষয় বিশেষে মনঃসংযম করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্তই তিনি বিশ্বত হইতেন। কলেজের মধ্যে একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী-সাহিত্য-সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কিনা সন্দেহ। পাঠাবস্থায় সাহিত্যেরই দিকে তাঁহার অধিক অহুরাগ ছিল; এবং অনেক সাহিত্যসেবকের জীবনে যেমন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত অহুরাগবশতঃ, তিনি গণিত-চর্চায় ঔদাসীন্য-প্রকাশ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার গণিতে বিরাগ ছিল না; বরং অন্ত কেহ তাঁহাকে গণিতে অতিক্রম করিলে, তিনি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া বসতই তিনি সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গণিতের প্রতি অজ্ঞানতা বর্ধিত হইতে লাগিল। গণিতের সময়ে, হয়, তিনি কোন উপক্ৰান্ত বা কাব্য পড়িয়া কাটাইতেন, না হয়, একবারেই অশ্রেণীতে উপস্থিত

থাকিতেন না।* গণিতের সম্বন্ধে এইরূপ বিরাগ; হ্রে, গোঙ্ডস্মিথ, লর্ড মেকলে প্রভৃতি অনেক সাহিত্য-সেবকেরই জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। লর্ড মেকলে একাধারে কবি, বাগ্মী, রাজনৈতিক, সমালোচক এবং ঐতিহাসিক হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গণিতের নামে তাঁহারও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আমাদের দেশের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহারও প্রতিভা গণিতে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার জীবন বৃত্ত লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, গণিতের প্রতি বিরাগের জন্মই, তাঁহার শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গণিতের দুরূহ অংশসমূহ কিছুতেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না।** গণিতের প্রতি মধুসূদনের বিরাগ সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা বলা আবশ্যিক। অনেকে এমন আছেন যে, গণিতে কিছুতেই তাঁহাদিগের বুদ্ধির ক্ষুণ্ণি হয় না, এবং সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক গণিতের জটিলতা ভেদ করিতে পারে না। মধুসূদন এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। গণিতে যে তাঁহার বুদ্ধির ক্ষুণ্ণি হইত না, তাহা নয়; ভাল লাগিত না বলিয়া, স্বেচ্ছাক্রমেই, তিনি গণিতাত্মশীলন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন ইচ্ছা হইত, তাহাতে এমনই পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন যে, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক দিনের একটি ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। প্রসিদ্ধনামা রিজ সাহেব হিন্দুকলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন।† গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। যাহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার জ্ঞান গণিতজ্ঞ ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই আনিয়াছেন। মধুসূদনের জ্ঞান বুদ্ধিমান ছাত্রকে গণিতাত্মশীলন ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রথমে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মধুসূদন কিছুতেই গণিতাধ্যয়নে প্রস্তুত নহেন, তখন নিরাশ হইয়া কাস্ত

* তাঁহার জ্ঞান কলেজের আরও কোন কোন প্রসিদ্ধ ছাত্র গণিতের সময়ে ঐরূপ করিতেন মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার “আত্ম-জীবন চরিত” লিখিয়াছেন, “গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে যে, গণিতাধ্যাপক রিজ সাহেবের সময় আসিলে, কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ কাইয়া পলাইত। আমি কখনও রেল টপ কাইয়া পলাই নাই কিন্তু একবার আমার স্নেহ হয়, তাঁহার ভয়ে সংকুত কলেজের বিতীৰ্ণতলের হলে অস্ত্র কতকগুলি ছোঁকরা দিগের সহিত লুকাইয়াছিলাম।”

ভক্তিজ্ঞান রাজনারায়ণবাবুর “আত্ম-জীবন চরিত” এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার অনুরতিক্রমে এইরূপ দুই একটি প্রয়োজনীয় স্থল আমি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই এ প্রকাশিত হইলে, ‘সেকালের’ একটি দৃষ্টান্তের চিত্র পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হইবে।

** He was at desperate odds in Trigonometry and Conic Sections—Life and Teachings of K. O. Sen, page 92.

† ইনি সন্ন্যাস পঞ্চম অপোলিসিয়নের প্রভ-বাহক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হইরাছিলেন, তাঁহাকে আব কোন কথা বলিতেন না। একদিন তিনি এমনই একটি দুঃস্থ প্রাণ দিলেন যে, গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রদিগেরও মধ্যে কেহ তাহার উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্বে মধুসূদন ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে সেক্সপীয়ার ও নিউটন উভয়েরই মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। ভূদেববাবু ও আরও দুই-একজন গণিত পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, মধুসূদন সাহিত্য-সেবক, তিনি সেক্সপীয়ারের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, “সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা গণিত ও সাহিত্য।

করিলে কখনও সেক্সপীয়ার হইতে পারিতেন না।” এই কথার পর হইতে মধুসূদন যে গোপনে গোপনে অঙ্ক কবিতাে শিখিতেছিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়ীরা কেহ তাহা জানিতেন না। এক্ষণে রিজ্ সাহেবের প্রস্নে স্বপর সকলকে অধোমুখ দেখিয়া, মধুসূদন অঙ্ক কবিতাে আরম্ভ করিলেন। ভূদেববাবু অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন, মধুসূদন অঙ্কটি কবিতাে প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রিজ্ সাহেবকে বলিলেন, রিজ্ সাহেব, মধুসূদনকে স্কুলের বোর্ডে, সকলের সমক্ষে, অঙ্কটি কবিতাে বলিলেন। মধুসূদন অতি সুন্দর প্রণালীক্রমে অঙ্কটি কবিতাে আনিলেন এবং ভূদেববাবুর গা টিপিয়া, তিন মাস পূর্বের কথা স্মরণ করাইয়া, বলিলেন, কেমন সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত ? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্যন্ত শেষ।”

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদন যে কেবল একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা নয়, কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক ছাত্র বলিয়াও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী-রচনায় তাঁহাব

সমকক্ষ ছাত্র কলেজের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন। সভা-ইংরাজী রচনার সমিতিতে রচনা পাঠ করা এবং সংবাদ-পত্রে লেখা অগ্রাস।

তখনকার ছাত্রদিগের মধ্যে বহুল প্রচলন ছিল। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক সকলেই ছাত্রদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহদান করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা, সেক্সপ স্বেযোগের অভাবে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের অন্তর্ভরণে, হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচার দ্বারা গ্রন্থকার হইবার বাসনা চরিতার্থ করিতেন। মধুসূদনের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়ী, বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার “আত্ম-জীবন চরিতে” লিখিয়াছেন, “হোয়ার স্কুলে প্রথম

শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি “হস্তবদ্ধে” মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রেরিত-পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালাইতে আমার সহাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিতেন।” লেখক হইবার বাসনা সে সময়কার ছাত্রদিগের স্বভাবে বিরূপ প্রবল ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রাজনারায়ণবাবু ও তাঁহার ছেলের স্কুলস্থ সহযোগীদের দ্বারা মধুসূদন ও তাঁহার হিন্দুস্কুলস্থ সহাধ্যায়ী-গণও, একত্রে, এইরূপ একখানি হস্তলিখিত সংবাদপত্র প্রচার করিতেন। এই পত্রখানি তিন-চার মাস চলিয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন, নবীন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত, প্রতি সপ্তাহে, ইহা নিয়মিত পাঠ করিতেন। কিন্তু বালক-বালিকার ধূলি-খেলার সংসার যেমন দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সংসারে পরিণত হয়, মধুসূদনের সেই বাল্যকীড়াও তেমনই, অল্পদিনের মধ্যে, প্রকৃত ব্যাপারে পরিণত হইল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একখানি সংবাদপত্রে লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এই সময়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত “জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। মধুসূদনের কোন সহাধ্যায়ী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, সংবাদ ইত্যাদি লিখিতেন। মধুসূদন, তাহা অবগত হইয়া, জ্ঞানান্বেষণে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লিখন-প্রণালীতে শ্রীত হইয়া, সম্পাদক তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি, আত্মদান সহকারে, প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তদশবর্ষ বয়সে, হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, মত্ৰাষত্বের সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরম্ভ হইল।

বিদ্যালয়লীলনে অগ্রগতির দ্বারা মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা এবং পর-দুঃখকাতরতাও, কলেজে অধ্যয়নাবস্থায়, তাঁহার প্রকৃতিতে স্নায়ু পরিষ্কৃত হইয়াছিল। রাজপথের রোক্তমান ভিক্ষুক বালক ও দারিদ্র্য প্রেমপ্রবণতা।

পীড়িত সহাধ্যায়ী ছাত্র উভয়েরই অভাব মোচনে বালক মধুসূদন সমভাবে তৎপর ছিলেন। পিতা-মাতার অগ্রদূতের তাঁহার অর্থাভাব ছিল না; বিপন্নের সেবার ব্যয় করিয়া তিনি, অনেক সময়, শিশুসন্ত অর্থের সার্থকতা করিতেন। কিন্তু দানশীলতা অপেক্ষা প্রেমপ্রবণতাই তাঁহার চরিত্রের সূক্ষ্ম উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যাহারা তাঁহার সহিত বনিষ্টরূপে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একমুখে বলেন যে, তিনি যেমন প্রেমপ্রবণ ও মেহান্বিত ছিলেন, তদ্রূপ অলোকই সেরূপ দুঃখিত হইত। তাঁহার সহাধ্যায়ী, সুপ্রসিদ্ধ “Travels of a Hindu” নামক গ্রন্থলেখক, বাবু জোহান্নান্স জেন্সন; “Madhu



স্বর্গীয় গৌরদাস বশাক।

fully justified his name—he was all মধু—all that endeared one to another,” বাল্যবন্ধুদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়বিশ্বত হইয়া ভাল-বাসিতেন। বালকমাত্রই পঠদশায় বন্ধুতার জন্ম লালায়িত হয়, কিন্তু তাহার পর, সংসারে প্রবেশ করিয়া, বাল্যবন্ধুদিগের কথা আর স্মরণ করে না। এই জন্মই “বালকের বন্ধুতা” উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের বাল্য-বন্ধুতার পরিণাম এরূপ হয় নাই। যে বন্ধুতা বাল্যে, যৌবনে, বার্মাকো, সকল অবস্থাতেই, অবিকৃত থাকে, এবং বন্ধুদিগের দুইজনেরই মৃত্যু ভিন্ন যাহার অবসান হয় না, মধুসূদনের বাল্যবন্ধুতা, কিয়দংশে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদিগের সহিত বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় বাবু গৌরদাস বসাকের ও

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।
বাল্যবন্ধুগণ

জীবনে বিভিন্ন পথের পথিক হইলেও ইহাদের পরস্পরের প্রতি অহুরাগ লোপ পায় নাই। কলেজ পরিত্যাগের পঞ্চদশ পরে ভূদেববাবু তাঁহাদিগের কৈশোর-সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গে, গৌরদাস বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক মধুসূদনের ও তাঁহার স্বহৃদবর্গের বাল্যাপ্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

Believe me, dear Gour, it was but in jest that I brought the charge of forgetfulness against you. In truth, I find nothing of the kind. Those who have met in early youth, lived and conversed together in that time of life when our liquid hearts can so easily intermingle, must be to each other, for ever and always, great ideas. We and the friends of early youth, you have named, must be to each and all such ideas, whether we have continued our intercourse in after Life or not.* To tell you the secret of my heart, I had rather not know much of these friends lest any passages

* ভক্তিসাজন ভূদেব বাবুর নাম বন্ধুর কৃতবিদ্যাব্যবহারই সুপরিচিত; তাঁহার ‘পরিচয়’ প্রদান নিম্নোক্তজন। বাবু গৌরদাস বসাকের নামও সাধারণের অবিস্মৃত নয়। ইনি কলিকাতার ইংরেজি বসাক বংশীয়। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া, ইনি বহুদিন বোম্বাইতে সহিত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন; এবং কলিকাতার একজন অসাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিবিডালদের ও আলিবাটিক সোসাইটির একজন উসাহী সদস্য ছিলেন।

of their after life should have *belied* the promises of their youth. They are to me noble and ennobling ideas still, and as such I would wish them to continue to the end of my days. I should not like to have those early impressions changed. Madhu Sudan Dutta is to me the same Madhu still—the youth of high and noble aspirations who would be nothing less than poet of the highest class, and “astound the world one day with his fame”; I quote his own words of his college days”.

ডিস্ট্রেলী যথার্থই বলিয়াছেন, “মাতুষ্য পূর্ণবয়সে যতই ভালবাসুন, বাল্য-বন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কোন স্থখ এমনভাবে হৃদয় পূর্ণ করে না; ক্রোধ অথবা নৈরাশ্রের কোন যন্ত্রণা এমন নিশ্চেষ্টক অথবা মর্ষভেদী বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যবন্ধুতায় যে মধুরতা, যে আশ্চর্যবিশ্বজন, পরস্পরের প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনর্মিলনে যে দ্রবীভাব, অপর কোন বয়সের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার নয়।” বাল্য-বন্ধুতার নৈরাশ্র কত হৃদয় যে নিম্পিষ্ট এবং কত আশা যে বিস্তৃত হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্ধুতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস-প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড বায়রন তাঁহার বাল্যবন্ধুতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; “My School friendships were with my passions”. এই প্রেমপিপাসু বালক বায়রনের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবদিত নাই। প্রেমপিপাসু বালক মধুসূদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচনা করিলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

মধুসূদন পঠদশায় তাঁহার শৈশব-সুহৃদ বাবু গৌরদাস বসাককে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার বাল্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা, সাধারণ প্রকৃতি, এবং ছাত্রজীবনের লিখিত পত্র।

সেই সঙ্গে তাঁহার ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহার অধ্যয়নাসক্তি, উচ্চাভিলাষ, স্বচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্যম ঐক্যতা, প্রভৃতি দোষ-গুণ এই সকল পত্রে প্রতিভাত হইবে বলিয়া, আমরা তাহা আত্মোপাস্ত ও অবিকল উদ্ধৃত করিব। মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, রিচার্ডসন সাহেব, সেই সময়, কিছুদিনের জন্য, বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কার (Kerr) সাহেব তাঁহার স্থলে কলেজের অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কারণে তিনি মধুসূদনকে তিরস্কার করিলে, প্রজ্ঞয়ে অভ্যস্ত মধুসূদন, অভিমানে, কলেজ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। তাহার প্রথম পত্রের প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তি তাহারই উল্লেখ, লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পত্র

Khidirpur, 25th Nov. 1842

Night

My dear Friend,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from college, during D. L. R.'s absence * Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to college until D. L. R's return, be it of whatever duration—I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians, except a few souls who love me, and whom I love—and I hate the d—d fellow K—R.† This will do me no harm—none whatever—

A fig for your scholastic fame.

Your Scholarships and Prizes :—

except one—a mighty one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am of you. This sounds like flattery, but it is not so. It is truth. There is not in this wide world a soul I prize so much as thine : you have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and what no? God bless you, my lad ! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of true friendship as yours, in this

* David Lester Richardson, D.L.R. এই অক্ষরত্রয় এক সময়ে কের কৃতবিদ্য সন্দ্বাদয়ের স্থপরিচিত ও সমাবৃত্ত ছিল।

† রচনাশক্তিতে রিচার্ডসনের সমকক্ষ না হইলেও ইনি (Mr. Kerr) একজন কৃতবিদ্য ও সফল শিক্ষক ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজ্যের Bishop Corrie's Grammar School নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করেন। তাহার পর হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংলেতে প্রতিগমন করিয়া ইনি Domestic Life of the Natives of India নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রাজ্যের স্থপরিচিতনাথ, বহুতাবাবিহ রত্ননাথ শাস্ত্রী ইহার নিকট পুত্রবৎ রহে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

"deceitful world of ours". As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered, and that with the tenderest feelings of friendship? When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course. This is what I have been thinking of to-day; I must do it. If circumstances allow, I intend taking one, even before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—Native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy sweet-self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery—don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next? If you do bring Moti with you: and let me know that I may be prepared, (poor as I am), to receive so beautiful a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but inclination to honour my "humble shed" with your handsome presence. This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father going to a noble friend of his tomorrow. We won't have the Jatra (যাত্রা). When you go to college, remember me to Moti and Madhab and Boncu,* if the beggars come to college. Don't forget. I am reading Tom Moor's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be great poet—which I am almost sure I shall be, if I can go to England.

Believe me, your most affectionate friend,

M. S. Butt.

* মধুসূদনের সহাবাসী ও বাল্যবন্ধুগণ।

P. S. An answer shall be very, very, very pleasing my Gour !

2nd P. S. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write — write — write !!!

M S. D.

দ্বিতীয় পত্র

27th Nov. Night.

There !—I begin this with a critique on the pigmy letter you sent as an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—“to stumble at the threshold is no good omen”—mind, you begin—I send you the “Shakespeare”. Had you been my pupil, Gour,—depend upon it—I would whip you to death or do something worse. “The article ‘The’ (A, too) is never used before a proper noun”—&c. &c. Again, “The Moor’s Poem” !!! Be careful for the future. “You like my letters”—ah ?—I’m flattered—very much flattered—and gratified—I have done with Tom’s “Life of Byron”.—The chapter wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree. But who the d—I can read that part of Tom (excellent fellow !) without shedding tears ? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) that you should read this book thro’ at the expense of anything it might cost you. It belongs to M. Here is a letter for him ; give it him when you see him at college. By the bye—how are you getting on, ye collegians ? H. C. is an earthly “Pandemonium” with his d—d satanic majesty K—s at the head of his vile occupants ; (you and a few others excepted, of course). But to depart

from this, are you coming to the M. L.* this evening? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I. and

Believe, (as usual) yours ever
M. S. Dutt.

P. S.—Send me Tom's "Byrons Life" I can assure you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least to me than its pages;—full of everything to make the reader—gay—sad—thoughtful and so forth.

P. S. 2nd—My resolution (of not going to the college during D. L. R.'s absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying your company there. But that is foolish—is n't it—eh?—What do you say?

P. S. 3rd—I intended to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time, quite disgusted with my long ones; but so Fate wills and let her will be done.

তৃতীয় পত্র

মধুসূদনের কোন অসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দেশে বাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই পত্রখানি তৎসময়ে লিখিত—

Hindu College.

True,—too true, my dearest Gour! The storm has, at last burst upon me! I am ordered to depart from Town this very night, for our country-house. But oh! where shall I go? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings! Language

* * * * *
সেকেন্দার হুসাইন, মধুসূদন এবং তাঁহার কোন কোন সহকারী-ছাত্রের পিতার দ্বারা

cannot paint them ! To Leave the friends I love,—Particularly ONE—(imagine, who that "one" could be) my poor heart cannot but break well may I exclaim in the Language of the poet,—

"Oh ! insupportable, oh ! heavy grief !"

I wish I could see you,—But oh ! that cannot be !—I am not allowed ! dear, dear, Gour !—dearest friend ! do not forget me !

If I do not start to-night, I shall see you tomorrow at the college. As I am to embark at Balliaghata,* I shall once step into the college when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Farewell ! I don't know when I shall return from our country-house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. "Farewell Forever."

I remain as I have been Dearest Gour,

Your ever obed't and devoted but unfortunate friend.

Khidirpur
7th August, 1842 }
Sunday

M. S. DUTT.

P. S. The accompanying copy of "Forget me not" is a present to you. I had no time to get it bound. Pray get it bound. Pray get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfotunate giver's respect, esteem and love.

M. S. DUTT.

মধুসূদন, তাঁহার পিতার সঙ্গে, তাঁহার কোন গির্জাবন্ধুকে দেখিবার জন্য, মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে গিয়াছিলেন ; নিম্নোক্ত পত্রখানি তমলুক হইতে লিখিত । মধুসূদন, ইহাতে তাঁহার কতকগুলি কবিতা Blackwood's

* সে সময় কলকাতা থেকে সাগরবাড়ি নৌকার যেতে হত ; এই নৌকা বেলিয়াখাটা থেকে ছাড়ত ।—সম্পাদক

Magazine নামক অপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল কবিতা তিনি মহাকবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রেরিত কবিতাগুলি ব্র্যাঙ্কউড-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু প্রকাশিত হউক বা না হউক, অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের স্বপ্নে কিরূপ উচ্চাভিলাষ ছিল, উক্ত পত্রিকায় কবিতা-প্রেরণ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

I have not seen you for a long time ;—long time, I say. it is ;—and perhaps will not have the pleasure (oh ! it is something more exquisite than the vulgar word “pleasure”) of seeing you for some days more I am going away, not to Jessore, man, but to a noble friend of my father’s—the Rajah of Tumlook. Wednesday last I did go to the Mechanics—not to learn Drawing, “Oh ! no ! ’twas for something more exquisite still !” that is to see you—but the door was shut. By the bye—I have not yet received the “Gleaner”. The begger Carrey hasn’t sent it to me tho’ I have written to him. I write to him to-day again. Have you received the “Blossom” ?* I haven’t, Pray, send it to me. Good Heavens ? What a thing have I forgotten to inform you of ! I have sent my poems to the Editor of the Blackwoods Tuesday last. I haven’t dedicated them to you, as I intended, but to William Wordsworth, the poet. My dedication runs thus :—

“These Poem are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esquire, the Poet, by a foreign admirer of his genius—the author.”

Oh ! to what a painful state have I committed my self. Now I think the Editor will receive them graciously ; now I think he will reject them.

* *Gleaner* এবং *Blossom* সে সময়কার দুইখনি সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা। মধুসূদন এই দুই পত্রিকায়, মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন।

Shall I see you at the Mechanic's to-morrow ? O ! come for my sake ! By the bye !—Jull fellow ! stupid creature ! thou hast forgotten thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet. When will you do that ? If you do not do it, my last calling on at yours would be the last.

পঞ্চম পত্র

TOMLOOK

Friday.

MY DEAR FRIEND,

Last Friday I wrote you a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter that "I will start to-night" but I have not : nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow ; but I have no power to fly to Calcutta. Now I do curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far : what a number of ships have I seen going to England ! But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from whom we receive no answer. And why is the task awkward ? Because the written may not know whether the person he writes to, is vexed at his writing or

pleased. Well I do not—nay, Gour Dass, I cannot give way to such an idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am.

TOMLOOK }
SUNDAY }

Truly yours
DUTT.

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot pursue what I have written for want of time.

M. S. DUTT.

ষষ্ঠ পত্র

TUMLOOK

28th. octo. 1842

MY DEAR GOUR DASS,

Do you receive the letters I write you ?—'pon my word,—a most tormenting—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault ; I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you,—I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you that the little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifying is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more*. Don't think my "Day is over" I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing

from i. e. Tomlook. But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or to-morrow. Well, Monday next at the college we will meet. Be sure of that, as well as that

I continue truly, eternally, and most affectionately yours

M. S. DUTT.

পাঠক এই সকল পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড বায়রণ তাঁহার যে বাল্যাহুরাগকে passion বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, মধুসূদনের বাল্য-প্রেম বায়রণ ও মধুসূদন।

প্রগাঢ়তায় তাহা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার বাল্য-প্রেমের পরিচায়ক অনেকগুলি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, আর কোন পত্র উদ্ধৃত করিতে আমরাঙ্গের ইচ্ছা হয় না। তাঁহার একখানি পত্র হইতে কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। তিনি গোরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

My heart beats when the thought that *you* are my friend, comes into my mind! You say you will honour my place—or “palace” (as you kindly designate my cottage) with your “Royal presence”. Your presence, Gour Dass, is something more than Royal. Oh! it is *Angelic*! oh! no! it is something *more exquisita* still!

যে হৃদয়, প্রিয়তমের একখানি প্রতিমূর্তির জন্ত, পরিধেয় বসন পর্যন্ত বিক্রয় করিতে প্রস্তুত; যাহা প্রণয়াস্পদকে ছাড়িয়া, জয়ভূমির কোণে গিয়াও শান্তি প্রাপ্ত হয় না, এবং যাহা প্রিয়তমকে রাজ্যরূপে—দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া আরও কিছু উচ্চতর বিশেষণে বিশেষিত করিবার জন্ত ব্যাকুল; তাহার প্রেম-শিপালা কিরূপ তীব্র তাহার ব্যাখ্যান নিম্নয়োজন। কিন্তু এই প্রেম-শিপালা, ভবিষ্যতে অলংঘ্য আকারে মধুসূদনের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিয়া, তৎসম্বন্ধীয় দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। স্বাভাবিক কোমলতার ও প্রেম-শিপালার সঙ্গে উচ্ছ্বলতার সংযোগে কবিদিগের মধ্যে লর্ড

বায়রণের জীবনই মধুসূদনের জীবনের সহিত সৰ্বাপেক্ষা তুলনীয়। উভয়ের বাল্য-বন্ধুতার আলোচনা করিলে, ইহা স্বস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। একবার একটি বয়োজ্যেষ্ঠ, দুর্দান্ত বালক বায়রণের কোন শৈশব-স্মৃদকে বেজ্ঞাঘাত করিতেছিল। শারীরিক বলে ইহার প্রতিবিধান করিবার শক্তি বায়রণের ছিল না। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রহারকারী বালকের নিকট যাইয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি আমার বন্ধুকে আর প্রহার করিও না। ইহাকে আর যে কয়বার বেজ্ঞাঘাত করিতে তোমার ইচ্ছা, তাহা আমাকেই কর।” এই প্রেম-পিপাসু, সরলহৃদয় বালকের পরিণাম চিন্তা করিলে, কে অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন? বালক মধুসূদনেরও শৈশব-সৌহার্দ্য সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছি;—মধুসূদন একদিন শুনিলেন, তাঁহার প্রিয় স্মৃদ, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অর্থাভাবে হিন্দু-কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি টাকার জন্ত কলেজ ছাড়িবে? তাহা কখনই হইবে না। তোমার মা, আর আমার মা ভিন্ন নন। আমার মা আমার খরচের জন্ত এত টাকা দেন; আর আমার আর এক মায়ের ছেলে, তুমি, টাকার অভাবে কলেজ ছাড়িবে! তাহা কখনই হইবে না।” নদী যখন পর্বত হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাতে আবিলতা থাকে না। কিন্তু যতই পৃথিবীর ধূলির ও পঙ্কের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইতে থাকে, ততই তাহা কলুষিত আকার ধারণ করে। লর্ড বায়রণের বা মধুসূদনের, কাহারও প্রেমে, প্রথমে, আবিলতা ছিল না। কিন্তু ঘোবনের পদাৰ্পণে অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার সঙ্গে ভোগাসক্তি ও রূপলালসা আসিয়া উভয়কে গ্রাস করিল। উভয়েরই সর্বনাশ হইল। সেই অবধি দুইজনেই প্রণয়ের নামে, নিজ নিজ জীবন ইন্দ্রিয়-সেবাতেই অভিবাহিত করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তি কাহারও ভাগ্যে মিলে নাই। মধুসূদন ভগ্নহৃদয়ে আত্ম-বিলাপ লিখিয়াছিলেন;—পৃথিবীর প্রেম, যশ, অর্থ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই;—না জানিয়া, না শুনিয়া, তিনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন মাত্র। আর লর্ড বায়রণ,—তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কাব্য কেবলই নিরাশা-জনিত আত্মনাশে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ম্যানফ্রেডের প্রথম অঙ্কে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

Philosophy and Science and the springs

Of wonder, and the wisdom of the world,

I have essay'd, and in my mind there is

A power to make these subject to itself—

But they avail not : I have done men good,

And I have met with good even among men—
But this avail'd not : I have had my foes,
And none have baffled, many fallen before me—
But this avail'd not.

পাঠক, ইহার সঙ্গে মধুসূদনের আত্মবিলাপ তুলনা করুন;—দেখিবেন, উভয়ই কিরূপ অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্তনাড়ে ও নিরাশার মর্মভেদী ক্রন্দনে পূর্ণ। উভয় লেখকেরই কি যেন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই;—কি যেন অভাব, কি যেন মর্মভেদী সন্তাপ উভয়েরই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বর্তমান থাকিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই জীবনকে অশান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। পরিতৃপ্তি যে ভোগস্থলে নয়—ভোগ-বাসনার দমনে, এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়—কঠোর আত্মসংযমে, বায়রণ অথবা মধুসূদন কেহই তাহা জানিতেন না; পরিতৃপ্তি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মিলিবে কেন? উদ্ধাম লালসা থাকিবে, অথচ পরিতৃপ্তি মিলিবে না, এ অবস্থায় মহুগের পরিণাম যে কি হয়, মধুসূদন ও বায়রণ দুইজনেই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

মধুসূদনের শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে আর দুই-একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। অসাদারণ বিজ্ঞাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই, তাঁহার চরিত্রে আত্মসংযমের ও সুনীতিপরায়ণতার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এই দুইয়ের অভাবে, দেব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়াও, তিনি আত্মজীবন দুঃখময় ও কলঙ্কময় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সবনাশের বীজ পঠদশাতেই তাঁহার চরিত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, সুতরাং মধুসূদনের অর্থাভাব ছিল না। একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার জননী, তাঁহার ব্যয়ের জগ্ন প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। সুতরাং মধুসূদন বেশভূষায় ও ব্যয় সম্বন্ধে কলেজের লক্ষপতির সন্তানদিগেরই ত্রায় চলিতেন। হিন্দুকলেজ, প্রধানতঃ, ধনী-সন্তানদিগেরই জগ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান পরিবারের বালকেরা তথায় অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং বিলাসপ্রিয়তা হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বড়ই সাধারণ ছিল। এই বিলাসপ্রিয়তা সম্বন্ধে মধুসূদন আবার অপর সকলের অগ্রবর্তী ছিলেন। নিত্য নৃতন, নৃতন পরিচ্ছদ এবং নৃতন প্রকার গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্যেও তিনি, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার একদিনের ব্যবহার হইতে পাঠক তাঁহার প্রকৃতি অনুমান করিতে

আত্মসংযমের ও
সুনীতির অভাব।

পারিবেন। একদিন সাহেব-কোরকারের দোকান হইতে চুল ছাঁটিয়া আসিয়া মধুসূদন সহাধ্যায়ীদিগকে বলিলেন; “দেখ, আমার চুল ছাঁটা কেমন সুন্দর হইয়াছে, আমি ইহার জন্য এক মোহর দিয়াছি।” কিন্তু এই বিলাসপ্রিয়তা

অপেক্ষা গুরুতর আরও কোন কোন দোষ, এই সময়ে, কদাচার ও কদভ্যাস।

তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। কুসঙ্গে পতিত হইয়া, এবং কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া, তিনি ছাত্রাবস্থাতেই, মত্তপানে আসক্ত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়ার ছাত্রগণের মধ্যে পান-দোষ ও হিন্দুধর্ম-নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণে অমুরাগ ক্রিপণ প্রবল ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। মধুসূদনের সময়ে যদিও তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, তথাপি কলেজের অনেক ছাত্র, তখনও, মত্তপান সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদন ইহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার সমকালবতী ও সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার আত্মজীবন চরিতে, এই সময়কার প্রসঙ্গে, লিখিয়াছেন; “তখন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মত্তপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর, একত্র হইয়া গোলদিঘীতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শীক-কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদিঘীর রেল টপ্কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ত্রাণ্ডি খাওয়া, সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কাৰ্য বলিয়া মনে করিতাম।” সমাজের কি শোচনীয় অবস্থায় মধুসূদন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এ অবস্থায় যে, সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের নৈতিক অধঃপতন হইবে, তাহা বিস্ময়কর নয়। মধুসূদনের সমকালবতী আরও অনেকে, জীবনে, তাঁহারই ত্রায় দুর্বলতা দেখাইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা, একবার আলিতপদ হইয়া, আবার উঠিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা পারেন নাই, এই মাত্র পার্থক্য।

পানদোষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও, ছাত্রাবস্থায়, মধুসূদনের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। যে শিক্ষায় ও শাসনগুণে তরুণ বয়সের উদ্ধামভাব সংযত হয়,

গৃহে অথবা কলেজে, কোথাও, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

গৃহ এবং বিদ্যালয়ে

নাতি-শিক্ষার অভাব।

তাঁহার পিতামাতা, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য, ষড়্ভের ও

অর্থব্যয়ের ক্রটি করিতেন না। কিন্তু পুত্রকে ধার্মিক ও

নীতিপরায়ণ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষাদানের ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন,

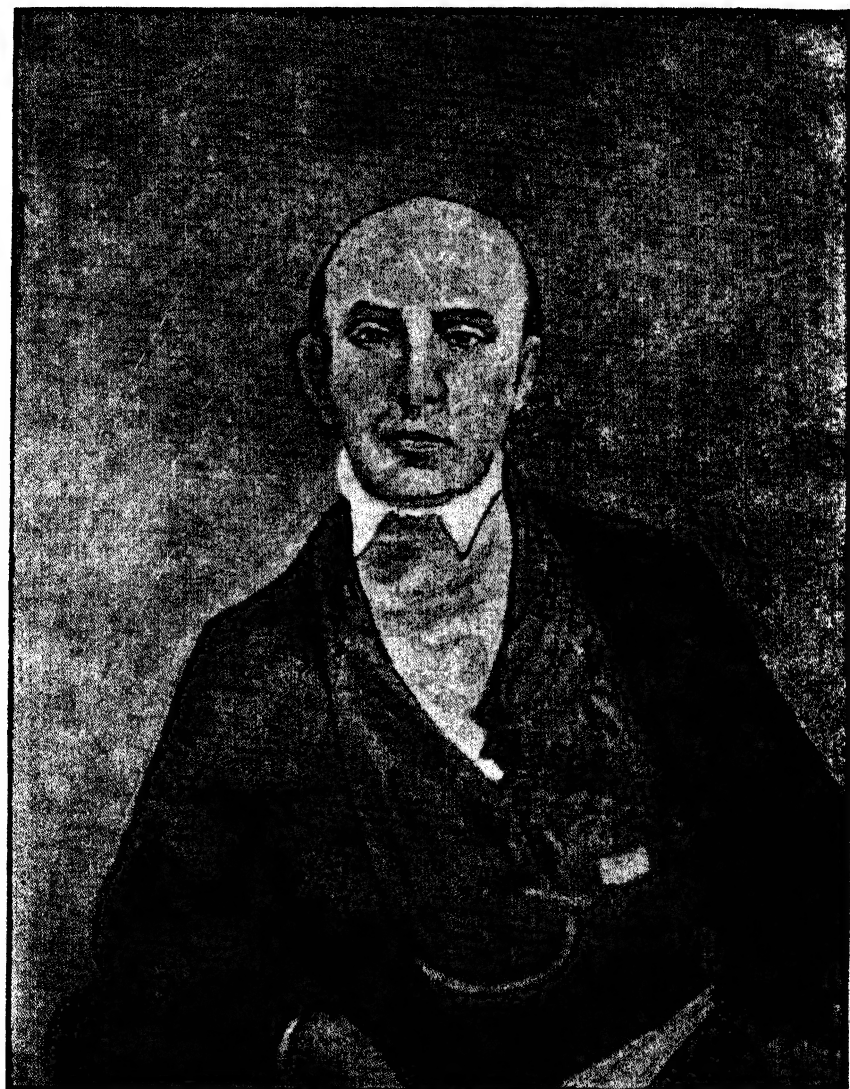
তাহারা তাহার উপায় করিতে পারেন নাই। একমাত্র পুত্র বলিয়া, তাহার মধুসূদনকে বাল্যাবধি আদরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে কোন অত্যাচার কার্য করিতে দেখিলেও কখন শাসন করিতেন না, বরং অনেক সময়, না বুঝিয়া, তাহার অশিষ্টাচারে প্রশ্রয় দান করিতেন।* সুতরাং শৈশব হইতে অত্যাচারে প্রতিপালিত মধুসূদনের পক্ষে তরুণ বয়সের উদ্দামভাব সংঘত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পিতামাতার ব্যবহারে যে ভ্রুটি ছিল, কলেজীয় শিক্ষাতেও তাহা সংশোধিত হয় নাই। হিন্দু-কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে যিনি সকল বিষয়ে মধুসূদনের আদর্শস্থানীয় ছিলেন, সেই রিচার্ডসন, বিদ্যা, বুদ্ধিতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও, স্ননীতিপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার দুর্নীতির ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় কলেজের ছাত্রগণের সকলেরই বিদিত ছিল। ছাত্রেরা, তাহা লইয়া, পরস্পরের মধ্যে, হাস্য, পরিহাস করিতেন। শিক্ষকই বাল্যকালে ছাত্রের আদর্শ। শিক্ষকের দোষ-গুণ ছাত্রের জীবনে নিত্যই প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে পিতামাতার এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রদত্ত শিক্ষায় ও শাসনগুণেই মনুষ্যের প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন, ইহার কোন স্থানেই, একটি উচ্চ আদর্শ দেখিতে পান নাই। মধুসূদনের চরিত্রের সমর্থনের জন্ত যে, আমরা এই সকল কথা বলিতেছি, তাহা নয়। পাপ, যে অবস্থাতেই কৃত হউক, চিরদিনই পাপ; তাহার সমর্থন নাই। সুতরাং মধুসূদনের চরিত্র সমর্থনের জন্ত এই সকল কথা নয়। কেবল কি অবস্থায় ও কিরূপ ঘটনাসম্মিলনে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্তই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। মধুসূদনের দুর্নীতি-পরায়ণতার আরও একটি কারণ ছিল। একেই ত তিনি অতি কোমলহৃদয় ও প্রেম-পিপাসু ছিলেন; তাহার উপর বায়রণের মাদকতাপূর্ণ কবিতা তিনি, সর্বদা, অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। টমাস মূরের লিখিত বায়রণের জীবন-চরিত তাহার ছাত্রাবস্থার অতি প্রিয়-গ্রন্থ ছিল এবং অনেক বিষয়ে বায়রণকেই তিনি নিজের আদর্শ মনে করিতেন। ছাত্রাবস্থায় বায়রণের অল্পকরণে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বায়রণের অল্পকরণে কতদূর কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন। বায়রণের প্রেম-পিপাসাপূর্ণ কবিতা তরল-হৃদয় মধুসূদনের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। বায়রণকে আদর্শ করিতে

বায়রণকে আদর্শ
করিবার কল।

* পরিশিষ্টে, গৌরদাস বাবুর লিখিত বস্তুবো, পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মধুসূদনের পিতা আলবোলার নল বহুশ্রেষ্ঠ পুত্রকে দিতেন।

যাইয়া, তিনি স্ত্রীশ্রীতির ও মিতাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার পরিণাম ফল যে বিষময় হইবে, সে জ্ঞান তাঁহাব ছিল না। একবার তিনি অল্পতপ্ত স্বদয়ে প্রিয়স্বস্তদ গোবদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, “দেখ, আমি কৃষিতুল্য ছিলাম, আমার কি অধঃপতন হইতেছে” (“you see from an anchorite and monk I am becoming a decided rake) কিন্তু লিখিলে কি হইবে? মেণ্টেবের জ্যায় কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বস্তদ, তাঁহাব বক্ষাব জ্ঞাত, আবিহৃত হইলেন না। স্ত্রীশ্রীতির পিচ্ছিল বস্ত্রের অব্যবহিঃপার্শ্বই স্ত্রীশ্রীতির অতলস্পর্শ গহবর মধ্যে আব কিছুই নাই। একবার পদস্থলন হইলে, কেহ আকর্ষণ কবিয়া না বাখিলে, আব বক্ষা হয় না। কিন্তু পতনোন্মুখ মধুসূদনে, কেহে ববিয়া আকর্ষণ কবিয়া, বাখিতে পাবেন, এমন কেহই ছিলেন না। মধুসূদন ভালবাসিয়া পরকে আপনাব ববিতে পাবিতেন, কিন্তু আপনাকে পবের হস্তে সমর্পণ কবিতে আনিতেন না। পিতা হউন, মাতা হউন, শিক্ষক হউন, বন্ধু হউন, নিজেব হচ্ছ। অপব কাণাব ইচ্ছায় বিসজন দিবাব শিক্ষা তাহাব হয় নাহ, শুতবাং তাহাব উপব কাণাব অধিকাৰ ছিল না। এই অধিকাৰেব অভাবে কেহ তাহাকে বক্ষা কবিত সমর্থ হইলেন না। ইতভাগ্য কবি, চিবজীবনেব জ্ঞাত, স্ত্রীশ্রীতির নান্দঃশঙ্কাবময় গহবরে নিপাতিত হইলেন।

অব্যয়নাবস্থায় মধুসূদনেব চবিজ্রে যে সমস্ত দোষ, ভুণ পবিস্কৃত হইয়াছিল, আমবা একে একে তাহাব সকলগুলিবই আলোচনা কনিয়াছি। তাঁহাব অনাযন নৈলতা, সাহিত্যানুবাগ, প্রেম-প্রবণতা, বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সমুদায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যে শিক্ষা তাঁহাকে ‘কাব মধুসূদন কবিয়াছিল, তাহাব উল্লেখ কবা হয় নাই। কবি-শক্তি মনুয়েব প্রকৃতি প্রদত্ত গুণ, শুতবাং হিন্দু শুলেজেব শিক্ষায় মধুসূদন যে কবি শক্তি লাভ কবিয়াছিলেন, তাহা নয়। তবে হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা হইতে তাঁহাব প্রকৃতি দত্ত শক্তি যে ক্ষতিলাভের অন্তরাল স্বযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বামগোপাল ঘোষেব রাজনৈতিক জীবন যেমন ডিবোজিযোব প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, মধুসূদনেবও সাহিত্যিক জীবন তেমনই বিচার্ডসনেব প্রভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। আমবা পববর্তী অব্যাযে বিচার্ডসনেব প্রদত্ত শিক্ষায়, মধুসূদনেব কবি-শক্তি বিকল্প বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।



ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গসমাজে এক্ষণে যে অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা তাহার প্রবর্তন সম্বন্ধে কিরূপ কাণ করিয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। ঐহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাশুণে হিন্দুকলেজ এই নবযুগ প্রবর্তনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদিগের

মধ্যে সর্বপ্রথমে ডিরোজিয়ার এবং তাঁহার পরেই রিচার্ড-ইনুকলেজীয় শিক্ষা ও সনের নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের আর কোন বৈদেশিক

শিক্ষকই, ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে, ঐহাদিগের দুইজনের ত্রায়, স্থায়ী প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিতে হইলে যেমন ডিরোজিয়ার বিষয় আমাদের মনে হয়, আধুনিক বাঙালা কবিতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইলে, তেমনই রিচার্ড সনের কথা আমাদের মনে পড়ে। বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রে এক্ষণে যে যুগ বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রবর্তনিতা মধুসূদন, রিচার্ড সনেরই শিক্ষাশুণে অল্পপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়ার ত্রায় রিচার্ড সনেরও নাম ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি যে, এক-সময়ে, এদেশের বিদ্যাবলীর কিরূপ সমাদর-ভাজন ছিলেন, এবং এদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন-গঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা অল্পমান করা দুঃসাধ্য।* রিচার্ড সন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে

* রিচার্ড সনের অন্তিম প্রসিদ্ধ ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ বসু নিজের আত্মচরিতে তাঁহার সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

“কাপ্তেন সাহেব ইংরাজ সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেঙ্গপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেঙ্গপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare.” তিনি আশ্চর্যরূপে সেঙ্গপিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হামলেটে যেখানে আছে, “that shows his hoar leaves in the glassy stream”, সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গাছের পাতা সবুজ, “hoar leaves” এই প্রয়োগ কবি কেন করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তলভাগ সাদা **। তিনি আমাদেরকে নাট্যাগারে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাড়িতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, are you going to the theatre to-day? তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যাগার। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহার সন্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত ***। তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উদ্ভূত হয়, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার লভ্য বিষয় ছিল না, কিন্তু তথ্যই হয়।”

সৈনিক-কাষে ব্রতী হইয়া, এদেশে আগমন করেন। সৈনিক-কাষে সতিত সম্বন্ধবশতঃই তিনি সাধাবণেব নিকট কাপ্তেন বিচার্ডসন নায়ে খ্যাত। তিনি সৈনিক-কাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা সাহিত্যের দিকেই ছিল। কিছুদিন কাগ্য কবিবাব পব, তিনি কোম্পানিব অধীনতা ত্যাগ করেন, এবং অল্পদিন ভাবতেব তদানীন্তন শাসনকর্তা, মহারাজা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কেব সহচাৰিহ কবিয়া, ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিব অধীনে কাগ্য কবিবাব সময় হইতেই তিনি একজন স্থলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন। সে সময়কাগ্য ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় অনেক প্রধান প্রধান, সংবাদপত্রেব সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তন্নিম্ন কয়েকখানি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাৰ সম্পাদন দ্বারা তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীৰও পৰিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিজেব বচনাশক্তি অপেক্ষা অগ্রেব বচনাৰ দোষ, গুণ নির্বাচন কবিবাব ক্ষমতাৰ জগুই তিনি সমবিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত কবি-কৌলীজ উপলব্ধি কবিবাব সেকপ শক্তি অতি গল্প লোকেব মপোট দৃষ্টিগোচৰ হয়। তাহার ছাত্রদিগেব মপ্যে অনেকেব বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রেব বসাস্বাদ ও অর্থগ্রহ কবিতে, তাঁহার গ্রায স্মনিপুণ অব্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। সে সময়কাগ্য উচ্চশ্রেণীৰ ছাত্রদিগেব জগু, তিনি “ব্রিটনীয় কবিগণের সাবসংগ্রহ” Selections from the British Poets নামক যে পুস্তক মঙ্গলন কবিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গুণ-গাহিতার ও বসজ্ঞতাৰ যথেষ্ট পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন। তাহার সাবসংগ্রহ পুস্তক এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যে কেহ ইহা মনোযোগেব সহিত পাঠ কবিবেন, তিনি, ইহাব নির্বাচন-প্রণালীৰ জগু, বিচার্ডসনেব ভূষসী প্রশংসা কবিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার অব্যাপনা-প্রণালীও অতি চমৎকাৰ ছিল। যে গ্রন্থ তিনি একপ নৈপুণ্যেব সহিত পাঠ কবিতে পারিতেন যে, তাঁহার একবার

ডিরোজিযোব ও
বিচার্ডসনের প্রদত্ত
শিক্ষাৰ পার্থক্য।

আবুত্তি মাত্র, ছাত্রদিগেব অনেক স্থলে, তাহার অর্থগ্রহ হইত। সে সময়কাগ্য অনেক প্রসিদ্ধ বঙ্গশালাব অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহার নিকট সেক্ষাপযাব আবুত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ কবিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লড মেকলে তাঁহার এষ্ট

আবুত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, “আমি ইংলণ্ডে প্রতিগমন কবিলে, ভাবতেব আব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু তোমাৰ সেক্ষণীয়াব আবুত্তি বিস্মৃত হইতে পারিব না।” ডিরোজিয়োর শ্রায তিনিও তাহার ছাত্রদিগের মনোবুত্তিব

উন্মেষ করিতে সাধ্যাহুসারে চেষ্টা করিতেন। তবে ডিরোজিয়ার শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর এই পার্থক্য ছিল যে, ডিরোজিয়ো ছাত্রদিগের বিচারশক্তির উন্নতি-সাধনেরই অধিক চেষ্টা করিতেন। আর রিচার্ডসন ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার পরিবৰ্ধনের জন্যই অধিক প্রয়াস পাইতেন। ডিরোজিয়ো, ছাত্রদিগের ধর্ম, সমাজ এবং বাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েব দোষ, গুণ আলোচনা করিয়া, নিজের নিজের গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে বলিতেন। আর রিচার্ডসন, তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতার উদ্দীপন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে বাহুজগৎ ও অন্তর্জগতের ষাট সৌন্দর্য প্রকটিত করিতেন। ডিরোজিয়ো ও রিচার্ডসন উভয়েই কবি, উভয়েই চিন্তাশীল। কিন্তু ডিরোজিয়ার কবিত্বেব সঙ্গে দার্শনিক বিচারশক্তি প্রবল। রিচার্ডসনে কেবলই অমিশ্র ভাবপ্রবণতা। প্রথম কাব্যক্ষেত্রের সহায়, দ্বিতীয় কল্পনাঙ্গগতের পথ-প্রদর্শক। ডিরোজিয়ো ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিতেন, তাহার নিষ্কর্ষ এইরূপ, “দেখ, যে সমাজে আমরাদিগের বাস, তাহাতে এই সকল কুসংস্কার ; যাহা আমরা ধর্ম বলিয়া সম্মান কবি, তাহাতে এই সকল ভ্রম, এবং যে শাসন-নীতি অহুসারে আমবা পরিচালিত হইতেছি, তাহাতে এই সকল অত্যাচার বর্তমান রহিয়াছে। আশ্চর্য্য বলিয়া নয়, সৃষ্টিকালাবধি এইরূপ ভ্রম, প্রমাদ চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহাদিগের সংশোধনের আবশ্যকতা নাই, তাহা নয়। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া, এই সকল ভ্রম, কুসংস্কার এবং অত্যাচার নিবারণের চেষ্টাতেই প্রকৃত মনঃশ্রম।” রিচার্ডসনের সহিত ধর্মনীতির অথবা সমাজনীতির বড় সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ছাত্রদিগকে সুলেখক ও সুপণ্ডিত করিতে পারিলেই আপনাব কর্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, “দেখ, এই বাহুজগৎ কেমন সুন্দর, কেমন সুন্দর, কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ, এই তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, এই সৌন্দর্যময় প্রদোষ, এবং এই জ্যোৎস্না-ধৌত বজনী কি অপূর্ব শোভায় সুশোভিত। পতির নিকট সতীর স্থায় প্রকৃতি তাহার উপাসকের নিকট আপনাব প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য প্রকাশিত করেন। কবিগণই প্রকৃতির সখার্থ উপাসক। সাধারণের নিকট প্রকৃতির যে মূর্তি শুষ্ক ও কঠোর বলিয়া বোধ হয়, কবির নিকট তাহা সরল লালিত্যময় প্রতীয়মান হয়। তোমরা প্রকৃতির উপাসক বা কবি হও, বাহুজগতের অদৃষ্টপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে।* এই

* তাঁহার সারসংগ্রহের ভূমিকায় রিচার্ডসন লিখিয়াছিলেন,—

To cold and vulgar minds how large a portion of this beautiful world is a dreary blank ! They recognise nothing but an uninteresting mono-

সঙ্গে মানব-হৃদয়েরও এত বহুস্ত্র আলোচনা করিতে শিখ। অপমানিত মানব-
হৃদয় প্রতিহিংসায় কি পিশাচমূর্তি ধারণ করে, তাহাব দৃষ্টান্ত দেখ এই সাইলকে,
পরিণামে কি ঘটিবে চিন্তামাত্র না কবিতা প্রেমিক কেমন পতঙ্গের ন্যায়
অগ্নিকুণ্ডে কাপ দেয়, তাহাব দৃষ্টান্ত দেখ এই বোমিও ও এই জুলিয়েটে,
প্রণয়িনীর উপর মন্দেহ জগিলে প্রণয়ী কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় কায করে, তাহাব
দৃষ্টান্ত দেখ দেখিলোয়। এই বাহুজগতেও ও এই অন্তঃজগতেও বহুস্ত্র-
কান্দে না পাবিলে, তোমাদিগের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না। দেখ, যে
মহাকাব্যগণ ও অপ্রত্যক্ষ জগৎ বর্ণনা শুনে, তোমাদিগের প্রত্যক্ষ ববাহতেছেন,
তাহাদিগের বি স্থিতিপুণ্য, কি বচনাকোশল। যদি স্নলেখক হইতে চান,

১০ একাধিক শিক্ষার
১০০ য।।

তবে ইহাদিগকে আদর্শ কর। এইরূপ শব্দবিশ্রাস এবং

এইরূপ ভাষার পবিপাট্য না হইলে বচনাব উৎকর্ষ হয় না।

ডিবোজিয়ার ও বিচারসনের প্রদত্ত এইরূপ বিভিন্ন
প্রকাৰের শিক্ষা যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা সহজেই প্রত্যাশা করা
যাইতে পারে। ডিবোজিয়ার ছাত্রগণ সকলেই বাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক
হবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বসিকরুষ্ক মল্লিক, বামগোপাল ঘোষ,
রক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাবর্ধন মুখোপাধ্যায়, বামতন্ত্র লাহিড়ী, শিবচন্দ্র
দত্ত প্রভৃতি ডিবোজিয়ার শিষ্যগণ তাহাদিগের সমকালীন বাজনৈতিক ও
সামাজিক কুসংস্কারের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু বিচারসনের ছাত্রগণ, স্নলেখক
ও স্থপতিগণ বলিয়াই অধিক পরিচিত। প্যাঁচীচরণ সবকার, ভূদেব
মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বস্তু, বাজনাচাৰ্য্য বস্তু
এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি বিচারসনের ছাত্র। ইহাদিগের মধ্যে বাবু

tony in the daily aspect of the the earth or sky. It is the spirit of
poetry which keeps the world fresh and young To a poetical eye every
morning's sun seems to look rejoicingly on a new creation. Poetry
widens the sphere of our purest and most permanent enjoyments. It
makes the familiar new, the past present, the distant near It is the
philosopher's stone discovered, the transmutates everything into gold

তিনি অল্পজ্ঞ লিখিয়াছেন—

It is the part of poetry to lift us above the reach of petty cares and
sensual desires, and to make us feel that there is something nobler and
more permanent than the ordinary pleasures of the world. It is a
species of religion. Poets are nature's priests. They lead us "from
nature upto nature's God "

রাজনারায়ণ বসু ভিন্ন আর কেহ ধর্মসংস্কারের অথবা সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।* বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায় যে বিভিন্ন কল উৎপাদন করে, ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের ছাত্রগণের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

ডিরোজিয়োর শ্রায় রিচার্ডসনও তাঁহার ছাত্রদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে ইংরাজী ভাষায় গল্প, পদ্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইত। তিনি নিজে একজন অতি স্থলেখক ছিলেন। অগ্ৰাণ্ড খ্যাতনামা লেখকগণের রচনার শ্রায় তাঁহার নিজের রচনাও

রিচার্ডসনকে
অনুকরণেচ্ছা।

তিনি, অনেক সময়, ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

তাঁহার স্থলিত কবিতায় ও হৃদয়গ্রাহিণী আবৃত্তিতে তাঁহার

ছাত্রগণের হৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইত। তাঁহারাও আশা

করিতেন, কতদিনে কাপ্তেন সাহেবের শ্রায় স্থলেখক হইতে পারিবেন। রিচার্ডসনও ছাত্রদিগের এই আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। তিনি তাঁহাদিগের রচনা অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কোন সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করাইতেন। এক্ষণে সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগের উচ্চাভিলাষ এবং রচনা-প্রবৃত্তি সহজেই বর্ধিত হইয়া থাকে। কাপ্তেন সাহেবের শ্রায় স্থলেখক হইব, রিচার্ডসনের ছাত্রমাত্রেরই হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল ছিল। অগ্ৰাণ্ড ছাত্রেরা রিচার্ডসনের কেবল গুণগুলিরই অনুকরণ করিতেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার দোষগুলি পর্বস্ত অনুকরণ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী বলেন,† একদিন মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময়ে, যখন কলেজের অগ্ৰাণ্ড ছাত্রেরা আমোদ, প্রমোদ করিতেছিলেন, মধুসূদন, তখন, একা গৃহের এক নির্জন অংশে বসিয়া রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতেছিলেন। স্থল বিভাগের প্রথম শিক্ষক, জোস সাহেব, দেখিতে পাইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন। মধুসূদনকে তদগতচিত্তে রিচার্ডসনের লেখার অনুকরণ করিতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন; “মধু, তুমি কি মনে কর, কাপ্তেন সাহেবের মত বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড় লোক হইবে?” মধুসূদন লজ্জায় নিকন্তর রহিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত লিখিত বিষয়টি লুকাইয়া

* ব্রজদমাজের, বিশেষতঃ মর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সন্মত হইতেই রাজনারায়ণবাসু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কলেজী শিক্ষার সহিত তাঁহার বড় সন্মত ছিল না।

† বাবু বহুবিহারী দত্ত।

কেলিলেন। রিচার্ডসনকে অমুদ্রণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের কিরূপ প্রবল ছিল, এই ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় রিচার্ডসনের “সারসংগ্রহ পুস্তক” প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা অতি উপাদেয়। কাব্যাত্মশীলনের দোষগুণ রিচার্ডসন তাহাতে অতি সুন্দররূপ আলোচনা করিয়াছেন। মুদ্রিত হইবার পূর্বে তিনি তাহা তাঁহার ছাত্রগণের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। মধুসূদন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন, এবং মনের আবেগে সধরণ করিতে না পারিয়া, সকলের সমক্ষেই বলিয়া উঠিলেন, “আহা, আমি যদি ইহার লেখক হইতাম” (“I wish I had been the author of it”)। সেই স্কুলমার বয়সে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাঁহার এইরূপ মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্ববীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায় ও আদর্শে তাহা এইরূপে উদ্ভিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতেই মধুসূদন ইংরাজীতে গল্প, পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ণ বয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য-রচনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন কিরূপে আবদ্ধ ও পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা তাঁহার বাল্যরচিত কয়েকটি কবিতা বর্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব। পূর্ববয়সে তিনি মিন্টনকে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ;

কিন্তু পঠদশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। বায়রণ,
 বায়রণ, স্কট, মুর এবং স্কট এবং মুর এই তিন স্কনেরই আদর্শে তিনি তখন তাঁহার
 ডিরোজিয়োর প্রভাব।

রচনা প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের অমুদ্রণে কতদূর কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন, তাঁহার “ক্যাপটিভ লেডী” ও উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই তিন জন কবির দ্বারা ডিরোজিয়োও, মধুসূদনের প্রথম জীবনে কিয়ৎপরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ডিরোজিয়ো যদিও সে সময় হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম তখনও সেখানে জাগরুক ছিল, এবং তাহার কবিতা তখনও সেখানে সাদরে পঠিত হইত। অনেকে তাঁহাকে “ইউরেশিয়ান বায়রণ” (Euresian Byron) বলিতেন। যাহা কিছু হৃদয়কে উত্তেজিত ও আন্দোলিত করে, এবং যাহাতে প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস থাকে, সেইরূপ মাদকতাপূর্ণ কবিতাই তৎকালবয়সে মধুসূদনের সর্বাঙ্গের প্রিয় ছিল। সুতরাং ডিরোজিয়োর বায়রণপ্রণালী কবিতার তাঁহার হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। উভয়ের

জীবনেও একটু সাদৃশ্য ছিল। ডিরোজিয়োর প্রথম কবিতা পুস্তক তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সে প্রকাশিত হইয়াছিল; মধুসূদনও অষ্টাদশবর্ষবয়সে, হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। উভয়েই বায়রণের শিষ্য এবং উভয়েই প্রেমপিপাসু ছিলেন। সুতরাং ডিরোজিয়োকে না দেখিয়াও মধুসূদন অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্ত মধুসূদনের প্রথম বয়সের লিখিত কোন কোন কবিতায় ডিরোজিয়োর কবিতার ছায়া লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা ছায়ামাত্র। ডিরোজিয়োর কবিতার অনুকরণ করিব, মধুসূদনের সেরূপ বাসনা কখনই হয় নাই। যাহারা কাব্যজগতে সকলেব শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইব, বালাবধি ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল; সুতরাং ডিরোজিয়োকে কখনও তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। এই মস্তুর উপাসক এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রবীণের সহিত নবীনের যে সম্বন্ধ থাকে, ডিরোজিয়োর সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধ ছিল, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

মধুসূদনের রচিত কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

I LOVED THEE !

I

I lov'd thee—how oft on the soft-beaming eye,
I've gaz'd with deep rapture and heart swelling high !
There was life in thy smile—there was death in thy frown ;
Thy voice it was sweeter than melody's own !

II

I lov'd thee—how Hope sooth'd me to dreams
Of paths strewn with flow'rs—of days gilt with beams ;
'Twas bliss when on Future's horizon afar
The shrin'd thee in glory—my Destiny's star ;

III

But 'tis past—like a vision of ethereal ray
 Thou camest—but to dazzle and vanish away—
 A seraph forth straying from Heaven's bright bow'r,
 In sun-shine and glory to bless—but and hour !

IV

But 'tis past—what is past ?—Can it be that fond breast
 Is now cold as the sod it hath silently prest—
 Can it be that those eyes—so soft and so bright—
 Are now quench'd in the grave's eternal-dark night !

V

How fain would I dream 'tis delusive and vain—
 How fain would I dream thou will come back again—
 But Reality lends all a tongue and a tone,
 To break the sweet spell by fond Fancy thus thrown !

MAEONIDES

SONG

THEY ASK ME WHY I FADE PINE.

They ask me why I fade and pine,
 And seem oppressed with woe ?
 They say what care now can be mine,
 To cloud my youthful brow ?
 Alas !—they know not that I die
 Of pains that none can heal,
 Save those dear smiles and that blue eye
 Who soon as Lethe's murmuring rill,
 Can lull my woes t' eternal sleep,
 And make me cease to sigh and weep !

That cruel—that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not, why thus I pine and fade,
And why oft thus I moan !

When fondly turn my ravished eyes
On her sweet cheeks to gaze,
What life embittering frowns arise
And could that heavenly face !

O ! thus abandoned to despair
I've naught but grief for me ;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery !

28th March, 1841 }
Kidderpore }

M. S DUTT.

THE FORTUNATE RAINY DAY

(Written at the request of my beloved friend,
Babu Gour Dass Bysack Mohashoy.)

Lo ! sweet was the hour ;—and a balmy shower of rain,
Revived th' drooping beauties of each flowery mead
and plain ;
Like tyrants, bereft of their power, as they fly,
The proud scorching sun was retiring in the sky—
And tuneful Zephyr warbled his heart entrancing song,
And sighed, as he wandered yon green groves among ;
When gladly I met her beneath yon Almond tree,
(Oh sacred as Elysium be its happy shades to me !)

There I kissed and embraced her ;—and oh !—who can tell
What passions tumultuous did in my bosom swell !

What tears joy-speaking rushed forth from my eyes !
 They bathed her snowy hands—while I warmed them
 with my sights !

29th March, 1841. }
 Kidderpore }

M. S. D.

“MY FOND SWEET BLUE-EYED MAID”

I

Though in a distant clime I roam,
 By Fate exiled from thee ;
 And tho' the sweets of native home
 Are thus estranged from me ;
 Yet oh ! e'en in my-gloomiest hour
 I've a joy that can console
 Me, and calm the storms of grief that lour
 The sun-shine of my soul !

II

Fond Fancy, sweet enchantress,
 Oft with her visions gay,
 Does chase my sad heart's dreariness
 And banish it far away ;
 I dream of that e'er-lovely scene
 Where in life's morning hour,
 We fondly loitered on the green
 And cull'd each rosy flower.

III

I dream—I steal the silent kiss,
 Tho' tremble while I take,

Like am'rous moon-beams that embrace
And kiss yon silvery lake ;
I dream—I see those azure eyes
Dance star-like in that face,
That face the better Paradise,
Where Ang'ls sight' pass their days !

IV

When wildly comes the tempest on,
When Patience with a sigh
The dreadful thunder-storm does shun
And leave me 'lone to die ;
I dream—and see my bonny maid ;
Sudden smiling in my heart ;
And oh ! she revives my spirit dead
And bids the tempest part !

V

I smile—I 'gin to live again
And wonder that I live ;
O' tho' flung in an ocean of pain
I've moments to cease to grieve !
Dear one ! tho' Time shall run his race,
Tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less,
“My fond sweet blue-eyed maid !”

26th March, 1841. }
Kidderpore. }

M. S. D.

মধুসূদনের বাংলা-রচনার মধ্যে এইরূপ প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাই অধিক ।
অল্পবয়সে তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ কিরূপ অকাল-পক্ব হইরাছিল, ইহা বারা তাহা
প্রমাণিত হইবে । এই প্রেমীর কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করা নিতর্য্যোজন ।

অল্পবিষয়ক কয়েকটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। তরুণবয়স্ক মধুসূদনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক নিম্নলিখিত কবিতাটির উপক্রমণিকা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তাঁহার উত্তরকালীন ব্যবহার স্বরণ করিলে, ইহাতে প্রকাশিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহাসাত্মক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

EVENING IN SATURN

A SONNET IN BLANK VERSE DEDICATED TO A PIGMY

PREFACE.

Reader ! who ever publishes a sonnet with a preface ? I hear, or fancy that I hear, you say "*none*" ! Well ! I publish. I am an enemy to what men call "*custom*." But be that as it is, I publish my sonnet with a preface ; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold ! I have written a *sonnet in blank-verse* ! What a rare experiment ! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this "*breach of etiquette*" towards her. O Joy ! O Glory ! O Happiness ! that I have done successfully what none dared do before me ! Excuse this short outbreak of impassioned exclamation. I have laid my scene in the Planet Saturn, because I despise everything earthly.

A beauteous veil of burning gold did hide
The Day-god's brow resplendent ; and the sky
Like to a canvass on its bosom wore
Sweet forms, the pencil of meek Even drew !
Now many a bird,—not Kokils—Philomels—
But of diviner kinds—began to sing
So sweet a dirge above the bier of day,
As might have made, ye, sons of this poor earth !

Sigh for a death that is so fondly mourned.
 Now from the west rose six moons hand in hand—
 Like a soft band of beauties—blushing—fair—
 Oh ! how their beams did brighten all the scene ;
 Their lights fell on the lakes and murmuring rivers,
 Like silver mantles :—Here the Sonnet endeth !

Crack back.

KING PORUS—A LEGEND OF OLD

"We ne'er shall look upon his like again !"—Shakespear.
 When shall such hero live again ?—Byron.

I

Loudly the midnight tempest sang,
 Ah ! 'twas thy dirge, fair Liberty !
 And clouds in thundering accents roar'd
 Unheeded warnings from on high ;
 The rain in darksome torrents fell,
 Hydaspes' waves did onward sweep,
 Like fiery Passion's headlong flow,
 To meet th' awaken'd calling deep ;
 The lightning flash'd bright—dazzling, like
 Fair woman's glance from 'neath her veil ;
 And on the heaving, troubled air,
 There was a moaning sound of wail ;—
 But, Ind ! thy unsuspecting sons
 Did heedless slumber,—while the foe
 Came in stealthy step of death,—
 Came—as the tiger, noiseless, slow,
 To close at once its victim's breath !

Alas ! they knew not 'midst this gloom,
 This war of elements, was nurst,—
 Like to an earthquake in the womb
 Of a volcano,—deep and low—
 A deadlier storm—on them to burst !

II

'Twas morn ; the Lord of Day
 From gold Sumero's palace bright,
 Look'd on his own sweet clime,
 But, lo ! the glorious flag,
 To which the world in awe once bow'd,
 There in defiance waved
 On India's gales—triumphant—proud !—
 Then rose the dreadful yell,—
 Then, lion like, each warrior brave
 Rushed on the coming foe,
 To strike for freedom—or the grave !
 Oh Death ! Upon thy glory alter
 What blood-libations freely flow'd !
 Oh Earth ! on that bright morn, what thousand
 Rendered to thee the dust they ow'd !—
 But 'fore the Macedonians driven—
 Fell India's hardy sons,—
 Proud mountain oaks by thunders riven—
 That for their country's freedom bled—
 And made on gore their glorious bed !

III

But dauntlessly there stood
 King Porus, towering 'midst the foe,

Like a Himala-peak
 With its eternal crown of snow :
 And on his brow did shine
 The jewell'd regal diadem
 His milk-white elephant
 Was deck'd with many a brilliant gem.
 He reck'd not of the phalanx
 That 'round him closed—but nobly fought,
 And like the angry winds that blow,
 And lofty mountain-pines lay low,
 Amidst them dreadful havoc wrought,
 And thin'd his crown and country's foe !
 The hardest warriors, at his deeds,
 Awe-struck quail'd like wind-shaken reeds !
 The dared not look upon his face,
 They shrank before his burning gaze,
 For in his eye the hero shone
 That feared not death ;—but high—alone—
 A being as if of lightning made,
 That scorch'd all that it gazed upon—
 Trampling the living with the dead.

IV

Th' immortal Thund'rer's son,
 Astonish'd eyed the heroic king ;
 He saw him bravely charge
 Like his dread father,—fulminating :—
 Tho' thousands' round him clos'd,
 He stood—as stands the ocean rock
 Amidst the lashing billows,
 Unmoved at their fierce thundering shock.
 But when th' emathian conqueror

Saw that with gaping wounds he bled,
 "Desist—desist !"—he cried—
 "Such noble blood should not be shed !"
 Then a herald was sent
 Where bleeding and faint,
 Stood, 'midst the dying and the dead,
 King Porus,—boldly, undismayed :
 "Hail, brave and warlike prince !
 Thy gen'rous rival bids thee cease—
 Behold ! there flies the flag,
 That lulls dread war, and wakens peace

V

'Like to a lion chain'd,
 'That, tho' faint—bleeding—stands in pride—
 'With eyes, where unsubdued
 Yet flash'd the fire—looks that defied :—
 King Porus boldly went
 'Where 'midst the gay and glittering crowd
 'Sat god-like Alexander ;
 'While 'round, Earth's mightiest monarchs bow'd
 King Porus was no slave ;
 He stooped not—bent not there his knee,—
 But stood, as stands an oak,
 'In Himalayan majesty.
 'How should I treat thee ?' ask'd
 The mighty king of Macedon :
 "Ev'n as a king", replied
 In royal pride, Ind's haughty son.
 The conq'ror pleas'd,
 'Him forth releas'd :
 'Thus India's crown was lost and won.

VI

But where, oh ! where is Porus now ?
 And where the noble hearts that bled
 For freedom—with the heroic glow
 In patriot bosoms nourished—
 —Hearts, eagle-like that recked not death,
 But shrank before foul Thraldom's breath ?
 And where art thou—Fair Freedom !—thou—
 Once goddess of Ind's sunny clime !
 When glory's halo round her brow
 Shone radiant, and she rose sublime,
 Like her own towering Himalye
 To kiss the blue clouds thron'd on high
 Clime of the sun ! – how like a Dream—
 How like bright sun-beams on a stream
 That melt beneath gray twilight's eye—
 That glory hath now flitted by !
 The crown that once did deck the braw
 Is trampled down—and thou sunk low ;
 Thy pearl, the diamond, and thy mine
 Of glistening gold no more is thine !
 Also !—each conquering tyrant's lust
 Has robb'd thee of thy very dust !
 Thou standest like a lofty tree
 Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
 Of every gale the sport to be,
 Despised and scorned e'en in thy fall !

উপরি উদ্ধৃত ভেজোগর্ভ কবিতাটি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের “লিটারারী গ্লীনার” (Literary Gleaner) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যে ওজোঙগ মধুসূদনের কবিতার প্রধান লক্ষণ, আমরা ইহাতে

তাহা সম্পূর্ণ দর্শন করি। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মধুসূদনের হৃদয় কিরূপ উজ্জ্বলিত হইত, এই কবিতা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার শেষ কয়টি পংক্তি পাঠককে ডিরোজিয়া প্রণীত “লক্ষীর অফ্ জঙ্গিরা” কাব্যের উৎসর্গপত্র স্মরণ করাইয়া দিবে।

SONNET

(Composed on the Ochterlony Monument.)

(Dedicated, as usual, to G. D. Bysac.)

Lo ! raised upon this vast aerial height,
This realm of air—free, uncontrolled I stand :
Behold ! beneath me how the grovelling band
Of this poor earth,—like emmets, whom the sight
Can scarce perceive,—are passing sadly by !
But what are they ?—poor things of mortal clay !
Thus pomp —thus pow'r—thus glory flit away
Like the bright meteor-glances of the sky.
When the black clouds do veil it. 'round me now,
The boundless sea of air, in clam profound,
Is sleeping gentle :—and the silent queen
Of swarth complexioned night, pale and serene,
Is rising brightly ! Oh ! how sweetly round
Falls the bright silver light of her calm brow !

Kidderpore, }
1842

M. S. Dutta.

মধুসূদনের এই সকল কবিতা সর্বাংশে নির্দোষ না হইলেও, ইংরাজী ভাষা-ভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে বৃকিতে পারিবেন যে, ভারতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়সে একজন যুবকের পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় এরূপ কবিতা লেখা সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নয়। কবিশক্তি মধুসূদনের অতি উল্লভ গুণ; দেবতামুগ্রহ ভিন্ন হইা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জননী প্রকৃতি

মধুসূদনকে এই দুর্লভ শক্তি এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করিতেন, অতি অল্পায়াসেই তাহাতে কবিতা লিখিতে পারিতেন। আলেকজান্দার পোপ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনেরও সম্বন্ধে বোধ হয় তাহা প্রয়োগ করা স্বাভাবিক হইতে পারে। প্রকৃতই তিনি

“Lisp'd in numbers for the numbers came.”

পোপের গ্রাম্য তিনিও বাল্যস্বপ্নদিগকে কবিতায় পত্র লিখিতেন, এবং কবিতা রচনা করিয়া উপহার দিতেন। কোন একখানি পুস্তক চাহিবার বা প্রত্যাশ করিবার সময়ে তিনি বাল্যবন্ধুদিগের নিকট কখন কখন কবিতাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। অবশ্য এরূপ কবিতায় কোন বিশেষ সৌন্দর্য থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু সৌন্দর্য না থাকুক, তাহাতে কৌতুকের বিষয় যথেষ্টই আছে। একজন প্রতিভাবান কবির স্বাভাবিক শক্তি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে যেমন কৌতুহল জন্মে, অবগত হইতে পারিলেও তেমনই উপকার আছে। আমরা সেইজন্ত মধুসূদনের রচিত কয়েকটি ক্রীড়া-কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। বীর বালক যেমন, বন্দুক, কামান লইয়া বাল্যক্রীড়া করে, শিশু কবিও তেমনই কবিতা রচনা দ্বারা আপনার ভাবী জীবনের আভাস প্রদান করেন; উভয়ই স্বাভাবিক। মানবজীবনেরও যেমন, কবিশক্তিতেও তেমনই শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য থাকে। যিনি পূর্ণ বয়সে কবিতা-ক্রীড়া।

মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিশোর বয়সেব এই কবিতা-ক্রীড়া দেখিয়া পাঠক অবশ্যই কৌতুক লাভ করিবেন।

STANZAS ON GRANTING “LEAVE OF ABSENCE” TO MY MUSE

I

Months, Years are gone away,
Since I my court did pay to thee ;
Since never I have pass'd a day,
Beloved Muse !—but 'twas with thee :

II

But now go to “Cape of Good Hope”
Or “Singapore” or where you will :

For thou art, Lady ! quite worn out,
And let me for a while be still !

III

Needst thou a testimonial
Of my affection, Love ! for thee ?
This single fact, Ma'am ! will suffice
That all I sacrifice for thee !

IV

Farewell ! But oh ! remember me,
Return, before our "Monthlies" all,
The "Gleaner"—"Blossom"—"Comet"* tempt
Me, to scribble for them all.

To G. D. B.

DEAR SIR,
"Lend me your Rollin"—how oft have I said,
Yet you do lend it not ;—But you evade
Me, with a silly, Bane-like † reply ;—
I do not this expect from thee ; and why ?
Because I love, respect and honor thee,
And think you are a man of honesty ;—
There is a lad,—his name I will not tell,
Who loves me not, tho' I do love him well,—

* "গ্লানার" "ব্লসম" এবং "কমেট" সে সময়কার তিনখানি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার নাম ।
মধুসূদন এই সকল পত্রিকায় রিচার্ডসনের উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতেন ।

† বেগীমাখর নামক মধুসূদনের একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন । "বেগীর মত" এই কথাটিকে বিশেষণ
করিয়া Bane-like পদটি সৃষ্টি করা হইয়াছে ।

Unask'd that wanted me this book to lend ;
But has he done it ?—no !—he is a friend
That rather would insult, than honor me ;—
I am, dear sir, your servant,

Kidderpore
The Poet's Residence, }
6th April 1842

M. S. D.

To G. D. B.

I thought I shall be able,
(Making thy lap my table)
To write that note with ease :—
But ha ! your shaking
Gave my pen a quaking ;—
Rudeness ne'er saw I like this I—

Hindu College.

M. S. D.

Gour excuse me that in Verse
My Muse desireth to rehearse
The gratitude she oweth thee ;—
I thank you and most heartily :
The notion that my friend thou art
Makes me reject the flatterer's art,
Here is your book ;—my thanks too here
That as it was, and these sincere.

KIDDERPORE }

Believe me, most amiable Sir,
Your most devoted Servant,
The Poet.

মধুসূদনের পত্র, অথবা কবিতা এ পর্যন্ত আমরা বাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গেই প্রথম বাঙ্গালা কবিতা। মধুসূদনের নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে; সুতরাং তাঁহার ইংরাজী রচনা অপেক্ষা শৈশবের বাঙ্গালা রচনা পাঠ করিতেই পাঠকগণের অধিকতর আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অল্পশীলন করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অগ্র অনেক ছাত্রের জ্ঞান তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয় সূর্যদ গৌরদাসবাবুর অল্পরোপে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটি সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে “গউর দাস বসাক” এইরূপ হইবে। ইহাতে বর্ণশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষাগত, ভাবগত নানাবিধ দোষ আছে, কিন্তু মেঘনাদবধ রচয়িতার প্রথম বাঙ্গালা রচনা বলিয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

বর্ষাকাল।

“গভীর গর্জন সদা করে জলধর
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানাবাদি দেব, যক্ষ স্থিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন বন বন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাবীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলয়ে করয়ে কোন মতে শাস্ত নয়।”

এইরূপ আরও একটি কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

হিমঋতু।

“হিমস্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাওণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জলে আর।

শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার অভ্যাস

ফুরিয়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার ।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বস আশায় মারিলে ।
স্বজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া ।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে ॥”

কবিতাটির অর্থ কি, পাঠক মহাশয় নিজেই তাহা বুঝিয়া লইবেন । তখন
বঙ্গ-সাহিত্যে গুপ্ত কবির রাজত্বকাল ; বিদ্যালয়ের 'বালক
বাল্লাভাষার
তৎকালীন অবস্থা
হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পঞ্চম সকলেই তখন গুপ্ত-কবির
অনুরাগী ও অনুকরণকারী । সেই জন্তই, বোধ হয়, মধুসূদনের
কবিতায় এত শব্দালঙ্কারের প্রাবল্য ঘটিয়াছে । আমরা যতদূর অনুসন্ধান
করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দুই একটি কবিতা ভিন্ন মধুসূদন
ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার আর কিছু রচনা করেন নাই । তাঁহার সমকালবর্তী
অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা তিনিও মনে করিতেন ইংরাজী সাহিত্যের
অনুলীনও ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা দ্বারাই তিনি বশ ও প্রতিপত্তি লাভ
করিতে পারিবেন । বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে কখন কোন প্রসঙ্গ হইলে তিনি
অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, “বাঙ্গালা-ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল ।” মধুসূদনেরও
বিশেষ অপরাধ ছিল না । বাঙ্গালা-ভাষার তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে
পাশ্চাত্য-ভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার অনুলীন দ্বারা তৃপ্তি-
লাভের সম্ভাবনা ছিল না । ষাঁহাদিগের চেষ্টায় এক্ষণে বাঙ্গালা-ভাষা সমৃদ্ধিমর্তী
হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই তখন লেখনী ধারণ করেন নাই । অন্তের কথা
দূরে থাকুক, বাঙ্গালা-ভাষার পিতৃস্থানীয় বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাভাগর
মহাশয় পর্যন্ত তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন । কাশীদাস, কুন্তিবাস
প্রভৃতি বাঙ্গালা-ভাষার যে দুই একজন কবির প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ ছিল,
তাঁহাদিগের কাব্য কলেজে পঠিত হইত না । রামরাম বসু প্রণীত “প্রতাপাদিত্য-

চরিত” ও মৃত্যুঞ্জয় বিতালঙ্কার প্রণীত “পুরুষ পরীক্ষা”^১ প্রভৃতি গ্রন্থ তখন কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তকের ভাষা যে কি উপদেশ, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকলিত প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক কখনও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে তাহা করিতে পারিবেন। সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার একখানি প্রশ্নপত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। সে সময়কার ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার কিরূপ স্বযোগ প্রাপ্ত হইতেন, এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

“শ্লাঘা অতি নিন্দনীয়। শ্লাঘা দ্বারা সর্বসাধারণ মনুষ্য অহংকারযুক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়। তাহাতে সর্বলোক তুচ্ছতা করে এবং কেহ তাহাকে আদর করে না। আর আপনার প্রশংসায় কি আপনি প্রশংসিত হয়? তাহা কখনও হয় না। যেমন আপনার নয়ন দ্বারা স্বীয় নয়নের গুণ দোষ দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় জানিবা। আর আত্ম-প্রশংসা হেতু পরের গুণ-জ্ঞান-করণে সমর্থ হয় না। সেই ব্যক্তির শাস্ত্রাদিজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব শ্লাঘা বিত্তার প্রধান প্রতিবন্ধিকা হয়; তাহাতে পরম জ্ঞান, পরম স্বথের কথা কি কহিব, সামান্য স্বথও হইতে পারে না। যেমন উষ্ণ অঙ্গার কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করণে সমর্থ হয় না, কেবল স্বয়ং উত্তপ্ত অগ্নিকেও উত্তপ্ত করেন, তাহার ন্যায় আত্মশ্লাঘাকারী ব্যক্তি আপনি উত্তাপযুক্ত হয়েন এবং অগ্নিকেও উত্তাপিত করেন, এতদ্রূপ অগ্ন্যাগ্ন দোষ জানিবা।”

একদিকে বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ অবস্থা, অপরদিকে দেশের রাজপ্রতিনিধি হইতে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই ইংরাজী ভাষার অনুশীলনে উৎসাহদান করিতেছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় যে সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা জন্মিয়া ইংরাজী ভাষারই প্রতি অধিক অনুরাগ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নয়। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও সমকালবতী ছাত্রদিগের অধিকাংশই এই বাল্য-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আজীবন ইংরাজী-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। সে সময়কার হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে মধুসূদন, বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এই তিন জনই কেবল পূর্ণবয়সে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের ন্যায় অপর সকলেও বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনা করিলে আমাদেরই জাতীয়

১. বাংলা ‘পুরুষ পরীক্ষা’ প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ দাসের লেখা। ভুলক্রমে আখ্যানপত্রে মৃত্যুঞ্জয় বিতালঙ্কারের নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল।—সম্পাদক

সাহিত্য যে আরও উন্নত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী-দিগের মধ্যে পরলোকগতা কুমারী তরু দত্তের পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদনের গ্রাম ইনিও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের লিখিত অনেক কবিতা, সৌন্দর্যে ও মৌলিকতায় মধুসূদনের বাল্যের কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। উপযুক্ত পথে চালিত হইলে, বোধ হয় তাঁহারও প্রতিভা মাতৃভাষাকে বহুসংখ্যক অমূল্য রত্নে ভূষিত করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আজীবন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেবা করাতে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কোনও উপকার সাধিত হয় নাই। যতদিন আমরা দিগের দেশীয় সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরূপ মহারক্ষের ছায়াতলে অবস্থান করিবে, ততদিন যে তাহার সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ধনের আশা নাই, গোবিন্দচন্দ্রের গ্রাম বজের আরও অনেক রুতবিদ্য ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

হিন্দুকলেজে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষা অল্পলীলনেব খেরুপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। এখানেই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার চরম, এবং এই শিক্ষা হইতেই তিনি তাঁহার রচনা প্রণালী গঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। সকল স্থলেই প্রায় দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে যে, তাঁহার কোন ভাষার নির্মাতা তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট সেই ভাষার লিখন প্রণালী শিক্ষা করিতে হয় না। স্বাভাবিক প্রতিভাবলেই তাঁহার নিজের পথ উন্মুক্ত করিয়া লন। অন্যান্য মহাকবিদিগের গ্রাম মধুসূদনও নিজের প্রতিভাবলেই বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এদেশীয় কোন গ্রন্থকারের নিকট যদি তিনি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে ঋণী থাকেন, তবে তাহা দরিদ্র কাশীদাসের ও কৃত্তিবাসের নিকটে; এবং সেই জন্তই আমরা তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের বিষয় সেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মধুসূদন যে সময় শিক্ষালাভ করেন, তাহা ছাত্রদিগের রচনাশক্তি পরিবর্ধনের পক্ষে কিরূপ অল্পকূল ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়কার রুতবিদ্য ও সম্ভাস্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ছাত্রদিগকে রচনাভ্যাসে উৎসাহিত করিতেন। শিক্ষা-সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্রদিগের রচিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তরগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। পুরস্কার বিতরণ-সভায় গভর্ণর জেনারেলের বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর এবং দেশীয় ও

ইংরাজী-রচনা

উৎসাহ-লাভ।

স্বী-শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

স্বরোপীয় নিমন্ত্রিত সন্মাস্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাহা পঠিত হইত, ছাত্রেরা তজ্জন্ত
বৃত্তি এবং স্বর্ণবোপ্যনির্মিত পদক ও পুরস্কার ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ
উৎসাহলাভের ফলেই সে সময়কাল ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে পবিণামে স্থলেগত
হইতে পাবিয়াছিলেন। মধুসূদন যখন সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে
অধ্যয়ন করেন, সেই সময় খ্যাতনামা বাবু বামগোপাল ঘোষ, জ্ঞান-শিক্ষা-বিষয়ক
সর্বোৎকৃষ্ট রচনাব জন্ত দুইটি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন।* হিন্দুকলেজেব
মধ্যে যে দুইজন ছাত্র প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত
হইবেন এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও ভূদেববাবু
দ্বিতীয় হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত গুণানুসারে স্বর্ণ ও বোপ্যনির্মিত পদক প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। জ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে মধুসূদনের বাল্যাবধি ক্রিপা সংস্কার ছিল, এই
রচনা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পাবিবেন বলিয়া বচনাটি অবিকল
উদ্ধৃত হইল।

ESSAY

On the importance of educating Hindu Females, with
reference to the improvement which it may be expected to
produce on the education of children, in their early years,
and the happiness it would generally confer on domestic
life.

The Subject, of which the present one is but a branch,
was, once about a year or two ago, proposed for
competition amongst the natives of Bengal, and is no
longer an untrod path. The masterly pen of the Rev'd,
gentleman (Babu K. M. Banerjee), who carried off the
palm has amply treated it in all its ramifications, in his
excellent and very beautiful "Essay". Though it is almost
hopeless for a school-boy to follow so great a master with
any thing like distinction (the very attempt to do so being

* বামগোপালবাবু এই সময় কলেজের পাঠ শেষ করিয়া বিষয়কাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং
অর্থ ও প্রতিগতিলাভের সঙ্গে কলিকাতার নব্য শিক্ষিত সমাজের একজন পরিচালক হইয়া
শ্রীড়াইয়াছিলেন।

a kind of literary sacrilege), yet as I am called upon to offer my unpremeditated thoughts on the subject, I cannot but hope that the indulgent reader will (to request him in the language of the poet) —

“Be to their faults a little blind
And to their virtues very kind.”

It is a fact almost as undisputed as any axiom of Euclid, that nothing can be more difficult for a man than to emancipate his mind from impressions, left upon it in youth—the season of his life wherein the mind, like wax, receives and retains any thing inculcated upon it,—and that the notions and prejudices which he imbibes in his younger days, exert a very great influence over him in his after-life.

In nothing, therefore, we ought to be more careful than in selecting nurses for our children; for there is scarcely any thing that exerts a more pernicious influence of its nurse. Many people have been unable to give up their belief in the existence of Ghosts, notwithstanding the strong remonstrances of Reason, and the evidence of Science because the impressions left on the mind by the idle tales heard or recited in the nursery could not be effaced! It is needless to dwell upon the numerous benefits a child may derive from an educated nurse. In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of

knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete. The very idea of so sweet a possession awakens even in the most prosaic bosoms feelings truly poetical. Who is there that would not give up

“All Bokhara’s vaunted gold,
And all the gems of Samarcund,”

for it ? This is surely what a poet calls—

“The foretaste of the joys of Heaven !”

In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.

Hindoo College.

MADHU SOODON DUTT.

আমরা বলিয়াছি যে, রিচার্ডসনের যত্নে, মধুসূদনের বাল্যকালের লিখিত অনেক কবিতা সে সময়কার সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত, এবং সেইজন্য, ছাত্রাবস্থাতেই, তিনি অনেকের নিকট নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একজন ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখবশত।

তিনি যে পুণবয়সে কবি হইবেন, তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রদিগের সকলেরই সে সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে তাঁহাকে তখনই “কবি” বলিয়া ডাকিতেন। মধুসূদনের নিজেরও দুঃখ-সংস্কার জন্মিয়াছিল যে,

একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের গৌরবে বিস্মিত হইবে। তিনি তাঁহার প্রিয়কবি দায়রণের জীবন চরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার প্রিয় স্বজন গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ; — *

“I am reading Tom Moor's life of my favourite Byron : —a splendid book upon my word. Oh ! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be if I can go to England !”

অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক একজন বালককে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিতে দেগিলে, বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। বাল্যাবধি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই প্রকৃত মহত্বের চিহ্ন এবং মনুষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। আপাততঃ প্রগল্ভতা-পূর্ণ বোধ হইলেও ইহা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। বালক মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে কিনা, বঙ্গ-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ইংলণ্ড-গমন সম্বন্ধে পঠদশা হইতে মধুসূদনের বিরূপ প্রগাঢ় বাসনা ছিল, তাঁহার পত্রের উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন।

ইংলণ্ড কবি-প্রসবিনী ; সেক্সপীয়ার, মিল্টন এবং তাঁহার প্রিয় কবি দায়রণের জননী। সুতরাং ভক্ত যেমন আরাধ্য ইংলণ্ড গমনের জন্য আকাজক।

দেবের, অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র-দর্শন নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের অন্তর্কূল বলিয়া মনে করেন, মধুসূদনও তেমনই ইংলণ্ড-গমন তাঁহার কবি-শক্তি পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তমলুক দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। তমলুক সমুদ্র হইতে অবিদূরে নদীমুখে অবস্থিত। তমলুক গমনের পথে ইংলণ্ডগামী অর্ণব-পোতসমূহ দর্শন করিয়া, মধুসূদনের বালক-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ; —

“I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period —which I hope is not far off—ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not

very far ; what a number of ships have I seen going to England."

কেবল পত্র নয়, কবিতাতেও তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেন ।
১৮৪২ খৃষ্টাব্দের Literary Gleaner পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be ,
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky,
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy,—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet ,
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exquisitely sweet :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

Kidderpore, 1842.

ইহার একবৎসর পূর্বের লিখিত আর একটি কবিতাতেও তিনি এইরূপ ভাব
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । সে কবিতাটি এই ;—

EXTEMPORARY SONG

I

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green—its mountains high,—
Tho' friends, relations I have none
In that far clime.—yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

II

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew
And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land !

KIDDERPORE. 1841.

M. S. DUTT.

মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডে গমন করিতে না পারিলে তাঁহার কবিতা-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদ, বীরঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি, সমস্তই, তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে হইতে প্রত্যাগমনের পর, তিনি যে দুই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। বিদেশীয় শিক্ষার ফলে ভারত সন্তান, কেমন, স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, বিদেশের সকলই সুন্দর দেখিতে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইংলণ্ড-গমন-বিষয়ক কবিতা হইতে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া ঘাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “যে দেশ স্বাধীনতার বিলাস-ভূমি, যেখানে লোকে প্রতিভার সমাদর করিতে জানে, এবং যেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই দেশ দেখিবার জন্ত আমার হৃদয় ব্যাকুল।” এ সকল কথায় আপত্তি নাই; কিন্তু যখন আবার তাঁহার মখে শুনিতে পাই যে, “যে দেশে প্রকৃতির মুখ অতুল সৌন্দর্যে পূর্ণ, যেখানে শ্রামল উপত্যকা এবং উচ্চ-পর্বতমালা বিরাজিত রহিয়াছে, সেই দেশ দেখিবার জন্ত আমার হৃদয় উৎসুক।” তখন আর্মানদিগের মনে হয়, পাশ্চাত্যশিক্ষায় আর্মানদিগকে কি দৃষ্টিহীন করিয়াই কেলিতেছে। নহিলে হিমাচল-কিরীটিনী ভারতভূমির সন্তান, ইংলণ্ডের কদ্রু-শৈলমালা দর্শনের জন্ত, এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন ?

মধুসূদনের ইংলণ্ড-গমন-সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে পাঠক, হয়ত, মনে করিতে পারেন যে, তিনি পঠকশায় স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন :

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইংলণ্ড গমনের জন্ত ব্যাকুলতা অন্তর্নিহিত স্বদেশানুরাগ প্রকাশ এবং আচার, ব্যবহারে যুরোপীয় অনুকরণ করিলেও অন্তরে স্বদেশের প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার ব্যবহারে

যে কোন জাতি ছিল না, তাহা নয় ; তবে কেহ কেহ যে, তাঁহাকে স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতি অতুরাগশূন্য বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা আদৌ সঙ্গত নয় । আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভিরোজিয়োর ছাত্রগণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মধুসূদনেরও ব্যবহার সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে । স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অতুরাগ থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সংসর্গ গুণেই তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষাবান হইয়াছিলেন । দোষ যদি থাকে, তবে তাহা তাঁহার বিচারশক্তি, তাঁহার হৃদয়ের নয় । যে সময়ে তিনি ইংলণ্ডে গমনের জন্ত তাদৃশ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েরই লিখিত তাঁহার আর একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে । ইহা পাঠ করিলে কে বলিবেন যে, ইহার প্রণেতা স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন না, এবং স্বজাতির গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন না ? পরস্পর-বিরোধী কত ভাবই যে মস্তিষ্কের হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে, তাহার সংখ্যা নাই । লোকে, তাহা বিবেচনা না করিয়া, মানব-চরিত্রের একাংশ মাত্র দর্শন করিয়া নিন্দা বা প্রশংসা করেন ।

মধুসূদনের লিখিত কবিতাটি এই :—

WRITTEN AT THE HINDU COLLEGE
BY A NATIVE STUDENT

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flower's to deck my country's brow.
Thus kindly nurtured in this nursery !—
Perchance unmark'd some here are budding now.
Whose temples shall with laureate-wreaths be crown'd
Twined by the sister Nine ;—whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages :—some perchance here are,
Who with a Newton's glance shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star ;
And like a god unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality !

‘মধুসূদন তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রগণের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহার আশাত্বরূপ সফল না হইলেও নিফল হয় নাই। তাঁহার সহাপাণ্ডিগণের মধ্যে অনেকেই বশস্বী হইয়াছেন।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ কায করিয়াছিল, পাঠক, এইবার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, পাঠক, এইবার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাশক্তি পরিবর্ধনের অন্তুকূল ছিল, এবং তিনি যে শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একজন স্বকবি ও কবিতার উৎসাহদাতা ছিলেন। সেই সঙ্কে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, আবাল্য মধুসূদনের হৃদয়ে কাব্যাতুরাগ ও অমুকরণেচ্ছা প্রবল ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক শক্তির ও প্রবণতার সঙ্গে এইরূপ অন্তুকূল সামগ্রী সমূহের সম্মিলন হইলে যাহা হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ভাবী জীবনে তাহাই হইয়াছিল। নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির দিকাক্ষের সঙ্গে তাঁহার আশা ও উচ্চাভিলাষ বর্ণিত হইয়াছিল; এবং অষ্টাদশবৎ বয়সেই তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যবিষয়ক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরিভূষ্টি হইত না, তিনি ইংলণ্ডের Bentley's Miscellany এবং Plackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন। নিজের রচিত কবিতা শৈশব-স্মৃদ্ধদমিককে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার ভূষিবোধ হইত না; তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) গ্রায় কবি কুলতিলককে উদ্দেশ্য করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন। আমরা তাঁহার উচ্চাভিলাষের নিদর্শক দুই একখানি পত্র পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আরও একখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। পত্রখানি “বেন্টলিস মিসেলেনীর” সম্পাদককে লিখিত। সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য শৈশব হইতে মধুসূদনের হৃদয়ে কিরূপ জ্বালাজ্বা ছিল, পাঠক এই পত্রে তাহার আর একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

To

THE EDITOR OF BENTLEY'S MISCELLANY

London.

Sir,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you

always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', Sir, is not my object at present ; for I am really conscious I do not deserve it ; —all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British—discerning generous and magnanimous—will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of year land, Cowley, "in learing but not in age".

Calcutta, Khidirpore.

I remain &c.

Oct., 1842.

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় মধুসূদনের প্রকৃতি যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। কলেজে পঠদশায় তাঁহার চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ

হিন্দুকলেজীয়
শিক্ষার নিরূপণ।

অঙ্করিত হইয়াছিল, পরবর্তী ঘটনাসমূহ তাহাদিগেরই পরিবর্ধন করিয়াছিল ; নূতন কিছু উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই, মধুসূদন

উজ্জ্বল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনি অধ্যয়নশীল, কাব্যাহুরাগী, প্রেম-পিপাসু, পরহুঃখ-কাতর এবং উদ্বেগসাধনে দৃঢ়ব্রত। এই সময়েই নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার অটল বিশ্বাস, এবং সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনীত হইবার নয়। ইহার অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য দোষ, গুণ তাঁহার চরিত্রে বিশেষ কিছুই নাই। এই সময়ে তিনি জীবনের যে লক্ষ্য নির্বাচন করিয়াছিলেন, কোনরূপ ভাবী ঘটনাই তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বিধাতার মনোনীত ছিল না। অকস্মাৎ তাঁহার জীবনে এমন একটি অচিন্তিত-পূর্ব ঘটনা উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত, তাহাকে পূর্বপথ পরিত্যাগ পূর্বক, নূতন পথে গমন করিতে হইল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সেই ঘটনার আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিশুদ্ধ কলেজে অধ্যয়ন

[১৮৪৩—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

৫

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে মধুসূদনের জীবনের যে অচিন্তিত-পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার ধর্মাস্তর গ্রহণই সেই ঘটনা। তাঁহার পারিবারিক অগ্রা কোন, কোনও কাণের দ্বারা তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণও প্রগাঢ় রহস্যপূর্ণ। কি জ্ঞাত যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রের পক্ষে অভ্যাসরূপে তাহা নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই।

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ।

তিনি নিজে সে সম্বন্ধে কখনও কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই; স্বতরাং অসুমান ও সমবায়ী ঘটনাপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া, আমাদিগকে সে সম্বন্ধে যতামত প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ কেহ, খ্রীষ্টীয় কলেজে অধ্যয়ন ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সেরূপ কোন কারণ ছিল না। হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পক্ষে অসুকল ছিল না; বরং প্রতিকূল ছিল, বলা যাইতে পারে। ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষায় হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্মে অনাস্থাবান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে আস্থাভাবন হন নাই। ডিরোজিয়োর শিক্ষা তাঁহাদিগের পূর্ব-সংস্কার নষ্ট করিয়াছিল যাত্র; তাঁহার স্থলে নূতন কিছু সংগঠিত করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্মের গোষকতা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহার প্রতিকূল যুক্তি শুনিতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। হিউমের নাস্তিকতাবাদ ও টমাস পেনের “Age of Reason” নামক গ্রন্থ তাঁহাদিগের অতি আদরের সামগ্রী ছিল। থিয়োডোর পার্কীর তাঁহার যে সকল বক্তৃতায় বা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয় সকল প্রকার ধর্ম সম্বন্ধেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন, তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর প্রকৃতি ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, “যদি একজন খ্রীষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দশজন সকল প্রকার ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।”* আলেকজান্ডার ডক্ প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের চেষ্টায়

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায়
খ্রীষ্টধর্মের প্রতিকূলতা।

তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর প্রকৃতি ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, “যদি একজন খ্রীষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দশজন সকল প্রকার ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।”* আলেকজান্ডার ডক্ প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের চেষ্টায়

* For one man who came to embrace Christianity or joined the Brahmo Samaj, ten expressed their wholesale defiance of all religion -- Life and Teachings of K. Sen, Page 8.

তাহাদিগেব প্রতিদ্বন্দ্বিত কলেজেব দুই একটি ছাত্র, সময়ে সময়ে, খ্রীষ্টধর্ম গঠন করিতেন সত্য, কিন্তু হিন্দুকলেজে তাহাদিগেব প্রভাব হিন্দুমাাত্রও প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুইজন হিন্দুকলেজেব ছাত্রদিগেব নেতা, শিক্ষক এবং আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তাহাদিগেব কাহাবও খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেযাব ও বিচার্ডসন, দুইজনেই খ্রীষ্টধর্মে প্রগাঢ় অনাস্থাবান ছিলেন। হেযাব হিন্দু স্কুলকে প্রাণাপক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং এদেশে ইংবাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আপনাব সদৃশ উৎসাহ কাব্যাজিলেন। তখন ইংবাজী শিক্ষার প্রতি লোকের এখনকার ন্যায় অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই। ইংবাজী শিক্ষায় নরমাণ হইবার ভয় কলিকাতাব অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তখনও সম্মানদিগকে ইংবাজী শিক্ষা দিতে সন্মত হইতেন। ডিবািজিযোব ছাত্রগণেব ব্যবহার আলোচনা কবিলে, তাহাদিগেব আশঙ্কা যে একেবানেই অমলক ছিল, তাহাও সত্য যায় না। ইহাব উপর কলেজেব ছাত্রদিগেব মধ্যে কেহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবিলে হিন্দুকলেজেব বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং সেই সঙ্গে এদেশে ইংবাজী শিক্ষা প্রচলনের পথ অনেকদূর হইবে ভাবিয়া মহাত্মা হেযাব ছাত্রগণেব উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ছাত্রেরা যাচাতে কিছুন্টে খ্রীষ্টীয় ধর্ম

গাঢ়তম সম্বন্ধ হেযাব
ও বিচার্ডসন

পচাবকদিগেব সংসর্গে না আসিতে পাবে, তজ্জন্ত তাহাব প্ররব দৃষ্টি ছিল। বিচার্ডসন যদিও হেযাব সাহেবেব ন্যায়

তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিলেন না, তাহাপি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাহাব যে আন্তরিক অনাস্থা ছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত কবিতে ক্রটি কবিতেন না। কলেজে আপনাব সময়ে তিনি পক্ষান্তভাবে, খ্রীষ্টধর্মেব প্রতি শ্লেষোক্তি কবিতেন এবং ছাত্রদিগেব মধ্যে কাহাবও খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগ আছে শুনিলে, তাহাকে উপহাস কবিতেন। একপ অবস্থায় হিন্দুকলেজেব শিক্ষা যে মধুসূদনেব ধর্মমত পবিবর্তনেব পক্ষে অন্তকূল ছিল না, তাহা একপ সিদ্ধান্ত কবা ঠাইতে পাবে। তাহাব সহিত যাহাবা বা যাবনি ঘনিষ্ঠরূপে পবিচিত ছিলেন, তাহাবা একবাক্যে বলেন যে, মধুব যে কোন কালে খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগ ছিল, তাহা আমাদিগেব মনে হয় না। সে যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে, আমবা তাহা কখন কখনাও কবি নাই। অকস্মাৎ তাহাব খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণেব সংবাদে আমবা সকলেই নিশ্চিত হইয়াছিলাম।” মধুসূদনেব পবিবাসন্ত ন্যক্তিগণেবও বিশ্বাস এইরূপ। তাহাবা বলেন, “ধর্ম-বিশ্বাসেব অহুবোধে মধুসূদন

এ সম্বন্ধে মধুসূদনেব একজন সহাব্যায়ী আমাদিগকে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে :

‘কলেজেব অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার বহারাে অস্বাভাবিক প্রকাশ করিতেন সত্য। কিন্তু কলেজেব কোন ছাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন কবিত্তে, তাহা আমি কোনেব জানি না। তাহাব

ঐতিহ্য গ্রহণ কবেন নাই, ঐতিহ্য গ্রহণ কাবলে তাহাব যুগোপ গমনেব স্বাবব।

হহবে, এবং তর্জন ও অপ্রীতিকব বিবাহের দায় হহতে
অপ্রীতিকব বিবাহের
প্রস্তাব অব্যাহতি পাহতে পাববেন, এহ ভাবিয়াহ তিনি ঐতিহ্য

গ্রহণ কবিয়াছিলেন। হংলও গমন সমক্ষে তাহাব কল্প
প্রগাণ আকাজ্ঞা ছিল, আমবা পূবেহ তাহাব আলোচনা কারয়াছি। কলেজে

কারণ দুটি, প্রথম কারণ অনেক গিবন পাড়েন হিউন, এডিন ও কবাসা বাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে
আব আব প্রহকারদিগেব প্রহ লহা বাদানুবাণ কাবতেন। দ্বিত্য কারণ, মহান্না ডেভিড হেয়ার
সাহেব কে কোণাষ যাহেচেহ, কিক কীর্তেচেহ, চত্যাদি বমযে তাহাব এক বিশেষ দৃষ্টি ছি।
এমন কি ছাত্রদিগের পিতা মাতা যাহ না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিচে পাবিচেন
এহ স্থলে আমার এক নিজের দৃষ্টান্ত প্রকাশ না কবিয়া থাকিচে পারিলাম না। মিজাপুর মসান
সেণ্ডিস নামে একজন পাদব আসযাছিলেন। কলেজব বে বাণক বাহবেল পড়িতে হহা
করিবেন তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উত্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এহ বোধবা পাহবা আমবা
৬৭ জন কলেজেব ছাত্র উত্ত সাহেবের নিকট ডান্ধিত হহ। তিনি স্নাত সম্বদেব আমাদিগকে
বসাহা, আগল বমযে গুণানুকাউন কবেন। পরে বদায় হংবার সময় এক একবাণি বাহবে
দেন। এমন বাহবেনা পুস্তক পবে আম কখনও দেখি নাহ, আবারে এযাল গলেভে, সটিন
বৃহৎসর, বাণাচ খরচ পাচ ছষ টাকাব নান নহে, স্ত্রণ কবা পুস্তকখানি সবাঙ্গমল। তাহা নাহ
বারা আমাদেব আঙ্গাদেব পরিস না।চা না। বে আনিবাব সময় আমবা প্রতিজ্ঞা কারিলাম
হে বাহবেনা তাহাব পাণ্ডাব বিয কাহাকেও মানিব না। বস্ত নবজ হেয়ার সাহেবের অনুসন্ধান
হে বনিতে পাবে। তিনি পাচ ছষ মান পবে এক দিবস আমাদেব নকলকে ওটার পবে তাঁতাব
নিকট যাহে কহেন, কিস্থ এহু দিনে সবলকে এচেহ গলেন নাহ। প্রথমে কে তাহা জান,
তাণকে অনেক মন্ত কথা কহা সকনা বিষয় জানবা নন। গতকলে একে একে সকলকে ডাকাহা
বাহবেলগুণি হস্তগত করেন। দুই দিনে দিবস রে তাহাব প্রথ কাণী মানী ছাবা আমাদিগকে
ডাকাইয়া লহা বান। এগলে বেগানে ক্যাথিড্রেল মিসন কবাজ, সেহ স্থানে উপরেব নাব তাঁতাব
বেঠক ওহত। আমাদিগকে লোণা তিনি এক বিকচমতে বারগ করেন। তাহাব এমন মতি
পূর্ব কখনও দেখি নাহ। আমাদেব যেমন কর্ম তেমনহ প্রাশিও হহল, অর্থাৎ এঠেককে এক
এক ডজন বেজাঘাও কবিয়া ছাউয়া দিলেন। আসবাব সম নানা প্রকাব মন্ত কথা বলি
ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান কবিয়া দেন। আমবা সেহ সববি বাহবেল পদা দুবে থাকুক, কোন
মিসার নিকট দিয়া চলিতাম না।

মধুসূদনের ভ্রাতৃপুত্র, কাবা বহুমাঞ্জাব বচযিএ শমতা মানবুমাসি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে
বাহা লিখিযা পাঠাইয়াছেন, তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হহতেছে

“মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অব্যয়ন করেন, প্রায় সমস্ত তাঁহার স্বদেশ
কোন সম্ভ্রান্ত জমিদাবেব কস্তাব সহিত তাহাব বিবাহেব প্রস্তাব হহ। মধুসূদন এই বিবাহে
গনিচ্ছ। প্রকাশ করেন। মধুসূদনেব পিতা মাতা, “ছেলেমানুষেব কথা” বলিযা, এ অনিচ্ছার
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাহ। কস্তাব পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, পাজাও সন্ন্যাসী, হস্তরা
অনিচ্ছাব কারণও বোধগম্য হহল না। মধুসূদনও বিশেষ কোন জেদ প্রকাশ কবিলেন না। পরে
যখন বিবাহের পত্র (পাকা দেখা) ঠিক হহবা গেল, তখন মধুসূদন মাতাকে বলিলেন, “মা এ কাণ্ড
কেন করিলে, আমি তা বিবাহ কবিব না।” মাতা পুত্রের কথা দুঃখিত হহবা ভাবা বৈবাহিক
ধনমান ও তদীয় কস্তার ঋণশ্রুতির বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন, সকা কথা নীরবে
শুনিয়া, অবশেষে বলিলেন, “মা, তুমি বতই বল বাঙ্গালির মেয়ে কাপে গুণে কখনই ইংরেজের
মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।” পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠিলেন, বাহাতে
স্বীয় পুত্রের বিবাহ হইবা যায়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া দুই একটি
হিন্দু যুবকের ঐতিহ্য গ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি একরূপ সন্ত্রিৎ হহিয়া উঠিলেন। যদিও

দ্বিতীয় জেগীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ কোন সম্ভাস্ত্র জমিদারেব কন্যাব সহিত মধুসূদনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহ কবিলে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া এবং আবও কতকগুলি কারণে, মধুসূদনের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না। তিনি পিতা, মাতাব নিকট আপনাব অসম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন, কিন্তু তাঁহাবা, বালকের কথা ভাবিয়া, তাহাব আপত্তিতে কণপাত করিলেন না। কন্যাটি, মধুসূদনের পিতা, মাতাব মনোনীতা হইলেও, তাঁহার নিজের মনোনীতা ছিল না। তিনি তাহার কোন শিশুব্যাপুত্রকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন,—“বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির কবিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্ত, বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।” অপবিনামদশী মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহার সঙ্কলিত কাণের বিষময় ফল পিতার অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহার পত্রের কিছুই ফল হইল না। পুত্রের উপর পিতার চিবন্তন অধিকার আছে এবং মধুসূদন বালক, নিজের হিতাহিত বুঝিবার তাঁহার শক্তি কি, এইরূপ সরল বিশ্বাসবশতঃ মধুসূদনের পিতা, পুত্রের অসম্মতি সত্ত্বেও, তাঁহাব বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে মধুসূদনের বিরূপ বিরাগ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত পত্র হইতে প্রমাণিত হইবে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবাব পব, তিনি গোবদাসবাবকে লিখিয়াছিলেন,—

সপ্তম পত্র

KIDDERPORE

27 Nov, Midnight

My dear Gour,—It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love inspiring. But, alas! the

মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এরূপ সঙ্কেহ ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি অজ্ঞাত কারণে তিনি একান্ত অধীবা :ন। পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাহার মন ভাল হইবে, এই বিবেচনায় তিনি শীঘ্রই বিবাহেব উত্তোগ করিত লাগিলেন। মহাসমারোহে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের বিবাহ শেষ করিবেন, এরূপ স্থির হইল। বিবাহেব ২০২২ দিন পূর্বে মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস এরূপ মনে হয় না। বিবাহসম্বন্ধীয় কথা শুনিলে এরূপ বিশ্বাস সহজেই উপস্থিত হয় যে, মধুসূদন দত্ত 'অশিক্ষিত, হীনচেতা' হিন্দুমহিলার পরিষর্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন-বিহারিনী, উন্নতামনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। আর এক কথা, মধুসূদন জনৈক আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, “আমার বড় ইংলণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে, বাহারা পরের দেশ (কলিকাতা) এমন হুম্মর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত হুম্মর।” ইহাতে বোধ হয়, ইংরাজদিগের দেশ দর্শনও মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বনের অন্ততম উদ্দেশ্য।

heart that "Melancholy marks for her own", imparts its own morbid hues to all around it ; and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love-letters or gay-letters ? You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh ! I really wish) that somebody would hang me ! At the expiration of three months from hence I am to be married ,—dreadful thoughts ! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine ! My betrothed is the daughter of a rich zeminder ;—poor girl ! What a deal of misery is in store for her in the ever inexorable womb of Futurity ! you know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all ,—*one of these must be done !* you are my friend, Gour ! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light : *You are a gentleman.* Hitherto I kept these secrets even from you. But now I cannot , I want sympathy—and to whom am I to look for it ? I won't go to college to-morrow , excuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved—and honoured—and ever shall be so, I will show you my wretched self, now and then,—but to college—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"— ? Upon my word, I don't understand it ; you really *mystify* me ; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps I might give a call on you—but if you have nothing of importance

to keep you away, pray do go. Don't absent for my sake—that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom moore, and that volume of your Shakespear which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one volume, send me the two that contain them : and believe me.

Yours affectionately,

M. S. DUTT.

একদিকে পিতামাতার সন্মিলিত বিবাহ সপক্ষে তাঁহার এইরূপ বিরাগ ছিল ; অপর দিকে তাঁহার পরিচিতা কোন ঐষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল। তখন ইংলণ্ড গমন এখনকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক দোষাবহ ও সমাজবিরুদ্ধ কাহ্ন ছিল। ইংলণ্ড-গমন সপক্ষে মধুসূদন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, তজ্জগৎ, তাঁহাকে, একদিন না একদিন, সমাজচ্যুত হইতেই হইবে। সুতরাং এখন সমাজ ত্যাগ করিয়া, যদি তিনি মনোনীতা পত্নীলাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে নিজের অপ্রীতিকর বিবাহের দায় মনোনীতা পত্নীলাভের হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তাহাই করা তাঁহার ইংলণ্ডগমনের আশা। পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ইহার উপর কোন ঐষ্টীয় ধর্মপ্রচারক তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার ইংলণ্ড গমনেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। তরলহৃদয় মধুসূদন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার নিজের লিখিত পত্রাদিতে যদিও তাঁহার ঐষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ কোথাও সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার উক্ত পত্র হইতে তাঁহার মানসিক ভাব অনেকাংশে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার ঐষ্টধর্ম গ্রহণ সপক্ষে স্বর্গীয় রেভারেন্ড ক্রসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষে বাহ্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আশাধিকারের কথা সমর্থন করিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ-Church. He called one day and introduced to me as a religious inquirer almost persuaded to be a Christian. After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian, was, scarcely, greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions; and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed disheartened and came to me less frequently after that. ***One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College, wishing at the same time, to be a christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next, and at his own desire, gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal".*

যে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি মধুসূদনকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিবেন বলিয়া মধুসূদনকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে কে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যেই হউন, সংসারানভিষ্ট মধুসূদন যে, তাঁহার আশ্বাসবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ধর্ম-বিশ্বাস অপেক্ষা অপর কোন কারণে তিনি ঐতিহ্য গ্রন্থ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের আত্মীয়গণের এইরূপ সংস্কার ভিত্তিহীন বলা বাইতে

* National Magazine, Vol. VI, No 1, page 35 "Michael M. S. Dutt" by K. M. Haldar.

পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা কর্তব্য যে, এই সকল কারণ ছিল বলিয়া, তাঁহার যে খ্রীষ্টধর্মে একবারেই বিশ্বাস ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হয় না। অসুস্থমান ও সমবায়ী কারণবশতঃ উপর নির্ভর করিয়া বাহা বলা সম্ভব, আমরা তাহাই বলিয়াছি।

যে কোন কারণেই হউক, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রকাশ্যরূপে ধর্মত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি, গোপনে গোপনে, রেভারেণ্ড

পিতৃগৃহ ভাগ ও
কেল্লায় অবস্থান।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাতায়াত আরম্ভ

করিয়াছিলেন, ইহার পব, একদিন, অকস্মাৎ, তিনি পিতৃ-

গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাবও মনে সেরূপ সন্দেহ কখনও উদ্ভিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার একপাশে গৃহত্যাগের সংবাদে সকলেই চমকিত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণেচ্ছু বালকেরা, পাছে, আত্মীয়গণের অনুরোধে, ধর্মত্যাগে অস্বীকৃত হয়, খ্রীষ্টান ষাজকগণ, সেই ভয়ে, তাহাদিগকে নিজের গৃহে স্থানদান করিয়া, আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার আবারও কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিলেন। মধুসূদনের পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং কলিকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কলিকাতার পুলিশ, তখন, এখনকার ন্যায় কার্যদক্ষ ও ক্ষমতাশালী ছিল না। পাছে মধুসূদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে, খ্রীষ্টান ষাজকগণ, মধুসূদনকে, অস্ত্র না রাখিয়া, একবারে কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেখানে হইতে মধুসূদনকে উদ্ধার করা কাহারও পক্ষে যে সম্ভবপব ছিল না, তাহা বলা অতিরিক্ত। মধুসূদনের পিতা লাঠিয়াল ও বড্‌কিওয়ালাদিগের সাহায্যে পুত্রকে উদ্ধার করিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। খ্রীষ্টান মিসনারীগণ মধুসূদনের কোন আত্মীয়কে, সাধ্যানুসারে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না এবং কচিং কেহ সাক্ষাৎ করিলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহারে কলিকাতার হিন্দুসমাজে হলহুল উপস্থিত হইল। মধুসূদন হিন্দুকলেজের একজন ধ্যানমায়া ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং মধুসূদনের পিতৃগৃহত্যাগের ও কেল্লায় অবস্থোধের সংবাদে সর্বত্রই আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু মধুসূদনের নিজের অনিচ্ছা ও মিসনারীগণের

কৌশলবশতঃ কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। দুই চারিদিন কেম্‌ব্রিজ এইরূপে বন্দীর আশ্রয় অবস্থানের পর, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ই ফেব্রুয়ারী, মধুসূদন আর্চ-ডিকন ডিষ্ট্রী (Arch-deacon Dealtry) নিকট ওল্ড মিশন চর্চ ধর্মমন্দিরে ঐষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সেইদিন ঐষ্টধর্ম গ্রহণ।

হইতে তাঁহার মধুসূদন নামের সঙ্গে মাইকেল নাম সংযুক্ত হইল। হিন্দুসমাজ সেই বৎসর আরও একটি প্রতিভাশালী সন্তানে বঞ্চিত হইলেন। গোবিন্দ সামন্ত প্রভৃতি ইংরাজী উপগ্রাম-গ্রণেতা, সুলেখক লালবিহারী দে-ও সেই বৎসর ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন ও লালবিহারী উভয়েই বশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আশ্রয় প্রতিভাশালী সন্তানদিগকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, হিন্দুসমাজের পক্ষে যে স্বথের বিষয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধুসূদন কবি—আজন্ম কবি। জীবনের একরূপ একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যে কবিতায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন না, তাহা কখনও সম্ভব নয়। তিনি নিজের ঐষ্টধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটি কবিতা অথবা ধর্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কুসংস্কারের ও উপধর্মের অন্ধকার হইতে ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কিরূপ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতাটি যথার্থই ধর্মভাবানুপ্রাণিত। যে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ভাব যদি তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইত, তাহা হইলে কতই স্বথের বিষয় হইত। কিন্তু হায়! তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে, প্রকারান্তরে, বিক্রম-মাত্র করিয়াছিল। তাঁহার রচিত কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

HYMN

By M. S. DUTTA

(A Hindu youth)

[Composed by him—to be sung at his Baptism

I

Long sunk in superstition's night,
By sin and satan driven—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

II

I sat in darkness, - Reason's eye,
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III

But now, at length, thy grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink Thy sweet,—Thy precious word,—
I kneel before Thy shrine !—

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake ;
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843

ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; কিন্তু পিতা, মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার পিতামাতার ব্যবহার। জননী তাঁহাকে আশ্রয় হইয়া ভালবাসিতেন। সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্তন খটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের গৃহ হইতে অন্তর্ধান অবধি তিনি আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে দিন তিনি শুনিলেন যে, মধুসূদন সত্যই ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি উরাদিনীর শ্রায় হইয়াছিলেন। যিনি মধুসূদন কতক্কে কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পুত্রের এরূপ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে যে কি নিদাক্ষণ বেদনা লাগিয়াছিল, তাহা কি বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে ? তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত ধর্মভট্ট পুত্রকে, সময়ে সময়ে, গোপনে, গৃহে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনকে দেখিলে তাঁহার শোকাভূরা জননীর যত্না কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইত। তিনি ধর্মভাগী পুত্রকে পূর্ববৎ স্নেহে আহ্বান করাইতেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। মধুসূদনের

পিতামাতার এবং আত্মীয়গণের ইচ্ছা ছিল যে, মধুসূদন সম্মত হইলে, তাঁহার তাঁহাকে শাস্ত্রাভ্যাসের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, পুনর্বীর স্বসমাজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহার তাঁহার পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে মধুসূদনকে, জীবিকার জন্ত, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুরূপের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা, তাঁহার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন। বিধর্মী হইলেও মধুসূদন যাহাতে, সুশিক্ষিত ও যশস্বী হইয়া, পরিণামে সুখী হইতে পারেন, তৎকৃত্য তাঁহাদিগের যত্নের ক্রটি ছিল না। হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান বালকদিগের পাঠের নিয়ম ছিল না বলিয়া, মধুসূদনের পক্ষে সেখানে অধ্যয়নের সম্ভাবনা ছিল না। দেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার জন্ত শিবপুরে বিশপ্প কলেজ নামক একটি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেখানে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার আনন্দের সহিত তাঁহার বিশপ্প কলেজে প্রবেশ।
বায়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের চেষ্টায় বাহা সম্ভবপর, মধুসূদনের কল্যাণের জন্ত, তাঁহার তাহার কিছুই করিতে ক্রটি করিলেন না।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ মধুসূদনের জীবনের একটি অতি প্রধান ঘটনা। এরূপ ঘটনায়, তাঁহার পারিবারিক ও সাহিত্যিক, সকল বিষয়েই যে বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, তাহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা বাইতে পারে।
খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয় কোন লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “হিন্দুধর্মের পারে গমন করিয়া তিনি, যেন, সমুদ্রপারবর্তী জনের জ্ঞান, বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন।”* বাস্তবিকও মাতৃভাষার সেরূপ প্রিয়সেবক এবং স্বদেশের প্রতি সেরূপ অনুরাগবান হইয়াও, তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতা, ভগিনীগণের নিকট হইতে তাদৃশ দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার জ্ঞান হিন্দুকলেজের আরও অনেক ছাত্র, ষষ্ঠদশায় স্বধর্মে ও স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লভ ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার, আপনাদিগের ভ্রম বুদ্ধিতে পারিয়া, আবার, ব্যবহারিক।

ক্রমে ক্রমে, হিন্দুধর্মের ক্ষোভে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করাতে, মধুসূদনের পক্ষে সেরূপ করিবার

* সমাজদর্পণ সম্পাদক।

সম্মাননা ছিল না। বায়বলে বৃত্তচ্যুত পত্র যেমন আশ্রয়বৃক্ষ হইতে ক্রমশঃই দূরবর্তী হইতে থাকে, তিনিও তেমনই হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমশঃ দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহার, ব্যবহারে যুরোপীয় সমাজের অনুকরণ করিবার বাসনা ছাঁজাবস্থাতেই মধুসূদনের হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়াছিল। সেই সময়েই তিনি “আধ-সাহেবী আধা-বাঙ্গালি” বেশভূষায় সজ্জিত থাকিতেন এবং সহাধ্যায়িদিগকে বাবুর পরিবর্তে “মিষ্টার”, “স্কোয়ার” ইত্যাদি সাহেবী প্রথায় সম্বোধন করিতেন। হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে অবস্থান করিলে, কালে, হয়ত, এ সকল সংশোধিত হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। খ্রীষ্টান হইবার পর তাঁহাকে বিশপ্স কলেজে যুরোপীয় ও ফিরঙ্গীবাংশীয় বালকদিগের সঙ্গে বাস করিতে হইত। সর্বদা তাহাদিগের সহিত একত্রে অবস্থান ও তাহাদিগের রীতি, নীতির অনুকরণ করিতে করিতে, তিনি ক্রমশঃ সেই সকলের একপক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, স্বদেশীয় সকল প্রকার আচার, ব্যবহারই বর্জনীয় বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনঃকল্পিত কোন কোন কুসংস্কারের সংশোধন করিতে বাইরা, তিনি তদপেক্ষা অনিষ্টকর অল্প কুসংস্কারে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শয়ান, এবং ডাক্তারী চিকিৎসায় যখন তাঁহার কোন উপকার হইতেছিল না, তখন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে স্বর্গীয় স্মরণীয় কবিরাজ রমানাথ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—“আমাকে ক্ষমা করিবেন; কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে আমার ব্যারিষ্টার ভ্রাতারা আমাকে ঘৃণা করিবেন; আমি কিছুতেই কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে পারিব না।” সংসর্গ ও সহবাস গুণেই লোকের মনের ভাব গঠিত হয়। মধুসূদন যে সংসর্গে বাস করিতেন, তাহারই দোষ, গুণে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল।

ঐষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে মধুসূদনের পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশত্যাগ, মাদ্রাজ গমন, যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয়স্বজনদের স্নেহ হইতে বিচ্যুতি সামাজিক।

এবং অবশেষে অনাথের ক্রায়, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, এ সমস্তই, স্বাভাবিক পরিমাণে, তাঁহার ঐষ্টধর্ম গ্রহণের ফল। বলা বাহুল্য যে, ঐষ্টধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা আমাদের পক্ষে অজিপ্রোক্ত নয়। ঐষ্টধর্ম অনেক পতিত নরনারীকে উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে। ঐষ্টধর্ম যে

মধুসূদনকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, তাহা কখনই নয়। মধুসূদনের স্ত্রায় তরলমতি ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির পক্ষে, যে কোন সমাজেই হউক, নিরবচ্ছিন্ন শাস্তিভোগ কোথাও সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন হিন্দুসমাজে বাস করিলে যে, নীতিশরায়ণ হইয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে এ কথা বলা সম্ভবত যে, স্বজাতীয়া জীব পাণিগ্রহণ করিয়া, ঘোষণা মাছুসন্নিধান, হিন্দুসমাজের শাসন-নীতির অভ্যন্তরে বাস করিলে, তাঁহার উচ্ছ্বলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, বোধ হয়, অতদূর বর্ধিত হইত না। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের শেষাংশও, সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত শান্তিতে অতিবাহিত হইত। কোন্ কার্যের পরিণাম কি হইবে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বনিমন্ত, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। মধুসূদন হিন্দুসমাজে থাকিলে যে, আরও অধিক ক্লেশ ভোগ করিতেন না, সাহস করিয়া সে কথা কে বলিতে পারেন? তবে বাহা সম্ভবপর, মাহুসের তাহা অল্পমান করিবার অধিকার আছে; আমরা সেই অল্পমানের কথাই বলিতেছি।

ঐতিহ্য গ্রহণ মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পঠদশায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ বিরাগ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজী ভাষার আলোচনা তাগ সাহিত্যিক।

করিয়া, তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐতিহ্য গ্রহণ, কিয়ৎ পরিমাণে, তাহার কারণ হইয়াছিল। ঐতিহ্য গ্রহণ না করিলে মধুসূদন, সম্ভবতঃ, সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহার অগ্রাঙ্ক সহাধ্যায়িগণের স্তায়, কোন উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহা হইলে জীবিকার জগ্ৰ তাঁহাকে সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইত না। অবকাশ অল্পসারে দুই একখানি ইংরাজী কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বহুটুকু প্রশংসালভের সম্ভাবনা, বোধ হয়, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। কিন্তু ঐতিহ্য গ্রহণ করাতে পিতৃদত্ত সাহায্যে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া, তাঁহাকে সাহিত্যকেই অবলম্বন-বষ্টি রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার অর্থাভাব ও বশোলিঙ্গা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই; তিনি, আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, বাঙাভাষার কোড়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা লোকের অভাব ছিল না। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা বঙ্গীন্দ্রমোহন প্রভৃতির দ্বারা উৎসাহিত ও প্ররুদ্ধ হইয়া, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের স্তায় মানবীয় কার্যাবলীও পরম্পর

সম্বন্ধ-বদ্ধ ; একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক। ধর্মমত পরিবর্তন হইতে মধুসূদনের জীবনের প্রত্যেক কার্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা এ কথার সাক্ষ্যদান করিবে।

মধুসূদনের গ্রন্থে যে জাতীয় ভাবের এত অভাব এবং বিজাতীয় ভাবের এত প্রাধান্ত, তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তন তাহাবও কারণ। হিন্দু-ভাবানুপ্রাণিত কোন কবির রচনা হইলে, মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই ওরূপ নিকট আদর্শে চিত্রিত হইত না। একেই ত সে সময়কার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বদেশীয় আচার, ব্যবহাব, এবং ভাষা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহার উপর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া, যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ কবাতো, মধুসূদন পাশ্চাত্য সমাজের দিকে আরও অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে জাতীয় ভাবের পরিবর্তে বিজাতীয় ভাবের আধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন, বিশপ কলেজে গ্রীক ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই হইতে গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অহুরাগ জন্মিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কখনই বিশেষ অহুরাগ বা অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে গ্রীক-সাহিত্য, বিশেষতঃ, হোমরের প্রহসনমূহ, তিনি অতি যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে হোমবকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একরূপ অবস্থায়, মেঘনাদবধে বাস্তবিকের পরিভ্রাণ করিয়া, তিনি যে হোমবকেই অধিক অহুসরণ করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলেও মধুসূদন গ্রীক ভাষা অহুশীলন করিতে এবং হোমরের প্রতি অহুরাগবান হইতে পারিতেন সত্য ; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া, পাশ্চাত্য-সমাজের সংসর্গে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত না হইলে, তিনি হিন্দু পৌরাণিক চিত্রসমূহ গ্রীক আদর্শে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন কি না সন্দেহ।

বিশপ কলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের জীবন গঠনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, এইবার, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। হিন্দু-

কলেজ যেমন তাঁহার রচনা-শিক্ষার, বিশপ কলেজ তেমনই তাঁহার ভাষা-শিক্ষার কেন্দ্র। মধুসূদন সাধারণের নিকট কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি যে বঙ্গদেশের মধ্যে

একজন কিরূপ বুদ্ধভ্রাতৃবান্ধব ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সন্দেহই অবশ্য নহেন। ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষারই ভ্রাতৃ ছিল। ল্যাটিন, গ্রীক, ফ্রেন্স, জার্মান এবং ইতালিয়ান, এই কয়টি ভাষায় তিনি অক্লেশে কথোপকথন

করিতে এবং পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে করাচী ও ইতালীয় ভাষার তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি তাহাতে কবিতা পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি যুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসিক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দুস্থানী, এই ছয়টি ভাষাতেও তাঁহার অল্পাধিক অভিজ্ঞতা ছিল; সুতরাং মাতৃভাষা বাদালা ছাড়া বারটি বিভিন্ন ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, বাবু মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সমকালবর্তীদিগের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান বহুভাষাবিদ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ।* বাস্তবিক ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ শক্তি অতি অল্পলোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশপ কলেজ হইতেই তাঁহার এই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবণতা পরিস্ফুটিত হইতে থাকে। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশপ কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি গ্রীক, লাতিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিশপ কলেজের অনেক অধ্যাপক বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতেই মধুসূদনের হৃদয়ে ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরাগ উদ্ভূত হইয়াছিল।

মধুসূদনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা তাঁহার বিশপ কলেজে অধ্যয়নকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ইংরাজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে জেতাজিত ভাব যেমন সর্বত্রই বর্তমান থাকে, বিশপ কলেজে

অবস্থানকালীন ব্যবহার। কলেজেও তেমনি ছিল। কলেজের ইংরাজ ছাত্রগণ

“কলেজ-ক্যাপ” নামে এক প্রকার চতুর্ভুজ টুপি ব্যবহার করিতেন; দেশীয় ছাত্রেরা তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মধুসূদন, কলেজে প্রবেশ করিয়াই, ইংরাজ ছাত্রদিগের জ্ঞান পরিচ্ছদ ও কলেজ-ক্যাপ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “হয়, আমাকে আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ, না হয়, যুরোপীয় বালকদিগের জ্ঞান কলেজীয় পরিচ্ছদ, পরিধান করিতে দিতে হইবে। একই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্বন্ধে একরূপ বিভিন্ন প্রথা কিছুতেই চলিতে পারে না।” কলেজের অধ্যক্ষ, এইরূপ ঐক্যোত্তর জন্ত, তাঁহাকে

* As a linguist and a scholar, he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European language, and in the literature, both ancient and modern of European countries.

কলেজ হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মিক মধুসূদন সেইবার অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মপ্রচারের সঙ্গে বাঙ্গালী-কোশল ও বিলক্ষণ বুঝিতেন। “মধুসূদন সন্ধ্যা গৃহের বালক, এরূপ সামান্য কারণে তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়িত করিলে, আর কেহ ঐঠান হইবে না”, কলেজের কোন অধ্যাপককে তিনি এইরূপ বুঝাইলে অব্যক্ত, অবশেষে, তাঁহার পরামর্শ অনুসারে, মধুসূদনকে কলেজ-ক্যাম্প পরিবর্তনের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাহেব ও দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত পার্থক্য মধুসূদন, অপ্রতিবাদে কখনই সঙ্কল্প করিতে পারিতেন না। তিনি যখন মাদ্রাজে অবস্থান করিতেন, তখন সেখানে “নেটিভ-ম্যান” (Native man) কথাটির বড় প্রচলন ছিল। সাহেবদিগের পক্ষে “European Gentleman” এবং দেশীয়দিগের পক্ষে ‘নেটিভ-ম্যান’ এইরূপ ভাবাই সেখানে ব্যবহৃত হইত। মধুসূদন, সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ করিয়া, এইরূপ ভাবাব পক্ষপাতীদিগকে পবাসিত কবিয়াছিলেন। আহার-ব্যবহারে যুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিলেও তিনি তাহাদিগের চাটুকার ছিলেন না, উচ্ছৃঙ্খল ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলেই তাহাব প্রতিবাদ করিতেন।

মধুসূদন বিশপ কলেজে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। ভাষা শিক্ষা ও কবিতাহুশীলন সম্বন্ধে তিনি এই কয় বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, বিভাবুদ্ধি উন্নতির সূত্রে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাও এখানে, সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেহ নিকটে থাকিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাকে মাসিক প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন, কিন্তু মধুসূদন যে সে অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা তাহাব সংবাদ রাখিতেন না। কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট শাসন ছিল, কিন্তু কলেজের বাহিরে, অবকাশ দিনে, ছাত্রেরা কে কিরূপ ব্যবহার করে, কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহার বড় সংবাদ পাইতেন না। কলেজে ঐতিহাসিকমোদিত উপাসনাদির ক্রটি ছিল না। কিন্তু ছুটীগতকমে মধুসূদন তাহা হইতে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যগুণান্ন মাত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রকৃত ঐতিহাসিকমোদিত নীতিতে তাহার শিক্ষা হয় নাই, তিনি প্রলোভনের হুক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে পিতামাতার ও সমাজ-শাসনের অধীনে থাকিয়াও তিনি অনেকবার নীতিবিগর্হিত কার্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে সকল প্রকার শাসনের অভাবে,

তাঁহার অসংযতভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধকহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অসংযতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির জগতে শাস্তির আশা কোথায়? মধুসূদনের জন্মের শাস্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীও অল্পবোধে তিনি মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আগমন করিতেন, কিন্তু সেখানেও শাস্তির প্রত্যাশা ছিল না। ধর্মমত ও সামাজিক আচার, ব্যবহার লইয়া সময়ে সময়ে পিতার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইত। পিতা তিরস্কার করিতেন, শাসনে ও সংযমে অনভ্যস্ত মধুসূদনের তাহা সহ্য হইত না, তিনি উদ্ধতের স্থায় প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার পিতা শেষে বিবর্ত হইয়া, তাহার মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মধুসূদনের জননীর স্নেহেব হাসরুদ্ধি ছিল না। স্বামী ও পুত্রের মধ্যে এরূপ মনোবাদের দেখিয়া তিনি দারুণ স্বস্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু প্রতিবিধান করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মধুসূদনের জন্মের অশান্তি ক্রমশঃই বর্ধিত হইতে লাগিল। যে সকল আশায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন,—মনোনীতা পত্নীলাভ, ইংলণ্ড-গমন প্রভৃতি তাঁহার আশাব কোঁন সামগ্রীই, তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। যে সকল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক তাঁহাকে পূর্বে আশ্বাসদান করিয়াছিলেন এবং বেভাবেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে সম্বাস্ত বন্ধ, মধুসূদনকে বাঙ্গালা দেশে তদানীন্তন ডেপুটি গবর্নর বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া, মধুসূদনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন (gave every encouragement in his views), প্রযোজনের সময়ে, তাঁহারা কে কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, এবং তিনিও যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, ধর্মমত পরিবর্তনের জন্ত, তাঁহার সেই দালালস্বহৃদগণও তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছিলেন। মধুসূদনের মনে সংস্কার জন্মিল যে, জগতে তাঁহার অবস্থায় সহানুভূতি কাবতে কেহ নাই। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। কলিকাতা ছাড়িয়া, অস্ত্র যে কোন স্থানেই হউক, বাইতে পারিলে, তাঁহার জন্মের শাস্তি কিরিয়া আসিবে, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মিল। বিশপ্প কলেজে মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-মাস্ত্রাজ গমন।

একজনের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার দিগের নিকট মাস্ত্রাজের কথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সেখানে বাইলে, তিনি স্বর্গী হইতে পারিবেন। গোপনে, গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। অবশেষে একদিন, অকস্মাৎ পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন।

কি অবস্থায় মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণ, কেহই তাঁহার দেশত্যাগের

সঙ্গ অবগত ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহার মাস্ত্রাজ-গমনের মাস্ত্রাজ বাসকালীন অবস্থা। সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি যখন মাস্ত্রাজে

উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অবস্থা এখনকার তায় ছিল না। এখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয়-পোতের প্রচলনে মাস্ত্রাজের দূরতা অপনীত হইয়াছে ; কিন্তু তখন মাস্ত্রাজ-গমন এখনকার দিনের ইংলণ্ড-গমনের তায় কষ্টসাধ্য ছিল বলিলে, অতুক্তি হইবে না। এখন দুই চারিজন বাকালী, বিষয়-কার্যপলক্ষে, মাস্ত্রাজে বাস করিতেছেন, কিন্তু তখন মধুসূদনের স্বদেশীয় একজন লোকও, বোধ হয়, সেখানে ছিলেন না। সেখানকার ভাষা, এবং আচার, ব্যবহার কোন বিষয়েই মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ছিল না। জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করাতে, তিনি হিন্দুসমাজের ঘৃণার আশ্পদ হইয়াছিলেন। ইহার উপর তিনি আবার রিক্তহস্ত। পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, পাথেয় প্রভৃতিতে অল্পদিনেই, তাহা নিঃশেষ হইয়াছিল। একেই ত এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, তাহার উপর মাস্ত্রাজে পঁছরিবার পরই তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কয়েককাল তাঁহাকে দারুণ দুর্বাসায় জীবনযাপন কবিতে হইয়াছিল। পিতার সহিত মনোমালিন্য আরও হইবার সঙ্গেই তাঁহার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী জননী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থসাহায্য করিতেন। সুতরাং দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ যে কি মর্মভেদী, মধুসূদনকে এতদিন তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে হয় নাই। এইবার হইতে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার তিক্ত আশ্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। নিক্রপায় হইয়া তিনি মাস্ত্রাজের দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফিরঙ্গী সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল। তাঁহার মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদেরই সহায়তায় তিনি পিতৃমাতৃহীন, ফিরঙ্গী বালকদিগের জন্ত প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ হ্রাসীভূত হইল ; এবং তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে হইলে, “প্রবল ঋটিকা অভিক্রম করিয়া কূল প্রাপ্ত হইলে নাবিক যেমন শান্তিলাভ করে”, তিনিই তেমনই শান্তিলাভ করিলেন।

‘পৃথিবীর অনেক আপাত-প্রতীয়মান অমঙ্গলের স্রায় মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসকালীন দুর্ববস্থা, এক বিষয়ে, তাঁহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের কাণ্ড হইল। প্রকৃতি তাঁহার অভ্যন্তরে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিহিত করিয়া সাহিত্য-সেবা।

রাখিয়াছিলেন, নিরাশাব ও দাবিদ্র্যতার সংঘর্ষে এইবার তাহা উদগত হইবার সুযোগ লাভ করিল। উপায়ান্তরের অভাবে তিনি, অর্থাগমের জন্ত, সাহিত্যের উপব নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিন তিনি, অল্পশীলনার্থ এবং অবকাশ কালেব বিনোদনের জন্ত, সাহিত্যের সেবা কবিতা আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাকে প্রাণধাবণার্থ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ কবিত্তে হইল। তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আবস্ত কবিলেন। তখন এদেশীয়দিগেব মন্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার স্রায় সন্দেহ ইংবাজী লিখিতে পারিতেন, স্তববাং স্বল্পকালেব মধ্যেই তাঁহার স্রখ্যাতি চতুর্দিকে পবিব্যাপ্ত হইল এবং মাদ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তিনি একজন স্রলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ কবিলেন।

‘যদিও হিন্দুকলেজে পাঠ কবিবার সময়েই মধুসূদনের লিখিত অনেক কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এতদিন তিনি গ্রন্থকাররূপে সাধাবণেব সমক্ষে আবিস্তৃত হন নাই। মাদ্রাজ প্রবাস-কালেই তাঁহার বচনা সর্বপ্রথমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি মাদ্রাজে যে কাপটিভ পেজী রচনা।

সমস্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার মধ্যে Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator এবং Athæneum এই তিনখানিৰ নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকদিগেব নিকট তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও সহায়ভূত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানিৰ জন্ত তিনি, পৃথ্বীরাজের চবিত্ত অবলম্বন কবিত্তা, কবিতায় একটি উপাখ্যান লিখিতে আরম্ভ কবিত্তাছিলেন। সাধারণেব পবিতোষে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে মনস্ত কবেন। তদনুসাবে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে Madras Circular হইতে উদ্ধৃত উপাখ্যান এবং Visions of the Past নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা। একত্রে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানি বচিত হইয়াছিল, এবং তাহার অবলম্বনীয় বিষয় কি, মধুসূদন নিজেই তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

The following tale is founded on a circumstance pretty generally known in India and, if I mistake not, noticed by

some European writers. A little before the famous Indian expeditions of Mahommed of Ghizni, the King of Kanoje celebrated the "Rajshooya Jujnum" or as I have translated it in text, the "Feast of Victory". Almost all the contemporary Princes, being unable to resist his power, attended it, with the exception of the King of Delhi, who, being a lineal descendant of the great Pandu Princes—the heroes of the far-famed "Mahabharat" of Vyasa—refused to sanction by his presence the assumption of a dignity—for the celebration of this Festival was Universal assertion of claims to being considered as the lord-paramount over the whole country—which by right of descent belonged to his family alone. The King of Kanoje, highly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chiet. On the last day of the Feast, the King of Delhi, having, with a few chosen followers, entered the palace in disguise, carried off this image, together, as some say, with one of the princesses Royal whose hand he had once solicited but in vain, owing to his obstinate maintenance of the rights of his ancient house. The fair Princess, however was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who, eventually effected her escape in the disguise of a Bhat or Indian Troubadour. The King of Kanoje never forgave this insult, and, when Mahommed invaded the kingdom of Delhi, sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after crushed him also. I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the "Feast of Victory".

I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the

following Poem. It was originally composed in great haste for the columns of a Local journal,—“The Madras Circular and General Chronicle”,—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty with the “battalions” of “sorrows” which they bring, leave but little inspiration for their victim!

আমরা বলিয়াছি যে, পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, ক্যাপটিভ্ লেডী
 ক্যাপটিভ্ লেডীর
 বর্ণনীয় বিষয়।
 রচিত হইয়াছিল। রাজকুমারী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজের
 হস্তে হইতে রক্ষার জন্য রাজা জয়চন্দ্র তাঁহাকে দ্বীপমধ্যস্থিত
 একটি গিরিভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ
 ভাটবেশে সেখান হইতে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাহার
 পর মুসলমানগণ পৃথ্বীরাজের রাজধানী অবরোধ করিলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাদিগের
 হস্তে পরাজিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। ইহাই সংক্ষেপে
 ক্যাপটিভ্ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন যে সকল বিষয়ে ইতিহাসের অনুসরণ
 করেন নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত। ঘটনা-বৈচিত্র্য, অথবা ভাবের লালিত্য
 অনুসারে বিচার করিলে ক্যাপটিভ্ লেডীতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই;
 কিন্তু একটি কারণে ইহা আলোচনার উপযুক্ত। তরুণ-বয়সে, ইংরাজী ভাষার
 উপর মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে
 তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।
 ইহার দুই একটি স্থল পাঠ করিলে মনে হয়, যেন বায়রণ, মুর বা স্কটের কোন
 গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। মেঘনাদবধের যে ভেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা বঙ্গীয় কবিতায় এক
 অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ক্যাপটিভ্ লেডীতে তাহার অল্প প্রথম উদ্ভিন্ন
 হইয়াছিল। মধুসূদনের ভাষা যে তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙ্গালি
 ক্যাপটিভ্ লেডীর
 ভাষা ও ভাব।
 কবিগণের ভাষা হইতে বিভিন্ন, তাহার প্রধান কারণ এই
 যে, তিনি তাহা কোমল-মধুর সংস্কৃত ভাষা হইতে শিক্ষা
 করেন নাই; সমধিক ওজোবান্বিত পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ হইতে শিক্ষা করিয়া-
 ছিলেন। ক্যাপটিভ্ লেডী পাঠ করিলে, মধুসূদনের রচনাশৈলীরও আদর্শ
 বুঝিতে পারা যায়। যে অলঙ্কার-বিজ্ঞান-প্রিয়তা মধুসূদনের রচনার একটি
 বিশেষ লক্ষণ, ক্যাপটিভ্ লেডীর সর্বত্রই তাঁহার আতিশয় লক্ষিত হইবে।
 ক্যাপটিভ্ লেডীতে প্রযুক্ত অনেক অলঙ্কার ও ভাব, পরে তিনি তাঁহার অন্ত্যস্ত

কাব্যে পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা সেইরূপ দুই একটি স্থল নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য সন্দেশে ;—

—Where upon the ocean tide,
Fair Lunka smiles in beauty's glow
And breathes soft perfumes, far and wide,
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd.—১৩ পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণের যমুনা তীরে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে বিহার সন্দেশে ;—

How fondly in the moon-lit bow'r
When mid-night came with star and flow'r
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumna's holy stream,
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep
Wing'd ravishment where-'er is fell,
Love's accents in their airy spell. ১৪ পৃষ্ঠা

রাক্ষসরাজ কর্তৃক সীতাহরণ সন্দেশে ,—

* * how to Beauty's lonely bow'r
The false one came at noon-tide hour,
And pluck'd its brightest, fairest flow'r ;
And on his airy-wheeled car
He wafted her to realm afar—
And how the wanderer of the wood
Came home—but came to solitude—
And in his grief sought her in vain
O'er mount—in cave—by tount—on plain.—১৬ পৃষ্ঠা

এইরূপ আরও অনেক স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থানেব ভাব অবিকল এইরূপ। রামচন্দ্র কর্তৃক সেতুবন্ধন সম্বন্ধে ক্যাপটিভ্ লেডীতে আছে ;

“The very ocean wore his chain.”

মেঘনাদবধে আছে, * * * *

“আপনি জলধি

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অহুরোধে।”

গম্ভীর তুরীধ্বনি সম্বন্ধে ক্যাপটিভ্ লেডীতে আছে—

“From sunny vale, all green and deep,

Prolong'd that sound its onward sweep,

The warriors bow'd them on their steed—

The Rishi paus'd to tell his beads—

The maiden from her fairy bow'r,

The very babe e'en ceas'd to cry

And look'd up to its mother's eye.

As if in voiceless wonderment,—

It too, its share of homage sent.—২১ পৃষ্ঠা।

প্রমীলার এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের শঙ্খধ্বনি ও ধনুঃটঙ্কার-শব্দ সম্বন্ধে মেঘনাদ-বধে আছে,—

* * একেবারে শত শঙ্খ ধরি

ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,

স্ত্রীবৃন্দ ; কাঁপিল লক্ষা আতঙ্কে, কাঁপিল

মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে

সাদীবর, সিংহাসনে রাজা, অবরোধে

কুলবধু, বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,

পর্জতগহ্বরে সিংহ, বনহস্তী বনে,

ডুবিল অতল জলে জলচর বত ॥”

ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিরূপভাবে যদুশৃঙ্গনের লিখন-প্রণালী গঠিত হইতেছিল, এবং বয়সের সঙ্গে তাঁহার শক্তি কিরূপ বর্ধিত হইতেছিল, ইহা হইতে পাঠক তাহা অহুমান করিতে পারিবেন। ক্যাপটিভ্ লেডীর লঙ্কে

ভিসন্-অফ্-দি-পাষ্ট (Visions of the past) নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিসন্-অফ্-দি-পাষ্টের অবলম্বনীয় বিষয় কি, ইহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আকার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম সৎকীয় কোন প্রসঙ্গ তাহার অবলম্বিত বিষয়। বর্ণনা করা, বোধ হয় মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল। ভাষার গাঙ্গীর্থে তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি ক্যাণটিভ্ লেডী অপেক্ষা নিকট নয়। ইহা পাঠ করিতে করিতে বায়রণের “ড্রীম” নামক কবিতা স্মরণ হয়। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই অসম্পূর্ণ কবিতাটিতেই কেবল তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে; তাঁহার অল্প কোন প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন নাই। ভিসন্-অফ্-দি-পাষ্টের প্রারম্ভিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

I sat me by a shrine and heard a strain,
Sweet as thy whispers, Cedar'd Lebanon !
Which lull the weary pilgrim, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain
His mighty haunt : it sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swell'd its vestal symphony in vain ;—
Echo'd by sainted spirits He hath won !
The bridal song of her, the spouse below :
I wept !—How oft, oh world ! thy harlot smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark Death will ne'er defile ;
I wept ! A Prodigal once weeping sought
His Father's breast,—and found love unforgot !—*

* মধুসূদনের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও, তাঁহার রচনাপ্রতিভা ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের জন্য, আমরা তাঁহার ইংরাজী রচনা, মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় যে মধুসূদনের কিরণ সূক্ষ্ম অধিকার ছিল, এবং ইংরাজী ভাষাতেও যে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বন্ধীর পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই তাহা অবগত নহেন। সেইজন্য তাঁহার ইংরাজী রচনা সম্বন্ধে হুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। যে সকল বাঙ্গালি, ইংরাজী ভাষায় লক্ষ্যতার জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে, অত্যাধিক হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ *Travels of a Hindu* নামক গ্রন্থ-প্রণেতা বাবু জোলানাথ চন্দ্র, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি মধুসূদনের ‘ক্যাণটিভ্ লেডী’ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনা ত্যাগ করিয়া, এইবার আমরা তাঁহার সাংসারিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব। স্বদেশ ও অলমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি, একরূপ নির্বাসিতের স্তায় মাস্ত্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ করিয়া, এই স্থানে, তিনি প্রথমে গৃহস্থাত্ম্যে প্রবিষ্ট হন। ‘ক্যাপটিভ্ লেডী’ প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্বে, তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস্-নায়ী স্চ-বংশোৎপন্ন একটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। রেবেকার পিতা একজন নীলকর এবং তাঁহার পিতামহ, ডুগান্ড ম্যাকটাভিস্, কড়াপা জিলার নীলব্যবসায়ী আরব্থনট কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। মাস্ত্রাজে, পিতৃমাতৃহীন যুবোপীয় বালকবালিকাদিগের জন্ত, যে আশ্রম ছিল, রেবেকা তথায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মধুসূদন সেই আশ্রমের সংশ্লিষ্ট বালকদিগের বিদ্যালয়ের অগ্রতম শিক্ষক ছিলেন। উভয়ের পরিচয় হইলে, মধুসূদন, কুমারী রেবেকার রূপেত্তে আকৃষ্ট হন। অশিক্ষিতা ও অন্তঃপুরনিবদ্ধা বাঙ্গালী বালিকার অপেক্ষা শিক্ষিতা ও স্বাধীনতায় অভ্যস্তা য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিলে, সাংসারিক স্ত্রেব অধিক সম্ভাবনা, বাল্যাবধি মধুসূদনের এই সংস্কার ছিল। তিনি বলিতেন যে,

“বাঙ্গালির মেয়ে রূপে, গুণে কখনই ইংরাজেব মেয়ের
সাংসারিক কথা- শতাংশের একাংশ হইতে পারে না।” য়ুরোপীয় মহিলাব
বিবাহ। পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বে যে প্রতিবন্ধক ছিল, ঐষ্টধর্ম গ্রহণ

করাতে তাহা দূরীভূত হইয়াছিল। স্ততরাং পরিণাম চিন্তা না করিয়াই মধুসূদন তাঁহার দীর্ঘকালপালিত সঙ্কল্প, কাখে পবিত্র করিয়াছিলেন। রেবেকার আত্মীয়গণ প্রথমে এ বিবাহে সম্মত হন নাই; কিন্তু মধুসূদনের নির্বন্ধাতিশয়ে এবং সম্ভবতঃ কন্ডার ধর্মপিতা (God-father) জর্জ নরটনের* মধ্যবর্তিত্বে,

It rose as an aurora-borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets, such as Kasi Prasad Ghosh, Rajnaryan Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others, Madhu distances them all. ভোলানাথ বাবুর স্তায় আরও অনেক নৃপতিত ব্যক্তি, ক্যাপটিভ্ লেডীর এইরূপ মূর্ত্যকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। “রেস এবং রাইট” “Reis & Ryat” সম্পাদক স্বর্গীয় শত্ৰুঘ্ন সুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্রিকায় ইহা সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

* জর্জ নরটন মাস্ত্রাজের “এডভোকেট জেনারেল” (Advocate General) এবং মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ইনি মাস্ত্রাজের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার (Eardly Norton) ইয়ার্ডলি নরটনের পিতা। মধুসূদন তাঁহার ক্যাপটিভ্ লেডী ইহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নটনের মধ্যবর্তিত্বে মধুসূদনের বিবাহের কথা শুনেব সুখোপাধ্যায় মহাশয় আনাকে বলিয়াছিলেন।

অবশেষে সন্মতি দান করিয়াছিলেন। নরটন মধ্যবর্তী হইয়া মধুসূদনকে বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রী করা নরটনের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক স্ত্রণ্ড ও ধর্মোপার্জনই বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিয়া স্ত্রী হইতে হইলে, যে সহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের এবং আশ্রম-সংঘের প্রয়োজন, মধুসূদনের চরিত্রে তাহা ছিল না। আমার জীবনের সঙ্গিনী আমা অপেক্ষা নিকট হইলেও আমি তাঁহাকে সর্বপ্রকারে আমার সমতুল্যা করিয়া লইব,—আমার বাহা আছে, তাহা তাঁহাকে দিয়া, এবং তাঁহার বাহা আছে, তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া, আমি তাঁহাকে প্রকৃতরূপে আমার অর্ধাঙ্গিনী করিব,—আমার সকল কামনা তাঁহাতেই পরিতৃপ্ত হইবে,—এ শিক্ষা মধুসূদন কখনও প্রাপ্ত হন নাই। ধর্মনীতি হউক বা সমাজনীতি হউক, কোন প্রকার শাসননীতির অভ্যস্তরে বাস করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ক্যাপটিভ্‌ লেডীর প্রারম্ভে, নববিবাহিতা পত্নীকে সন্মোদন করিয়া, অমুরাগভরে, তিনি যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ভাবী জীবনে তাঁহার হৃদয়ের সে ভাব স্থায়ী হয় নাই।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নী সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পত্নী-ত্যাগ।

বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।* মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজেব তদানীন্তন কোন শিক্ষকের দুহিতা কুমারী হেনরিয়েটার প্রতি তাঁহার অমুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সেই মহিলাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইনিই সাধারণের নিকট মধুসূদনের পত্নী বলিয়া পরিচিত। মধুসূদনের সহিত তাঁহার পত্নী রেবেকার ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র, কন্যাগণের সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল বলিয়া, আমরা আপাতত তাঁহাদিগের কোন উল্লেখ করিব না। ইহার পর তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির কথা দেখিলে পাঠক এই শেষোক্তা মহিলার ও তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র, কন্যাগণের কথা বুঝিয়া লইবেন।

মধুসূদন জীবনে যে সকল অপকাষ করিয়াছিলেন, সমাজনীতির প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্দ্ৰই তাহাদিগের প্রধান কারণ। তাঁহার বৈবাহিক জীবনের ব্যবহারও তাঁহার সমাজনীতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্দ্ৰের ফল। অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের ও নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, তাঁহার জীবন যে কেবল তাঁহার

* “এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন”-হওয়া আইনানুযায়িত বিবাহ-বিচ্ছেদ বা divorce নয়। মধুসূদন তাঁর বিবাহিতা পত্নী রেবেকাকে পরিত্যাগ করে হেনরিয়েটাকে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন। হেনরিয়েটার সঙ্গে কখনও তাঁর বিবাহ হয়নি। এ-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় পরিশিটে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।—সম্পাদক।

স্বদেশীয়গণের আদর্শস্বরূপ হইত, তাহা নয় ; তাঁহার নিজের পক্ষেও শান্তিময় হইত। ক্যাপটিভ্‌লেডীর উপক্রমণিকায়, মনোনীতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া, তিনি বাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;

I

Come list thee, gentle one !—and whil'st the lyre
Breathes softer melody for thee, mine own ?
I'll weave the sunny dreams, those eye inspire,
In wreathes to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gentle one !—to Beauty's queenly throne.

II

'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam ;—
'Tis sweet to see thee smile as from above
Some child of Light—such as we often dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden gleam.

III

The heart which once has sigh'd in solitude,
And yearn'd i' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings,—well, may shun the mood
Of grief—so cold—when thou, dear one ! art nigh,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous radiancy ?

IV

The home of youth, 'tis far,—oh ! far away,—
The hopes of youth, they've fled and taught to weep ;
The friends of youth, e'en they, oh ! where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet from, Past ! thy donjon
keep ?

V

But must I weep, e'en now, as once I wept,
 'Midst lifes gay—crowded scenes, unmark'd and lone,
 Where bitterest thoughts of solitude oft crept
 To chill the bosom's glow, when thou, mine own !
 Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne ?

VI

Yes,—like that star which, on the wilderness
 Of vasty ocean, woos the anxious eye
 Of lonely mariner,—and woos to bless,—
 For there be hope writ on her brow on high,
 He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky.

VII

Oh ! beautiful as Inspiration, when
 She fills the poet's breast,—her fairy shrine ;—
 Woo'd by melodious worship !—Welcome then ;—
 Tho' ours the home of want,—I ne'er repine,
 Art thou not there—e'en thou—a priceless gem and mine ?

VIII

Life hath its dreams to beautify its scene—
 And sun-light for its desert ;—but there be
 None softer in its store—of brighter sheen—
 Than love—than gently Love : and thou to me
 Art that sweet dream, mine own ! in glad reality !

IX

Though bitter be the echo of the tale
 Of my youth's wither'd spring—I sigh not now ;
 For I am as a tree when some sweet gale
 Doth sweep away the sere leaves from each bough,
 And wake far greener charms to re-adorn its brow !

X

Then come and list thee to the minstrel lyre,
And lay of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And pluckt her brightest gems with rude, unsparing hand.

XI

The world's dark frowns may dam,—its coldness chill
The kindling altar which the Heart hath rear'd
For deep—devoted—life-long worship,—still
Be thine the soothing smile by love endear'd :—
Eve's dew must heal the flow'r by day's hot breathings
sear'd !

নিদারুণ যন্ত্রণা ও প্রগাঢ় নিরাশার পর, মনোনীতা পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমে কিরূপ স্ব্থের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, এই কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হায় ! অসংযতচিত্ত পুরুষের পক্ষে স্ব্থের গার্হস্থ্য অশাস্তি।

সম্ভাবনা কোথায় ? এই কবিতা রচনার দ্বাদশ বৎসর পরে “আত্ম-বিলাপ” নামক কবিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গার্হস্থ্য-স্ব্থ তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই ; নিদারুণ যন্ত্রণাতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আত্ম-বিলাপ কবিতায় নিজের বৈবাহিক জীবনের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

“প্রেমের নিগড় গড়ি’ পরিলি চরণে সাধে,

কি কল লভিলি ?

জলন্ত পাবক-শিখা-লোভে, তুই, কালফাঁদে

উড়িয়া পড়িলি।

পতক যে রকম ধায়, ধাইলি অবোধ, হায় !

না দেখিলি, না শুনিли, এবে রে পরাণ কাঁদে।”

কি দারুণ মর্ষবেদনায় মধুসূদনের প্রাণ অধীর ছিল, এই করটি পংক্তি তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাঁহার নিজের অসংযতচিত্ততা ও উজ্জ্বলতাই যে

তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ, সে কথা বলা অতিরিক্ত। রূপ-বিমূৰ্ছ-পতন, যেমন, পরিণাম কি হইবে চিন্তা না করিয়া, প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে কাঁপ দেয়, পতনবৃত্ত মধুসূদনও, তেমনই, “না দেখিয়া না শুনিয়া”, সুখ-লালসায় অগ্নিকুণ্ডে কাঁপ দিয়াছিলেন। মধুসূদন অধীর—বালাবধি আত্ম-সংযমে অনভ্যস্ত, প্রেমের জ্ঞান, পতনের জ্ঞান, প্রাণ আহতি দিবার শিক্ষা তিনি কখনও প্রাপ্ত হন নাই। অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, তিনি দক্ষদেহে তাহা হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন। শরীরে প্রগাঢ় কলঙ্ককালিয়া এবং হৃদয়ে মর্মভেদী যন্ত্রণা, এই তাঁহার চির-সহচর হইয়াছিল। হতভাগ্য কবি বায়রণের জ্ঞান হতভাগ্য কবি মধুসূদনেরও জীবন অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবি-জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, “ক্যাপটিভ্ লেডী” রচনা করিয়া মধুসূদন মাস্ত্রাজের কৃতবিদ্যসমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জর্জ নরটনের জ্ঞান কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, তাঁহার কবিতার মাস্ত্রাজে ক্যাপটিভ্, লেডীর সমাদর। প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং মাস্ত্রাজের প্রায় সমস্ত প্রধান

প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার কাব্যের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আধিনীয়ম্ পত্রিকার কোন ইংরাজ পত্র-প্রেরক, “ক্যাপটিভ্ লেডীর” সমালোচনা করিয়া, লিখিয়াছিলেন, “ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা বায়রণ অথবা স্কট নিজের রচনা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না,” (what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own)। বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়া পঞ্চবিংশবয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে এরূপ প্রশংসালভ, অবশ্যই গৌরবের বিষয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষগণ যেমন সাধারণের অপেক্ষা বিত্তাবুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ হন, তাঁহাদিগের আকাজক্ষাও তেমনই উচ্চতর হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ প্রশংসা অস্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও মধুসূদন তাহাতে পরিভূষ হইতে পারেন নাই। না হইবারও একটি বিশেষ কারণ ছিল। শূন্যগর্ভ প্রশংসা লইয়া পরিভূষ থাকা, কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ক্যাপটিভ্ লেডী রচনার সময়ে কবির সাংসারিক ও মানসিক অবস্থা বেক্রপ শোচনীয় ছিল, উচ্চ ও উপক্রমণিকার শেষ কয়টি পংক্তি হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার গৃহে অন্নান্নাভাব ঘটিতেছিল, তিনি প্রশংসা লইয়া কি করিবেন? মাস্ত্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজের প্রশংসায় মধুসূদন, প্রথম প্রথম, বড়ই উল্লসিত ও আশস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম উল্লাস প্রশমিত হইবার পরেই,

নিরাশা ও অবসাদ আলিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বায়রণের, কেহ স্বর্টের

কাব্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের তুলনা করিতেছিলেন,
কবির উন্নতি ও
অবসাদ। আর তিনি, মৃত্যাবস্থার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া,

বহুলায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিলেন। এরূপ অবস্থা
গ্রন্থকারের পক্ষে বড় উৎসাহোদ্দীপক নয়। মধুসূদনের আশা ছিল, অঙ্ককারাঙ্কর

মাস্ত্রাজ তাঁহাকে অর্থদানে উৎসাহিত না করুক, জ্ঞানোজ্জ্বল কলিকাতা, নিশ্চয়ই,
তাঁহার কাব্যের সমুচিত সমাদর করিবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মধুসূদনের
সে আশাও উন্মূলিত হইয়াছিল। মাস্ত্রাজে অর্থগণের স্ববিধা না হউক, অন্ততঃ
স্তলেখক বলিয়াও, তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায়
তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। যাহারা বিজ্ঞাবুদ্ধিতে সে সময়কাব
কলিকাতা সমাজের অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা “ক্যাপটিভ্ লেডী” সম্বন্ধে

একরূপ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে সকল সংবাদ-
কলিকাতায় ‘ক্যাপটিভ
লেডীর’ গনাদর। পত্র-সম্পাদকেব নিকট “ক্যাপটিভ্ লেডী” সমালোচনাব

জ্ঞ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা কেহই তাহার সম্বন্ধে
কোন বিশেষ প্রশংসাজনক কথা বলিয়া, কবিকে উৎসাহিত করেন নাই।

Hindu Intelligencer পত্রিকার সম্পাদক ও তাৎকালিক খ্যাতনামা
কবি, স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকট মধুসূদন বড়ই প্রত্যাশা
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ
করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনেব হৃদয় পরিতপ্ত হয় নাই। “হরকরা” পত্রিকা,
সে সময়কার ভারতীয় পত্রিকাসমূহেব শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহাতে “ক্যাপটিভ্
লেডীর” যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কবির পক্ষে উৎসাহ
লাভ কবা দূরে থাকুক, তাহা পাঠ কবিয়া তাঁহার স্বহৃদগণ মর্মান্বিত
হইয়াছিলেন।* মধুসূদনের নিজের মনের বল যথেষ্ট ছিল, তীব্র সমালোচনায়
সহজে নিরাশ হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। কিন্তু “হরকরা” স্বেচ্ছাক্রমে
তাঁহার বীর-হৃদয়ও আহত হইয়াছিল। নবীন কবিকে উৎসাহ দেওয়া দূবে
থাকুক, ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের চুরাশা যেন তিনি হৃদয়ে

* হরকরার সমালোচনার মধুসূদনের বহুলায় বিরূপ ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের
মধ্যে একজনের লিখিত পত্রের নিম্নোক্ত কয়েকটি পাণ্ডি হইতে প্রতীয়মান হইবে। তিনি
হরকরার ক্যাপটিভ্ লেডীর সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন:

“I am not in the habit of reading any of the papers, and thus am
happily saved the pain which I should otherwise derive from the sight of
a friend roughly used by those bloody culthroats, the Calcutta Editors.”

পোষণ না করেন, সম্পাদক এইভাবেই তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজের সাংসারিক অভাব ও মানসিক অশান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া, মধুসূদন “ক্যাপটিভ্ লেডী”র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, “যে অবস্থায় পড়িয়া তিনি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কবি-শক্তি বিকাশের উপযোগিনী নয়।” সম্পাদক এই উপলক্ষ করিয়া, তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও প্রতি বক্তোক্তি করিতে ক্রটি করেন নাই।* মধুসূদনের সাহায্যার্থ, তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ, “ক্যাপটিভ্

লেডী” বিক্রয়ের জন্ত, চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু ‘হরকরা’ পত্রিকার বক্তোক্তি।

গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ছই একজন কৃতবিত্ত, অথবা পদস্থ ব্যক্তি গ্রন্থকারকে মৌখিক উৎসাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার গ্রন্থের গুণের জন্ত নয়, তাঁহাব নিজের প্রতি অতুল্যকম্পাপ্রদর্শনার্থ। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে মধুসূদন কখনও কাহারও অমূল্যগ্রহের বা অতুল্যকম্পাব ভিক্ষুক ছিলেন না। যাহারা কাব্যজগতে সকলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন, এবং তাঁহার কবিত্বের গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিবেন, “around the world with his fame” বাগ্যাবধি ইহাই

* হরকরার সেই প্রবেশিকা-পূর্ণ সমালোচনা আত্মপ্রাপ্ত উদ্ধৃত করিবার আমাদের স্থান নাই। নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :-

“The Captive Lady”, the author in his preface informs his reader, “was originally composed in great haste for the columns of a local journal, the Madras Circular and General Chronicle” but he does not tell us why he was in such a hurry about it, and we cannot imagine the necessity. He says further that it was produced “in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one’s thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty, with the battalions of Sorrows which they bring, have but little inspiration for their victim.” Possibly had our poet looked the ugly realities of life manfully in the face, instead of trying to abstract his thought from them, he might not have been dependent on Want, Poverty & Co. for his inspiration. We are not of them that think a poet must necessarily be poor and miserable, but we believe that a youth, “Who pens a stanza when he should engross” has only himself to blame, if his pen brings him neither fame nor food. These verses of M. M. S. Dutt are very fair amateur poetry, but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more common place uses of the pen, the delusion is greatly to be regretted. We believe that none of our Calcutta Duttas have fallen into this ruinous error. ***

Bengal Harkara, Saturday Evening, May 19, 1849.

তাঁহার আকাজ্ঞা ছিল। স্বতরাং এরূপ অল্পকম্পাপ্রদর্শনে, উৎসাহিত না হইয়া তিনি বরং ব্যথিত হইয়াছিলেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য তিনি বুঝিতেন; উপেক্ষাকারীর উপেক্ষা এবং অল্পকম্পাশীলের অল্পকম্পা সমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি, স্বতন্ত্র পথ দিয়া, লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

মধুসূদন অনেক বিষয়ে চপল ও অস্থির-চিত্ত ছিলেন; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কখনও মতিভ্রম হয় নাই। সাহিত্যের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিব, এ সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য ঐক্যতারার জ্বায়া, চিরদিন নিশ্চল ছিল। নিন্দা, উপেক্ষা, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি, কিছুতেই তিনি সে ক্যাপটিভ্ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব। লক্ষ্য হইতে বিচলিত হন নাই। ক্যাপটিভ্ লেডী প্রকৃত-

প্রস্তাবে তাঁহার জীবনের প্রথম উত্তম। প্রথম উত্তমে অকৃতকায হইলে, অনেকেই নিরাশাস ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। কিন্তু মধুসূদন ভগ্নোত্তম হইবার পাত্র ছিলেন না। “ক্যাপটিভ্ লেডী” অনাদৃত হইলেও তাঁহার লক্ষ্য পূর্বের জ্বায়া নির্দিষ্ট রহিল; তবে এক বিষয়ে একটি অতি গুরুতব পরিবর্তন সংঘটিত হইল। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত, এতদিন তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহার দুর্গমতা অনুভব করিতে পারিলেন; “ক্যাপটিভ্ লেডী” প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্তি-লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। সম্পটরূপে, তখনও, বুঝিতে না পারুন, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার উপলব্ধি জন্মিল যে, সেক্সপীয়রের এবং মিল্টনের ভাষায় চিরস্থায়ী কীর্তিলাভ করা বিদেশীয়ে পক্ষে সহজ নয়। মাস্ত্রাজে কেহ তাঁহাকে এরূপ কথা বলেন নাই। কিন্তু কলিকাতায় ধাঁহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পরাশ্রুত হন নাই। ইহাদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। ইনি আমাদের দেশের জ্বী-শিক্ষার প্রবর্তক, সুপ্রচিতিতনাম্য ডিক্‌সনসারিয়ার বেথুন। মহাত্মা বেথুন, তখন আমাদের দেশের উপদেষ্ট ও গুরু।

দেশের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষাসমাজের (Education Council) সভাপতি ছিলেন। স্বতরাং তাঁহার জ্ঞান ব্যক্তির মতামত যে কতদূর মূল্যবান, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেথুন বেতাবে ক্যাপটিভ্ লেডীর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার জ্ঞান

মহাত্মার উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি হরকরা-সম্পাদকের স্তায়, গ্রন্থকারকে ব্যঙ্গ করিয়া, তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। সন্দেহ উপদেশ-বাক্যে, তাঁহার অবলম্বিত পথের কুটিলতা নির্দেশ করিয়া দিয়া, গম্ভ্যবাহুলে উপস্থিত হইবার জন্ত, অপেক্ষাকৃত সরল, সুগম পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মহাত্মা বেথুনকে কেবল বঙ্গদেশে জ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা, বোধ হয়, অতি অল্পলোকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্ত, আমরা যে সকল বৈদেশিক পুস্তকের নিকট গুণী আছি, মহাত্মা বেথুন তাঁহাদিগের অল্পতম বলিলে, কিছুমাত্র অত্যাক্তি হইবে না। তৎকালীন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি অহুরাগ সঞ্চার করিবার জন্ত, তিনি যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদিগের মধ্যে আর কেহই সেরূপ করেন নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভায় লেখ্যে, কথোপকথনকালে, এবং পত্রে, সর্বদাই, তিনি বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে নিজের অহুরাগ ব্যক্ত করিতেন। শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষরূপে যখনই তিনি কোন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-প্রদান সভায় উপস্থিত থাকিতেন, তখনই তিনি, সেখানকার ছাত্রদিগের হৃদয়ে বাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অহুরাগ সঞ্চার হয়, তজ্জন্ত উপদেশ দান করিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অহুরাগ সঞ্চার হইতেছে কিনা, ইহাই, অনেক স্থলে, তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল। এরূপ অবস্থায় মধুসূদনের জায় প্রতিভাবান নবীন লেখককে যে, তিনি, বাঙ্গালা ভাষার অহুশীলনে উপদেশ না দিয়া নিরন্তর থাকিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। মধুসূদন গৌরদাসবাবুর দ্বারা বেথুনকে তাঁহার “ক্যাপটিভ্ লেডী” উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বেথুনকে বাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার দ্বাদশসংখ্যক পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে। বেথুন, প্রত্যুত্তরে গৌরদাসবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বেথুনের কিরূপ অহুরাগ ছিল, এই পত্র তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

CHOWRINGHEE

20 July, 1849

Sir,

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity, through

you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.*

I am

Sir

Your obedient servant

J. E. D. BETHUNE.

* এই পত্র লিখিবার সমকালেই বেথুন শিক্ষাসমাজের সভাপতিরূপে কলকাতার কলেজের পুরস্কার-বিতরণ-সভার উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও অবিকল এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে

"It is impossible that the English language can ever become familiar to the millions of inhabitants of Bengal; but, if you do your duty, the English language will become to Bengal what, long ago, Greek and Latin were to England; and the ideas which you gain through English,

মহাত্মা বেথুনের স্তায় মধুসূদনের বন্ধুগণও তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অহুশীলনে আত্মহান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়-স্বহৃদ গৌরদাসবাবু, যদিও নিজের, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি মাতৃভাষার অহুশীলন ভিন্ন যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই তিনি, বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষমতা, মধুসূদনকে সর্বদা অহুরোধ করিতেন। বেথুনের পত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন;—

“His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. ‘The taste and talents you have cultivated’ would rebound much to the honor and advantage of your country, ‘if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if Poetry at all events you must write.’ We do not want another Byron, another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature.”

প্রিয়-স্বহৃদ গৌরদাসবাবুর এইরূপ অহুরোধ, মহাত্মা বেথুনের সম্মুখে উপদেশ এবং কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের উদাসীনতা মধুসূদনের পক্ষে, পরিণামে মঙ্গলজনক হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় যতই অধিকার থাকুক তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া চিরস্থায়ী গৌরবলাভ করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। শুভকণ্ঠেই মধুসূদনের মনে এ কথা উদ্ভূত হইয়াছিল। যদি তিনি

learning will, by your help, gradually be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. The language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago. It is your taste and your learning by which it is to be cultivated and adorned. This is the language which I have constantly held to those young men in Calcutta, who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English composition in prose and verse. I have told them, while awarding the praise that I have thought due to many of these productions, that if they would follow my advice, they would not seek for distinction by such channels: but if their talents and disposition led them to authorship, they would attain a more lasting reputation, either by original compositions in their own language, or by transfusing into it the master-pieces of English literature. There is great glory in store for those who will be the first to achieve success in this path.”

স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা না করিয়া কেবলই ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন ; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কখনই স্থায়ী গৌরবলাভে সক্ষম হইতেন না। বিদেশীয় কবির লিখিত কবিতা কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতালীয় কবি পেত্রার্কো এবং ইংলণ্ডীয় কবি মিশ্টন উভয়েই ল্যাটিন ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইহাদিগের

মাতৃভাষায় লিখিত কবিতা ইহাদিগকে অমর করিয়াছে,
 স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কবিতা ইহাদিগের ল্যাটিন রচনার সংবাদ রাখেন কে ?
 ভাষায় গ্রন্থরচনার স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শশিচন্দ্র দত্ত এবং কুমারী তরু
 তারতম্য।

দত্ত প্রভৃতি আরও দুই একজন ইংরাজী ভাষায় অতি সুলক্ষণ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বিদেশীয়েদের পক্ষে সেরূপ লেখা অবশ্যই জ্ঞানার বিষয়। কিন্তু কয়জন ইংরাজ বা সুশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখেন ? তাঁহাদিগের মাতৃভাষা না হইলেও যে, তাঁহারা ইংরাজীতে সেরূপ সুলক্ষণ কবিতা লিখিতে পারিয়াছেন, এইজন্যই তাঁহাদিগের বাহা কিছু প্রশংসা ; ইংরাজী, সাহিত্যের উন্নতির জন্ত কিছু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা নয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পরে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থের নাম শুনিবে কিনা সন্দেহ। মধুসূদনও যদি “ক্যাপটিভ্ লেডী” বা সেইরূপ আরও দুই একখানি কাব্য লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহাদিগেরই জ্ঞায় প্রশংসা লাভ করিতেন। কিন্তু শুভক্ষণে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার শৈশবের অনাদৃত মাতৃভাষার উপর নিপতিত হইয়াছিল, এবং মাতৃভাষার অহুশীলন করিয়া বাহাতে তিনি স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্ত তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অহুশীলনে কিরূপ প্রয়োচনা গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা বলিয়া তাহাতে, স্বভাবতঃ, তাঁহার যতটুকু অধিকার ছিল, মাস্ত্রাজে আলোচনার অভাবে তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তাঁহার সংস্কার জন্মিল যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহার কবিশক্তি বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং তাহাতেই তিনি অক্ষয়কীর্তি লাভ করিতে পারিবেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে, এই সময় হইতে তিনি বিদ্যালয়ের বালকের জায় আগ্রহে ও পরিচর্য্যে নানা ভাষা ও নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের

এই সময়কার অধ্যয়ন-প্রণালী সৰ্ব্বদে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বাহা লিখিয়া-
ছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসিতা ও ভোগাসক্তির
মধ্যে মধুসূদনের বিছোপার্জন-স্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল, পাঠক ইহা হইতে তাহা
অল্পমান করিতে পারিবেন। মূল ইংরাজী পত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া
আমরা তাহার কয়েকটি পংক্তির অল্পবাদ নিয়ে সন্নিবেশ করিতেছি।* মধুসূদন
আলস্ত্রে সময়ক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, গৌরদাসবাবু তাঁহাকে লিখিয়া-
ছিলেন; “একরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্তব্য নয়; তুমি যদি তোমার
শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা
কতই ফলপ্রসূ হইত।” মধুসূদন প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন; “আমার জীবন

এখন বিজ্ঞানায়ের বালাকের অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত।

মধুসূদনের অধ্যয়ন-
শীলতা।

আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ; ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু;

৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে

২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে

৭টা পর্য্যন্ত লাতিন, এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার

পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্ত

প্রস্তুত হইতেছি না?”† বিধাতা মধুসূদনকে স্বাস্থ্য ও প্রতিভা উভয়ই মুক্তহস্তে

দান করিয়াছিলেন, বিছোপার্জন সৰ্ব্বদে তিনি তাহার অপব্যবহার করেন নাই।

তিনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কিনা, সে সৰ্ব্বদে মতভেদ থাকিতে পারে;

কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিজ্ঞানভাষায় সকলের অগ্রগণ্য, তাহা বোধ

হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মধুসূদন, মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্ত এইরূপে প্রস্তুত হইতেছিলেন

বটে, কিন্তু মাস্ত্রাজে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থ-

রচনা দ্বারা তথায় প্রতিষ্ঠালাভের সুবিধা দূরে থাকুক, বৎসরান্তে কাহারও সহিত

মাতৃভাষায় একটি বাক্য বিনিময়েরও সুবিধা ছিল না। আট বৎসরব্যাপী

প্রবাস বড় সামান্ত সময় নয়; এই দীর্ঘ প্রবাসের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার

বৎসামান্য যে জ্ঞান ছিল, তাহাও ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার

* ত্রয়োদশ পত্র দেখুন।

† “My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine :
6—8 Hebrew; 8—12 School; 12—2 Greek; 2—5 Telegu and Sanskrit;
5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for great object of
embellishing the tongue of my fathers?”

সহিত পাছে তাঁহার সযত্ন লোপ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার বাল্যের প্রিয়গ্রন্থ কানীদালী মহাভারত ও কুন্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি যে আবার মাতৃভাষার অল্পশীলন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার নিকট দুরাশা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে মধুসূদনের মাস্ত্রাজ ত্যাগ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার ভাবীজীবনের পথও সেই সঙ্গে পরিষ্কৃত হইল।

মধুসূদনের মাস্ত্রাজ গমনের তিন বৎসর পরে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর সময় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে মধুসূদনের পিতাও পরলোক গমন সাংসারিক অবস্থা; করেন। মধুসূদন সে সংবাদ অবগত হন নাই। তাঁহার মাস্ত্রাজ ত্যাগ। আত্মীয়, স্বজনগণ তাঁহার কোন সংবাদ রাখিতেন না; তিনিও তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন না। মধুসূদন পরলোক গমন করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধুসূদনের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পূর্ব হইতেই আত্মীয়, বন্ধুগণের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; তাহার উপর আট বৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে এমনই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার পিতৃগৃহে তাঁহার জন্ম দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিবার লোক কেহ ছিলেন না। স্বদেশে, বিদেশে সকলেই তাঁহার কথা ভুলিয়া আসিতেছিলেন; কেবল একজনের নিকট তাঁহার স্মৃতি, সমভাবেই, জাগরুক ছিল। তাঁহার প্রিয়-স্বজন্ম গৌরদাসবাবু তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি পূর্বেরই জ্ঞান স্মরণে মধুসূদনকে পত্র লিখিতেন, এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান লইতেন। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্পে আসিয়া অধিকার করিতেছে; অথচ মধুসূদন বিদেশে অন্নভাবে হাহাকার করিতেছেন। তিনি মধুসূদনকে, স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক, পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্ত, অহরোহ করিয়া, পত্র লিখিলেন। এদিকে মধুসূদনেরও সাংসারিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। কলনায় তিনি যে স্থানের বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল আকাশকুসুমের পর্ববসিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ কিছুই তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই। তিনি মাস্ত্রাজের একমাত্র দৈনিক-পত্রিকা “স্পেক্টেটরের” (Spectator) সহকারী সম্পাদক এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন শিক্ষক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। স্নেহক বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। চিরাত্যস্ত অপরিমিত-ব্যয়িতা দোষে তিনি তখনও অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ব্যবহারের জন্য তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশান্তিময় হইয়াছিল। মাদ্রাজ তাঁহার নিকট কণ্টক-শয্যায় পরিণত হইল। “ক্যাপটিভ্-লেডী” রচনার পর এবং তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্বে, তিনি উৎসাহে লিখিয়াছিলেন।—“Heigh ho! my stars are brightening”—কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গ্রহ স্প্রসন্ন হয় নাই, তিনি কেবল বিডম্বিত হইয়াছিলেন মাত্র। নিবাণায় মর্ষাহত হইয়া, তিনি শেষে বলিতে বাধ্য হইলেন, “হায়! সাংসারিক উন্নতির জন্য যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না (“I have not thriven so well in the world as I had expected”)। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য গৌরদাসবাবু আহ্বান তাঁহার নিকট বড়ই সময়োপযোগী বোধ হইল। তিনি মাতৃভূমির ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আট বৎসর কাল বাসের পর মাদ্রাজ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাদ্রাজ প্রবাসকালে লিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কি অবস্থায় মধুসূদন মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কি অবস্থায় ক্যাপটিভ্-লেডী রচিত হইয়াছিল, হৃদয়কার তীব্র সমালোচনা পাঠ করিয়া কবির মনেব ভাব কিরূপ হইয়াছিল এবং তাহার পর মাতৃভাবায় সমৃদ্ধি লাভনের জন্য তিনি কিরূপ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত এইরূপ অনেক বিষয় পাঠক, এই সকল পত্রে, মধুসূদনের নিজের কথায় অবগত হইতে পারিবেন।

অষ্টম পত্র

নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্র মধুসূদনের মাদ্রাজে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরে গৌরদাসবাবুকে লিখিত।

Madras Male Orphan Asylum
Black Town.

14th February, 1849.

MY DEAREST FRIEND,

By my troth you wrong me! It is impossible for me to forget you,—and you may rest assured that I have

often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale ! —Here's a simile for you, my boy !

Your information with regard to my matrimonial doing is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency, I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well that ends well !" I am sorry to hear of your severe loss, but I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God ! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie" and a short poem or two. I must give you a description of my "Captive". It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo syllabic verse and (truth, 'pon honour !) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of

which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to republish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you. I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know ; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers ? I am sure, if you try, you will succeed, Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy ! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B. B. Dutta. (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, &c. ?* My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers ? I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

* ইহারা মধুসূদনের খাল্যবন্ধু। ইহাদিগের প্রভোকেব পরিচয় প্রদান নিত্যাযোজন।

I say, old Gour Dass Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack ?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freight-age. What more, just now, my dear fellow ! When I have time, I shall give you a full detail of my-self. So, let me conclude, now, with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am,

Ever your affectionate,
M. DUTTA.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose,* please give my respects to him. What are you doing with yourself now. Are you employed any where or "cutting it fat"—eh ?

* ইনি বঙ্গবন্ধুর পরিচিত জনৈক খ্রীষ্টান বর্নপ্রচারক ।

নবম পত্র ।

ক্যাপটিক্ লেডী রচনা সম্বন্ধে—বাবু গৌরনাথ বসাককে লিখিত ;—

Madras

19th March,

1849.

MY DEAREST FRIEND,

I hardly know how to thank you for your letter,—accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The “Captive” is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton Esqr., the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work “exhibiting such great powers and promise” dedicated to him. I have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta critics will receive me.

You are right.—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time, it is too late now. I have, (would you believe it?) commenced and written greater part of the 1st canto of another Tale! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you. I write this with a severe head-ache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has got into the Madriasa. He is a nice fellow,—I always thought so. Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother?

As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants"—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash feringee". Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her. I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S. and Bh. think of them.

Oh! beautiful as Inspiration, when
 She fills the poet's breast, her faery shrine,—
 Woo'd by melodious worship! welcome then,—
 Tho' ours the home of want,—I ne'er repine :
 Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine ?
 Life hath its dreams to beautify its scene ;
 And sun-light for its desert ; but there be
 None softer in its store—of brighter sheen—
 Than love—than gentle love, and thou to me
 Art that sweet dream, mine own, in glad reality !
 Art these readable, old fellow? I shall give you two
 stanzas more. The introduction contains eleven.

* * *

Yes—like that star which on the wilderness
 Of vasty ocean woos the anxious eye
 Of lonely mariner,—and woos to bless,—
 For there be hope writ on her brow on high
 He reck's not darkling waves nor fears the lightless sky.

* * *

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive", I shall come

out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation with a few hundreds a month. Who will give it me ? Is there none in India ? Time will show !

Excuse the foolish letter,—I am sure it's very foolish—full of nonsense, egotism and what not ? I trust it won't give you a head-ache to read it. With kindest regards to all,

I remain,

Mr Dearest Friend,

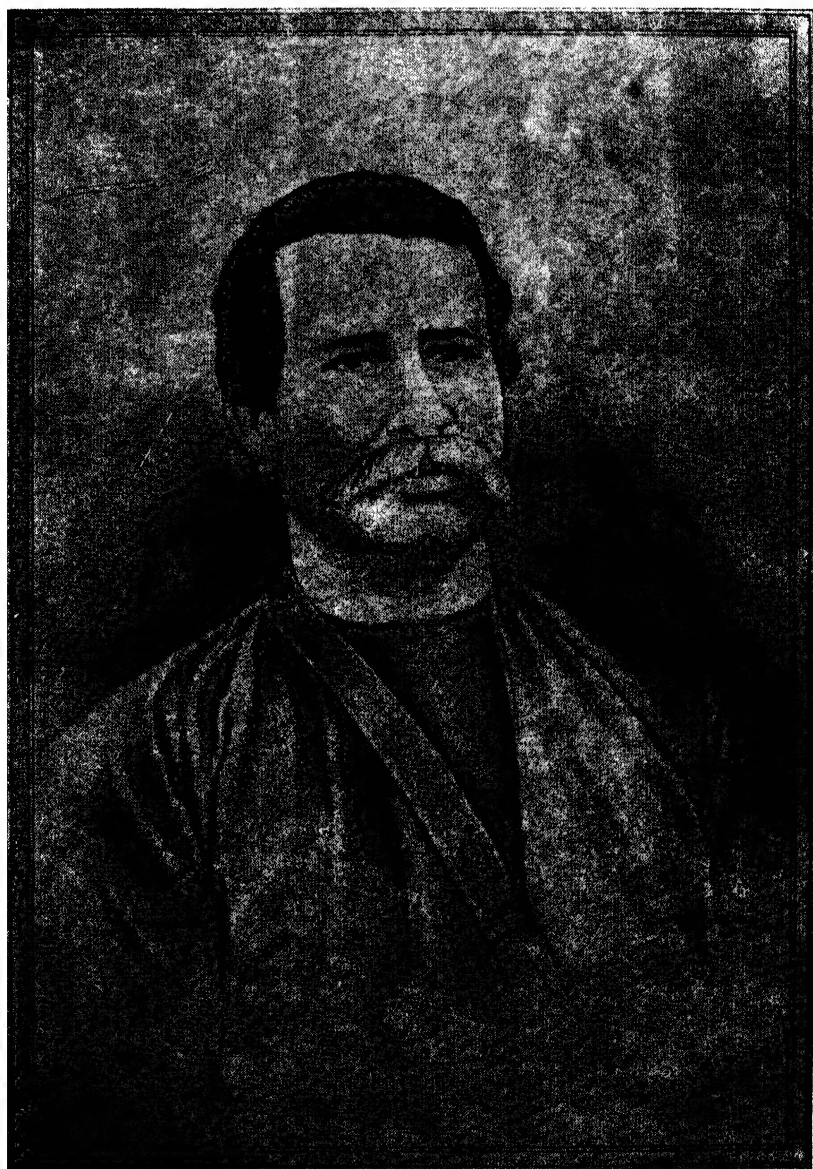
Your affectionate

M. DUTTA.

P. S. Where's Harry ? I say, Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother ? Do you know that I have not yet forgotten her queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once ? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She was or is (which ?) one of the handsomest Bengalee ladies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calis—Lutchmees, Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The 1st canto contains an episode called the "Rajshoonya Jujnum" with a terrible battle and "a' that". Adieu !

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25". Dost comprehend ? eh ?

নিম্নলিখিত পত্রখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত । ভূদেববাবু এই সময় নিরিরহুত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষকতা করিতেছিলেন ।



স্বর্গীয় কুন্দের মদ্যোপাধ্যায়, C. I. E.

दशम पत्र ।

Madras

27th May, 1849

MY DEAR BHOODEB,

Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, bad and indifferent verses, yclept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh ! have you received the d—d "Captive Ladie" ? By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity, (tho' a Heathen rascal) tell me something about it.

I have just received a letter from Gour in which he is in the clouds. Do tell him, that in order to induce my Highness to put pen into paper for him again, he must write to me a long—long letter, all about my poem.

When you get my poem, I hope, you will rewrite the Notes and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with my new Poem. Can't you quote Sanscrit authority for all I say ? Do write a learned Essay, garnished

with Sanscrit and other quotations on the "Rajshooya Jujnum". I shall acknowledge it publicly.

The Captive has met with a pretty fair reception here. Make my salams to the two Mahomedan gentlemen—especially my old friend, Abdul Luteef. He is a clever fellow, isn't he ? Does he drink grog and eat pork, or is he still a —Bismillah-sort of a chap—eh ? Has the learning of the Feringees done any thing in that way ? Let me know all about yourself. How is your good mother ? Are you married ?

My wife is annoyed with me for calling you a "Heathen rascal". I know you better than she, of course. More anon,

Ever your affectionate

M. DUTTA.

P. S. I send this letter bearing.—Don't fail to return the compliment. My bank is just dry.

Tell master Bysack to send a copy of the "Captive" to Ram Chandra Mittra and another to Mr. Bethune,—if he thinks it proper, and let him write to him and send me his reply, provided he sends any.

M. D.

একাদশ পত্র ।

হরকরার সমালোচনা সহজে ।

MADRAS,

5th June, 1849.

MY DEAR GOUR,

I find that your "Hurkara" has been somewhat severe with me. Curse the rascal ; his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know, O thou noble youth, that I have girt my loins to do battle

manfully even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth—the Poet's crown of laurel-leaf! Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them are indubitable, I can afford to stand a little abuse.

I am anxious to know how my friends like the book.. I will not do them the injustice to suppose that the critique of the "Hurkara" has in any way, prejudiced them against me. It is an unpleasant thing, Dear Gour, to have any thing to do with the "many-headed", especially, in the way of literature. Remember that no man is willing to allow the palm of Superiority to another, unless actually forced to do so. Anything like an acknowledgment of merit *must be wrung out* by patient perseverance. Don't you be cast down to find your friend, handled so roughly. I have written to Messrs Bhoodeb and Soroop who, I doubt not, will communicate to you the contents of my imperial despatches.

I had intended to have written to you a long letter, but, having some business to attend to, I must disappoint myself.

You are welcome to send a copy of the "Captive" to our old tutor, Ram Chandra Mitter, with my respects.

If you have succeeded in collecting any money, have the goodness to forward it through some house of Agency. My printer is almost clamorous. With best regards,

Ever yours aff'ly,

M. DUTTA.

P. S. Send me all the opinions of the Press (if there be any) post not-paid. I don't want the "Hurkara". Do look out for the "Review".

দ্বাদশ পত্র ।

ক্যাপটিভ্. লেডী মাদ্রাজে কিরুপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ,

MADRAS,

6th July, 1849

MY DEAR GOUR,

I received your voluminous and thrice-welcome despatch yesterday, containing sundries All right, my boy. You seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For look you, it has procured me the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honor to know. You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place It seems they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benaras, Hugly affairs &c. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay—if not altogether,—at least for some time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard". He has moreover, introduced me to E. B. Powell. Esqr.—the head master of the University here. I paid a visit to Mr. Powell a short time ago. You have no idea what a good man he is. The University is a sorry building, and has

nothing in the shape of a good library. If you
your mind to come to Madras, I hope to be able
you. Why should I, my friend, consider the poem
has done all this for me a failure? You know that when I
came here I had no friends; but now many a barbarous
villain, born and bred here, would be glad to be in my
shoes, "Fortune", say the Latin Poet "favours the brave".

Pray let me have the money as early as you can. Get
good old Sham to get on order from Bagshaw and Co. to
Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at
sight to the high and mighty M. Dutt. Esqr. & Co. or order.
So much for business. Printing, my friend, is as dear, here
as possible. What could I do? My printer is impatient.
I am sure you can ask some friends to get you few pur-
chasers. I make you my plenipotentiary to sell the books
at any rate you like; only let me have money to pay my
printer. As regards my liabilities to the Public Library, I
am not, aware of owing them any thing, beyond some money
which I had promised to pay them as a *donation*. Your
friend must wait till I am better off. It would be absurd
for a poor Devil to be discharging his debts of honour, in-
curred when he was in prosperous circumstances, at a time,
when he has scarcely the necessaries of life to bless him-
self with. You must tell your friend that I shall make
arrangements as soon as I can and have the means
to do so. You astonish me by saying that old Banquo* has
not been written to, by me. What has he done with the
letter, I wrote to him some months ago, addressed to your
care? I have never heard from him since.

* ইনি মধুসূদনের সহযোগী বাবু বহুব্রীহী দত্ত। বোধহয় (স্বাক্ষরের Banquo কষ্টে) বিক্রপ করিয়া ইহার নাম Banquo লিখিয়াছিলেন।

As regards Bethune, here goes ;

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously, I subscribe myself, Dear sir, your most obedient and grateful servant—&c.*"

This is neat and *pertinent*. Ram Tanu must wait.† He is indeed a good fellow. I am glad you are becoming intimate with Walker. He is a fine fellow. And now, my good Gour, I must tell you that you are wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron ? I hope you will make up your mind to come to Madras. I tell you I have every hope of being of some service to you.

Do send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me and let me have the bill of lading. I do not think it will cost much.

You told me that some persons find fault with some portions of my poem ; which are they ? I mean passages. I am sure you are disappointed by my poem ! I *feel* it. Remember, my friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects and not exactly for Fame. However what is done, is done.

* এই পত্রের প্রত্যুত্তরে বেথুন, গৌরদাসবাবুকে বাধা দিখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† স্বর্গীয় দ্বারভদ্র নাহিকী মহাশয়। হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইন্ডি, তখন শিক্ষকতা-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

Look out for the Review. As regards my other publications, you shall hear of them by and by. I am above being cast down. I tell you the "Captive" has produced a very favourable sensation here.

Do you know that I expect to be a father soon? Heigh ho! my stars are brightening. I trust, I have answered every thing in your letter and that you will never cease to believe me.

Ever your affectionate

6th July

M. DUTT.

P. S. Send my love to Mr. Walker and tell him to write to me. I left a Persian book behind me in Bp's College. Ask Mr. Walker to send that book to you, and do you enclose it in my mother's parcel. I am glad you have made up your mind not to marry again. Be independent, first, as regards money.

M. D.

ত্রয়োদশ পত্র ।

মাতৃভাষার অছন্দ্যলনের জ্ঞাত, মধুসূদন কিরণভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তৎসময়ে ;

18th August, 1849.

MY DEAREST FRIEND,

Accept my best thanks for your kindness. You have in a great measure, saved me from something like a grave. How can I thank you sufficiently. The books are all safe and sound. You will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father.

Your anxiety to ascertain this portion of my affairs, is what one would take in favour of one's heart's best brother. I shall enter into particulars regarding them at some other time. I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify. I have a great deal to say about Mr. Bethune's.

You must look upon me as a most unthinking father if you are under the impression that I do not think ardently and uninterruptedly on such a subject. Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu, and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers? For the present you must excuse my brevity.

Your most truly and aff'ly,
M. S. DUTT.

P. S. As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know, how to do the thing in Bengali. I am sorry for B— ; I heartily give him credit for the possession of a strong mind. I shall do what you desire with reference to your School* (for which I congratulate you) by and by.

মধুসূদনের পত্রের শেষ কয়েকটি পংক্তি পাঠক মহাশয়কে স্মরণ রাখিতে বলি। যিনি অনভিজ্ঞতাবশতঃ পিতাকে বাচ্চালা ভাষায় পত্র লিখিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, তিনিই পরে মেঘনাথবধ ও বীরাক্ষনা রচনা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত

* ব্রাহ্মনগরে গৌরহাসকানুর উভোপে ও সাহায্যে সংস্থাপিত বিদ্যালয়।

যে কোন্ কার্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন করান তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বাকালীর গৃহে জয়গ্রহণ করিয়া মধুসূদন যে, ইচ্ছা করিলে, পিতাকে বাকালী ভাষায় পত্র লিখিতে একবারেই পারিতেন না, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, বাকালী ভাষায় তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল, ইহা হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি। পরবর্তী পত্রখানি মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস অবসান-কালে লিখিত। মধুসূদনের পিতৃবিয়োগের পর, গৌরদাস বাবু বেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা তাঁহাকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ইহা তাহারই প্রত্যুত্তরে লিখিত। এই পত্র লিখিবার পরই মধুসূদন মাদ্রাজ ত্যাগ করেন।

চতুর্দশ পত্র।

MADRAS, SPECTATOR, PRESS,
20th Decr. 1855.

MY DEAREST FRIEND,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I know that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death for months, perhaps, years. O dearest Gour, when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th) but I am very poor just now, my brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds!—Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in Heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your own friend.

Unchanged & Unchangeable

M. S. Dutt.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator," the only daily in this town.

মাল্লাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাল্লালা সাহিত্যের অবস্থা

৭

আট বৎসর পরে মধুসূদন মাল্লাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাহার এই দীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে নানাবিষয়ে তাহার
স্বদেশে প্রত্যাগমন
পূর্বাভাসের পরিবর্তন। স্বদেশে কি গুরুতর পরিবর্তনই সংঘটিত হইয়াছিল ? তিনি

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ বলিলে
লোকে বাহা বুঝে, তাহার পক্ষে তাহার কিছুই ছিল না। তাহার জনক,
জননী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন ; তাহাকে প্রত্যাগমন করিয়া লইবার
লোক তাহার পিতৃগৃহে কেহই ছিলেন না। কলিকাতায় যে গৃহে
তিনি বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গে সুখে বাস করিতেন, তাহা আর
একজনের অধিকৃত হইয়াছিল। তাহার জন্মভূমিতেও তাহার জন্ম স্থান ছিল না।
তাঁহার স্বসম্পর্কীয়গণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না ; যাহারা
পারিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে, ধর্মচ্যুত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন
না। তাঁহার শৈশব-সুন্দরদিগের মধ্যে কেহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; কেহ
স্থানান্তর গিয়েছিলেন ; কেহ তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; কেহ বা, বিস্মৃত
না হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া আর সেই শৈশবের অমুরাগ প্রকাশ করিলেন না।
তাঁহার চতুর্দিকে অপরিচিত মুখমণ্ডল—স্বদেশে কিরিয়া আসিয়াও তিনি
বিদেশী ;—বঙ্গভূমি পট পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন অভিনব আকার ধারণ করে,
বঙ্গদেশও তাঁহার সম্বন্ধে তেমনই এক বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।

মধুসূদন নিজেও পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। আট বৎসরব্যাপী প্রবাসের
কালে তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্বাশঙ্ক

মধুসূদনের নিজের
পরিবর্তন। হুলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কঠোর স্বর পরিবর্তিত
হইয়াছিল। যুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া, এবং

বিজাতীয় সমাজের সংসর্গে বাস করিয়া তিনি আহারে,
পরিচ্ছদে এবং আচার, ব্যবহারে, সম্পূর্ণরূপে বৈজাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।
আলোচনার অভাবে তিনি স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বঙ্গবাক্য-
দিগের সহিত কথোপকথন সময়ে ইংরাজী ভাষায় ও ইংরাজী রীতিতেই
মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। কচিং যে ছুই একটি বাল্লালা শব্দ ব্যবহার
করিতেন, তাহাও বিকৃত বৈজাতিক স্বরে। হিন্দুকলেজে পাঠের সময়, তিনি

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য, কখনও কখনও যে বলিতেন, “বাঙ্গালা ভাষা তুলিয়া যাওয়াই ভাল ;” মাস্ত্রাজপ্রবাসের কালে তাঁহার বাল্য-কালের সেই বিজ্ঞপ বাক্য, কিয়ৎ পরিমাণে, সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

কেবল মধুসূদনেরই পরিবর্তন ঘটে নাই। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক পরিবর্তন। প্রত্যেক বিষয়েই এই সময়ের মধ্যে, বঙ্গদেশে অতি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাস্পঘানের ও তাড়িত বার্তাবহের

প্রচলনে সমাজের সম্মুখে অভিনব কর্মক্ষেত্রের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে লোকের চিন্তাশ্রোতও নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বর্গীয় বাবু রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবলবেগে উথিত হইতেছিল। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী এবং প্রত্যেক গৃহ আন্দোলিত হইতেছিল। নবোৎসাহময় ব্রাহ্মধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের গতিরোধ করিয়া, ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। চতুর্দিকেই পরিবর্তন, পুরাতনের সহিত নূতনের সংগ্রাম। পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার ও প্রাচ্য সমাজের সংঘর্ষে এক অভিনব শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সকল বিষয়েই মধুসূদন যে পরিবর্তন-যুগের সূত্রপাত দেখিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহাদিগের পূর্ণবিকাশ দর্শন করিলেন। মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহারও প্রতিভা এই পরিবর্তন যুগ সন্মুখে কিরূপ কাঁচ করিবে। ঐশ্বরিক বিধান বলে উপযুক্ত সময়ে তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মধুসূদন সাহিত্য-সেবক ;—সাহিত্যেরই সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সন্ধ—রাজনীতির অথবা সমাজনীতির সহিত তাঁহার বড় সন্ধ ছিল না। সেই সাহিত্য

বঙ্গীয় সাহিত্যের
অবস্থা ; বিভাদাসের
মহাশয়ের ও অক্ষয়-
বাবুর চেষ্টায় বাঙ্গালা
ভাষার উন্নতি।

সন্ধেও তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করা দূরে থাকুক,

“বাঙ্গালা ভাষাতে আমার অভিজ্ঞতা নাই” একথা বলাও, যেন, অনেকে গৌরবজনক মনে করিতেন। কিন্তু মধুসূদন যখন মাস্ত্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বিভাদাসের মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভাও

মাস্ত্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ১৪২

বাঙ্গালা ভাষা আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মধুসূদনের মাস্ত্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্বেই বিদ্যাসাগরে মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত ও শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে ও বাবু অক্ষয়কুমারের প্রতিভাশ্রমে তত্ত্ববোধিনী তখন বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় যে ওজস্বী, গম্ভীর রচনা হইতে পারে এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই যে, ইংরাজী ভাষার স্তায়, বাঙ্গালা ভাষাতেও আলোচিত হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তখন তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপাদন করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং অক্ষয়বাবুর রচনা হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয় ; ক্ষমতাবান লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তি বিকাশ করিতে সক্ষম। ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির কাষ ইংরাজীতে নিষ্পন্ন হওয়া যেন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সে সংস্কারের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ডেভিড্ হেয়ারের স্মরণার্থ সভা ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সাপ্তাহসরিক উৎসব উপলক্ষে অক্ষয়বাবু বাঙ্গালা ভাষাতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সভায়, বোধ হয়, ইহার পূর্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নাই। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা হইতে যেন এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি এতদিন বাঙ্গালা ভাষাকে “বর্বরের ভাষা” বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা, শিশুর ও মূর্খের হৃদয়ের ভাব বিকাশের উপযোগী হইলেও, সুশিক্ষিতের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী নয় ; অক্ষয়বাবুর তেজস্বিনী ভাষা হইতে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালপ্রসিদ্ধ পত্রিকা ইণ্ডিয়ান কিন্ডের সম্পাদক, খ্যাতনামা বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরাজী ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার ছিল না। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশের সময়, পুলকিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—

“The Discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so, because of its being a Bengali one, I know * * * that there is a large number of our educated friends who can relish nothing that is-

Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is, I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language—the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined—will ere long be recognised by all.”

কিশোরীবাবুর গ্রন্থ আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা হইতে বাঙ্গালা ভাষা আলোচনায় অগ্রগামী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে হেয়ার-সরণার্থ সভার আলোচ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই রচিত হইতেছিল। এই সভার চতুর্থ হেয়ার-সরণার্থ সভার বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা।

সাম্প্রদায়িক উৎসব উপলক্ষে তাত্‌কালিক ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী, রেভারেণ্ড ক্লফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেই একটি রচনা পাঠ করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর সুকবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও তাহার পর বৎসর (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) বাবু রাজনারায়ণ বসু এই উপলক্ষে, বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতার দিন সভাপতি ছিলেন। স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন যে স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রেই একান্ত কর্তব্য, এবং বিদেশীয় মহাকাবিগণের রচনা অমৃততুল্য হইলেও তাহা যে স্বদেশের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার বক্তৃতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।*

* বাঙ্গালা ভাষায় অগ্রগামী পাঠকে রাজনারায়ণ বাবুর “বিবিধ প্রবন্ধে” সন্নিবিষ্ট এই বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহার কয়েকটি পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

“বর্ধাৎ বলিতে কি, হোমর, ঘেটো ও স্কোপ্লিস রচিত চারুভূষ, নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত হৃৎ সন্তোষ করি, কিবা চরিত্র বর্ণনা মৈশূপোর পর্বাকারী প্রশংসক দেহপরিমারের অন্তর্ভুক্ত আশু নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিবা অদ্ভুত স্মরণশক্তি সম্পন্ন খোটে ও সিলারের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যাবশেষ হয় হই, তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবার্য থাকে। সেই আশা বহুদূরকে জগজ্জন-পূজা, বিশাল-খ্যাতি প্রত্যাশার সিন্ধু বস : সৌভাগ্যবান প্রভুর বৈধিবার আশা। সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমাজের কাব্যাক্রিত অন্তর্ভাব্য গান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদের আর-ভাষার রচিত কাব্যের বস : সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হইয়া অস্বদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?”

মাস্ত্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ১৫১

যে স্ববীজ বপন করিয়াছিলেন, মাতৃভাষা-বৎসল অন্তঃস্থ ব্যক্তিগণের স্বত্রে তাহা, এইরূপে অঙ্কুরিত হইয়া, দিন দিন পরিবৰ্ধিত হইতেছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে হেয়ার-স্মরণার্থ সভায় পাঁচ বার বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি বক্তৃতা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটীতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে” তৎসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়টিতে, মহাভারতের সুপ্রতিষ্ঠ অম্ববাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ “বাঙ্গালা ভাষার অম্বশীলন” বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার অম্বশীলন ইহার পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখন হইতে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে সম্বন্ধেও উত্তোষের ক্রটি ছিল না। হেয়ার-স্মরণার্থ সভা হইতে তাঁহারা, প্রতিবর্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্ত, একটি করিয়া পুরস্কার প্রদান করিতেন। সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, এইরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঈহাদিগের মধ্যে দুইজনের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত;—প্রথম সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র, কাদম্বরী লেখক, পণ্ডিত তারাশঙ্কর শর্মা এবং দ্বিতীয়, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা, স্ক্রবি বাবু রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পণ্ডিত তারাশঙ্কর “হিন্দু-রমণীদিগের শিক্ষা” এবং রত্নলালবাবু “ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে রচনার জন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ অম্বশীলনের ও উৎসাহদানের ফলে, বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনার বাসনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল; এবং ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা যে অপমানের বিষয় নয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অম্বরাগ সঞ্চারের সঙ্গে
কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে সাধারণের কুচিরও পরিবর্তন আরম্ভ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও
সংবাদ প্রভাকর।
হইয়াছিল। যতদিন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা
ভাষার আলোচনার প্রবৃত্ত হন নাই, ততদিন সাধারণ
বঙ্গীয় পাঠকের কুচি মার্জিত ও বিস্তৃত ছিল না। এখন যেমন সংবাদপত্র ও
কবিতা দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হইয়াছে, মধুসূদনের মাস্ত্রাজ গমনের

পূর্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত, তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্র, “সংবাদ-প্রভাকর” কবিতা-প্রধান ছিল। সাধারণ পাঠকগণ, ইহার গভাংশ ত্যাগ করিয়া গভাংশই আদরের সহিত পাঠ করিতেন। রসরাজ পত্রিকার ও সংবাদ-প্রভাকরের অনুল্ল কবিতামূল্য সে সময়কার লোকের অতি উপায়ে ভোগ্যসামগ্রী ছিল! তখন বঙ্গ-সাহিত্যে গুপ্ত-কবির প্রভাবকাল; গুপ্ত-কবির রচনা তখনকার লেখকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিল। যে প্রতিভাশূণ্য গুপ্ত-কবি “পৌষ পার্কণ”, “জামাই বধী”, “অরদ্ধন” প্রভৃতি কবিতাতেও লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন, সে প্রতিভা ইচ্ছামাত্র, সকলের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। গুপ্ত-কবির অম্লকরণকারী লেখকগণ, তাঁহাকে আদর্শ করিতে যাইয়া, তাঁহার প্রতিভার অভাবে, আপন আপন পত্রিকা কেবল অতি জঘন্য স্বাবর্জনা পরিপূর্ণ করিতেন। সম্প্রদায়বিশেষের বা পরিবারবিশেষের কুসারটনা, নব্য-শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের চেষ্টার প্রতিরোধ, এবং পৌরাণিক কিম্বদন্তী সম্বন্ধে অথবা সম্মানপ্রদর্শন করাই তখনকার অধিকাংশ সংবাদপত্রের মূখ্যত্রত ছিল।* কিন্তু মধুসূদনের মাস্ত্রাজ হইতে প্রভাগমনের কিছুদিন পূর্ব হইতে এই শোচনীয় অবস্থার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সুশিক্ষিত ও সূক্ষচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে লোকের রুচি ও মানসিক প্রবণতা নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার “সর্বশুভকরী” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করেন। নানাপ্রকার কল্যাণকর বিষয়সমূহ অতি সূক্ষচিসম্পন্ন ও গুজস্বী-ভাষায় তাহাতে লিখিত হইত। যদিও ইহা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই তথাপি ইহা অনেকের শ্রদ্ধা ও অমুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভাট্টার রাজেন্দ্রলাল তত্ত্ববোধিনী ও

মিত্র মহাশয়, “বঙ্গীয় সাহিত্যসমিতির” অল্পমোদনক্রমে, লণ্ডন-পেনি-ম্যাগাজিনের আদর্শে, “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস,

* বাবু রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় এই সময়কার পত্রিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন; “১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। এই সময়ে “আরেকলঙ্ঘন” নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখন ভুলী দেখিয়া লোকের আকোষ বর্ষাই শুদ্ধ হইত। সোম একাংশ একাংশের পূর্বে সংবাদপত্র সকল অসীলতা ঘোষে অজ্ঞান দূষিত ছিল। একাক্ষর ও রসরাজে বধন বসড়া হইত, তখন রাজার দুইজন বরলা পরিচারকজাতীয় লোক, বগলা কবির, পরস্পরের কড়িকাড়িত বরলা লইয়া, পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করিলে, বেশপ জঘন্য হুত হয়, সেসকল জঘন্য হুত হইত।”

মাস্ত্রাজ হইতে বদশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ১৫৩

পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় ইহাতে আলোচিত হইত। এক তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন সে সময়কার আর কোন পত্রিকাই বিদ্যাবস্তায় ও প্রবন্ধগোরবে ইহার সমকক্ষ ছিল না। ডাক্তার মিত্র, নানাশাস্ত্রে ও নানাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বিবিধ শাস্ত্র হইতে রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে উপহার প্রদান করিতেন। বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকাসমূহ ইহার এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট, এক বিষয়ের জন্ত, চিরদিন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। ইহাৱাই দুইজন, লোকের রুচি অলীক কিম্বদন্তী, অসার উপন্যাস এবং অশ্লীলতাপূর্ণ কবিতা হইতে আকর্ষণ করিয়া, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন। সাধারণের রুচি পরিবর্তন সম্বন্ধে ইহারা সে সময় বাহা করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিবিধার্থ সংগ্রহের সঙ্গে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত “বিজ্ঞানকল্পজ্বলের”ও নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও ইহার ভাষা মার্জিত ও ওজোগুণসম্পন্ন ছিল না, তথাপি নানাবিধ সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনার দ্বারা ইহাও বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের রুচি-পরিবর্তন সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য করিয়াছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের ও বিজ্ঞানকল্পজ্বলের দ্বারা আরও একখানি সুকৃতিসম্বৃত পত্রিকা এই সময় দুইজন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক ছাত্র বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বাবু রাখানাথ শিকদার “মাসিক পত্রিকা” নামক মাসিক পত্রিকা।

একখানি পত্রিকা প্রচারিত করেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রভৃতির ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা ইহাতে বতদূর সম্বদ, সহজ ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগের ভাষার পরিচয় প্রদান নিম্নয়োজন। “আলালের ঘরের দুলাল” ও “হতুম প্যাচার-নক্সার” তাহা বঙ্গীয় পাঠকমাজেরই সুপরিচিত হইয়াছে।

মধুসূদনের মাস্ত্রাজ গমনের পূর্বে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, এবং বাহারা সে সময় “ইয়ং বেঙ্গল” বা নব্য বাঙ্গালি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করা দূরে থাকুক, তাহাতে অভিজ্ঞতা না থাকাই যেন সৌরভের বিষয় মনে করিতেন। কিন্তু মধুসূদনের মাস্ত্রাজ প্রবাস-কালের মধ্যে সেই ইয়ং বেঙ্গলদিগের অন্তর্গত, কেবলমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য বহুপরিকর হইয়াছিলেন। ইহাদিগের সকলের এবং বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সমবেত যত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে অর্থাৎ গদ্যাংশে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, তাহার অপর বিভাগে অর্থাৎ পদ্যেও পরিবর্তনের আবশ্যকতা ছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে লোকের রুচির ও প্রবণতার যে কিরূপ বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি।

পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। নূতন শিক্ষার ও নূতন সামগ্রীর সহিত পরিচয়ের সঙ্গে লোকের হৃদয়ে নূতন আকাজক্ষা ও নূতন অভাব-বোধ হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার গদ্যাংশের যে অভাব মোচন করিতেছিলেন, পদ্যেও সেইরূপ করিবার প্রয়োজন ছিল। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য প্রত্যেক বিষয়েই তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বঙ্গসমাজে প্রসারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনে ও নূতন প্রণালীর শিক্ষা-গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ধর্ম-সমাজ-সমূহের আদর্শ, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং পুঁর্বাত্ত্ববিদগণের অঙ্ক-সঙ্কানের ও গবেষণার ফল, তখন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও বিবিধার্থ-সংগ্রহে

প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের সমীপে অনেক নূতন বাঙ্গালা পত্রের অভাব।

তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য-মহাকবিগণের কাব্যের আদর্শ মাতৃভাষাবৎসলদিগের সমক্ষে সংস্থাপিত করিতে সে সময় কেহই ছিলেন না। মধুসূদনই সে কার্য সম্পাদনের জন্য বঙ্গসাহিত্যে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রবণতা ও শিক্ষাগুণে তিনিই যে কেবল সে কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যাক্তি হইবে না। তাঁহার পূর্বে এবং পরে বঙ্গদেশে কত কবি জয়গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্তায় বহু ভাষায় অভিজ্ঞ এবং হোমর, ভার্জিল, দান্টে, ওভিদ্ প্রভৃতির কাব্যের আদর্শ মাতৃভাষায় প্রতিবিম্বিত করিতে সক্ষম কবি বঙ্গদেশে,

মাস্ত্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ১৫৫

এ পর্যন্ত আর কেহ জয়গ্রহণ করেন নাই। যে কল্যাণময়ী প্রকৃতি, প্রত্যেক
রেণুকণার সন্নিবেশেও, অসীম বুদ্ধি-কৌশল ও দূরদর্শিতা
অতাব পূরণার্থ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, শিক্ষা, প্রতিভা এবং স্বাভাবিক
মধুসূদনের আবির্ভাব। প্রবণতা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের
পরিবর্তন-যুগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে যথাসময়ে প্রেরণ
করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-রস-প্রাবিত দেশে মধুসূদনের হ্রাস
বাঙ্গালা কবিতার
বিভিন্ন যুগ। দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বাবু রাজনারায়ণ বসু

তাঁহার “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে”
বাঙ্গালা ভাষার যুগ-প্রবর্তক কবিদিগের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে, প্রথম বিভাগতির,
দ্বিতীয় কবিকঙ্কণের এবং তাহার অব্যবহিত পরেই একবারে মধুসূদনের কাল
নির্দেশ করিয়াছেন। স্থলতঃ বিবেচনা করিলে তাঁহার এক্ষণ নির্দেশ অসঙ্গত
হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে মধুসূদন কবিকঙ্কণের অব্যবহিত
পরবর্তী নহেন। কবিকঙ্কণের পর ভারতচন্দ্রের এবং তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র
গুপ্তের কালের অবসানের পর মধুসূদনের কাল আরম্ভ হইয়াছে। রায়গুণাকর
এবং গুপ্ত-কবি উভয়েরই আদর্শে বঙ্গদেশে এক সময় এক নূতন শ্রেণীর সাহিত্য
উদ্ভূত হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহা এখনও সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন;
ইংরাজী সাহিত্য এদেশে প্রবেশ না করিলে বোধ হয়, এখনও তাঁহাদিগের
প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই কালের সহিত
মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র, যেমন, ভারতচন্দ্রের আদিস-প্রাবিত
কবিতার প্রভাব হ্রাস করিয়া নিজের হস্তরসানুপ্রাণিত কবিতার প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিলেন; মধুসূদনও, তেমনি, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গরস প্রধান সমকালুপ্রাস-প্রাবিত

কবিতার প্রাধান্ত বিলুপ্ত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ
মধুসূদনের পূর্বে বাঙ্গালা
কবিতার অবস্থা—
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে
বঙ্গীয় কাব্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে হইলে

গুপ্ত-কবির সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা আবশ্যক। গুপ্ত-
কবির কবিতা এখন ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তিনি যে
এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর কিরূপ একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এখন
তাহা অনুভব করা সহজ নয়। তাঁহার প্রণীত কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইলে
এবং তাঁহার পত্রিকায় কোন রহস্যগর্ভ কবিতা প্রচারিত হইলে লোকে তাহা

দেখিবার অল্প উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতাসমূহ লোকের নিকট এত সমাদৃত হইত যে, অনেক সময়, প্রভাকরের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা সাধারণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে হইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকল শ্রেণীর মধ্যেই গুপ্তকবির কবিতার অল্পরাগী ও অল্পকরণকারী লোক বর্তমান ছিলেন। গুপ্ত-কবির পূর্বে বঙ্গভাষায় কবিতাপ্রস্রোত ভারতচন্দ্রেরই প্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইতেছিল; গুপ্ত-কবিই, আপনার প্রতিভাগুণে তাহার গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্তী কবিতা-লেখকগণের মধ্যে প্রায় এমন কেহই ছিলেন না, যিনি, কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রভাবের বশবর্তী না হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেবল একমাত্র বাসবদত্তাপ্রণেতা, স্বর্গীয় মননমোহন তর্কালঙ্কারই, তাঁহার অল্পবর্তী না হইয়া, ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময়কার ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্য-বয়স্কদিগের এবং প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ত তাঁহার একাধিপত্যই ছিল; নব্য-বয়স্ক ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে ইঁহার তখন কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিতেছিলেন, তাঁহারও তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে তুলসীদাস প্রণীত বালকাণ্ড রামায়ণের বঙ্গানুবাদক স্বর্গীয় হরিমোহন গুপ্তের এবং নাটককার বাবু মনোমোহন গুপ্ত-কবির নিয়গণ।

বহুর নাম বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সুপরিচিত। শৈবোক্ত শ্রেণীর মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, সুধীরজন-প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী; দ্বিতীয়, বঙ্গের সুবিখ্যাত নাটককার বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং তৃতীয়, বঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার তিনজনেই তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র, তিন জনকেই উৎসাহ দিয়া কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তিনজনেরই বাল্যরচনায়, স্বল্পাধিক, গুপ্ত-কবির প্রভাব লক্ষিত হইবে। সে সময়, যিনি, যে পরিমাণে, গুপ্ত-কবির অল্পকরণে সক্ষম হইতেন, তিনি সেই পরিমাণে কবি বলিয়া সমাদর লাভ করিতেন। দ্বারকানাথ তিন জনের মধ্যে গুপ্ত-কবির অল্পকরণে সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী হইয়াছিলেন; তাঁহার কবিতাও সেইজন্য, সে সময়কার সমালোচকদিগের মতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল।*

* দ্বারকানাথ কুলসর্থ কলেজের, দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের, এবং বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদিগের বাল্যরচনাও প্রত্নিযোগিত। সখ্যে দ্বারকানাথের জীবনচরিত লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন। "দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, এবং বঙ্কিমচন্দ্র তিন জনেই প্রভাকরের কবিতা পছন্দ করিয়া। 'দ্বারকানাথ' 'হুমোয়কবি' নাম ধারণ করিয়া, 'দরবারীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামক

বক্শিমচন্দ্র, পরিণত বয়সে, ভিন্নশখগামী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছিলেন; অল্পবয়সে গভীরাচারকানাথের পক্ষে সন্মুখ অবসর ঘটে নাই; দীনবন্ধু, শেষ বয়সেও, “দ্বাদশ কবিতায়” এবং “স্বপ্নধূনী কাব্যে” ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের তিনজনের গ্রন্থ আরও কতজন যে, সে সময়, গুপ্ত কবির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। মৈম্বেরী (Mesmerism) বিজ্ঞানিৎ যেমন মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার সমকালীন বঙ্গীয় লেখকদিগকে, একদিন, সেইরূপ পরিচালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন জাতির সাহিত্য চিরদিন ব্যক্তিবিশেষেরই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিবে, প্রকৃতির নিয়মে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত সময়ে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অত্যাশ্রয় হইল; নিপুণতর ঐন্দ্রজালিকের গায় তিনি গুপ্ত-কবির মন্ত্রবল বিধ্বস্ত করিলেন। তাঁহার সময় হইতে বাঙ্গালা কবিতার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে।

সমাজে অধর্মের ও অসদাচারের প্রাবল্য হইলে যেমন ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাষার অবনতি হইলেও তাহার উন্নতির ও পরিণতির জন্ত, তেমনই, মধ্যে মধ্যে সংস্কারক লেখকগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মধুসূদনের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। বঙ্গভাষার সংস্কারের ও সমৃদ্ধিশাধনের জন্ত ইহাদিগের উভয়ের জন্ম হইয়াছিল। উভয়েই, স্ব স্ব বিজ্ঞা, বুদ্ধি, শিক্ষা এবং দেশকালগত রুচি অনুসারে, সে কায সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের উভয়ের কবিশক্তিতে অথবা রচিত কাব্যে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠিত কার্যের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। ভারতচন্দ্র

একটি কবিতা লিখিয়া প্রত্যেকে একটন করেন। ঐ কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ কবিত্বকে কিছু ব্যঙ্গোক্তি করা হয়। তাহাতে ঐ তিনজন কবি কবিতাবুদ্ধি করেন। উহা ক্রমাগত এক বৎসর কাল ‘কলেজীয় কবিতাবুদ্ধি’ বলিয়া প্রত্যেকের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুতীর জমিদার বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ কবিতাবুদ্ধি পাঠ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ দ্বারকানাথকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেন; কিন্তু প্রত্যেক সম্পাদক ঐ টাকা দ্বারকানাথের সম্মতিক্রমে তিন জনকে বিভাগ করিয়া দিয়া কবিতা বুদ্ধি নিবারণ করেন।” স্থায়ীভাবে সন্নিবিষ্ট দ্বারকানাথ অধিকারীর জীবন চরিত।

বাবু বক্শিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—“বাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) বিশেষ উৎসাহ দিতেন। কবিতা রচনার জন্য দানবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কখনও কলেজের ছাত্র, তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা প্রাণীটা কতকটা ঈশ্বরচন্দ্রের মত ছিল—নরল, বন্ধু, দেশী কথাই দেশী ভাবে তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে, যথেষ্ট হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।”

এবং তাঁহার অল্পকরণকারী কবিগণ, আদিরসের যে প্রাবনে, বঙ্গভাবকে পঙ্কিল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধারের জন্যই হাশুরসের অবতার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সে কাৰ্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অন্তের কথা দূরে থাকুক, অধিতীয় প্রতিভাশালী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও, ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া, কোন নূতন পথে গমন করিতে সঙ্কচিত হইয়াছিলেন।*

গুপ্ত-কবির কবিতার
বিশেষত্ব।

গুপ্তই কেবল, হাশুরসের সমাবেশ কবিতায় বঙ্গীয় পাঠকের রুচি পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল হাশুরস লইয়াও, মধুসূদনের পক্ষে চিরদিন, পরিতৃপ্ত থাকা সম্ভবপর নয়। জামাই যদী বা অরজুন, পিঠেসংক্রান্তি বা বড়দিন, পাটা বা তপস্বে মাছ সম্বন্ধে কবিতা আহাৰ্বেব সঙ্গে মুখরোচক “চাটনির” স্থায় চলিতে পাবে বটে, কিন্তু দেহরক্ষার জন্য অগ্ররূপ খাত্তের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনেব অভ্যুদয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গরস ভিন্ন যে আব কিছু ছিল না, আমরা তাহা বলিতেছি না; ব্যঙ্গরস-প্রধান কবিতাতেই তাঁহার প্রতিপত্তি বলিয়া একথা বলিতেছি। গুপ্ত কবির কাব্য যেখানে শেষ হইয়াছিল, মধুসূদনের কাব্য ঠিক সেইস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র, রায়গুণাকারের আদিরস-প্রধান কবিতার প্রাধান্ত বিলুপ্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের বচনাও অঙ্গীলতা-বর্জিত ছিল না। বিসৃদ্ধ রুচির অভাবে, সমকালপ্রাসের প্রাচুর্য এবং অর্থহীন শব্দ-বিশ্রাস-প্রিয়তার জন্য, গুপ্তকবির “প্রতিভা প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন” হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, তখন, বঙ্গদেশে এমন এক জেগীর পাঠক আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে, গুপ্ত-কবির কবিতায় তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত-কবির কবিতার সমালোচনাস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর হইতে “খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালির মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না।*** মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি—ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এমন আর খাঁটি বাঙ্গালি জন্মে না—জন্মিবার বো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার কিরিয়া অবনতির পথে না গেলে, খাঁটি বাঙ্গালি কবি আর জন্মিতে পারে না।”

* এইরূপ কথিত আছে যে, রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালা ভাষায় একখানি কাব্য রচনার আশায় বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারিব না বলিয়াই, জ্বালাতে নিরন্ত হইয়াছি।”

যাত্রাক হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ১৫২

পাশ্চাত্য শিক্ষারই গুণে যে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এই “খাটি বাঙ্গালি” কবির
 তিরোধান ঘটয়াছে, তাহা বলা অতিরিক্ত। অভাব অল্পসারেই সৃষ্টি।
 পাশ্চাত্য শিকা বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে যে অভাব উৎপাদন করিয়া দিয়াছে,
 আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ তাহাই পূরণ করিতেছেন। গুপ্ত-কবির সময় হইতে
 এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বল্পাধিক
 পরিমাণে, পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত। মধুসূদন ইহাদিগের সকলের অগ্রবর্তী
 ও পথপ্রদর্শক। গুপ্ত-কবির সময় হইতেই এই পরিবর্তন যুগের সূত্রপাত
 হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু
 ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া, তিনি অনেক ইংরাজী কবিতার
 মর্ম অবগত ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষা প্রচলনের সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের উপর
 যে একটি নূতন শক্তি কাঁধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে
 তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; এবং নিজেও, কিয়ৎপরিমাণে
 সে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার “সর্ববাদী-সম্মত স্তোত্র”,
 “প্রণয়ের প্রথম চুষন” প্রভৃতি কবিতা, (“Universal Prayer”, “First Kiss
 of Love”) ইত্যাদি ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত কবিতার আদর্শ ও
 অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে আলোক, মাধ্যাত্মিক
 হৃদয়কিরণ-সদৃশ প্রভায় মধুসূদনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রে তাহার

ঈশ্বরচন্দ্র ও
 মধুসূদন।

প্রথম রশ্মি নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রে, পাশ্চাত্য
 ভাবের প্রতিবিম্বন হইলেও, প্রাচ্য ভাবেরই প্রাধান্য
 মধুসূদনে ঠিক ইহার বিপরীত। ঈশ্বরচন্দ্রে এক যুগের শেষ

মধুসূদনে অপর যুগের সূত্রপাত। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ ছিল, প্রাচ্য ও
 পাশ্চাত্য উভয় ভাবের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত একজন কবি, উভয়ের সংযোগ
 হেতুক্রমে, তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রণেতা, স্বর্গীয়
 বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন উভয়েরই সহিত ইহার
 নিষ্ঠতা ছিল। ইনি একের শিষ্য, অপরের স্নেহদ। রঙ্গলাল বাবুর কবিতায়
 ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট বর্তমান রহিয়াছে; মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী, স্মরণ্য।

* গুপ্ত কবির কবিতার অঙ্গীকৃত্যের প্রমাণে বহিঃসাক্ষ্য এইটুকু লিখিতাছেন: “ঈশ্বরচন্দ্র
 গাবও পীড়ন” এবং তর্কবাণীশ (দেবীপদ) “রসরাজ” অবলম্বনে কবিতাবুদ্ধি আরম্ভ করেন।**
 ই কবিতাবুদ্ধি যে কি ভরানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুদ্ধিগা উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবন
 ই। সৈবানী আদি এক সংখ্যা হাজ “রসরাজ” একদিন দেখিয়াছিলেন। চারি পাঁচ ছন্দে
 শি আর পড়া গেল না। বহুভাষা এত কথায় হইতে পারে, ইহা অনেকেরই জানেন না।”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রকাশিত “জীবনচরিত” ৩৪ পৃষ্ঠা

মধুসূদনের প্রভাব তাঁহার উপর তাদৃশ প্রসারিত হয় নাই। কিন্তু অরুণ ধেমস্বরের আবির্ভাব সূচনা করে, তিনিও তেমনই বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের স্থান একজন যুগ-প্রবর্তক কবির আবির্ভাব সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার “পদ্মিনী উপাখ্যান,” “কর্মদেবী” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ও নব্য রীতির সংমিশ্রণে রচিত কাব্যের অত্যাৎকষ্ট নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শেষ বয়সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রত্নলাল বাবুর “পদ্মিনী-উপাখ্যান” এবং তাহার পর মধুসূদনের গ্রন্থাবলী ঘির্মনযোগের সহিত পাঠ করিলে, তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে, জীব-জগতে ধেমস্বরের ক্রমপারগতি অনুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব হয়, মানসিক জগতের বিকাশক্ষেত্র সাহিত্যেও, তেমনই, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর কাব্য, ইতিহাস বা দর্শন-শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া থাকে।

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তাঁহার হ্রাস একজন কবির আবির্ভাবের জন্ত কিরূপ প্রস্তুত ছিলেন, আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিয়াছি। স্বদেশের কল্যাণজনক অগ্রাগ্র প্রতিষ্ঠানের হ্রাস, স্বদেশীয় সাহিত্যেরও সমৃদ্ধিসাধন করিয়া, তাহার জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, তাহাদিগের ব্রত অতি মহৎ। এই মহাব্রত সম্পাদনের জন্তই বিধাতা, মধুসূদনকে উপযুক্ত সময়ে মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি তাহাকে কিরূপ প্রতিভা ও শান্ত দান করিয়াছিলেন, নিজের শক্তির ও সামর্থ্যের উপর তাহার কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্ত তিনি কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্বে সে সকল কথা আলোচনা করিয়াছি। মাদ্রাজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ছিল না। কলিকাতায় উপস্থিত হইবার পর তিনি, কিরূপে সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমে মধুসূদনের নিজের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। মধুসূদন যখন কলিকাতায় প্রত্য-
গমনের পর মধুসূদনের তিনি একবারেই নিঃসহায় ও নিঃসমর্থ। কলিকাতার হ্রাস অবস্থা।

বহুজনপূর্ণ নগরীতেও তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। পৈত্রিক ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মীয়, বন্ধুগণের নিকট পরলোকগত বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাঠাকুর মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জাতিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা গ্রাস করিয়া বলিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার কথা বিশ্বাস হইয়াছিলেন;



রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

কেবল, তাঁহার চিরনিষ্ঠ হৃদয় গোরদাস বাবু তাঁহার কথা বিশ্বত হইতে পারেন নাই। আট বৎসরের পর সাক্ষাতে তাঁহাদিগের উভয়ের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা নিম্নয়োজন। গোরদাস বাবুর চেষ্টায়, মধুসূদন তাত্‌কালিক পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বগীয় বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে একটি কেরাণীগিরির কার্য প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তথাকার ভাষান্তরকারীর (Interpreter) পদে উন্নীত হইলেন। সংবাদপত্রে লিখিয়াও কিছু কিছু আয় হইত। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা, মধুসূদনের জায় ব্যক্তির পক্ষে, সকল সময় নিরাপদ ছিল না। একবার Citizen নামক একখানি পত্রিকায় কলিকাতার কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক, মধুসূদনের নাম প্রকাশ না করিয়া, স্বয়ং অন্তর্ধান করাতে মধুসূদন সে যাত্রা নিষ্ফল লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা সধক্ষে সেই অবধি তাঁহার বিরাগ জন্মিয়াছিল। পুলিস আদালতের কার্য এবং জাতিগণের হস্ত হইতে পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার তখন মধুসূদনের প্রধান কার্য হইল। সাধারণের অজ্ঞাত এবং অপরিচিত ভাবে তাঁহার দিন গত হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহাকে অধিক দিন এভাবে জীবনযাপন করিতে হয় নাই। সেই সময় বঙ্গদেশে এমন একটি কাণ্ড নূতন পথে লক্ষ্য।

অহুষ্ঠিত হইল যে, মধুসূদনের ভাবী-জীবনের পথ তাহা দ্বারা পরিকৃত হইল, এবং তিনি আপনার বিধি-নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। অহুষ্ঠানটি কি, পরবর্তী অব্যাহে, পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ

[১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

৮

ইংরাজাধিকারে আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত লুপ্ত-রত্ন পুনর্বীর প্রাপ্ত

ইংরাজাধিকারে
নাট্যশালার
পুনরুদ্ধার।

হইতেছি, জাতীয় নাট্যশালা তাহার মধ্যে অন্ততম।

যাহারা মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের সাহিত্য আলোচনা
করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, তাহাতে জাতীয়
গৌরবের উপযুক্ত একখানিও নাটক নাই। কিন্তু

মুসলমানদিগের আগমনের বহুদিন পূর্বে, ভারতবর্ষে, নাটক রচনার এবং
নাটকান্ধিনয়ের একরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, বোধ হয় এক গ্রীক জাতি
ভিন্ন অপর কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে সেরূপ হয় নাই। জাতীয় গৌরব ও
জাতীয় নাট্যশালা, এক সময়েই, ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজার
অমুরাগ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত না হইলে, কোন স্কুমার কলারই ত্রীবৃদ্ধি হয় না।
দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ সৃষ্টিকার অভাবে, এবং তাঁহাদের
ধর্মশাস্ত্রের নিষেধবশত: নাট্যমোদের অমুরাগী ছিলেন না। তাঁহাদিগের
ঐদাসীন্ত দীর্ঘকাল অবধি ভারতীয়, নাট্যশালার উন্নতির প্রতিকূলতা
করিয়াছিল। বহুশত বর্ষব্যাপী পরাধীনতায় ও নিধাতনে হিন্দুসন্তানগণও
ক্রমশ: ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছিলেন। বঙ্গভূমি জাতীয় ক্ষুণ্ণতার ও সজীবতার
লক্ষণ। এই উভয়ের অভাব ঘটিলে, আমোদাহুসঙ্গী নাট্যশালার ও বঙ্গভূমির
অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্তই আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানাধিকৃত
ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রচারক, উৎকৃষ্ট দার্শনিক এবং উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা-লেখক
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও উৎকৃষ্ট নাটককার জন্মগ্রহণ করেন নাই।
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শ জাতীয় জীবনে আবার নূতন ক্ষুণ্ণতার সঞ্চার করিতেছে;
হয়ত আবার শকুন্তলা ও উত্তর-রামচরিত রচনার দিন আসিতে পারে।

যদিও ভারতবর্ষে, অতি প্রাচীনকালেই, নাট্যশালার অমুরাগীলন আবহ

নাট্যশালা
প্রতিষ্ঠা।

হইয়াছিল, তথাপি বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পদিন মাত্র

নাটক-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালী কাব্যে,

ব্যাকরণে ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন,

কিন্তু নাটক রচনার উপযুক্ত মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রণের শক্তি লাভ করিতে পারেন

নাই। বাঙ্গালা দেশের গৌরবের উপযুক্ত একমাত্র প্রাচীন নাটককার, ডক্টরারায়ণ, প্রকৃত বাঙ্গালী নহেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের দ্বায় জাতীয় নাট্যশালারও অভ্যুদয় ইংরাজাধিকারে হইয়াছে। ইংরাজসমাজ চিরদিনই নাট্যমোদের অল্পরাগী। আফ্রিকার শাপদপূর্ণ বনভূমিতে হউক, আর উত্তর-মেকুর চিরতুবারাবৃত প্রদেশেই হউক, যেখানেই দশজন ইংরাজ আছেন সেখানেই তাঁহাদিগের জন্ত একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, সমুদ্রবন্ধবাহী অর্ণবপোতেরও উপর তাঁহাদিগের অভিনয়-ক্রিয়ার বিরাম হয় না। এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের নুত্নপাত হইতেই তাঁহারা নাট্যশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখন যে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এতগুলি দেশীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বর্ষে বর্ষে, সেই সকল নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্ত, শত শত নাটক, নাটিকা প্রকাশিত হইতেছে ইংরাজী-শিক্ষার প্রচার এবং ইংরাজ সমাজের সহিত সংস্রবই তাহার কারণ। কলিকাতায় ইংরাজদিগের দ্বারা প্রথমাবস্থায় যতগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাব মধ্যে সঁসস'ছি (Sans-Soci) নাট্যশালার নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।* সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হিমান্ উইলসন্, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টোকুলার (Stocquer), বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী H. M. Parker, বোর্ডের মেম্বর টরেন্স (Torrens) এবং ব্যারিষ্টার হিউম (Hume)† প্রভৃতি সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন। এই নাট্যশালায় গমনাগমন হইতে সে সময়কার দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও, কাহারও হৃদয়ে নাটকভিনয়ের প্রতি অল্পরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল; এবং তাহার কলে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা শ্রামবাজারস্থ বাবু নবীনচন্দ্র বসু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহার বাটিতে

কয়েকবার বিভ্রান্তির নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র বসুর বাটিতে
বিভ্রান্তির নাটক
অভিনয়।

আধুনিক রীতি অনুসারে বিচার করিলে নবীনবাবুর বাটির
অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণ নাটকোচিত হয় নাই। তাহাতে

প্রত্যেক দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে একজন অভিনেতা সেই

দৃশ্যের সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করিয়া দর্শকদিগকে শুনাইতেন।

* সঁসস'ছি প্রতিষ্ঠার আরও পূর্বে চৌরঙ্গী থিয়েটার নামক একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের বড় বাতায়ানত ছিল না। দারকানাথ ঠাকুরের ভায়রুই একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ব্যক্তি তাহার, কখন কখন উপস্থিত থাকিতেন।

† ইনি পরে কলিকাতার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে দর্শকদিগকেও রক্ষভূমিতে স্থান পরি-
বর্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট স্বাম্বর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য
দর্শকদিগকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র স্থানে বাইতে হইত। তথায় তাহাদিগের জন্য আসন
প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েরই অসুবিধা হইত। কিন্তু
এই সকল ক্রটি সবেও, দৃশ্যপটের সমাবেশ, অভিনেতৃগণের সঙ্গে অভিনেত্রীগণের
প্রবর্তন এবং নাটকোচিত বাক্য-বিশ্রাস ও ভাবভঙ্গী প্রভৃতির জন্য, বিজ্ঞানন্দর
অভিনয়কেই বঙ্গদেশের প্ৰথম নাটক অভিনয় বলা খাইতে পারে। নবীনবাবুর
বাটির অভিনয় কাষ দুই তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং নবীনবাবু তজ্জন্ম যথেষ্ট
পরিশ্রম ও অপখাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এদেশে, সে সময়ে, যাহা কিছু
সম্ভবপর, নবীনবাবু তাহার কোন বিষয়েই এটি কবেন নাট। তাহাব বাটিব
বিজ্ঞানন্দর-অভিনয় হইতেহ বঙ্গীয় দর্শকগণ, প্রথম, নাটক অভিনয়েও আস্থা
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাঁহুছি থিয়েটার এবং বিজ্ঞানন্দর অভিনয় হইতে বঙ্গীয় দর্শকদিগের হৃদয়ে

হিন্দুকলেজে কাপ্তেন
রিচার্ডসনের এবং
ওরিয়েন্টাল সেমি-
নারীতে হার্মান
জেফ্রয়ের প্রদত্ত
শিক্ষার ফল।

যে নাট্যাঙ্গুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, অমুকুল ঘটনাবলীতে
তাহা আবও অধিক ক্ষুধিতলাভ করিয়াছিল। ইহাদিগেরই
সমকালে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দুকলেজে
প্রবেশ কবেন। নাট্য-শাস্ত্রে তাহাব একরূপ অভিজ্ঞতা ও
অঙ্গুরাগ ছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানন্দ্রে অধ্যাপনার সময়ও তিনি অভিনেতাব ন্যায়
আকৃষ্টি করিতেন। অভিনয় করা তাহাব একরূপ প্রিয় ছিল যে, তাহার কোন
ছাত্র তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাইলে তিনি তাহাকে থিয়েটারের টিকট দিয়া
বলিতেন, “আশা করি তুমি আজ থিয়েটার দেখিতে বাইবে।” তাহার ন্যায়
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেও অবসরলব্ধ ব্যারিষ্টার হার্মান জেফ্রয় (Hermann
Jeffrey) নামক একজন নাট্যাঙ্গুরাগী অধ্যাপক ছিলেন। রিচার্ডসনের ন্যায়
তিনিও বাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ে নাটক অভিনয়ের প্রতি অঙ্গুরাগ উদ্দীপিত হয়
তজ্জন্ম চেষ্টা করিতেন। হিন্দুকলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী তখনকার
কলিকাতার সম্রাটবংশীয় বালকদিগের প্রধান শিক্ষাব স্থল ছিল। রিচার্ডসনের
ও জেফ্রয়ের উপদেশে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে অভিনয়ান্গুরাগ বক্ষমূল
হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহারা বেলগাছিয়া নাট্যাঙ্গালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দুকলেজের ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্র ছিলেন।

নবীনবাবুর বাটির বিজ্ঞানন্দর অভিনয় দর্শন করিয়া অনেকে পরিতুষ্ট

হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভিনীত নাটকের অসীলতাব জন্ত, সকল সম্প্রদায়ের

বিশেষতঃ ইংবাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়েব তাঙ্গ সম্পূর্ণ
বাঙ্গালা নাটকের প্রীতিকর হয় নাই। তখন বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়োপ
অভাবে ইংরাজী যোগী নাটক ছিল না। বিষয়মূল ও ভদ্রাজুর্ন প্রভৃতি যে

দুই একখানি নাটক নামে পরিচিত গ্রন্থ ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত নাটক বলা যাউতে পারে না। ইহাদিগেব মধ্যে ভদ্রাজুর্ন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ইহলেও তাহাতে মক ৭ গর্ভাক ছিল না। অভিনেতাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং দৃশ্যপটের পরিবর্তন প্রভৃতি নাটকীয় অঙ্গ সকল তাহাতে স্থাবরীতি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ইহাব ভাষাও এরূপ কদম্ব ছিল যে, পাশ্চাত্য নাটকসমূহেব বসান্বানে অস্বাভাবিক ব্যক্তিগণেব পক্ষে সেরূপ নাটকেব অভিনয় কখনই তুপিজনক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। স্তববাং অভিনয়োপযোগী বাঙ্গালা নাটকেব অভাবে কলিকাতাব অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নিজ নিজ গৃহে ইংবাজী নাটকেরই অভিনয় কবাহতে লাগিলেন। একবাব খ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহাব শুভোব উত্তানে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস ডিমান উইলসনকৃত উত্তরবামচবিত্তেব ইংবাজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। উইলসন নিজে সেই অভিনয় কায়েব অব্যাক ছিলেন এং অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র, বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও হবিহর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজের অনেক স্তবোগ্য ছাত্র তাহাতে অভিনেতাব কায় করিয়াছিলেন। উত্তররামচরিত অভিনয়ের পর ডেভিড্ চেম্বাব একাডেমী নামক এক বিদ্যালয়ে মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস ও জুলিয়াস সিভায় অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কতকগুলি ভূতপূর্ব ছাত্রের উদ্যোগে তাহাদিগের বিদ্যালয়গৃহে, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামক একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(Mr. Clinger) মিটার ক্লিনার নামক সাঁহুছি থিয়েটারের ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার।

জনৈক স্তবদক্ষ অভিনেতা তাহাতে নাট্যোপদেশ দিতেন। এই থিয়েটারে ওথেলো ও মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস অভিনীত হইয়াছিল। (Mrs. Greig) মিসেস্ গ্রেগ নাম্নী সে সময়কার একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তাহাতে (Portia) পোর্সিয়ার অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পর বংসর পরি-
য়েণ্টাল থিয়েটারে (Henry IV) হেনরী ফোর্থের প্রথমংশ অভিনীত হয় ; কিন্তু, নানা কারণে ইহার অহুষ্ঠাভাগণ বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় সুবিধাজনক মনে না করায়, তথায় কোন বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হয় নাই।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কিন্তু তাহাতে

ও তাহার আদর্শে অন্ত ছুই এক স্থানে, যে সকল নাটকাভিনয় হইত, তাহাতে কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পরিতোষ লাভ করিতেন। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে রঙ্গভূমির সজ্জা, দৃশ্যপট, অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণের বেশভূষা ও ভাবভঙ্গী দর্শনমাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে হইত। এইরূপে কিয়ৎ-কাল অতীত হইবার পর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারেব ছইজন অভিনেতার উত্তোগে, চড়কভাঙ্গাহু জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটিতে

কুলীন-কুল-সর্বস্ব, শকুন্তলা, ধৌলমহার এবং বিক্রমোর্ধ্বা নাটক অভিনয়।

দ্বিতীয়।

দ্বিষস কলিকাতাও তৎকালীন প্রসিদ্ধ পর্নী, খ্যাতনামা বাবু আশুতোষ দেবের (ছাত্তুবাবুর) বাটিতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সেই বৎসর মহাভারতের লক্ষপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও তাঁহার বাটিতে বেণীসংহাৰ নাটক অভিনয় কবাইয়াছিলেন। বেণীসংহাৰ অভিনয়ের আট মাস পরে, সিংহ মহোদয়ের বাটিতে সমধিক সমারোহের সহিত তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্বশী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজে তাহাতে একজন অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয় কাৰ্যও এক্ৰপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, কলিকাতাব নিমন্ত্ৰিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং ভারত গবৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বিডন সাহেব (পবে সাব সিসিলি বিডন) পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে অভিনয় ক্রিয়ায় প্রশংসা কবিয়াছিলেন।* ইহাব পূৰ্বে কলিকাতায় যে কয়বার ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত নব্যগণই কেবল তাহার রসাস্বাদ কবিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কুলীন-কুল-সর্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহাৰ এবং বিক্রমোর্বশী অভিনয় হইতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নব্য, প্রাচীন, সকলেই নাটকভিনয়ের রসাস্বাদে সমর্থ হইলেন। কলিকাতায় একটি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং যাত্রা, চাক্-আখড়াই, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত আমোদ, প্রমোদ সম্বন্ধে নব্য সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিতৰ্কা জয়িল।†

* সূত্রসিদ্ধ কারিগর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে অভিনেতা ছিলেন।

† প্রচলিত বাজা, হাক, আছড়াই ইত্যাদির সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ হইরাছিল, তাহা নাটককার বর্ণীর রামনাথায়ণ তরুর প্রণীত বঙ্গাবলীর ভূমিকা হইতে নিম্নোক্তরূপে জান পাঠ করিলেই প্রতীপন্ন হইবে। তরুর বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন, “সমস্ত সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটক সমূহের অভুতলা রসনাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত স্থিতি বাজানিতে সকলেরই সম্মতি অপ্রত্যা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হ্রবাকর বিন্যস্ত ব্রহ্মাবারের

আন্ততঃ বাবুর বাটিতে শকুন্তলা অভিনয়ের সময় কলিকাতার অগ্রান্ত
নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা
হারী নাট্যশালা ঈশ্বরচন্দ্র এবং বাবু (একগণে সার মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন
সংস্থাপনের প্রস্তাব, বেলগাছিয়া নাট্যশালা ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নাটকের রসান্বাদ
করিয়া ইঁহার পূর্ব হইতেই নাট্যকাভিনয়ের অমুরাগী হইয়া-

ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট
প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, “দেখুন, দুই এক দিনের আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করিয়া
স্বায়ীভাবে একটি নাট্যশালা সংস্থাপন করিতে পারিলে বোধ হয় অধিক উপকার
হয়।” রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ইহার পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের উত্তোগী
ছিলেন; সুতরাং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের এই প্রস্তাব তাঁহার এবং তাঁহার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রতাপচন্দ্র উভয়েরই বিশেষ মনঃপূত হইল। তাঁহাদিগের
স্বন্দগণও সকলেই এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছু-
দিন পূর্বে রাজারা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেলগাছিয়ায় স্থায় উত্থান ক্রম
করিয়াছিলেন। নাট্যশালা তথায় নির্মিত হওয়া স্থির হইলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র
স্বয়ং নাট্যশালা নির্মাণের এবং আভুযুক্তিক সমস্ত আয়োজন সংগ্রহের ভার গ্রহণ
করিলেন। মহাসমারোহে অভিনয়ের সমস্ত উত্তোগ হইতে লাগিল। “জাতীয়
নাট্যশালার সঙ্গে জাতীয় একতান-বাদনও সংগঠিত হওয়া কর্তব্য”, মহারাজা
যতীন্দ্রমোহনের এইরূপ প্রস্তাবে এবং সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির
যত্নে ইংরাজী রীতির অনুকরণে, একতান-বাদন-সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইহাই

বঙ্গদেশের প্রথম একতান-বাদন-সম্প্রদায়। এইরূপে, অল্প
একতান-বাদন-সম্প্রদায় দিনের মধ্যেই অভিনয়ের উপযোগী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত
গঠন।

হইয়া আসিল। বঙ্গভাষার নাটকের অবস্থা তখন কিরূপ
ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিনয়ের উপযোগী অগ্রান্ত
আয়োজনের সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অমুঠাভূষণ বাঙ্গালা ভাষায়
একখানি স্ক্রুটি-সজ্জত নাটক প্রণয়ন করাইবারও উত্তোগী হইলেন। ইহার কিছু
দিন পূর্বে সংস্কৃত কলেজের স্বেচছা ছাত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন* মহাশয় কুলীন-
কুল-সর্বস্ব নাটক রচনা করিয়া রঙ্গপুরের জমিদার বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর

* ইনি পরে নাটক রচনার ক্ষেত্রে “বাইকে বারাগ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
কুলীন-কুল-সর্বস্ব, রত্নাকরী, নবনাটক, ধর্মবিজয়, কল্পিতবরণ, বৈদ্যসংহার, শকুন্তলা, প্রভৃতি অনেক-
গুলি তৎকালপ্রসিদ্ধ নাটক ইঁহার প্রণীত।

† বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছা করিয়া, যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আবাদিগের জাতীয়ভূক্ত-
তার পাত্র হইয়াছেন, ইঁহার নাম তাঁহাদিগের নামের সঙ্গে প্রসিদ্ধ হইবার উপকূল। রত্নাংলার
বাবুর পঞ্জিলী-উপাখ্যান ইঁহার এবং বঙ্গীয় রাজা সজলরণ বোবালের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল।

প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তি বোধে তাঁহাবই উপর নূতন নাটক রচনার ভার অর্পিত হইল। রাজাদিগেব অনুবোধে পণ্ডিত বামনারায়ণ শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত বহুবলী নাটিকা অবলম্বন কবিত্তা, একপাশি নাটক প্রণয়ন কবিলেন। কনিবব ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু বহুবলী নাটক।

বাবু গুরুদয়াল চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সে সময়কার একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি বহুবলীর জন্ত কয়েকটি তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলেন।

অভিনয়ের সময় আয়োজন ঐকরূপ সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু এক বিষয় তখনও পক্ষ অজ্ঞান বহিল। রাজাদিগেব উভয় পাতাব তৎকালীন বলিকাতা সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্ব্যের অর্নিপত্ত ৩৭° সানাবণেব হিতকর অন্তষ্ঠানসমূহেব উৎসাহদাতা বলিয়া বাজপুকষেরা তাঁহাদিগকে বারংবার সম্মান কবিতেন। তন্মিত্ত ইংরাজ, পাবসী, ইত্যাদি পণ্ডিত সকল সম্মাদায়েবই লোকদিগেব সহিত তাঁহাদিগেব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যাশালাব অন্তষ্ঠানেব কথা শুনিয়া তাঁহাদিগেব মনো অনেক অভিনয় দর্শনেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিত্তা-ছিলেন। এত অর্থ ব্যয় কবিত্তা তাঁহাদিগেব নিমন্ত্রণ কবা হইবে ন, এবং কবিলেও বাজালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশত। তাঁহাব অভিনয়েব বসান্বাদ কবিত্তে পারিবেন না, এই ভাবিয়া বাজাবা স্থির কবিলেন যে, বহুবলী ইংবাজীতে অনুবাদিত কবা হইয়া অভিনয়ের সময় বাজালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদিগকে এক এক গুণ প্রদান কবিতেন। শুদ্ধকণেই তাঁহাদিগেব ক্ষময়ে এইরূপ সঙ্কল্প উদ্ভিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগেব সেই সঙ্কল্প হইতেই মধুসূদনেব ভবিষ্যৎ জীবনে পথ পরিষ্কৃত হইল।

কলিকাতাব অন্ত্রাণ অনেক সদাও গৃহের যুবকদিগেব নাম বাবু গোবদাস বসাক ও বেলগাছিয়া নাট্যাশালাব একজন প্রধান উদযোক্তা ছিলেন। মধুসূদন তখন যাত্রাজ হইতে প্রত্যাগমন কবিত্তা

বহুবলীর চরিত্র
অনুবাদ।

পুলিস আদালতে কার্য কবিত্তাছিলেন বহুবলীর ইংবাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে গোবদাস বাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবাব প্রস্তাব কবিলেন। মধুসূদনেব নাম বেলগাছিয়া নাট্যাশালাব অন্তষ্ঠাতৃগণেব অবিত্তিত ছিল না। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নাবস্থা হইতেই ইংবাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল, এবং কাপটিভ্ লেডী হইতে অনেকেই তাঁহার ইংবাজী ভাষার উপর অসাধারণ অধিকায়েব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আত্মাদের সহিত গোবদাস বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং



রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

মধুসূদনের উপর রত্নাবলীর অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন। এই হইতে রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল।* কবিশক্তির জ্বালায় সরস কথোপকথন-

* মধুসূদনের জীবনের সহিত ইঁহাদিগের জিনজনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইঁহাদিগের সাহায্য, উৎসাহ এবং অনুপ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন, তাবুশ অল্পদিনের মধ্যে, সেরূপ প্রতিভা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবনচরিতে ইঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। আমরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটি কথা বলিয়াই নিরন্তর হইয়া। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম এক্ষণে বঙ্গের বঙ্গের শিক্তি ব্যক্তি মাত্রেই পরিচিত। কিন্তু অনেকে কেবল তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং বঙ্গের দ্বিতীয়া রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক সময় কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে একজন কিরূপ গুণগ্রাহী ম্পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদনের জীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রাজালা সাহিত্যে স্বাভাবিকতার প্রবর্তন করিয়া যখন মধুসূদন প্রাচীনত্ব পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার সাহিত্য-শত্রু স্থানীয় করিয়াছিলেন, ইনি এবং ইঁহার জ্বালায় আরও দুই চারিজন ব্যক্তিই তখন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। উপযুক্ত হলে পাঠক ইঁহার সন্মততার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লাল বাবুর বংশধর। অল্পবয়সে পরলোকগমন করিতে ইঁহাদিগের নাম ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য ইঁহাদিগের নিকট এক সময় যে কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহাদিগের বদান্ততার সীমা ছিল না। সে সময়কার এমন কোনও সমসুষ্ঠান ছিল না, বাহ্যতে ইঁহারা অর্থ সাহায্য না করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাধারণের হিতকর যে কোনরূপ অনুষ্ঠানই হউক, সকল শুভ কার্যেই ইঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার সভা এক সময় ইঁহাদিগের অর্থসাহায্যে জীবিত ছিল। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের অরোয়ালীদিগের আবাস প্রধানতঃ ইঁহাদিগেরই ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তজ্জন্ত পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। বিভাগস্বর মহাশয়ের উদ্যোগে সংস্থাপিত* সে সময়কার বালিকাবিদ্যালয় সমুহের উন্নতিসাধন কার্যে তাঁহারা প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষা তখন এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ছিল : রাজা প্রতাপচন্দ্র আপনার দুহিতার জন্য শিক্ষারিণী নিয়োগ করিয়া এ সম্বন্ধে প্রথম পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্তও তিনি প্রচুর ব্যয় ও অপব্যয় অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার নিকট বখেই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে যে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহা হইতে ইঁহাদিগের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন :—

"Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national theatre." যদি কখনও ভারতবর্ষে আবার নাট্যশাস্ত্রের জীবন হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আমাদের তাত্ত্বিক নাট্যশালায় প্রথম স্ফূর্ত এই মহানুভব ব্যক্তিগণকে বিস্মৃত হইবেন না। (শ্রীমতি নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা)।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছিলেন :—“আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দর্শন-কাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর কতি হইয়াছে, তাহা দর্শন-কাব্য-প্রিয় মহাশয়গণের অবিস্মৃত নহে। আমি এই ভরসা করি যে, মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অজান্ত মহাশয়েরা ব্রতবান হন। এই কাব্য বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় যে আমাকে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কোন প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিলেন।” কৃষ্ণমারীর উপসর্গ পত্র।

শক্তিতেও মধুসূদন অধিতীয় ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, পাণ্ডিত্যে বাকপটুতায় এবং রহস্তনৈপুণ্যেও তিনি তাহার প্রাণ-স্বরূপ হইতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অহুষ্ঠাভাগিণের প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন। তাঁহার কৃত অন্ত্যবাদ সকলেরই মনোনীত হইল। রাজারা নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করাইলেন এবং মধুসূদনকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচশত টাকা দিলেন।

এইরূপে অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের একত্রিশে জুলাই, রত্নাবলী প্রথমবার অভিনীত হইল। প্রথম দুই-রত্নাবলী-অভিনয়।

বারের অভিনয়ে কেবল বাঙ্গালী দর্শকগণই উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বারের অভিনয়ে বাঙ্গালী দর্শকদিগের সঙ্গে ইংরাজ, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্তা সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলেই অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশে আর কখনও এরূপ ভাবে কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। অভিনয়-ক্রিয়া কিরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার দর্শক ও অভিনেতাগণের মধ্যে যাহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, “সেইরূপ অহুষ্ঠান ইহার পূর্বে বঙ্গদেশে কখনও হয় নাই। তানলয়বিজ্ঞ সঙ্গীত, সূচ্যাক দৃষ্টগট, সূক্ষ্মচিস্তার বোধভূমি এবং সর্বোপরি স্বভাবানুযায়ী অভিনয় বাহা কিছু দর্শককে শ্রীত ও বিমুগ্ধ করে, তাহার সকলেরই সেখানে আয়োজন হইয়াছিল। অর্থে ও পরিশ্রমে বাহা সম্ভবপর তাহার কিছুই সেখানে ক্রটি হয় নাই। বঙ্গীয় দর্শকের সমক্ষে যেন এক অভিনব অগ্নয় রাজ্য অবতরিত হইয়াছিল।” অভিনয় ক্রিয়ার সাক্ষী হিন্দুকলেজের একজন অধ্যাপক ছাত্র, এ সম্বন্ধে আমাদেরকে বাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহা হইতেও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন; * “একেইত নাট্যশালা সর্বাঙ্গসুন্দর,

* স্বদেশীয় নাট্য-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য রাজা দ্বৈরচন্দ্রের কিরূপ প্রাণ অমুরাগ ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বেলগাছিয়া থিয়েটারের সময়ের লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম পত্রখানি বাবু গৌরধাস বসাককে লিখিত; গৌরধাস বাবু একদিন কোন কারণে অভিনয়ভাঙ্গাস হলে উপস্থিত হইতে না পারাতে রাজা দ্বৈরচন্দ্র তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

তাহার উপর অবচেত্রে বতব্বর মনোরম হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রত্নাবলীর শোভা ইজ্রালয়ের জায় হইয়াছিল, একথা বলিলেও অভ্যক্তি হইতে

11 P. M. 11th July, 1858.

After the Rehearsal.

My dear Gour,

I am really astonished at your conduct. You are the friend who is determined to put me to shame, not only before the Amateur Company, with which we have identified ourselves, but before the audience that we expect on the night of the performance. Barring yourself, there is not a single individual who trifles or absents himself from the stage on the Rehearsal night. If you are unwilling to be the fool of an actor (for there are some who really think Amateur Actors to be fools, if not vagabonds) why not say that plain and plump? You must know that after so much trouble, anxiety, expense and what not, I am not the man to abandon the idea or throw the theatre and all to the dogs. No, call me fool or vagabond or by any name you wish, I am not so silly as to relinquish one of my favourite hobbies, the drama. I am in right earnest and must perform my part, and have the play acted out, notwithstanding the difficulties friends like you put in the way. Now be plain once for all, and tell me that you will not absent yourself again.

I shall have every thing ready by Thursday next, as we appear publicly on the 19th instant.

Your sincerely,

Issur Chandra Singh.

P. S The next Rehearsal takes place on Tuesday, the four acts will be rehearsed.

অপর পত্রখানি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উৎপত্তি ও রত্নাবলী-অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠক তাহা হইতে অবগত হইতে পারিবেন।

My dear Kesub,

I have put Kanchanmala on his (her) legs again. He or she (as you may choose to call) is all right; hale and sound; and is perfectly willing to appear on the stage to-morrow. But alas! a strange fatality hangs about Rutnabullae. Altho' not a firm believer in astrology I am half inclined to believe that we commenced at a time when some strange stars were on the ascendant, whose principal qualities seem to be to throw all sorts of obstacles on the progress of the works under their influences. You might say it is impossible, but I will prove it, and before positive proof every objection must give way. Now first of all three or four years ago when you all quarrelled with the proprietor of the Oriental Seminary we all proposed to have a native drama written out and acted; and such was our earnestness in the cause that we all asked you to select and hire a site, and a native gentleman was asked either for the loan or hire of his premises. Some how or other the subject dropped here and was never thought of more till a year and half ago, when we found some youngsters

getting up a representation of a native drama. At this time a consultation was held, and after much discussion the Rutnabullee was fixed upon as the best drama or one of the best dramas that our Sanskrit could boast of. Then again came the difficulty of finding a man, who with a thorough knowledge of language would combine a dramatic talent. This man was at last found. Some time before this the Koolin-Koolashurbosso had acquired a just and well merited fame, and the author was pitched upon as the only pundit, who, with a good knowledge of Sanskrit, combined dramatic talent; and subsequently the translation was entrusted to him. Pundit Ramnarain, unlike most Pundits, has too many irons in the fire and he could only devote his leisure hours to the completion of his new task and it took him nearly 4 months to finish the drama. Then came the revision, which entirely changed a great portion of the book, and that I believe took a month more. Then the book was entrusted to a printer who is proverbially slow in all his printings; and he, I am afraid, kept us one-fourth of a year in anxiety. I need not remind you then what time it took us to fix on the female characters; and what difficulty we were put to on that account. Suffice it to say that long after we began our rehearsals our heroine was fixed upon. You know very well that very few companies take so much time, and have so many rehearsals as we had, and when we were all ready one thing or other prevented us from appearing to the public. Imagine then the influence of the star whom I tell you that on the first day of our public appearance one of our principal actors, and the first in fact, who had to appear before the public, suddenly fell sick, and had to be personated by another. You know already what difficulty we were put on the third day on account of the queen and Sagorica; and under what disadvantages we managed to get them on their legs; and now, far from the last, Rootrodhur, Babhrobbo and Kanchunmala, you know, were, or I should rather say are ill, for none of them have up to this time had anything substantial to take. Over and above these Sagorica is suffering from this morning from a severe attack of fever and rheumatism; he can't act to-morrow. So please order the harbour not to come. I shall try my skill and see if I can't make him act on Sunday. So our friend, Denonath, I am afraid, will be precluded from going to Konnuggar. I shall send you a carriage to-morrow evening at 6 o'clock, and we will talk over the subject and fix a day. Don't disappoint me. Excuse this long letter which I have no time to go over, and therefore must be full of blunders.

Yours sincerely,
Issur Chunder Singh
11 P. M., 27th August, 1858.

পাবে না। শ্রোতা মাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন এবং আমি স্বাভাবিক অনেন বিষয়ে সিনিকাল (Cynical), আমিও কণকাল মোহিত হইয়াছিলাম।*

বেলগাছিয়া নাট্যালায় অস্থান দিবসমাত্রব্যাপী, অস্থায়ী আমোদে রত্নাবলী অভিনয়ের কল। পর্বসিত হইলে, আমবা তাহাব একুণ স্তরীয় বিবরণ

লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। কাথের গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব যদি লোকসারে বিচার কবিতে হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের একটি অতি মহৎ অর্জন। অনেকগুলি কৃতাবতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়াই ইহাব গৌরব নয়। এদেশের সাহিত্যে ও গীতাভিনয়ে নবযুগের প্রবর্তন কবিয়াছে বলিয়াই ইহার প্রশংসা। ইহাব পূর্বে যদিও কলিকাতায় আবেদন কয়েকবার নাটকভিনয় হইয়াছিল, তথাপি অধিকাংশ স্থলেই দিবসমাত্র-স্থায়ী আমোদ ও সাময়িক উচ্ছ্বাসে পর্বসিত হওয়াতে তাহা আধাবর্ণের মনে কোন স্থায়ী ভাব মুদ্রিত করিতে পাবে নাহ। বেলগাছিয়া থিয়েটার একুণ এক বাজিবাণী অস্থায়ী আমোদ মাত্র ছিল না, এক রত্নাবলী নাটকই তাহাতে ন্যূনতম দ্বাদশ বাব অভিনীত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যালা হইতেই বঙ্গদেশে নাটকভিনয়ের প্রকৃত প্রচাব হইয়াছে। আজ যে বঙ্গদেশের নগরে নগরে এমনকি অনেক পুরাতনেও এক একটি নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেলগাছিয়া নাট্যালাই তাহাব প্রথম পথপ্রদর্শক। এই সকল নাট্যসমাজের জন্ম, বর্ষে বর্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় এত এত নাটক নাটিকা এবং প্রশংসা বাঁচত হইতেছে। অংকুর অপকুর যাহা

* স্বর্গীয় পূজাপাদ প্রেমচাঁদ ভববাসী মহাশয়ের কন্যাতা শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়।

। বেলগাছিয়া নাট্যালায় অভিনেতৃগণ কিরূপ শৌর্য লোক হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন নিম্নলিখিত কথেকল্পন প্রাধান অভিনেতার পরিচয় হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত রাজা উদয়নের এবং বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যুৎকর অংশ অভিনয় করিতেন। প্রিয়নাথবাবু ব্যাংকাতার সহিত অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পট্রোলার জেনারেলের সম্মানজনক কার্য করিয়া অজস্র মাত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। কেশববাবুর পারচর পাঠক স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। কম্পট্রোলার জেনারেল অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কায করিয়া তিনি এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

রাজা দ্বৈতেন্দ্র সিংহ সেনাপতি কনস্থানের, এবং গৌরদাসবাবু রাজমন্ত্রী যোগেশ্বরায়ণের অংশ অভিনয় করিতেন। অপর একজন অভিনেতা বাবু দীননাথ ঘোষ কাইনালাল বাজারে কায করিয়া ব্যয়বাহুর উপাধির সঙ্গে স্পেশাল পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবাহা সীতাকোথন সীতাচাষ কেশবোহন গোখারী, বাবু বদ্রনাথ পাল প্রভৃতি একজন বাদক সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রধান ছিলেন। তদ্বিধ স্বর্গীয় ডাক্তার রাতেন্দ্রনাথ মিত্র, বিভাসাগর মহাশয়, মহাপ্রসাদ রায় পটলডাক্তার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বসিক এবং হোগলকুড়ের স্বর্গীয় তারাচরণ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ইহার সতি অনিষ্ট লব্ধে লব্ধ ছিলেন। বিভাসাগর মহাশয় প্রায় প্রায় রাজিহেই অভিনয়ভাষায় স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্গদেশের আর কোন নাটকভিনয়ে কখনও এতগুলি লক্ষ্য ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একত্রিত হয় নাই — স্বর্গীয় মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে অভিনীত “দবদ্বন্দ্বাবন” ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য।

হউক, বঙ্গভাষা যে তাহাদিগের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সমৃদ্ধিমতী হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল নাট্যাশালার আদর্শেই আমাদের দেশের প্রচলিত বাজা ইত্যাদি সংস্কার হইয়াছে। পৌরাণিক চিত্র অবলম্বন করিয়া বাকালী ভাষার নাটক রচনার প্রথা বেলগাছিয়া নাট্যাশালাই সর্বপ্রথমে এদেশে প্রদর্শন করিয়াছিল। রত্নাবলী এবং শর্মিষ্ঠার অনুকরণে এক সময় যে এদেশে কত নাটক রচিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যাশালার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা কেবলই সংস্কৃতরীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের সমাদর করিয়া নিরন্তর হয় নাই, সেই সঙ্গে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেবও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মান কবিতা তাহাদিগের প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যাশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নাটক রচনা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই একমাত্র অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কেহ কেহ মনে কবিতেন, ইংরাজী-শিক্ষিতগণ অন্য বিষয়ে কৃতকায হইলেও নাটক রচনায় কখনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগেব সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। কিন্তু মধুসূদনেব জায় ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মান কবিতা বেলগাছিয়া নাট্যাশালার অমুষ্ঠাতৃগণ তাহাদিগেব সে ভ্রম দূর কবিতাছিলেন। এদেশে নাট্যাশাষেব যদি কখনও পুনরুজ্জীবন হয় তবে যে তাহা ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই দ্বারা হইবে, তাঁহারা ই তাহার প্রথম প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জাতীয় নাট্যাশালার পুনরুদ্ধার জাতীয় সাহিত্যেব পক্ষে একটি অতি মহৎ অমুষ্ঠান, সেই অমুষ্ঠানেব সহিত মধুসূদনেব জীবনেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমরা তাহাব এক্ষণ বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কবিতাছি।

রত্নাবলী অভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইল। সে সময়কাব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে তাহার সুখ্যাতি কবিতা লাগিল; সেই সঙ্গে রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদকেরও নাম চতুর্দিকে

রত্নাবলীর ইংরাজী
অনুবাদের প্রশংসা।

প্রসারিত হইল। বঙ্গের ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্মিণী হইতে সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ পর্যন্ত সকলেই অনুবাদ দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন। তৎকালপ্রসিদ্ধ হরকরা পত্রিকার সম্পাদক এই অনুবাদের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, এক্ষণ বিদ্বজ্জ ইংরাজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাকালীর লেখনী হইতে এক্ষণ লেখা যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাকালী নহে, কালকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এক্ষণ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা আপনি ভাষা প্রকাশ করিলে, অল্পকাল বলিয়া দূষিত হইবেন না।”*

* দ্বারীয়া জীয়ার ছোটলাটার মহাপ্রভুর লিখিত।

রত্নাবলীর এই ইংরাজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন। ষশোমন্দিরে আরোহণের পথ অতীব দুর্লভ, কিন্তু একবার

তাহার সোপান-পংক্তি দৃষ্টিগোচর হইলে, আরোহণকারীকে আর বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। বেলগাছিয়া

নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ মধুসূদনকে তাঁহার চিরপ্রার্থিত ষশোমন্দিরে আরোহণার্থ সোপান-পংক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আর কখনও তাঁহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় নাই। ধীরভাবে, অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে, অগ্রসর হইয়া তিনি আপনার গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ বিস্মৃত হইবেন বটে, কিন্তু তাহা মধুসূদনের জীবনের পথ কিরূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা

[১৮৫৮—১৮৫৯ খ্রষ্টাব্দ]

প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল

৯

একদিন বত্সাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন, গৌরদাস বাবুকে বলিলেন, “দেখ কি চুংথেব বিষয় যে, এই একথানা

অকিঞ্চিংকব নাটকের জন্ত, বাজাবা এত অর্থব্যয় করিতে-
বাজালা নাটক রচনার সঙ্গজ।” গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, “নাটকগানা যে

অকিঞ্চিংকব, তাহা আমবাও জানি, কিন্তু উপায় কি ?
বিজ্ঞানজ্ঞানবেব জ্ঞান নাটক আয়া। অভিনয় কবি, ইহা অবশ্যই তোমাব ইচ্ছা নয়।
ভাল নাটক পাচলে, আমবা বত্সাবলী অভিনয় কবিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক
বাজালা ভাষায় কোথায় ?” মধুসূদন বলিলেন, “ভাল নাটক ? আচ্ছা, আমি
বচনা কবিব।”

গৌরদাস বাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাজালা ভাষায় মধুসূদনেব
ষতদূব জ্ঞান, তাহা তাঁহাব অগোচব ছিল না। বাজালা ভাষায় একথানা পত্র
লিখিতে হইলে যে, মধুসূদনেব শিবঃপীড়া উপস্থিত হইত, তাহা তিনি
জানিতেন। কিন্তু তিনি তখন ভাব গোপন কবিয়া বলিলেন, “ভালই। হচ্ছা
হইলে চেষ্টা কবিয়া দেখিতে পাব।” মধুসূদন ঝঙ্কিতে পাবিলেন, গৌরদাস
বাবু মুখে তাহাকে যাহাই বলুন, অন্তবে তাহাব কথায় আস্থা-স্থাপন করিলেন
না। কিন্তু তিনি সে সময় আব কোন কথা বলিলেন না। উপেক্ষায় নিবত্ত
থাকা মধুসূদনেব প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। গৌরদাস বাবুব সহিত এইরূপ কথো-
পকথনের পর দিনই তিনি আসিয়াটিক সোমাইটিব পুস্তকালয় হইতে সে
সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাজালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ কবিয়া
আনিলেন, এবং মনোযোগেব সহিত তাহা পাঠ কবিত্তে আবশ্য করিলেন।
ইহাব কয়েকদিন পবেই তিনি শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপিব কিয়দংশ গৌরদাস বাবুকে
দেখিবাব জন্ত দিলেন। যে মধুসূদন, ইহার কিছুদিন পূর্বে, বাজালা রচনায়
পৃথিবী লিখিতে “প্র—থি—বী” লিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থেব পাণ্ডুলিপি
প্রাপ্ত হইয়া গৌরদাস বাবু বিস্মিত হইলেন।* বাজা প্রতাপচন্দ্র, বাজা ঈশ্বরচন্দ্র

* ইহার কিয়দিন পূর্বে হুগলা নর্মাল স্কুলেব শিক্ষকতােব জন্ত মধুসূদন প্রাচ্যোপা
পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভূদেববাবুও এই পদের জন্ত প্রার্থী ছিলেন। পরীক্ষার পর মধুসূদন
বাহিরে আসিয়া ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, পৃথিবী কপাটার বানান কি ?” ভূদেব-
বাবু বাহা জানিতেন, বলিলেন। মধুসূদন তখন মাস্তাজ-কোরং সাহেব, সাহেবী চণ্ডে বলিলেন
oh no, it must be—প্র-থি-বী।

এবং মহারাজ বতীন্দ্রমোহনও, গোরদাস বাবুর মুখে মধুসূদনের নাটক-রচনার সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত কোতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী-নবীস, মাদ্রাজী সাহেব মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, ইহা সকলেরই পক্ষে বেন বিশ্বাসের বিষয় হইয়াছিল; পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ঈহাদিগের সকলের উৎসাহে মধুসূদন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, শমিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন। রাজাদিগের স্বল্প এবং পরিজনদিগের মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়স্থ ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ দুই শ্রেণীরই লোক ছিলেন। শমিষ্ঠার দোষ, গুণ সম্বন্ধে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইল। ইহার পূর্বে “কুলীন-কুল-সবন্ধ”, “রত্নাবলী” প্রভৃতি যে দুই একখানি বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত রীতি অনুসারেই হইয়াছিল। সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অল্প কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পযুক্ত ছিল না। মধুসূদন শমিষ্ঠায়, কিয়ৎ পরিমাণে, ইংরাজী রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে নান্দা এবং নটী ও সূত্রধরের অভিনয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে স্বরূপ পার্থক্য রাখা কর্তব্য এবং নাটকীয় পাত্রগণ স্বরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, তিনি সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই। ব্যাকরণে বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার কোন কালেই অধিকার ছিল না, সূত্ররূপে তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ব্যাকরণ-দৃষ্টে ও অলঙ্কার-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সংস্কৃতরীতিপক্ষপাতিগণের নিকট মধুসূদনের এই সকল ত্রুটি অমার্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহারা মধুসূদনের রচনায় “দুঃশ্রবণ”, “চ্যুত-লঙ্কারস্ব”, “নিহিতার্থস্ব”, “অবিসৃষ্টবিধেয়াংশ” প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষ নির্দেশ করিয়া, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় তখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ছিলেন। কাব্য ও নাটকাদির দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লোকে অবিসম্বাদিতচিত্তে গ্রহণ করিতেন। রাজাদিগের

উপরোধে তিনি শমিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শমিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে উপেক্ষা।

দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দংশ দেখিয়াই, উপেক্ষার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন;—“সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয় নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, ইহা কোন ইংরাজী শিক্ষিত, নব্য বাবুর রচনা হইবে।” প্রাচীন

সম্রাট তর্কবাগীশ মহাশয়ের এইরূপ তীব্র সমালোচনার বিলম্ব পরিভূট হইলেন। কিন্তু নব্য সম্রাট তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। মধুসূদনের দ্বারা তাঁহার ব্যাকরণের বা অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষগুলির বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না। মধুসূদনের নাটকের ভাষা স্বমধুর, বর্ণিত বিষয় চিত্তাকর্ষক এবং অঙ্কিত চরিত্রগুলি স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহার পরিভূট হইয়াছিলেন। নাটকখানি প্রাচীন, কি আধুনিক রীতির, তাহা অনুসন্ধান করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই দলেব নেতা ছিলেন। তাহার, শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি আন্তোপাশ্রয় পাঠ কবিয়া, বিশেষ পরিভূট হইলেন এবং তাহা বেলগাছিয়া নাট্য-শালার অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজের শর্মিষ্ঠার জন্ত কয়েকটি সঙ্গীত বচনা করিলেন। শেষোক্ত শিব-স্তোত্র-বিষয়ক স্বমধুর সঙ্গীতটি তাঁহাবই রচিত। এইরূপে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে রাজাবা মধুসূদনকে উপযুক্ত পাবিত্র্যমুক প্রদান পূর্বক শর্মিষ্ঠা নিজেদের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইলেন। মধুসূদনেব এই সময়কার লিখিত একখানি পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন বীতি প্রবর্তনের জন্ত মধুসূদনের মনে কিরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। মধুসূদনের কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে নবীন লেখক বোধে, বঙ্গাবলী-প্রণেতা স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্কবন্ধ মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, মধুসূদন তাহাবই প্রসঙ্গে গৌরদাস ঠাকুরকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পত্র।

SUNDAY.

My Dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayan's "Version", as you justly call it, dis-appoints me. I have at once made up my mind to reject

his aid. I shall either stand or fall by myself, I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to day, pray, don't say a word about Ram Narayon, I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the Second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity ; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old * * * in the shape of Pandits. When you see Joteendra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing.

Yours, as usual,

M. S. Dutta.

শর্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মহা সমারোহের সহিত বেলেগাছিয়া শর্মিষ্ঠা অভিনয়।

নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রত্নাবলী অভিনয় কালের ত্রায়, এবারও, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বের ত্রায় এবারও, বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জ্ঞাত, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুসূদন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নাট্যশালা কুরুপ মনোহর হইয়াছিল এবং অভিনেতাগণ কুরুপ জ্ঞেয় লোক হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি।* সেইরূপ সূচাক দৃশ্যগট, সেইরূপ প্রকৃতি-সজ্জা অভিনয় এবং সেইরূপ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত; দর্শকগণ এবারও মোহিত হইলেন। শর্মিষ্ঠার প্রথম দৃশ্য অতি সুন্দর।

* শর্মিষ্ঠার অভিনেতাগণের সম্বন্ধে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের লিখিত একখানি পত্র নিচে সরিষিষ্ট হইল। সৌরদাসবাবু তখন রাজকাৰ্য উপলক্ষে বাগেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন; পত্রখানি তাঁহাকে লিখিত। পত্রে উল্লিখিত অভিনেতাগণের অংশ পরে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল।

Paikpara,

21th March, 1859.

My Dear Gour Das,

* * *
**For the present I shall speak of Farmista—the production of your friend, Michael M. S. Dutt, Esqr. You know all about it, and that it is going to be acted on the boards of our Belgachia Villa. I shall first of all give you the names of the *Dramatis Personae*, and as I am going to send you the book through to-day's post, you will be able to know more

✓ বনিকা উৎকৃষ্ট হইবামাত্র দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন, গিরিয়ার হিমালয়, সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দূরে ভুবন-ভুন্দরী অমরাবতী, জ্যোতির্ময়ী আভাষ এক একবার দর্শকের চক্ষু ঝলসিত করিতেছে। সেই সঙ্গে দেবনগরগত, অপ্সবাকষ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত, হিমালয়বাহিনী শ্রোতৃস্বতীর কলকল নাদের এবং বনচর প্রাণিগণের গর্জনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতির মধুর ও ভীষণভাবের সমন্বয় করিতেছে; এবং এই সকলের উপযুক্ত গ্রহরী, একজন ভীমাকায় দৈত্যাবীর, উজ্জ্বল সৈনিক বেশে সজ্জিত হইয়া, বজ্রমঞ্চের উপর সগর্বে পাদচারণ করিতেছে। বাজালি দর্শকগণের নিকট রত্নভূমি তখন

from it, than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know. You will see, from what I am going to show you, some new faces in our Corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our Heroine. He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and, to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations.

Now,

TO THE DRAMATIS PERSONÆ

King Yayati	Preonath Dutt.
Madhobya	Bidhusak .	Keob Chundra Ganguly.
Montri	Minister .	Nobin Chundra Mukerjee.
Sukracharjya	Rishi ..	Deno Nath Ghose.
Kopil	His disciple .	Sarat Chander Ghose.
Bokasur	General .	Issur Chunder Singh.
Daitya	An officer .	Tara Chand Guha.
1st Citizen	Huris Chundra Mukherjee.	
2nd do	Russick Lal Law.	
3rd do	Brojo Lullal Dutt.	
Courtiers	Jotindra Mohan Tagore, Preonath Sett and Rajendra Lal Mitter.	
Chopdar	Dwarkanath Mullick & Mohesh Chunder Chunder	
Durwan	Jadu Nath Ghosh (my brother-in-law)	
Debjani	Hem Chunder Mukherjee. (our Shagarika)	
Sharmista	Kristodhan Banerjee (a new-comer)	
Purnika	Kally Das Sandel (formerly our dancing girl)	
Debika	Aghor Chander Dhagria (our Susongota)	
Notes	Chuni Lal Bose (as before).
Maid servant	...	Kally Prasanna Mookerjee.
Dancing girls	...	The same of before, plus Bunkim Chunder Mukherjee.

এক অপূর্ব-দৃষ্ট মনোহর সামগ্রী ছিল, হুতরাং এইরূপ হুচাক হুত সমাবেশের জন্য মধুসূদন ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়কার সংবাদপত্র সমূহে শর্মিষ্ঠা-অভিনয় বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার মনের ভাব বর্ণনা করা নিশ্চয়োজন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন;—

When Sharmista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell." Poor old Ramchandra,¹ was half mad and grasped my hand, "Why my dear Modhu, my dear Modhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful."

মধুসূদনের নাটকসমূহের সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলে পাঠকগণের বৈধৃতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য, তাঁহার কাব্যসমূহের স্বল্পভাবে আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা আছে, তাঁহার নাটক সমূহের স্বেল্প আলোচনা

Here you have as complete a list of the characters as I could give you and I believe none can give you better the names of the characters than the manager of the theatre. Now as to other particulars, the rehearsals are going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectively. Almost everybody is prepared and we can get up the play at ten days notice, but our Raja's father is unfortunately dead, and that will delay us. My brother, moreover, is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear before the public in all April. No less than eight scenes have to be newly painted; most of them are already finished, and beautiful and magnificent they are without doubt.

I have not spoken any thing about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism.***

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain, yours ever sincerely
Issur Chandra Singh

1. কিছুকালের প্রাজ্ঞ বিদ্বৎ বাবু রামচন্দ্র দত্ত।

* Prao Nath Dutt's father.

হইতে আমরা বিরত থাকিব। কিন্তু নাটক রচনা হইতেই মধুসূদন তাঁহার শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেইজন্য আমরা, সংক্ষেপে, শর্মিষ্ঠার বর্ণনীয় বিষয় ও দোষগুণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা অতিরিক্ত যে, মধুসূদনের রচিত কোন গ্রন্থেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়; জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বাহা বলা কর্তব্য, আমরা কেবল তাহাই বলিব।

শর্মিষ্ঠা-নাটক মহাভারতীয় যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। যযাতি উপাখ্যান পুরাণজ ব্যক্তি যাজ্ঞেরই পরিচিত; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ

নিম্নয়োজন। মধুসূদন যযাতি-উপাখ্যানের আভ্যোপান্ত শর্মিষ্ঠার অবলম্বনীয় বিষয়। গ্রহণ করেন নাই; শর্মিষ্ঠার নির্বাসন হইতে রাজা যযাতির জরানিমুক্তি পর্যন্ত ঘটনাবলী তাঁহার গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন যখন শর্মিষ্ঠা রচনা করেন, তখন তিনি সাহিত্য-শিক্ষাগারে শিক্ষার্থীমাত্র ছিলেন; শিল্পকৌশল তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। সেইজন্য তিনি তাঁহার কুঙ্কুমারী নাটকে যে নির্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, শর্মিষ্ঠায় তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠার একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে অবতারণিত চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে পাঠকের উৎসুক্য চরিতার্থ হয় না। অতি কমনীয়মূর্তি কীর্ণাঙ্গ দেখিলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, শর্মিষ্ঠার চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্লোভ জন্মে। মনে হয় যেন পরিবর্তিত হইতে হইতে হইল না;—যেন আরও দুই একটি কথা বলিলে, আরও দুই একটি ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা হইত। মূল উপাখ্যানের কোন কোন নাটকোচিত অংশ পরিত্যাগ করাতেই শর্মিষ্ঠা এইরূপ অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি স্থলের উল্লেখ করিতেছি। দৈত্যসভামধ্যে শর্মিষ্ঠার প্রতি দৈত্যরাজের নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা শর্মিষ্ঠা উপাখ্যানের একটি উৎকৃষ্ট নাটকোচিত অংশ। সহিসুতায় এবং যৈর্ষে মহাভারতকার শর্মিষ্ঠাকে তথার প্রকৃত দেবীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পিতার কঠোর আদেশে এমন কি গর্বিতা দেবযানীর ব্যাধেও তাঁহার ঐর্ষ্যচ্যুতি হয় নাই। শর্মিষ্ঠা নাটকে এই অংশ পরিত্যাগ করাতে, শর্মিষ্ঠার চরিত্র পরিষ্কৃতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। শুক্রাচার্য প্রভৃতি অন্যান্য নাটকীয় পাত্রগণেরও সম্বন্ধে কবির এইরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয়।

শর্মিষ্ঠার দোষ। শর্মিষ্ঠার অপর দোষ এই যে, ইহার ভাষা, কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকোপযোগী

নয়, এবং ইহার ভাব অনেক স্থলে কৃত্রিমতাপূর্ণ। সংস্কৃত নাটক সমূহের যতই গুণ থাকুক, কৃত্রিমতা তাহাদিগের প্রধান দোষ। সংস্কৃত নাটকসমূহকে আদর্শ করিতে যাওয়াতেই শর্মিষ্ঠা কৃত্রিমতা দোষে দূষিত হইয়াছে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। দেবধানীকে দর্শনাস্তর দৈত্যদেশ হইতে প্রত্যাগত রাজা, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, মনে মনে বলিতেছিলেন;—

“আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করিয়াছিলাম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে, তোমার কি একথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নমণ্ডল ব্যথিত হয়। কেননা, দৈত্যদেশগমনে তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সারপদার্থ দর্শন করেছে। বাড়বানলে পরিতপ্ত হ'লে মানব যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও অস্ত্র সেইরূপ হ'লেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? কি আশ্চর্য! আমি কি যুগয়া ক'রতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলেম?”

প্রিয়জনের অদর্শনে এরূপ ভাবে বিলাপ কি স্বভাব সঙ্গত? ইহা হৃদয়ের কথা নয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ শব্দাভ্যাস মাত্র। শর্মিষ্ঠার অনেক উৎকণ্ঠ স্থল এইরূপ কৃত্রিমতা দোষে দূষিত। প্রচলিত যাত্রা প্রভৃতিতে যেমন নাটকীয় পাত্র আসিয়া, শ্রোতাগণের নিকট আপনার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে, শর্মিষ্ঠারও অনেক স্থলে সেইরূপ করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাচলশৃঙ্গস্থিত দৈত্যসৈনিক যেন শ্রোতাদিগকে আশ্রমপরিচয় দিবার জন্তই বলিতেছিল;—

“আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশ অনুসারে এই পর্বত প্রদেশে অনেকদিন অবধি বাস করি; দিবারাজের মধ্যে কণকাল স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ, ঐ দূরবর্তী নগরে দেবতারা যে কখন কি করে, কখনই বা সেখান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অস্বরপতির নিকটে লগ্নে বেতে হয়।”

এইরূপ গুজ্জাচার্য্য কপিল প্রভৃতি পাত্রদিগকেও কবি রক্তমঞ্চে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদিগেরই মুখ হইতে সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করাইয়াছেন। নিপুণ নাটককারগণ যে রূপ কৌশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন, মধুসূদন তাহা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও, শর্মিষ্ঠা যে সময়ে এবং যে অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমরা গ্রন্থকারকে অসলোকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হই। শর্মিষ্ঠা, দেবধানী, গুজ্জাচার্য্য

এবং যথাক্রমে এই চারটিই শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান চরিত্র। যথুন্দন বৈরাগ্যভাবে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা মূল মহাভারতের অপেক্ষা নিকট হয় নাই। ক্ষমাশীলা এবং সহিষ্ণুতাময়ী সবলা দৈত্যবান্ধবী শর্মিষ্ঠার, কোপনা অথচ অহুতপ্তা প্রেমিকা দেবযানীর এবং শমশুগাংগিত মহর্ষি-শুক্রাচার্যের চরিত্র, সর্বত্র-সুন্দর না হউক, বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা-নাটকের যথাক্রমে দেখিয়া আমরা মহাভারতের ইন্দ্রিয়দাস রাজা যথাক্রমে ক্রিয়ৎপরমাণে বিস্মৃত হই। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শুক্রাচার্যের আশ্রমে, সখীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কথোপকথন, মেঘনাদ বধের কবিরই উপযুক্ত শর্মিষ্ঠার গুণ।

হইয়াছে। শর্মিষ্ঠার ও দেবযানীর বিবাদে শর্মিষ্ঠাকে কলহ-কারিণী বলিয়া আমাদের ঘে ঘণা জন্মিবার সম্ভাবনা, এই কথোপকথনে কবি তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিয়াছেন। এ সংসারে ভ্রম, প্রমাদ না করে কে? কিন্তু যে অপরাধের পর অহুতাপ করে এবং ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান হয়, সে আর আমাদের ঘৃণার পাত্রী নয়, সহানুভূতিরই পাত্রী। শর্মিষ্ঠাকে আমরা যখন শুক্রাচার্যের তপোবনে দেখিতে পাই, শর্মিষ্ঠা তখন আর সৌভাগ্য-গবিতা রাজহুঁহিতা নয়; দর্পহারী বিধাতার বিধানে শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা তখন দাসী এবং সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যে শর্মিষ্ঠা তখন তপস্বিনী। পরাধীনতার পুনর্বাসক্লেশে শর্মিষ্ঠার আর সে পূর্বের রূপলাবণ্য ছিল না। “নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহার আর সে শোভা থাকিবে কেন?” প্রতিষন্ধিনীর পদসেবা তখন শর্মিষ্ঠার ব্রত হইয়াছিল। পরাধীনতায় অনভ্যস্তা, স্বেচ্ছাবিহারিণী তুরগী দাসীকে ক্লেশে শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব থাকি সন্তব, ততদূর পরিভ্রষ্ট। শর্মিষ্ঠা আশ্রু-কৃত কার্যের জন্ত অহুতপ্তা; শর্মিষ্ঠার জগতে কাহারও প্রতি ঘৃণ বা বিরাগ নাই। যে দেবযানী শর্মিষ্ঠার সর্বনাশের কারণ, তাহার উপরও শর্মিষ্ঠা অনুয়া-লুপ্ত। শর্মিষ্ঠার সখী বিধাতার উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিতে চাহিলে, শর্মিষ্ঠা তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন; সখি—

“তুমি বিধাতাকে আমার জন্ত দোষ দাও কেন। বিধাতার** দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সঙ্গে, আমার বিবাহ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করিতে হতো না। পিতা আমার দৈত্যরাজ** তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত, আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি। আমি আপনি মিষ্টায়ের সহিত মিশ্রিত করে বিষ ভক্ষণ করেছি, তায় অস্ত্রের দোষ কি?”

অল্পভগ্না শর্মিষ্ঠার অতি সুন্দর চিত্রই হইয়াছে। এই শর্মিষ্ঠা-চরিত্রই শর্মিষ্ঠা ও দেববানী। নাটকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠাকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অভিমানিনী করিয়া কবি ইহার অঙ্গহানি করিয়াছেন, নচেৎ ইহা সর্বদা-সুন্দর হইত। ভারতীয় অন্তান্ত কবি-শ্রেষ্ঠদিগের স্তায় মধুসূদনও নারীচরিত্র চিত্রনেই সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রমীলা, অনেক বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্যে অভুলনীয়। থাকিবেন। শর্মিষ্ঠা নাটকে কবি তাঁহার এই নারীচরিত্র-চিত্রণের শক্তির প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা গ্রন্থের নায়িকা এবং দেববানী প্রতিনায়িকা। এ অবস্থায় শর্মিষ্ঠার প্রতি অমুরাগের সঙ্গে দেববানীর প্রতি বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনাগুণে তাহা হয় নাই; বরং পতিপ্রেম-বাকিতা, দুর্ভাগিনী বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অল্পকম্পা জন্মে। দেববানী, শুক্রাচার্যের একমাত্র দুহিতা, বৃদ্ধ পিতার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা, স্নেহাত্মক আদরের আদরিণী। দেববানী মূখরা ও অভিমানিনী, এবং কিশোর বয়সে নিরাশ প্রণয়ে মর্মপীড়িত। ঋষিকুমারী হইলেও দেববানী তপস্বিনীজনোচিত আশ্রমসংযম শিক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম যৌবনে দেববানী একজন ঋষিকুমারকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিদান পান নাই। প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দেববানী অভিমানে প্রণয়ান্দকে অতি কঠোর অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং নিজেও তাঁহার নিকট অভিশাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। দেববানীর পূর্ব-জীবন এইরূপ। ইহার পর পিতার স্নেহ-কোড়ে পালিত হইয়া দেববানী কৈশোর-প্রণয়ের নিরাশ্বাস বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং চ্যুতপল্লবা লতিকা আবার ঘেমন, বসন্তবায়ু-স্পর্শে, পত্রপুল্পধারণের উপযুক্ত হয়, তেমনই অভিমত পাঞ্জে পুনর্বীর আশ্রমমর্ষণ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটিল। তাঁহার প্রিয়তম, আর একজনের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেন। দেববানীর হৃদয়ের ভাব সহজেই অহুমান করা বাইতে পারে। দেববানী, অভিমানে, ইষ্টানিষ্টজ্ঞান-শূন্য হইয়া, নিজের সর্বনাশে নিজেই প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু দেববানী, কোথের বশীভূতা হইলেও প্রগাঢ় প্রেমময়ী সাক্ষী। প্রথম কোথের আবেগে দেববানী কি সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রিয়ভ্রমের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দেববানীর চৈতন্তের উদ্রেক হইল। হিন্দুললনা পতির দুরবস্থা কবে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন? দেববানী প্রিয়ভ্রমের অবস্থা দর্শন করিয়া, উদ্গাদিনীর স্তায় হইলেন। দেববানীর সে অবস্থার করুণবিলাপ প্রবণ করিলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিগলিত হয়। দেববানী,

নিজেই পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রিয়তমের শাপাবসান করাইলেন। দেবধানীর সেই প্রায়শ্চিত্ত দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি পাঠকের বিরাগ থাকে না। শর্মিষ্ঠার চরিত্রের গৌরব রক্ষার সঙ্গে মধুসূদন যে দেবধানীরও চরিত্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার গ্রন্থের সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে। ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কবি-শ্রেষ্ঠদিগের নাটকের সহিত শর্মিষ্ঠা নাটকের তুলনা করিলে ইহা অবশ্যই অনেক নিম্নস্থানীয় হইবে, তথাপি শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ইহা আমাদের সাহিত্যের মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সুন্দর নাটক, এবং নির্মাণদক্ষতা সম্বন্ধে মেঘনাদবধ রচয়িতার প্রথম উক্ত্যের অযোগ্য নয়।

শর্মিষ্ঠার ভাষা যে নাটকোপযোগী নয়, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু নাটকোপযোগী না হইলেও, তাহাতে শর্মিষ্ঠার ভাষা। কবিত্বের অথবা মাধুর্যের অভাব নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে সায়ংকালীন তপোবনের বর্ণনা পাঠ করিলে যেন প্রাচীন কাব্যেরই বর্ণনা পাঠ করিতেছি মনে হয়। আমরা নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। দেবধানীর প্রস্থানের পর রাজা জ্যোৎস্নালোকে অন্তঃপুরস্থিত উজ্জানের শোভা দেখিয়া, বলিতেছেন—

“নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নব-বোঁদনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অল্পমম লাভণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অল্প সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবর-সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানা শব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোময়া তপস্বিনীর স্নায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত ঝটোড়িকাগণ উজ্জল রত্নরাজীর স্নায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবাস্তরে শোভিত হচ্ছে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মহাস্বাভাতি ভিন্ন সকলেই

বাকল্য ভাষায় বর্ণজান-শূন্য মধুসূদন, তাদৃশ অল্পকালের মধ্যে তাহাতে কিরূপে দৈর্ঘ্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদের বিস্ময় জন্মে। বেরূপ উপায়ে তিনি এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আবার আরও অধিক বিস্ময়জনক। রীতিমত ভাষা শিক্ষা না করাতে তাঁহার শব্দভাণ্ডার অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। এক একটি শব্দের জগৎ তাঁহাকে, অনেক সময় আপনার সংস্কৃত-শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। তিনি সংস্কৃত-শিক্ষককে অভিপ্রেত শব্দের বাচক কতকগুলি শব্দ বলিয়া বাইতে বলিতেন। শিক্ষক

মহাশয় সেইরূপ করিলে তিনি সেই সকল শব্দের মধ্য হইতে আপনার ইচ্ছানুসারে কোন একটি শব্দ নির্বাচন করিয়া লইতেন। একরূপ অবস্থায় রচনা বিস্তৃত অথবা প্রাঞ্জল হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভবে ও মেঘনাদবধে যে অনেক অপ্রযুক্ত, ক্লান্ত শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও, মধুসূদন তাঁহার শর্মিষ্ঠায় ধেরূপ রচনা পরিপাট্য ও ভাবালালিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমকালীন, ইংরাজী শিক্ষিত যে কোন লেখকের পক্ষেই গৌরবকর। মহাভারতীয় ঘটনা সত্বেও মধুসূদন তাঁহার অন্ত্যন্ত গ্রন্থে, সাধারণতঃ, কালীদাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু শর্মিষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়গুলি মূল মহাভারতেরই অনুরূপ। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্ব এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। শর্মিষ্ঠার ঘটনা-সম্মিলন পর্যালোচনা করিয়া ও তাহার ভাবার সঙ্গে মহাভারতের ভাবার তুলনা করিয়া আমাদের বোধ হয় যে, মধুসূদন উভয় বিষয়েই সিংহ মহোদয়ের মহাভারত হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কি অবস্থায় শর্মিষ্ঠা রচিত হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি।
বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্তই শর্মিষ্ঠার
শর্মিষ্ঠা ও রত্নাবলীর
সাদৃশ্য। উৎপত্তি। সেই একই রঙ্গ-মঞ্চ, সেই সকল অভিনেতা,
সেই সমস্ত বেশভূষা। সুতরাং মধুসূদনকে স্বতঃই সে
সকলের উপযোগী একখানি নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছিল।
ইহার উপর বারবার রত্নাবলীর অভিনয় দর্শন করিতে তাহার ভাব তাঁহার হৃদয়ে
এরূপ মুক্তিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা অপসারিত করিতে পারেন
নাই। কোন একখানি গ্রন্থ জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, পরবর্তী লেখক
দ্বিগুণে প্রায়ই তাহা আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হয়। রত্নাবলী সাধারণের নিকট
বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছিল। নিজের উদ্ভাবনীর ক্ষতির উপর মধুসূদন তখনও
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্ত
তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে রত্নাবলীকেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয়
গ্রন্থে সেইজন্ত, ভাবগত, এবং কোন কোন স্থলে, ভাবগত সাদৃশ্যও লক্ষিত
হইবে। উভয় গ্রন্থেই দুই জন নায়িকা; জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী ও কোপনা,
কনিষ্ঠা অভিরাম শূভ্রা ও মৃদুস্বভাবা; রূপেণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাক্রান্ত।
উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিশেষে কনিষ্ঠারই
জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বাধীন কৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা

করিয়াছেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধ। ষতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অমুরক্ত, কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়ের প্রেম শরতের মেঘের গ্রায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ আরও অনেক শাদৃশ্য আছে। উভয়ের উপসংহারও একরূপ। কিছুদিন বঙ্গনা ভোগের পর উভয় গ্রন্থেরই নায়কনায়িকাগণ সমভাবে সুখী হইয়াছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, রত্নাবলীর এইরূপ আদর্শে রচিত হইলেও, মূলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন সগর্বে বলিয়াছিলেন যে, “আমি এমন গ্রন্থ রচনা করিব যে, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।” বাস্তবিকও তাঁহার গর্ববাক্য সফল হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীন নব্য সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ একবাক্যে শর্মিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন।* শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় কবিতা-রচনা-শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের শ্লোকের গ্রায় শর্মিষ্ঠারও স্থানে স্থানে পন্ন্যাসাদি ছন্দে রচিত কবিতা লক্ষিত হইবে। সেই সকল কবিতার মধ্যে প্রস্তাবনাটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, শর্মিষ্ঠা সমালোচনা শেষ করিব।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।

যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।

শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা বাবে তুমি,

আর নিদ্রা উচিত না হয়।

উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর,

দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাম্বীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,

কোথা ভবভূতি মহোদয়।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাতে, বন্ধে,

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

স্বাধারস অনাদরে বিষবারি পান করে,

তাহে হয় তত্ত্ব, মন সয়।

মধু কহে, আগো মাগো, বিতু স্থানে এই মাগো,

স্বরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব ভনয় নিচয় ॥

* স্বর্গীয় ভাস্কর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় শর্মিষ্ঠার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন : “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ বলিবেন, সন্দেহ নাই।” বিদ্যাবার্ষ সংগ্রহ, ৫ম পর্ব, ৫৮ সংখ্যা, শক ১৭৮০ বাব্দ।

মধুসূদন, এতদিন, ইংরাজী ভাষায় স্থপতিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছিলেন, শর্মিষ্ঠারচনা হইতে বাঙ্গালা ভাষাতেও স্থলেখক বলিয়া সম্মানলাভ করিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অমূল্যভূষণ ঐশ্বর্য ও সম্মানে

শর্মিষ্ঠা রচনা হইতে
সাধারণের নিকট
প্রতিষ্ঠালাভ।

তাৎকালিক কলিকাতা সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন :-

সুতরাং তাঁহাদিগের সমাদরে মধুসূদনও সাধারণের সমাদর
ভাজন হইলেন। যে সকল ঘটনায় লোকের উন্নতির পথ

পরিষ্কৃত হয়, বিধাতার অঙ্গগ্রহে ও নিজের প্রতিভা বলে.

তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভার সঙ্গে প্রতিভার উৎসাহদাতা-
বন্ধুও তিনি লাভ করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র, রাজোচিত উদারতার
সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিলেন। তাঁহাদিগের কৃপায় দুর্বল ঋণতার
বিমোচিত হওয়ায়, মধুসূদনের চিত্ত সুস্থ হইল; তিনি উৎসাহের সহিত
সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া
মধুসূদনের ভাগ্যে কিরূপ পুরস্কার মিলিয়াছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ
করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা দ্বারা এক্ষণে তাঁহার চিরাভিলষিত
বাসনা চরিতার্থ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। নাটকরচনাতেই তিনি নিজের
শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কাল বিলম্ব না করিয়া, তিনি আর একখানি
নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার এই সময়কার লিখিত
একখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার মানসিক
ভাব, সাংসরিক অবস্থা এবং শর্মিষ্ঠা সাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ
করিয়াছিল, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। গৌরদাস বাবু, তখন, রাজকাষ
উপলক্ষ্যে বালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, পত্রখানি তাঁহাকে লিখিত।

ষোড়শ পত্র।

My Dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your kind letter so many days. But I have had but little time to devote to my friends. The present Magistrate—Mr. W—is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to mall Cause Court, and we are to have Mr. Briefless F.

You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at rest just now ; our noble friends—noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence ;—don't tell him that I desire you to do so.

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore—it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book ; as for the Bengali Original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for everyone is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometime ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M.

Tagore has written to me to say that it is "indeed very good". If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self—ad—d unpleasant subject.

There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. My friends think I should keep quite, till Sharmista is brought out and makes me "Famous".

How do you like Balasore? I would give anything to be posted near the sea and in a country where I could at times catch glimpses of distant mountains—the two noblest objects in creation. * * * * !!

What is the distance of the sea, the sea, the open sea from where you are located? Do you hear its mighty roar—ceaselessly sounding? To me it is a familiar voice, but God knows if I shall ever hear it again.

I must now conclude for it is getting late. I want you to tell me where you lodge, who are your new friends, what sort of food you get, * * * and all such domestic information.

19th March 1859.

}

With kind regards
ever yours
Michael M. S. Dutta.

মধুসূদনের প্রথম নাটক, শমিষ্ঠা ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল; তাহার দ্বিতীয় নাটক, পদ্মাবতী, গ্রীক পুরাণের পদ্মাবতী ও তাহার অবলম্বনীয় বিষয়। ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণের উপাখ্যান এইরূপ। Discordia অথবা কলহদেবী, অন্তান্ত দেবী-গণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্ত, একটি স্বর্ণময় "অপল" (apple) নির্মাণ পূর্বক তাহাতে ইহা "সর্বোত্তম সুন্দরীর জন্ত" এইরূপ লিখিয়া তাহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটারের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও

বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বাঙ্গীকৃত হইয়া স্থির করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা ঐয়-রাজপুত্র পারিসকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে, আপন আপন কার্যোদ্ধারের জন্য পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃত হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী এবং ভিনস্ তাঁহাকে সর্বোত্তম সূন্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পারিস সর্বাঙ্গীকৃত সূন্দরী বোধে ভিনস্কেই স্বর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীদ্বয় ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে পারিসের সর্বনাশের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির দ্বারা তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে জীড়াপুষ্টলীর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্, ডিস্কর্ভিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে মধুসূদন নাটকে হস্তরাজ মহিষী মুরজা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্য মৌলধাভিমানিনী রমণীর দ্বারা বিবাদপরায়ণা না করিয়া মধুসূদন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং সূক্ষ্মতর পরিচয় দিয়াছেন। জীজাতি, বিজ্ঞাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও মৌলধাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু জীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে একরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন না। সামান্য রমণীর পক্ষে বাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সম্ভব নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটা যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুসূদন তাহাকে একরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অঙ্গকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতী নাটকের উপাখ্যানভাগ এইরূপ;—

বিমর্ভদেশের অধীশ্বর রাজা ইন্দ্রনীল, একদিন যুগয়া গ্রামে বিজ্ঞারণ্যের সমীপবর্তী দেবোপবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যুগের অঙ্গুরণে শ্রান্ত হইয়া তিনি একখানি শিলাধরের উপর উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ চতুর্দিক স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হইল এবং আকাশ হইতে অতি মধুর বাস্তু তাঁহার

কৰ্ণে প্রবেশ করিল। রাজা মোহাভিকৃতের দ্বায় শিলাখণ্ডের উপর পতিত হইলেন। সেই সময় দেবরাজ মহিষী শচীদেবী, ময়ূখ-প্রণয়িনী রতিদেবী এবং যক্ষরাজপত্নী মুরজাদেবী, বিহারার্থ সেই উপবনে প্রবেশ করিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন করিবার জন্য একটি কনকপদ্ম লইয়া বলিলেন; “যিনি আপনাদিগের মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা স্তন্দরী তিনিই ইহা গ্রহণ করিবেন।” দেবর্ষি এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলে দেবীগণ প্রত্যেকেই আপনাকে সৰ্বাপেক্ষা স্তন্দরী বোধে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি রতি দেবীকেই সৰ্বাপেক্ষা স্তন্দরী বোধে তাঁহাকে কনকপদ্মটি অর্পণ করিলেন। শচী ও মুরজাদেবী রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যবহারে একান্ত ক্রুদ্ধা এবং রতিদেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন। রতিদেবী, গ্রীকদেবী ভিনসের দ্বায় রাজা ইন্দ্রনীলকে পৃথিবীর সর্বোত্তম স্তন্দরী প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞতা হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মাহিম্বতীপুত্রীর রাজকুমারী অল্পম লাবণ্যবতী পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা ইন্দ্রনীলের বিবাহ হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জয়ে শচীদেবী নিশ্চিন্তা রহিলেন না। তিনি রাজা ইন্দ্রনীলকে দণ্ড দিবার জন্য কলিদেবের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কলিদেব রাজা ইন্দ্রনীলের প্রতিবাসী রাজন্যবর্গকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন, এবং যে সময়ে রাজা ইন্দ্রনীল তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন সেই সময়, কৌশলক্রমে, পদ্মাবতীকে বিদর্ভরাজপুত্রী হইতে হরণ পূর্বক এক নির্জন, অরণ্যময় প্রদেশে রাখিয়া আসিলেন। রতিদেবী এই সংবাদ অবগত হইয়া পদ্মাবতীকে মহর্ষি অজিয়ার আশ্রমে লইয়া বাইলেন এবং বাহাতে ক্রুর-স্বভাবা শচীদেবী ভবিষ্যতে তাহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে না পারেন, তজ্জন্ত ভগবতী পার্বতীর নিকট আত্মোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ভগবতী, শুনিয়া শচীদেবীকে পদ্মাবতীর অনিষ্টাচরণে বিরত হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে রাজা ইন্দ্রনীল, যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন, যে, পদ্মাবতী রাজপুত্রীতে নাই। তিনি মনোহুঃখে সংসারাজ্যম পরিত্যাগ করিয়া, তীর্থ পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে নানাবিধ পর্যটন পূর্বক, মহর্ষি অজিয়ার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজদম্পতির হুঃখের অবসান হইল। পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন; দেবীগণও ভগবতীর আদেশে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, রাজদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলেন। মহর্ষি নারদ পদ্মাবতীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন :—

বশঃসরে চিরকচি কমলিনী রূপে,
শোভ তুমি পদ্মাবতী রাঞ্জেস্ত নন্দিনি !
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্য-রাজবালা,
শর্মিষ্ঠা যেমতি ; তাঁর সহ নাম ভব,
গাঁথুক গোড়ীয় জন কাব্য-রত্ন-হারে,
মুকুতালহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা ।

ঘটনাবৈচিত্র্যে পদ্মাবতী শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু নাটকীয় চরিত্রচিত্রণ

সম্বন্ধে মধুসূদন ইহাতে শর্মিষ্ঠার অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য
পদ্মাবতীর দোষগুণ ।

দেখাইতে পারেন নাই । শর্মিষ্ঠার জ্ঞান পদ্মাবতীতেও
মধুসূদন জ্ঞী-চরিত্র চিত্রণেই সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন । পদ্মাবতী
প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞীচরিত্র-প্রধান নাটক । ইহার পুরুষ-চরিত্রগুলি ইহার জ্ঞীচরিত্রের
সহিত তুলনায় অতি নিকট স্থান অধিকার করিয়া আছে । গ্রন্থের নায়ক রাজা
ইন্দ্রনীলকে কবি বীররূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে
পারেন নাই ; প্রেমের তরঙ্গে ইন্দ্রনীলের বীরত্ব তানিয়া গিয়াছে । স্বর-রমণীগণ
ধাহাকে আপনাদিগের মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে বৈরাগ্য
গান্ধীর্ষ ও দৃঢ়তা থাকি সন্দেহ, রাজা ইন্দ্রনীলের চরিত্রে তাহার কিছুই নাই ।
বিদ্যারণ্যে দেবকস্তাগণের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন-
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল ; কিন্তু সেক্ষেপে গুরুতর ঘটনায় তাঁহার মনে বৈরাগ্য ভাবোদয়
হইবার সম্ভাবনা, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই । দেবকস্তাগণের অন্তর্ধানের
পরই রাজাকে বিদূষকের সঙ্গে রহস্তলিখ্য করিয়া কবি তাঁহাকে চপল-
বালকের জ্ঞান চিত্রিত করিয়াছেন । ইহা অসঙ্গত হয় নাই । কলিরাজেরও
চরিত্র বৈরাগ্যভাবে চিত্রিত দেখিবার জন্য পাঠকের আশা জন্মে, তাহা পূর্ণ
হয় না । শর্মিষ্ঠার জ্ঞান পদ্মাবতীতেও কবি, নাটকীয় পাত্রদিগের পরিচয়
প্রদান স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । লোকের মনে স্বভাবতঃ বৈরাগ্য চিন্তা
উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নাটকে “স্বগত”-রূপে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে ।
কিন্তু দর্শক বা শ্রোতাদিগকে নাটকীয় পাত্র বিশেষের পরিচয় প্রদান জন্য,
কোন কথা বলা “স্বগতের” উদ্দেশ্য নহে । কঙ্কু, বিদূষক প্রভৃতির চরিত্রে
উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই । সংকুত নাটক সমূহের অঙ্গকরণেই মধুসূদন তাঁহার
নাটকে এই সকল প্রবর্তন করিয়াছিলেন । পদ্মাবতীর মধ্যে একমাত্র
শচীদেবীর চরিত্রই সজীব । হিন্দু পুরাণে শচীদেবীর নামোল্লেখ আছে বটে,
কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অথবা কার্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

যায় না। মধুসূদন গ্রীক আদর্শে তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে শচীদেবীর চরিত্র অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেরই বর্ণিত চরিত্র পরস্পর হইতে বিভিন্ন। বৃদ্ধসংহারে যে মতিমাময়ী রাজ্ঞী শচীদেবীকে আমরা দেখিতে পাই, তিলোত্তমাতেই তাহার প্রথম রেখাপাত হইয়াছে। পদ্মাবতীর শচী-চরিত্র হিন্দু পুরাণানুযায়ী নহে; ইহা গ্রীক আদর্শে কল্পিত। গ্রীক পুরাণের জুনো কুরন্থভাবা, ঈর্ষাপরায়ণা, সৌন্দর্যাভিমানিনী এবং অসহনা। সপত্নী-সন্তানদিগকে তিনি অমাতুল্যিক স্বত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; স্বামীর বিরুদ্ধে বিরোধে উত্থান করিতেও তিনি কুণ্ঠিতা হন নাই। পারিসের অতি তুচ্ছ অপরাধের জন্য তিনি ট্রয়নগরীর সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর সর্বনাশ করিয়াছিলেন। গ্রীক পুরাণের এই জুনোকে হিন্দু বৈশভূষা প্রদান করিয়া মধুসূদন পদ্মাবতীর শচীরূপে অবতারিত করিয়াছেন। গ্রীকদেবী জুনোর ত্রায় পদ্মাবতীর শচীও সৌন্দর্যাভিমানিনী, ঈর্ষাপরায়ণা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর জয়লাভের জন্য সদসদ্বিচাররহিত। সৌন্দর্য বিচারে তিনি ও মুরজাদেবী উভয়েই পরাজিতা হইলেও, প্রধানতঃ, তাঁহারই উদযোগে পদ্মাবতীর এবং রাজা ইন্দ্রনীলের তাদৃশ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিচ্ছেদ সংঘটন করাইয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হন নাই। রাজা ইন্দ্রনীল যুদ্ধে হত হইয়াছেন—এই অলীক সংবাদও তিনি পদ্মাবতীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সহিত বৈষম্যে কবি অপেক্ষাকৃত কোমল স্বভাবা মুরজাদেবীর চরিত্র পরিস্ফুটনের সমধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুরজা, রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যবহারে অভিমানিনী হইলেও, শচীদেবীর ত্রায় সদসদ-জ্ঞানশূন্য নহেন। ইন্দ্রনীলের দেওর জন্য নিরপরাধা বালিকা পদ্মাবতীকে চিরদুঃখিনী করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; প্রবলা সহযোগিনীর ভয়েই তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ স্বতি জীবগণের হৃদয়ের উপর কিরূপ রাজত্ব করে, মুরজা ও পদ্মাবতীর পরস্পর সম্বন্ধে কবি তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন। মুরজাদেবীর কন্যা বিজয়াই ভগবতী পার্বতীর শাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবমায়ায় মুরজাদেবী তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। কিন্তু না পারিলেও, কি জানি কেন, তাঁহার হৃদয় পদ্মাবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি শচীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখি, তোমার কি ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দিবার জন্য এ স্থলীনা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?” নৃশংস স্বভাবা শচীদেবী অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন; “কেন দেব না? পরমায় চণ্ডালকে বেড়ান অপেক্ষা জলে বেলে দেওয়া ভাল। দেখ, ছুই দমনের নিষিদ্ধ বিধাতা

সময় বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্ন করেন।” প্রবলা সহযোগিনীকে তাঁহার ছরভিসন্ধি হইতে নিরস্ত করিবার সাধ্য মুরজাদেবীর ছিল না ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় পদ্মাবতীর জন্ত ব্যাকুলিত রহিল। ইহার পর, যখন তিনি পদ্মাবতীর সরল স্তন্যর মুখখানি দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় একবারে স্নেহে বিগলিত এবং স্তন্যয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময় অবধি তিনি পদ্মাবতীর অনিষ্টচিন্তা হইতে বিরতা হইলেন ; এবং পরে পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে শত শত বার ধিকার দিতে লাগিলেন। ষতদিন পদ্মাবতী মানবীরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে পদ্মাবতীর পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি পদ্মাবতীর পুনঃপ্রাপ্তির আশায় আশ্রয় হইয়া, অলকায় প্রস্থান করিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদন তাঁহার সকল গ্রন্থেই দ্বীচরিত্র চিত্রণে সমদিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্গাণ্ড গ্রন্থের নারিকাদিগের দ্বারা পদ্মাবতীরও চরিত্র চিত্রণে, তাঁহার দক্ষতার অভাব হয় নাই। পদ্মাবতী সৎলা বালিকার অতি স্তন্যর আদর্শ। রতিদেবী, যখন চিত্রকরী বেশে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“রাজকুমারি, আপনি হচ্ছেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।” সরলা পদ্মাবতী তখন বলিলেন, “কেন, রাজকুমারি কি রাক্ষসী? তারাও ত তোমাদের মত মানুষ বৈ ত নয়।” রতিদেবী, পদ্মাবতীকে যে সকল চিত্রপট দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র একখানিতে অশোকবনস্থিতা সীতা দেবীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। মেঘমালার মধ্যস্থিত সৌদামিনীর দ্বারা রাক্ষসী পরিবেষ্টিত। সীতাদেবী অশোকবন আলোকিত করিয়াছিলেন। সমীপবর্তী একটি বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হস্তমানের নয়ন হইতে তাঁহার অবস্থা দর্শনে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। চিত্রে এইরূপ অঙ্কিত ছিল। সরলাবালার হৃদয় সে দৃশ্যে বিগলিত হইল। পদ্মাবতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সখীকে বলিলেন ; “সখি, এ সকল জ্ঞেতা যুগের কথা, তবু এখনও মনে হলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়।” এইরূপ বৈশ্বাসেই মধুসূদন পদ্মাবতীকে অবতারিত করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার সরলতার ও মাধুর্যের পরিচয় দিয়াছেন। রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহের পর যখন কলিদেবের প্ররোচনার উত্তেজিত রাজগণ বিদর্ভনগর অবরোধ করিল, তখন পদ্মাবতী আবুলহুদয়ে সখীকে বলিলেন ;—

“সখি, আমার মত হতভাগিনী কি আর দুটি আছে ? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্ত কি কৈশই না পেলেন। আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সময় আরম্ভ হয়েছে,

বমি ভগবতী পার্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে, আমাকে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে ? হে বিধাতা : তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখ নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমায় তিরস্কার করি না ; তুমি আমাকে অশ্রুর সুখনাশিনী করলে কেন ?”

কোমলহৃদয়া বালিকার অতি মনোহর চিত্র ! কোমলতা ও করুণা ব্যতীত পদ্মাবতীর চরিত্রের আর কোন উল্লেখযোগ্য গুণ নাই। হিন্দুবালিকার চরিত্রে আর কিইবা থাক সম্ভব ? মধুসূদন, পরে কৃষ্ণকুমারী নাটকে কুমারী কৃষ্ণার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, পদ্মাবতীতে তাহারই প্রথম রেখাপাত হইয়াছে। নাটকীয় লক্ষণ অল্পসারে বিচার করিলে পদ্মাবতী মধুসূদনের অপর দুইখানি নাটক অপেক্ষা নিকট ; কিন্তু, তাহা হইলেও, ইহা কুমারী কৃষ্ণার ও শর্মিষ্ঠার সহোদরা হইবার অযোগ্য নয়।

পদ্মাবতীর ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন কুরুপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পদ্মাবতীর ভাষা অনেকাংশে শর্মিষ্ঠার ভাষা অপেক্ষা নাটক রচনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

পদ্মাবতীর ভাষা।

ইহা সরল এবং অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতা শূন্য। মধুসূদন ইহাতে গল্প ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। পদ্যগুলি অমিত্রচ্ছন্দে লিখিত। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তনের জগুই মধুসূদনের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়াছে। কিন্তু কি অবস্থায় তিনি অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল—বাক্সালা ভাষায়
অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য ।
[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

১০

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সঙ্ঘ হইতে মধুসূদন কলিকাতার যে সকল
সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন,
অমিত্রচ্ছন্দ সঙ্ঘে তাঁহাদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত
কথোপকথন । মধুসূদন ইহাদিগের নিকট বেক্স উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, পাঠক তাহাও অবগত আছেন । ইহাদিগের
দুইজনের ভ্রাতৃ মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও মধুসূদনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ।
মধুসূদন কবি এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন কাব্যানুসারী ; সুতরাং তাঁহাদিগের
মধ্যে অতি অল্পদিনেই বিশেষ বনিষ্ঠতা উৎপন্ন হইয়াছিল । কাব্য ও সাহিত্য
সঙ্ঘে তাঁহারা অনেক সময়ে, নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন । মধুসূদন
যে সময় তাঁহার শর্মিষ্ঠা নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় একদিন নাটক
ও অমিত্রচ্ছন্দ সঙ্ঘে কথা পাড়িলে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন ;
“যতদিন বাক্সালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না হইবে ততদিন বাক্সালা নাটক
সঙ্ঘে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই ।” মহারাজা শুনিয়া বলিলেন,
“বাক্সালা ভাষার বেক্স প্রবণতা, তাহাতে যে ইহাতে, কোন দিন, অমিত্রচ্ছন্দ
প্রবর্তিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প ।” মধুসূদন বলিলেন ; “আমি
তাহা মনে করি না । চেষ্টা করিলে আমাদিগের ভাষাতেও অমিত্রচ্ছন্দ
প্রবর্তিত হইতে পারে ।” মহারাজা বলিলেন, “বাক্সালা ভাষার গঠন বিবেচনায়
ইহাতে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে । করালী ভাষা
আমাদিগের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি বতদূর অবগত আছি,
তাহাতে ইহাতেও অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই ।” মধুসূদন বলিলেন ;
“সত্য ; কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাক্সালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার
হুহিতা ; এক্ষণ জননীর সম্ভাবনের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় ।” মধুসূদন এবং
মহারাজার মধ্যে কিয়ৎকাল এইরূপ বাদানুবাদের পর মধুসূদন বলিলেন ;
“আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে

তাহার প্রত্যেক প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দে কোন রচনা কবিতা আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?” অপর কেহ সে অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয়ত তিনি উপহাসাস্পদ হইতেন; কিন্তু মধুসূদনের শক্তি সৰ্বক্ষে তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের কথা শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, আমি তাহা হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রচ্ছন্দে রচিত গ্রন্থ মুদ্রাক্ষরের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিব।” আপাততঃ তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত সময় যে কত মহৎ কার্য সম্পাদিত হয়, উপরিউক্ত ঘটনা তাহাব একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। তাঁহাদিগের সেই কথোপকথনের ফলে বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে যে ভবিষ্যতে কিরূপ পরিভ্রবন ঘটিবে, মহাবাজা যতীন্দ্রমোহন বা মধুসূদন কেহই তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষায় একটি সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ প্রবর্তিত হইয়াছে, অথবা কেবল নূতন ছন্দ কেন? সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা শ্রোত এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইতে আবম্ভ করিয়াছে।

মধুসূদন যে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহাব করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার কারণ। আত্মোপাস্ত অমিত্রচ্ছন্দে একখানি নাটক বচনার জন্ত মধুসূদনের তখনই বাসনা ছিল; কিন্তু সেক্ষণ আমূল পরিবর্তন করিলে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের আদরগীয় হইবে না ভাবিয়া, তিনি পদ্মাবতী কলিদ্বেব অংশমাত্র অমিত্রচ্ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত উল্লিখিত কথোপকথনের পূর্ব হইতে তিনি মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা কবিতাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যে, আহাৰ নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, তিনি যে দুই বাঙ্গালী কবির গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অনেক দিনের পর আবার তিনি তাঁহার সেই প্রিয় কবি কাশীদাসের ও কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জননী প্রকৃতির অল্পগ্রহে তিনি কবি-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া, তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রবণতা বুঝিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্য হইতে তিনি অমিত্রচ্ছন্দের গঠন প্রশালীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রিয়তাবশতঃ তাঁহার কণ সহজেই শব্দের হ্রস্ব, দীর্ঘ নিরূপণে ও বর্ণসংস্থান জনিত মাধুর্য অল্পভবে লক্ষ্য হইল। কিস্যদিনের মধ্যেই তিনি, তিলোত্তমার প্রথম ও তিলোত্তমা-সম্ব রচনা।

দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন। তখন কাহারও আর সন্দেহের কারণ রহিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে এবং স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি স্থপতি



महाराजा नारा बडौन्द्रमोहन ठाकुर, K. C. S. I.

ব্যক্তিগণ একবাক্যে, স্বীকার করিলেন যে মধুসূদন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন। সেদিন মধুসূদনের জীবনের যে কি আনন্দের দিন, তাহা বর্ণন করা নিম্প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই মধুসূদনের আনন্দে আনন্দিত হইলেন। ডাক্তার মিত্র মহোদয়ের সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তখনকার শিক্ষিত সমাজের অগ্রতম মুখপাত্র ছিল। তিলোত্তমার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ তাহাতে প্রকাশিত হইল। বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক স্থপণ্ডিত ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কাব্যের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ হইলে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন আনন্দের সহিত, তাহার মুদ্রাক্ষেপের প্রতিশ্রুত ব্যয় প্রদান করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

যে দেশে কোন গুণবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ সৌভাগ্যবান; কিন্তু যে দেশে গুণবানের সমকালে তাঁহার গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকেন, সে দেশ আরও অধিক সৌভাগ্যবান। পতিত বঙ্গভূমি বড়ই সৌভাগ্য যে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাদিগের গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির একান্ত অভাব হয় নাই। বজ্রের আদি কাবি বিদ্যাপতি হইতে মধুসূদন পর্যন্ত প্রত্যেকেরই জীবনে এ কথা সপ্রমাণ হইতে পারে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের, মুকুন্দরাম রাজা রঘুনাথদেবের এবং ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির, মুকুন্দরামের এবং ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে তাঁহাদিগের উপজীব্য মহাশ্রাণের নাম যেমন জড়িত আছে, মধুসূদনের নামের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নামও তেমন জড়িত থাকা সম্ভব। সামান্য অর্থসাহায্যের জন্ত নয়, মধুসূদনের প্রতিভা বুঝিয়া, তাঁহার। যে তাঁহার সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্তই তাঁহাদিগের প্রশংসা। রত্ন ও কাঞ্চন পরস্পর মিলিত হইলে উভয়েরই সৌন্দর্য বর্ধিত হয়; গুণবানের সহিত গুণগ্রাহী পুরুষের সম্মিলন হইলে উভয়েরই গৌরব বর্ধিত হইয়া থাকে। ইহারাও যেমন মধুসূদনের প্রতিভার সম্মান করিতেন, মধুসূদনও তেমনই ইহাদিগের গুণগ্রাহিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনেরও সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ইহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। সাহিত্য সম্বন্ধে ইহার মতামতের উপর তিনি বিশেষ আস্থা সংস্থাপন করিতেন। তাঁহার কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তিনি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

প্রথমে ইঁহাকে দেখাইয়া এবং ইঁহার পরামর্শানুযায়ী সংশোধন করিয়া, পরে তাহা প্রকাশিত করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন যখন বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর লোককে তাঁহার সাহিত্য-শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন; উপহাস, ব্যঙ্গ এবং কটুক্তি যখন তাঁহার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইত, তখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতৃ হই চারিজন গুণগ্রাহী স্বজ্ঞদের আশ্বাসবাক্য ও সহায়ত্বই তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষন্দ-পক্ষপাতী লোকের অভাব নাই, কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশের সময়ে এ অবস্থা ছিল না। সে সময় যাহারা ইঁহার প্রচার সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাঝেরই সম্মানেব পাত্ত। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন সম্বন্ধে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার একরূপ প্রশংসা করিতেছি। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার যে কি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিবে, মধুসূদনের ভ্রাতৃ মহারাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কার্যের প্রারম্ভে তাহার গুরুত্ব অগ্রাহ্য করিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ কার্যের সূচনা দেখিয়াই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারেন, এবং সেইজন্যই সমাজে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য-সংসারে, তখনও, একরূপ অপরিচিতনামা মধুসূদন, অপ্রচলিতজন্মে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দেশেব অনেক কৃতবিশ্ব ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার দ্রুতি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; এই সময় ভবিষ্যতের ভ্রাতৃ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যে সেই কাব্যের ভাবি গৌরব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার দূরদর্শিতার পক্ষে

অবশ্যই বিশেষ গৌরবজনক। মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমা তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে মধুসূদনের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভাবিত্য এবং যে অবস্থায় তিলোত্তমা রচিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহা-বাণী।

দিগের উভয়ের জীবনে চিরস্মরণীয় কবিরাজ জন্ত, উভয়ের উপহার প্রদানকালীন অবস্থার একখানি ছায়াচিত্র (Photograph) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মধুসূদন তিলোত্তমা উপহার দিতেছেন এবং মহারাজা তাহা গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবের ছায়াচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন সাহিত্যের পক্ষে কিরূপ মহৎ কার্য বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা ছিল, উপরিউক্ত ঘটনা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। মধুসূদন তিলোত্তমার স্বহস্তলিখিত পান্থলিপি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে উপহার প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

“বে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিবরে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এক্ষণ পরীক্ষার ফল, সত্যঃ, পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেশীর চরণ হইতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিত্যায় আচ্ছন্ন থাকিবে যে, কি দিকার, কি মন্তব্য, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।”*

মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে কিনা, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মহারাজা স্বতীন্দ্রমোহনও এ সৎক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিফল হয় নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব হইতে বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক উন্নততর যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে।† মধুসূদন তাঁহাকে তিলোত্তমার সহস্র লিখিত পাণ্ডুলিপি উপহার প্রদান করিলে মহারাজা তাহার প্রভুত্বেরে তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলেন নিয়ে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষরে রচিত প্রথম কাব্য যাহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তিনি তাহার অল্পপৃষ্ঠ নহেন।

MY DEAR SIR,

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves, I feel sure that my

* তিলোত্তমার উৎসর্গ পত্র।

† পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার সাথিত্রী লাইব্রেরীতে অভিযুক্ত বক্তৃতার বলিয়া ছিলেন যে, “আমরা বাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ঘরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এক্ষণ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদের সেই ক্রমোচ্চারণ কুর করিয়া দিল একান্ত বাঞ্ছিত হইব। তিলোত্তমা-সম্ভবের পর যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাক্ষ্য বলিতে আমরা কিছুমান্য স্থগিত নহি।”

descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscripts in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.

I quite forgot to mention in my last letter that I have read পদ্মাবতী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short, the play is well worthy of the author of *Sharmista*; but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite দৈত্যরাজবালা। It may be that a longer and more intimate acquaintance with her has made me partial to her merits; but this is simply a matter of opinion, and I hope you will not take my remarks amiss.

Praying sincerely that you may live long to adorn the literature of our mother country with your inestimable contributions.

I remain,

Very sincerely yours.

22nd May, 1860.

J. M. Tagore.

আমরা বলিয়াছি যে, আত্মোপাত্ত অমিত্রজ্ঞানে একখানি নাটক রচনার জন্য মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পাছে তাঁহার নাটক অভিনয়োপযোগী ও সাধারণের প্রীতিকর না হয়, সেই ভয়ে তিনি সহসা তাঁহার সকল কার্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। এখন সাধারণ যাত্রাওয়ালা হইতে বিদ্যালয়ের বালকেরা পর্যন্ত অমিত্রজ্ঞান হ্রাসকরণে আবৃত্তি করিতে পারে; কিন্তু তখন

অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও অমিত্রচন্দ্র পাঠ করিতে কৌতুকজনক ভ্রম করিতেন। অমিত্রচন্দ্র যে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী হইবে, কেহই তখন তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু মধুসূদন এই সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে, অমিত্রচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের অন্ত্রপযোগী হইবে না। তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, মহারাজা তাহার প্রত্যুত্তরে তাহাকে বাহা লিখিয়াছিলেন নিয়ে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন তাহার নিকট কিরূপ সংপরামর্শ প্রাপ্ত হইতেন। পত্রখানি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের তৃতীয় অধ্যায় রচিত হইবার পরে লিখিত।

MY DEAR SIR,

Here is the third book of your poem. I have marked a few passages which in my humble opinion require annotations, either for the want of perspicuity, to some extent, or for the mythological references which are obscure to the general reader without the help of explanatory notes. I have also taken the liberty to make a few remarks here and there, which, however, I submit to your judgment to determine how far they are just.

I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgment. Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for that would make the

thing at once unpopular and injure the cause for many years to come. Such are my sentiments on the subject, but I need hardly add that I am always open to correction. I am sorry to say, however, that I cannot hold out much hope as to your seeing, soon, such plays acted on the stage ; for I am led to believe that the Rajas will have no more Bengali plays at the Belgachia Theatre, and as for my brother's stage, I am afraid that Malabika must be the first and the last drama that is represented there.

Apologising for the length of this letter, I remain, with best regards.

Yours very sincerely,

J. M. Tagore.

কি অবস্থার তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য রচিত হইয়াছিল আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এইবার ইহার বর্ণনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তিলোত্তমা-সম্ভব হৃদয়, উপস্থানের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

হৃদয় উপস্থানের উপাখ্যান পুরাণজ ব্যক্তিমাজেরই পরিচিত।

তিলোত্তমাসম্ভবের
বর্ণনীয় বিষয়।

মহাস্বর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর দেবগণ, দৈত্যবীরস্বয়ের
প্রচণ্ড ভূজবল সহ্য করিতে না পারিয়া, দিগ্‌দিগন্তে

পলায়ন করিয়াছেন। দেবগণের বিলাস-নিকেতন স্বর্গপুরী দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। বায়ু, অগ্নি, যম প্রভৃতি দিকপালগণ, পলায়ন করিয়া, ত্রাঙ্গলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র, এই বিপৎপাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হিমাচলের নিভৃত শৃঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। স্বরলোকের এই অবস্থার সঙ্গে তিলোত্তমা-সম্ভব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রায়ের প্রারম্ভেই ধবলাচলের গম্ভীর মূর্তি পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সে দৃষ্ট অতি ভীষণ এবং অতি বিস্ময়কর। সেখানে বৃক্ষলতা নাই, পশুপক্ষী নাই, বনচর প্রাণীমাত্র নাই। কেবলই চিরধবল ভূবার-ভূগ, তপোনিমগ্ন ধ্যামকেশের ভ্রায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিমাচলের তির্যাককারময় গহ্বর হইতে জলস্রোত, পাতালবাহিনী ভোগবতীর ভ্রায় মধা কোলাহলে নিঃসৃত হইতেছে। পর্বতোচ্ছিত প্রচণ্ড বায়ু, কতের প্রলয়কালীন নিখাণের ভ্রায়, প্রবাহিত হইতেছে; এবং ভূতনাথের অলঙ্কার ভূতগণের ভ্রায় জলদকাল ধবল শৃঙ্খের চতুর্দিকে অবিরাম উত্তীর্ণমান হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র একাকী এই নির্জন স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। স্বর্গপুরীর বিলাস-
 লামগ্রীসমূহ অঙ্গরাগণের নৃত্যগীত, এবং দিক্‌পালগণের
 দৈত্য-প্রপীড়িত দেবরাজের হিমাচল-
 শূন্যে অবস্থিতি।
 সমুদ্রগর্ভ হইতে কুলে নিক্ষিপ্ত মংস্তরাজ তিমির স্তায়
 দেবরাজ এক্ষণে অসহায় ও আশ্রয়-শূন্য ; তাঁহার জ্যোতির্ময়
 অস্ত্র বজ্র, ধনু এবং তুণ, তাঁহার সম্মুখে, লুপ্তিত হইতেছে। ত্রিদিবনাথ, অনাথের
 স্তায়, আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছেন। তিলোত্তমার এই প্রারম্ভ অংশ
 গান্ধীর্ষে কীটস্ (Keats) প্রণীত হাইপিরিয়নের (Hyperion) অনুরূপ।
 দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া
 হিমাচল-শৃঙ্গে পতিত হইল। রজনীদেবী, চিরসহচরী নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে লইয়া
 ধবল-শিখরে পদার্পণ করিলেন। দেবরাজ চিন্তাময়; প্রণতা দেবীষ্মকে সম্ভাষণ
 করিলেন না। যাহাতে নিদ্রাগমে দেবরাজ তাঁহার মর্যাদিক বাতনা বিস্তৃত
 হইতে পারেন, তজ্জন্ত নিশাদেবী, নিদ্রাদেবী এবং স্বপ্নদেবী প্রত্যেকেই
 আপন আপন সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের
 উদ্ভব নিফল হইল। উৎকর্ষায় দেবরাজ একবারও চক্ষু নিমীলিত করিতে
 পারিলেন না। দেবীগণ বুদ্ধিত পারিলেন যে, দেবরাজমহিষী শচীদেবী ভিন্ন
 আর কাহারও এ অবস্থায় দেবরাজকে সাহায্য দিবার শক্তি নাই। স্বপ্নদেবী
 তখন শচীদেবীকে ধবল-শিখরে আনয়নের জন্ত, আকাশ-পথে, প্রস্থান করিলেন।
 কণকাল পরেই

“আচম্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল,
 উজ্জলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
 ঠলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ,
 টটিল অম্বর পথে ; কিবা স্বিরাষ্পতি
 ধরণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
 টদয় অচলে আসি দিলা দরশন ;
 যতেক যোজন বেড়ি আলোকমণ্ডল
 শোভিল আকাশে যেন রক্তের ছটা
 নীলোৎপল দলে, কিবা নিকবে যেমতি
 হৃৎকণের রেখা দেখা বক্র চক্ররূপে।”

কেই আলোকমণ্ডলের অভ্যন্তরে

“চরণ ধরণ রাখি যেরূপে দিগে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

নীল জলে বস্ত্রোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিন্দা মাধবের বৃকে কোমল বতন ।
দশচক্র পড়িবে রাজ্যাব পদতলে
পূজা ছলে বসে সেখা স্বধের সদন ।
কাঞ্চন মুকুট শিবে—দিনযগি তাহে
যগিরূপে শোভে ভান্ন, পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী—কামবধু বতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা ঝাঁপিতে বাসবে ।

* * * *

অলিপংক্তি—রতিপতি ধনুকের গুণ—
সে ধনুরাকার বরি বসিয়াছে স্থখে
কমলনয়নযুগোপরি মধু আশে ।

* * * *

পদ্মরাগ খচিত পদ্মেব পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র, হু অঞ্চলে জলে বহাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা ।

* * * *

ভুবনমোহিনী দেবী এসি মঘাসনে,
আহলা অনব পথে মুহুমন্দগতি ।”

পোলোমীর আগমনের শব্দে চিরভুযাবারত ধবল শব্দে সহসা বসন্তঋতুর
আবির্ভাব হইল । এহ অকাল-বসন্তোদগম মধুসূদন কুমাব সন্তবের আদর্শে
রচনা করিয়াছেন । বৃক্ষ সকল পল্লবিত এবং লতিকাগণ
শরীদেবীর আগমন ।

মঞ্জরিত হইল । মধুপ কুল, মকবন্দ-লোভে আনন্দধ্বনি
করিতে করিতে, সেখানে উপস্থিত হইল এবং বসন্ত-দূতের কলকণ্ঠে চতুর্দিক
মুখরিত হইয়া উঠিল । রতিব নিঃখালের জ্বায় স্বরভি সমীপে চতুর্দিকে
প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং পর্বতের পাষাণ দেহ বিদীর্ণ করিয়া শত শত
উৎস উৎসারিত হইল । যগি-মুক্তা খচিত সোপান অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রানী ধবল-
শিখরে আরোহণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক হৈমবরকতময়
সিংহাসন প্রসারিত রহিয়াছে । সহস্র সহস্র কুসুম-সুশোভিত পাদপ শাখায়
শাখায় লবঙ্গ হইয়া তাহার উপর এক স্বন্দর কুম্ভাঙ্কুরণ নির্মাণ করিয়া

রাখিয়াছে। সেই কুসুমবিতানের অভ্যন্তরে কুসুমলক্ষ্মীকৃপণী, কমলবসনা—
—কমলভূষণা—কমলায়ত-নয়না—কমলবাসিনী-সদৃশী—নগ-বালিকাগণ, তাঁহার
অভ্যর্থনার জন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে
অর্থ্য, কাহারও হস্তে ধূপদান। এবং কাহারও হস্তে বা বীণা, সপ্তস্বর প্রভৃতি
বাস্তবজ্ঞ। ইন্দ্রানীকে দেখিবামাত্র পার্বতীয়া যুবতীগণ, মহানন্দে নৃত্যগীত
করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। নগ-বালিকাগণ নিম্নক হইলে শচীদেবী
দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে কনকময় সিংহাসনে দেবরাজ আসীন রহিয়াছেন।
পৌলোমীর চির-পরিচিত পদশব্দে দেবেজের বিবাদ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি
সমহৃৎ-ভাগিনী পত্নীকে, সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, দিক্‌পালগণের কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন। ইন্দ্রানী বলিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দেবেজের জন্ত অপেক্ষা
করিতেছেন। দেবরাজ শুনিবামাত্র তাঁহার তেজঃপুঞ্জ ব্যোমযান স্বরণ করিলেন,
এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া সপত্নীক ব্রহ্মলোকে গ্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি দেবদম্পতীর ব্রহ্মলোকে গমন, অতি নৈপুণ্যের
সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। দেবযান, মেঘলোক ভেদ করিয়া এবং রথচক্রের

দেবদম্পতীর
ব্রহ্মলোকে গমন।
ঘণ্ট শব্দে দিগ্‌ধারণগণকে উদ্বেষিত করিয়া উর্ধ্বে উখিত
হইল। অলক্ষণের মধ্যে দেবদম্পতী নীলায়ু মধ্যস্থিত
রজোদ্বীপের শ্রায় চন্দ্রলোক এবং রাশিচক্র মধ্যস্থিত
সূর্যলোক অতিক্রম করিলেন। দেবযান আরও উর্ধ্বে উখিত হইল। অকস্মাৎ
সহস্র দিবাকরপ্রভা সদৃশী প্রভা দেবদম্পতীর নয়ন যুগল ঝলসিত করিল। সেই
অদৃষ্টপূর্ব আলোক দর্শনে পৌলোমী সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলেন, দেবরাজ
অন্ধি আবৃত করিলেন এবং মাতলি সারথি, সংজ্ঞাশূন্যের শ্রায় রথের রশ্মি ছাড়িয়া
দিলেন। দেবযানের অচঞ্চল পতাকা সেই অদ্বৃত আলোকে দিবাভাগে ধূম-
কেতুর শ্রায় বিমলিন হইল। রথ দেখিতে দেখিতে কারণ-সলিল-বন্ধে-বিরাজিত
ব্রহ্মলোকের সমীপবর্তী হইল। অস্বর-ভয়-ভীত স্বরসৈনিকগণ ব্রহ্মলোকের
দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বহুদিনের পর দেবরাজকে দেখিতে পাইয়া,
তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং বায়ু, বম, অগ্নি প্রভৃতি দিক্‌পালগণ
আসিয়া দেবরাজকে বেষ্টন করিলেন। উপস্থিত বিপৎপাতে কি করা কর্তব্য,
তাহা স্থির করিবার জন্ত দেবরাজ দিক্‌পালগণের সঙ্গে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই মন্ত্রণা-সভার বক্তৃতা হইতে মধুসূদন বায়ু ও বম প্রভৃতি দিক্‌পালগণের
প্রকৃতি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃদ্ধ-সংহারে আমরা যে সকল
মনোহর চিত্র প্রাপ্ত হই, তিলোত্তমাসম্ভবে তাহার অনেকগুলি প্রথম

রেখাপাত হইয়াছে। পাতালপুরস্থিত দেবগণের সভা, স্রমেকশৃঙ্গে দেবরাজের তপশ্চর্যা, ব্রহ্মলোক, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মান ভবনে বজ্র-নির্বাণ দেব-সভা।

প্রভৃতি বৃজসংহারের কবি দেবেন্দ্রকে উচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়াছেন, তাহারও আদর্শ তিলোত্তমায় লক্ষিত হইবে। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসী, ইন্দ্রিয়সেবক এবং অস্ত্রের সৌভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণ। অপরের স্বর্থ ও সৌভাগ্য বিলুপ্ত করিয়া আত্ম-মহাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার ইন্দ্র-চরিত্র।

অভ্যাস ও প্রকৃতি। আশ্রিত জনের জগ্ন উৎকর্ষা এবং বিজিত শত্রুর প্রতি দয়া তাঁহার চরিত্রে বড় লক্ষিত হয় না। কিন্তু তিলোত্তমার ইন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠ, আশ্রিতজনের দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবদ্ভিচার উপর নির্ভর-শীল। নিজের দুঃখে তিনি দুঃখিত নহেন, তিনি বিধাতাকে বলিয়াছিলেন,

“* * * কিঙ্ক নহি নিজ দুঃখে দুঃখী,
স্বজন, পালন, লয় তোমাব ইচ্ছায়,
ভূমি গড়, ভূমি ভাঙ, বজায় বাথহ
ভূমি, কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবাব দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।

* * * হায়রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোব আশ্রিত যে জন,
রক্ষিতে তাহাবে মম না হয় ক্ষমতা।”

বায়ু ও ষমের সৃষ্টিধ্বংসের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

“পালিতে এ বিপুল জগৎ,
স্বজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন,
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম, জয় তথা।
অস্ত্রায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
স্বরাস্ত্রে বিভেদ কি থাকিবেক কহ?”

পৌরাণিক ইন্দ্র-চরিত্র মধুসূদনই, প্রথমে, এইরূপ উজ্জলবর্ণে চিত্রিত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৃজসংহারে ইহারই পূর্ণতাসাধন হইয়াছে। বৃজসংহারের কবির মৌলিকতা। অপনোদনের জন্ত আমরা এ সকল কথা বলিতেছি না; তিলোত্তমার কোন, কোন চিত্র বস্তুর আর একজন প্রতিভাবান্ কবির করুনা উদ্দীপনে কিরূপ কাব্য করিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্তই আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। দেবরাজকে আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত করা

মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দেবরাজ আদর্শ পুরুষ হইলে, সরল-প্রকৃতি অসুর বীরঘরের উচ্ছেদের জন্য, তিলোত্তমাকে প্রেরণ করিতে পারিতেন না রাজনীতি ও ধর্ম, জগতে এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, মধুসূদনও তাহার অন্তর্থা করেন নাই। দেবরাজের চরিত্রের জায় তিলোত্তমার অন্তান্ত দেবগণেরও চরিত্র বখাযোগ্য সুরক্ষিত হইয়াছে। সমবেত দেবগণের প্রত্যেকেই আপন, আপন প্রকৃতি অনুসারে দেবরাজকে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। সৃষ্টিনাশই যমের ব্যবসায়; দয়া মায়ী অন্তকের ধর্ম নয়। তিনি বলিলেন, এ অপমান সহ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নয়।

যম।

অতএব

“এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে

নাশি জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অতল জলতলে ॥”

বায়ু। বায়ু স্বভাবতঃ চঞ্চল, একবার উত্তেজিত হইলে আর রক্ষা নাই; যমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন;

“দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা

এ ব্রহ্মমণ্ডলে, দেখ সব, মুহূর্তেকে,

নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুলসুন্দর,

বাহুবলে ত্রিজগৎ লও ভঙ করি ॥”

কার্তিকের সৈনিক পুরুষ; দিকৃষ্টি ব্যতীত প্রভুর আদেশ প্রতিপালনই সৈনিকের প্রধান ধর্ম। তিনি বলিলেন, যুদ্ধে বাহা সম্ভবপর, কার্তিকের।

আমরা তাহা করিয়াছি; বিধাতার ইচ্ছার কে মর্যোন্মত্ত করিতে পারে? অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তন করাই আমাদের কর্তব্য।

“কিসের কারণে

কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,

কে পারে বুঝিতে? রাজা বাহা ইচ্ছা করে;

প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?”

বক্ররাজ ধনাধীশ্বর; সৌন্দর্যের ও ঐশ্বর্যের প্রতি অহরাসই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। ধনবান্ধব ক্ষতিলাভ গুণনায় সর্বদা অত্যন্ত; ধনাধিপ, বাহুর ও

যমের কথা শুনিয়া, বলিলেন ; লেকি, পৃথিবী বিনাশ ? এই ধনধান্তে অলঙ্ঘ্যতা,
কলরবে স্তম্ভোদ্ভিতা, বহুমতীকে আমাদিগের মধ্যে কে

কুবেব ।
এমন নিষ্ঠুর আছেন যে, দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ বশতঃ,
বিনাশ করিবেন ?

“কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ?”

প্রিয়জন রোগাক্রান্ত হইলে প্রণয়ী-হৃদয়, কি তাহার জীবন সম্বন্ধে
হতাশাস হইয়া, তাহার কণ্ঠে অজ্ঞাঘাত করিয়া থাকে ? তবে দৈত্যগণের প্রতি
আক্রোশ বশতঃ পৃথিবী বিনাশের কথা কেন ?

বরুণ জলাধিপতি ; গান্ধীর্ষ ও শাস্তি তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষণ ; তিনি
বলিলেন ;—

বরুণ ।

“আমরা সকলে

বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি,
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা,
সে জনের ? দাস সদা প্রভু আজ্ঞাবাহী ।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি,
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা ।
চল যাই ধাতার সমীপে দেবগণ ।
সাগর আদেশে যথা তরঙ্গ নিকর,
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁকর সাগর পাশে যায় তারা কিরি,
হীনবল ; চল মোরা যাই দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি—পদ্মাসন পিতামহ ।”

বরুণের মুখে প্রতীহত সাগর-তরঙ্গের সহিত পরাজিত দেবগণের তুলনা
যেমন সুন্দর, তেমনই স্বভাব-সঙ্গত হইয়াছে । ব্রহ্মার নিকট গমনই শেষে,
সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইল । তিলোত্তমা-সম্ভবের এই অংশ মধুসূদন
কুমারসম্ভবের আদর্শে রচনা করিয়াছেন । দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব, অবিকল
কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত হইয়াছে । দেববাক্য চিরদিনই প্রহেলিকাময় ; বিধাতা
দেবগণের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন ;

* * * “ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অত্র পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।”

দেবতারা, বিধাতার এই প্রহেলিকাময় আদর্শের মর্মভেদ করিতে সক্ষম না
হইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে, তাহার অর্থ করিবার চেষ্টা
করিলেন। এই সময় দৈববাণী হইল ;

“আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায় অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।

* * * * *

তাহ’তে হইবে নষ্ট ছুটি অমরারি।”

দেবরাজ, শুনিবামাত্র বিশ্বকর্মাকে আনয়নের জ্ঞাত, বায়ুদেবকে তাঁহার নিকট
প্রেরণ করিলেন। বায়ুদেবের বিশ্বকর্মার পুরীতে গমনের প্রসঙ্গে কবি পথ-
মধ্যস্থিত সূর্যলোক, চন্দ্রলোক এবং সেই সঙ্গে স্বমপূরী প্রভৃতির চিত্র পাঠকদিগের
সমক্ষে অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে আমরা স্বম-
লোকের যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রাপ্ত হই, তিলোত্তমায় তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।
প্যারাডাইস লষ্টের নরকেব গ্ৰায় বিশ্বকর্মার বাসভবন উত্তরমেককে মধুসূদন
ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্ন স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। বিধাতা সৃষ্টিকালে উত্তরমেককে
জগতের সীমারূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিমিরময় মহাসমুদ্র তাহার অপর
পার্শ্বে বিরাজিত। অকুল পর্বতাকার তরঙ্গসমূহ সেই সমুদ্রবক্ষে মহাকোলাহলে
উখিত হইতেছিল। বিশ্বকর্মা বায়ুদেবকে দেখাইলেন ;—

* * * “ওই দেখ তিমির সাগর,
অকুল পর্বতাকার হাহার লহরী
উথলিছে, নিরবধি, মহা কোলাহলে ;
কে জানে জল কি স্থল, বুঝি ছুই হবে।
লিখিলা এ মেক খাতা জগতের সীমা,
সৃষ্টিকালে, বসে স্বম, দেখ ওই পাশে।

সই মহাসমুদ্রের কূলে দেব-শিল্পীর বাসভবন ; সেখানে

“ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাঙ্গ অযুত
ছোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যথা
মেঘাবৃত আকাশে ; * * *

* * * খাতু রাশি রাশি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

শৈলাকার । মূর্তিমান দেব বৈশ্বানরে
পাই, সোহাগার সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেমরসে , বাহিরিচে রক্ত জলিয়া
পুটে ; * * * *
* * * লৌহ বার তম্বু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি মহারাগে ধাতু
জলে, অগ্নি সমতেজ, অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
জলিছে ।”

ব্রজসংহারে আমরা বিশ্বকর্মার শিল্পাগারের যে সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই, তিলোত্তমায় তাহার এইরূপ প্রথম রেখাসন্নিবেশ হইয়াছে ; ছায়া ও আলোক-পাতের গুণে হেমচন্দ্র তাহাকে আরও অধিক পরিষ্কৃত ও মনোজ্ঞ করিয়াছেন ।
বায়ুরাজের মুখে দেবেশ্বরের আহ্বান অবগত হইয়া বিশ্বকর্মা তিলোত্তমার উৎপত্তি ।
ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । তাঁহার তপোবলে সৃষ্টির স্বাবর, জঙ্গম সকল পদার্থ ব্রহ্মলোকে আকৃষ্ট হইল । দেবশিল্পী, তাহা হইতে তিল তিল আকর্ষণ করিয়া, তিলোত্তমার দেহ নির্মাণ করিলেন ; স্বয়ং বীণাপাণি আসিয়া তিলোত্তমার রলনায় উপবিষ্ট হইলেন ;

“অমৃত সঞ্চারি তবে দেবশিল্পপতি
জীবাঈলা কামিনীয়ে—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা, প্রভা যেন আরা মূর্তিমতী ।

দেবগণ সেই অদৃষ্টপূর্বা নারী দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন । সেই সময় দৈববাণী হইল ;

“পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে
(অল্পময়া বামাকূলে) যথা অমরারি
সুন্দ, উপসুন্দাসুর ; * * *
* * * এ মাধুরী হেরি,
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে ।
ভিল, ভিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীয়ে
দেব-শিল্পী কেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা ।”

মধুসূদন যে বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এইখানেই শেষ হইয়াছে । তিলোত্তমার “সম্ভব” হইতেই তাঁহার কাব্যের

উপসংহার হওয়া কর্তব্য। কিন্তু পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য

তিনি আরও এক সর্গ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিলোত্তমার উপসংহার।

তিনি তিলোত্তমার সাহায্যে দেবগণের বিজয়লাভ কীর্তন করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে কাব্যের এই সর্গই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই সর্গে আমরা দেখিতে পাই, বিজয়ী দৈত্যবীরদ্বয়, বিহারার্থ, বিদ্যারণ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন;—দৈত্যপুরী আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ। দৈত্যবীরদ্বয় দিব্যাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের কণ্ঠে পারিজাত মালা এবং মস্তকে রাজহুত্র শোভা পাইতেছে। বীতিহোত্র-মূর্তি শত শত দৈত্যবীর, তাঁহাদিগকে বেটন করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বন্দীগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং নর্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। যুদধ, বীণা, সপ্তস্বর প্রভৃতি বায়ুযন্ত্রসমূহ অনবরত ধ্বনিত হইতেছে, এবং কস্তুরী, চন্দন ও পুষ্পদাম চতুর্দিকে বর্ষিত হইতেছে। দৈত্য-সৈনিকগণ আনন্দে উন্নত। কেহ স্ত্রীশ্রাব্য ভোজন করিতেছে; কেহ জলক্রীড়া করিতেছে; কেহ বা নির্জনে প্রণয়িনীর অঙ্গ কুম্ভমাল্যে ভরণে স্ত্রীশোভিত করিতেছে। চতুর্দিকে স্তপাকারে অস্ত্র, শস্ত্র সম্বিষ্ট রহিয়াছে, এবং তাহার নিকট উপবেশন করিয়া দৈত্যবোধগণ, দেবগণের সহিত সংগ্রামে দেবসৈনিকদিগের লাজনা এবং আপনাদিগের বীরত্ব পরস্পরের নিকট কীর্তন করিতেছে। দেবরাজ, দৈত্যকুলভুজঙ্গিনী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া, বিদ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে দৈত্যবীরদ্বয় বিহার করিতেছেন, তিলোত্তমা, দেবেশ্বরের আদেশে, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও স্বয়ং কামদেব অদৃশ্য ভাবে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিলোত্তমার বিলাসলীলা কবি অতি দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অপরিচিত কুম্ভমবনে কুরঙ্গিনী যেমন সজ্জতা এবং প্রতি পদে চমকিতা হইয়া ভ্রমণ করে, বিদ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়া তিলোত্তমাও সেইরূপ সভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। পত্রের মর্ম্মরে, মলয় বায়ুর হিল্লোলে, অলির স্বধ্বরে এবং আপনাদিগের পদস্থিত নুপুরের নিক্কে তিলোত্তমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তিলোত্তমার ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া বিদ্যারণ্যবাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। বনদেবী কুম্ভমদাম প্রথিত করিতেছিলেন; তিলোত্তমাকে দেখিয়া, অলকাস্ত্র উত্তোলন পূর্বক, অনিমেঘ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বনদেব তপস্বী, নয়নযুগল মুদিত করিলেন; এবং বিদ্যারণ্য-বিহারী যুগেন্দ্র, জগদ্ধাত্রী ভ্রমে তাঁহাকে পৃষ্ঠালন প্রদান করিল। সরোবরের নির্মল জলে আপনাদিগের প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া তিলোত্তমা, মিস্টনের প্যারাডাইস্ লেটের ইভের (Eve) স্তায় আপনাদিগের রূপে আপনি বিমোহিত হইলেন। কাননপথে ভ্রমণ করিবার সময়,

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

* * * কত স্বর্ণলতা

সামিল, ধরিয়া আঁহা রাঙা পা দুখানি,
 থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীকহ,
 মোহিত মদনমদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
 কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
 কপোতীর সহ ; কত গুণ গুণ করি,
 আরাধিলা অলিদল, কে পারে কহিতে ?
 আপনি ছায়া, স্তম্ভরী ভাঙ্গ-বিলাসিনী,
 তরু-মূলে, ফুল-ফল ডালায় সাজায়ে,
 দাঁড়াইলা, সখিভাবে বসিতে বামারে ;
 নীরবে চলিলা, সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
 কলরবে প্রবাহিনী—পর্বত-তুহিতা
 সন্ধ্যাখিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
 নাচিল. হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীয়ে ।

* * * * *

সাহসে সুরভি বায়ু, তাজি কুবলয়ে,
 মুহুমূহু, অলকাস্ত উড়াইয়া কামী
 চুইলা বদন-শশী । তা দেখি কোতুকে
 অন্তরীক্ষে মধুসূহ মদন হাসিলা ।

এদিকে দৈত্যবীরদ্বয় মহানন্দে বনবিহার করিতে করিতে যেখানে
 তিলোত্তমা নিরুজ্জ্বলভাস্তরে উপবিষ্টা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ।
 তিলোত্তমার বরবপুর সৌরভে কানন আমোদিত হইতেছিল । সেই অপূর্ব
 সৌরভ আভ্রাণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরকে বলিলেন ;

* * * কি আশ্চর্য দেখ,

দেখ ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরভে
 বনরাজী ! বসন্ত কি আবার আইল ?
 আইল, দেখি, কোন ফুল ফুটি আমোদিত
 কানন ।”

কিন্তু কুসুম নয়, তাঁহাদিগের সর্বনাশের জন্ত, কুসুমাবৃত্তা ভূজদ্বিনী সেই
 বনে আবির্ভূতা হইয়াছিল । ভ্রাতৃদ্বয় দেখিতে পাইলেন, প্রস্তুতিত কুসুমদামের

অভ্যন্তরে কুসুমলক্ষ্মীকুপিনী তিলোত্তমা শোভা পাইতেছেন। সেই অপূর্ব মূর্তি দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় বিস্মিত হইলেন। স্তম্ভ কনিষ্ঠ উপস্তুম্ভকে বলিলেন ;

“কি আশ্চর্য দেখ ভাই, * *

* * * নিকুঞ্জ মাঝারে

উজ্জল এ বন বৃক্ষি দাবায়ি-শিখাতে

আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি

গৌরী। চল, বাই দ্বরা পূজি পদযুগ :

দেবীর চরণপদ্ম—পদে যে সৌরভ

বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি।

মোহমুগ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়, মহাশক্তি ভ্রমে, তিলোত্তমার চরণ-যুগল পূজার জগ্ৰ ধাবিত হইলেন ; এদিকে মধুসহ মন্থথ, অস্তুরীক্ষ হইতে, শরঙ্গালে তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। উন্নতের জ্বায় উভয়েই, এক সময়ে তিলোত্তমার এক একটি কর ধারণ করিলেন। দৈত্যাকুলের সর্বনাশ হইল। কামাভিভূত উপস্তুম্ভ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, রোষভরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;

“* * কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে

ভ্রাতৃবধু তব বীর ? * *

স্তম্ভ বলিলেন ;

“বরিণু কল্যায় আমি তোমার সম্মুখে

এখনি ! আমার ভার্য্য, গুরুজন তব ;

দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।”

ক্রমে, রোষাবেশে, উভয়েই শাণিত অসি নিক্ষেপিত করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিলেন। বিধাতার নির্বন্ধ পূর্ণ হইল ; উভয়ের অন্ত্রে উভয়ে আহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

দৈত্যবীরদ্বয়ের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র দেবগণ দৈত্য-দেশ বেষ্টন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দৈত্যপুরী আশান-ভূমিতে পরিণত হইল। অস্ত্রাশ্র দেবগণকে নিহ্নেরের জ্বায় পরাজিত দৈত্যবীরদিগকে বিনাশ করিতে দেখিয়া দেবরাজ স্বয়ংকনি পূর্বক সকলকে নিবারণ করিলেন। তিলোত্তমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্বে কবি দেবরাজ সম্বন্ধে যে উচ্চ আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, চতুর্থে গর্বে তাহারই অল্পকম লক্ষিত হয়। দেবরাজের আদেশে দৈত্যবীর-

ঘরের দেহ চন্দন-কাঠ-নির্মিত চিতায় ভস্মীভূত হইল। তাঁহাদিগের পত্নীগণ, তাঁহাদিগের অঙ্গগামিনী হইয়া, স্বর্গগমন করিলেন; দেবকার্য সম্পূর্ণরূপে হুসিদ্ধ হইল। তিলোত্তমা, দেবেশ্বরের আজ্ঞায়, স্বর্ষলোকে প্রস্থান করিলেন; তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য সমাপ্ত হইল।

তিলোত্তমা-সম্ভবে মধুসূদন আত্মোপাস্ত পৌরাণিক ঘটনার অম্লসরণ করেন নাই; ইহার অনেক স্থানই তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত, অথবা অস্ত্রান্ত্র কাব্যের

ছায়াপাতে গঠিত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার ত্রায় তিনিও তিলোত্তমাসম্ভবের বিবিধ কাব্য হইতে তিল, তিল রূপে তাঁহার গ্রন্থের দোষভণ।

উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ হইতে তিল, তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি, যেমন ভারতীয় প্রাচীন কবিগণের উৎকট কল্পনার নিদর্শক, যে অভিনব আকারে মধুসূদন তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের সমক্ষে অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও তেমনই কোতূহলোদ্দীপক। চিরভূষাধারিত হিমাচলে দেবরাজের অবস্থিতি, বায়ুদেবের বিশ্বকর্মার নিকট গমন এবং উত্তর মেরুস্থিত বিশ্বকর্মার পুরী প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীব বিশ্বাস্যকর। তিলোত্তমার ভাষাও বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী। ইহার পূর্বে যে সকল বাঙ্গালা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানিরই ভাষা অথবা ভাব ইহার ত্রায় গাম্ভীর্যপূর্ণ নহে। কিন্তু এই সকল গুণের সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভবে কতকগুলি দোষও বর্তমান আছে। ইহার ভাষা অনেক স্থলে কৰ্কশ, ইহার ভাব, পুঞ্জীকৃত অলঙ্কারের সমাবেশে, অনেক স্থলে দুর্বোধ্য; এবং প্যারাডাইস্ লষ্টের ত্রায় ইহাতেও (human interest) মানবচিন্তাকর্ষক ঘটনার অধিক উল্লেখ নাই। আমরা ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রকৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু আকৃষ্ট হই না। ইহা আমাদেরই ত্রায় রক্তমাংসময় নর-নারীর প্রকৃতি, এরূপ ভাবিয়া আমরা সহানুভূতি করিতে পারি না। শর্মিষ্ঠার ত্রায় ইহারও চরিত্রগুলি সম্যক পরিবর্তিত হয় নাই। মধুসূদন তখন অনভিজ্ঞ, নবীন লেখক ছিলেন; নির্মাণ-কৌশল তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। তিনি নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষার উপর তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই; তিনি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যে কোন্ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তাঁহার স্বদেশীয় পাঠকগণ তাঁহার গ্রন্থ কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল; সুতরাং তিনি সঙ্কচিত চিত্তেই স্বদেশের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রা স্বতীক্ষ্ণমোহন তিলোত্তমার

মৃত্যুজনের ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; পাছে গ্রন্থের কলেবর বর্ধিত হইলে মৃত্যুজনের ব্যয় অধিক হয়, সেই ভয়ে তিনি তাঁহার কাব্যোক্ত বিষয়গুলিও ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ধিত করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে এবং প্রথম উক্তম বলিয়া তাঁহার অন্ত্যান্ত কাব্যের অপেক্ষা তিলোত্তমার অধিক দোষ লক্ষিত হইবে। মধুসূদন নিজেও তাহা জানিতেন এবং সেইজন্য যুরোপে থাকিতে, তিলোত্তমা-সম্ভব নূতন আকারে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দূর্তাগ্রক্ৰমে সমাপ্ত করিয়া ষাইতে পারেন নাই। ভাষার কর্কশতাবশতঃ তিলোত্তমা-সম্ভব, মধুসূদনের অন্ত্যান্ত কাব্যের ত্রায়, সাধারণের প্রিয় নয়। কিন্তু যে কেহ সেই কর্কশ ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া, ইহার মাধুর্য অন্বেষণ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সম্পূর্ণরূপেই মেঘনাদবধ-কাব্যের পূর্বগামী হইবার যোগ্য। রঘুবংশের কবি বলিয়াছেন যে, সহকারের স্মিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলে লোকে তাহার মঞ্জরীকে বিস্মৃত হয়। মেঘনাদবধ ও বীরাজনা প্রাপ্ত হইয়া বজ্রীয় পাঠকও তেমনই তিলোত্তমার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি মধুসূদনের প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে মেঘনাদবধ পাঠের পূর্বে একবার তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিতে বলি।*

* মধুসূদন তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠার ত্রায় ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম অংশ গান্ধীর্বে বাদলা তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথমাংশের অনুরূপ। নিয়ে তাহা হইতে কিংদশ উদ্ধৃত হইল।

English Translation of the 1st Canto of

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।

Dhabala by name, peak
On Himalaya's kingly brow—
Swelling high into the heavens,
Ever robed in virgin snow ;
And endued with soul divine,
Vast and moveless like the Lord

Siva, mightiest of the gods.
By holiest anchorites adored,
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immersed in prayer,
With his arms uplifted high,
His towering head hid in the air !

ভিলোক্তমা-সম্ভব রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের একাংশ সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে বিভাগ করিলে তাহাতে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল ও প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাবকাল, স্থূলতঃ এই দুই অংশ

Forests, groves and trees and creepers,
 Blossoms, flowers, and all that gem
 Every mountain's airy brow,
 Like gold and emerald diadem—
 Grow not here ; as if Earth's lord,
 Of earthly pleasures sick, disdains
 Life's gay vanities and follies,
 Breaking their delusion's chains.
 Birds that ever sweetly warble,
 Bees that wander on the wing,
 Seeking honey from each flower,
 Come not here : the forest-king
 Mountain-bodied elephant,
 Tiger, bear and all that move
 And live and breathe in woodland-bower,
 In dark dim forest, boundless grove,—
 Of the wilderness the lotus,
 She—the long-eyed gazelle,
 And the she-snake in whose locks
 The brightest gems are said to dwell.
 And the snake with poison hoarded
 Ne'er approach this frowning hill—
 Awful, wild, majestic, stands it—
 Solitary—stern and still !

Hoarsely in its sunless glens
 Aye the torrent flood is sounding
 Like the roaring Bhogabaty
 Through hell's darksome valley bounding
 Round it blows the howling tempest,
 Like tremendous Rudra's breath,
 When, with terrors clad, he dooms
 This vast creation all to death !
 And clouds around it lower,
 Fierce and gloomy night and day,
 Like the demons that round Siva,
 Dance in wild and demon-play.

বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শর্মিষ্ঠা হইতে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য পর্যন্ত প্রথম অংশের এবং মেঘনাদবধ হইতে মায়াকানন পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অংশে প্রতীচ্য কবি-দিগের ভাব তিনি কিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে ভারতীয় মহাকবিগণের ভাব তিনি কিরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ব্যাস ও বায়ীকির পরবর্তী কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতি ভিন্ন অপর কোন কবির সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। তাঁহার গ্রন্থের অনেক ভাব ইহাদিগেরই আদর্শে কল্পিত হইয়াছে।

রঘুবংশের প্রথম সর্গে, নন্দিনীকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রাজা দিলীপকে বলিয়াছিলেন,—

অদূরবর্তিনীং সিদ্ধিং, রাজন্ ! বিগণয়াম্ননঃ ।

উপস্থিতৈয়ং কল্যাণী নান্নি কীৰ্ত্তিত এব যৎ ॥

ইহারই আদর্শে, শর্মিষ্ঠা নাটকে, দেবযানীর সখি, মহর্ষি জ্ঞানার্চকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

“শাস্তমিদমাশ্রমপদং স্মরিত চ বাহুঃ কুতঃ কলমিহাস্ত

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবন্তি সর্বত্র ।”

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন ;

“আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হইতে লাগলো কেন * * * বলাও যায় না ; ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে ॥”

উত্তর-রামচরিতে রামচন্দ্র, চিরদুঃখিনী সীতাদেবীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, বলিয়াছিলেন ;

অপূর্ব কর্ম-চাণ্ডাল, ময়ি যুগ্মে বিমুক্ত মাম্ ।

প্রিতালি চন্দন-ভ্রাস্ত্যা দুর্বিপাক বিষ-ক্রমম্ ॥ .

রাজা যযাতির দুর্ব্যবহারে দুঃখিত দেবযানী বলিয়াছিলেন ;

“যাকে স্নানাতল চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে আশ্রয় কল্পেম, দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বিপাক বশতঃ বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো ।”

শকুন্তলা নাটকে যুগ্মা-মত্ত রাজা, ঋষিহুহিতা শকুন্তলাকে দর্শনানন্তর, আপনার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—

“ন নময়িতু মধিক্যমস্মি শক্তো ধম্মুরিদ মাহিত-শায়কং যুগেষু।

সহ বলতি মুপেত্য ধৈঃ প্রিয়ায়াঃ ক্লত ইব মুঞ্চ বিলোকিতোপদেশঃ ॥

ঋষিহুহিতা দেবধানীকে দর্শনানন্তর, রাজা যথাতিও আপনার মানসিক অবস্থা লক্ষ্যে বলিয়াছিলেন ;

“স্বাভাবিক যুগয়াসক্তি বশতঃ আমি হরিণীকে দর্শনমাত্রে শরযোজনা করলেম, কিন্তু তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমল নয়ন স্মরণ হলো এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন ও বিমুখ হলেম যে, আমার হস্ত হতে শরাসন কখন ভূতলে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জান্তে পাল্লেম না।”

বিক্রমোর্বশী নাটকে, মুচ্ছাবসানে উর্বশীকে দর্শন করিয়া রাজা পুরুষবা বলিয়াছিলেন ;

“মোহেনাস্তর্বর তমুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যামান।

গজারোথপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥”*

পদ্মাবতী নাটকেও মোহাবসানে উন্নীলিতনয়না পদ্মাবতীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা ইন্দ্রনীল বলিয়াছিলেন ;

“আহা! ভগবতী জাহ্নবী-দেবী, ভয়ভট পতনে কিঞ্চিংকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্মল শ্রী পুনর্বার ধারণ করেন।”

শকুন্তলার রাজা দ্ব্যস্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের পর আছে ;

“অনন্তএ, অহিংস কুসন্তুইএ পরিক্ষদং মে চলনং, কুববঅ সাহা পুরিলগ্গং অ বকলং দাব পরিবালেধ মং জাব গং মোআবেমি।”

পদ্মাবতীও, রাজা ইন্দ্রনীলকে দর্শন করিয়া, সখীকে বলিয়াছিলেন ;

“সখি, দেখ, এই তৃণাকুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহ, আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর।”

রঘুবংশে দিলীপের ও হৃদক্ষিপার বশিষ্ঠদেবের আশ্রয়গমন বর্ণনায় আছে :—

স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ মেকং স্তম্ভন মাস্থিতৌ।

প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যাদৈরাবতাবিব ॥

* বীরাদনা-কাব্যের উর্বশী-পত্রিকাতেও কবি ঠিক এই ভাব ব্যাখ্যার করিয়াছেন ;

“দেখ নিরখিয়া

এ বরাদ বরকটি রিচায়ান এবে

মোহান্তে জাকিলে পাড়ু মলিন মলিণ,

হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,

আঁখার প্রমাদে, ক্লতে।”

ইহার অল্পকরণে মধুসূদন দেবরাজের ও ইন্দ্রাণীর ত্রক্ষলোক-গমন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

“উড়িল অম্বরপথে হৈম ব্যোমধান
মহাবেগে, ঐরাবতসহ সৌদামিনী
বহি পয়োবহ যথা,”

মেঘদূতে বিরহ-ব্যথিত যক্ষ, মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল ;—

মন্দং মন্দং হৃদতি পবনশ্চানুকুলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধান-ক্ষণপরিচয়ান্নুনমাবদ্ধ মালাঃ
সেবিষ্ণুস্তে নয়ন স্তভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥
নীপং দৃষ্টে, হরিত কপিশং কেশঠৈ রধরুটৈ
রাবিভূত-প্রথম-মুকুলা কন্দলীশ্চানুকুলম্ ।
জঙ্ঘারণ্যে স্বধিক সুরভিঃ গন্ধমাত্রায় চৌৰ্যাঃ
সারঙ্গা স্তে জললবমূচঃ স্ফটয়িষ্ণুস্তি মার্গং ॥
উৎপত্তামি ক্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিষ যোঃ
কালক্ষেপং ককুভস্বরভৌ পর্বতে পর্বতে তে
শুল্লাপাঠৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রতুদঘাতঃ কথমপি ভবান গণ্ডমাণ্ড ব্যবস্তেং ॥

মধুসূদন এই সকল কবিতার প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়া-
ছিলেন ; মেঘধ্বনি অবশান্তর,

চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল,

* * *

নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী স্থখিনী,

প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ,

বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা স্বরিতে

যুড়িয়া আকাশ পথ, স্বর্ণ কন্দলী

মাথা তুলি শূন্য পথে চাহিয়া হাসিল ।”

প্রমদা-পাদ-স্পর্শে অশোক-বৃক্ষে এবং নারী-স্থ-নিহত মস্তে বহুলে-
পুষ্পোদগম সংকুত আলঙ্কারিকদিগের মতে “কবি-প্রসিদ্ধি” বলিয়া পরিচিত
কালিদাস, এই কবি-প্রসিদ্ধি অনুসারে, কুমার সম্ভবের অকাল বলন্ত সমাগম-
বর্ণনায়, লিখিয়াছিলেন ;

“অমৃত সত্তাঃ কুম্ভমাত্রশোকঃ

পাদেন নাপেক্ষত স্তম্ভবীণাং

সম্পর্ক মাশিক্ষিত ছপুয়েণ ॥”

মধুসূদন এই আদর্শ অমৃতাং, তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছেন,—

“প্রমদাব পাদপদ্ম পবণে অণোক,

স্তখে প্রসূনেব হার পবে তরুবব,

গাংমনাব বিধুমুখ শীধুসিক্ত হ'লে,

বকুল, ব্যাকুল তাব মন যোগাইতে,

ফুল আভরণে ভুষে আপনাব বপুঃ ॥”

কোন কোন স্থলেব ভাষা অবিকল অমুক্ত হইয়াছে। কুম্ভাব সম্ভবে দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মাব স্তবে আছে,

“জগদ্যোনি বয়োনিষ্ঠং

জগদন্তো নিরন্তকঃ।

জগদাদি বনাদিষ্ঠং

জগদাশো নিবীষবঃ ॥”

মধুসূদন ইহাব অমুক্তবণে তিলোত্তমা সম্ভবে লিখিয়াছেন,

“হে বিতো! জগৎযোনি, অযোনি আপনি,

জগদন্ত! নিবন্তক, জগতেব আদি!

অনাদি! হে সবব্যাপী, সর্বজ্ঞ, কে জানে

মাহিমা তোমাব?”

এইরূপ আরও, অনেক স্থলে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহেব ভাব পবিগৃহীত হইয়াছে। শমিষ্ঠা নাটকে সায়ংকালীন শুক্রাচাষে আশ্রম-বর্ণনা রঘুবংশের প্রথম সর্গেব মহর্ষি বশিষ্ঠদেবেব আশ্রমবর্ণনাব অমুক্ত মহর্ষি অজিবার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতােব মিলন মহর্ষি মাঝীচের আশ্রমে ছয়ন্ত ও শকুন্তলার মিলনের আদর্শে বচিত হইয়াছে। শুক্রাবতার, শচীতীর্থ এবং গৌতমী প্রভৃতি নামগুলিও গুরুশ্রী হইতে গৃহীত। মধুসূদনের এই সময়কার রচিত

প্রজ্ঞা কবিগণের
প্রভাব।

গ্রন্থসমূহে যে পাশ্চাত্য কবিগণেব প্রভাব একেবারেই

নাই, তাহা নয়। বাজ্যচ্যুত ও শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত

দেবরাজকে দেখিলে পাঠকের হাইপিরিয়নের প্রথমাংশ মনে

হইবে; বিশ্বকর্মাকর্তৃক তিলোত্তমার সৃষ্টি পাঠ করিলে ভবানু কর্তৃক আকিঙ্গির

বর্ধ-নির্মাণ মনে পড়িবে এবং তিলোত্তমার বিলাসলীলা পাঠককে প্যারাডাইস লষ্টের ইভের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিবে। পদ্মাবতী-নাটকের স্বর্ণ-পদ্ম বৃত্তান্তটি অবিকল গ্রীক হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশীয় কবিদিগের মধ্যে মধুসূদনের এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহে প্রাচ্য কবিদিগেরই প্রাধান্য অধিক বলিয়া আমরা ইহাকে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল নাম দিয়াছি।

আবাল্য পাশ্চাত্য ভাষাভাষীগণী মধুসূদনের গ্রন্থে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাবের একরূপ আধিক্য হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবার প্রত্যাশায়, তিনি, বন্ধুগণের পরামর্শে, সংস্কৃত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অপর কারণ এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য, তিনি এই সময়, মনোযোগের সহিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন; স্তত্রাং তাহাদিগের ভাব, অজ্ঞাতসারে তাঁহার রচনায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব হইতে মধুসূদনের মনের ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত কবিত্ব দেখাইতে পারিলে, সংস্কৃত আদর্শই রচিত হউক, আর পাশ্চাত্য আদর্শই রচিত হউক, তাঁহার গ্রন্থ উপেক্ষণীয় হইবে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, চিরদিন কেবল তাহাই অম্লস্মরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার এই সময়কার লিখিত একখানি পত্রে, বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন;—

If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to great Dramatists of Europe for models.

ইহার পর হইতে তিনি সংস্কৃত আদর্শের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরকালবর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিই পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত।

তিলোত্তমা বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। তিলোত্তমা প্রকাশের পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে। স্তত্রাং ইহা যে-

এক সময় বঙ্গীয় পাঠক সমাজে কিরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, এতদিন পরে তাহা অল্পমান করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা রামমোহন রায় ধর্ম

ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত। কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদন সেইরূপ করিয়াছিলেন, বলিলে

অত্যাুক্তি হইবে না। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস, অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে গুপ্তকবির শিষ্যদল, অপরদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সেইসঙ্গে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ছাত্র ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে উপহাস ও বিক্রপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ কবিবার জন্ত, অমিত্রচ্ছন্দের বিকৃতি করিয়া, কত জনে কত হাস্যোদ্বীপক কবিতা প্রচাৰ করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা ক্রমে বিন্দু-লাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, এখন আর তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক। বেক্রপ নিন্দা, বিক্রপ এবং শ্লেষোক্তি সহ করিয়া মধুসূদন তাঁহার গম্ভব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বীরোচিত। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো (V. Hugo) এবং ইংলণ্ডীয় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ছাত্র দুই চারিজন পাশ্চাত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেক্ষণ দৃঢ়তা লক্ষিত হয়। লোকের সমালোচনায় উপেক্ষা-প্রদর্শন বাল্য হইতেই মধুসূদনের অভ্যাস ছিল, এবং সেইজন্ত তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই দোষ তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। চিরাত্যস্ত দৃঢ়তার সহিত, বিরুদ্ধবাদীদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া, তিনি গম্ভব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভবভূতি, তাঁহার সমকালবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষায়, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক, সগর্বে লিখিয়াছিলেন ;

“যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তিতে কিমপি তান্ প্রতিনৈষ যতঃ
উৎপত্ততেহস্তি মম কোহপি সমান-ধর্মী, কালোহয়ং নিরবধির্বিপুলো চ পৃথী।”

মধুসূদন, ভবভূতির এই গর্বিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তিলোত্তমায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভবভূতির ছাত্র তাঁহারও ভবিষ্যৎ বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করে না।

সাধারণের মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভবের উপযুক্ত সমাদর না হইলেও দুই চারিজন সুশিক্ষিত ও সূক্ষচিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার আদর করিতে ক্রটি করেন নাই। মহারাজা ষষ্ঠীপ্রমোহনের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ছাত্র মহাত্মারত্নের লঙ্কপ্রতিষ্ঠ অল্পবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল

মিঞ এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মধুসূদনের কাব্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গুণশরৎপাতী হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু “ইণ্ডিয়ান-ফিল্ডে” (Indian-Field)* তিলোত্তমার যে সূন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের ও তাঁহার সাহিত্য-সুহৃদগণের মধ্যে, এই সময়ে তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত।
যে সকল পত্র-বিনিময় হইত, আমরা তাহা হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। তিলোত্তমার দোষ, গুণ এবং বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট ইহা কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিল এই সকল স্থল হইতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইবে। তিলোত্তমার ভাষা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

“If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author’s extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description ; compared to it, what are “Lucent syrups tinct with cinnamon ?”

কবিকে তিনি লিখিয়াছিলেন,

Your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole, and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation.

ডাক্তার মিত্র রাজনারায়ণবাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন ;

Your opinion of Madhu’s poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well-cultivated taste,

* ইহা এক সময় দেশীয় শিক্ষিত সম্ভ্রমের সন্ততর সুবন্দ ছিল। পরে ইহা হিন্দু-পেট্রি-পত্রিকার দ্বিতীয় মিলিত হইয়াছিল।

and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার,

বাজেজলাল দিত্র
মহাশয়ের মত।

and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed and

Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

The farce* is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of *Tilottama*.

সাবারণের নিকট তিলোত্তমার সমাদর হইতেছে না, এবং প্রাচীন বীতিব পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মধুসূদনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;

Poor fellow ! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank-verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem *Tilottama* as her

* একেই কি বলে মজাভা।

autotype was in the court of Indra For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks current an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value.

ডাক্তার মিত্র কেবল এইরূপ পত্র লিখিয়াই নিবস্ত হন নাই। তাঁহার সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিলোত্তমাব অতি সুন্দর সমালোচনাও করিয়াছিলেন। মিত্র-মহাশয়ের শেষ জীবন পুৰাতত্ত্বের অন্তঃসন্ধানে এবং ইংবাজী ভাষায় গ্রন্থ বচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি, এক সময় বাঙালী ভাষার উন্নতির জন্ত, যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, বাঙালী ভাষা তাহার নিকট কতদূর ঋণী। অমিত্রাঙ্কনের প্রবর্তন দ্বারা ভাষার যে কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তৎকালে অনেকেই সে সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা ছিল না। মিত্র মহোদয়, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্ত, বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখিয়াছিলেন,

“পদ্যবচ্ছন্দে প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অন্তর্বোধে মনোগত ভাবের সঙ্কেত হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দভাবে বহুদূর ব্যাপন কবিত্তে পাবেন না, উজ্জল ভাব খর্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং প্রকোপের হানি হয়। অন্তঃপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে ষতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ কবিত্তে পারেন, যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বাক্য শেষ কবিত্তে পারেন, ও যে পৰিমিত্র ছন্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে পাবেন, কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পবিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ বর্ণার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাঙ্কর কবিতার নিগড়, তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাঘব হইতে পারেন। * * *”

তিলোত্তমাব প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,

“তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নমন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই সূচক রসাত্মক ভাব অতি প্রোক্ষল বাক্যে বিস্তৃতি হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভূবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুল-কেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ

করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দস্তজ কেবল অল্পবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্তের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদবণীয় বলিয়া বোধ হয় না ; প্রভূত সকলি ক্ষুদ্র, দীপ্তিময়, ও প্রীতিকর অল্পভূত হয় । লালিত্য বিষয়ে, বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না । তথাপি পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে । * * * *
আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষায় প্রধান কাব্য-মধ্যে গণ্য হইবে ।”*

মিত্র মহোদয় ও রাজনারায়ণ বাবুর দ্বায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের সঙ্গে সে সময়কার দুই একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তিলোত্তমাসম্ভবেব গুণপক্ষপাতী হইয়া-
ছিলেন । ইংগাদিগেব মধ্যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ
বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । বিদ্যাবূষণ মহাশয় যদিও প্রাচীন

রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি অমিত্রাক্ষন্দ সন্মুখে তিনি
দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ
মহাশয়ের মত ।
মধুসূদনকে সমর্থন কবিয়াছিলেন । ইংরাজী সাহিত্যে

প্রবেশের সঙ্গে মধুসূদনেব দ্বায় একজন যুগ-প্রবর্তক কবির
আবির্ভাব যে অবশ্যসম্ভাবী, আমরা পূর্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি । মধুসূদন বঙ্গ-
ভাষায় অমিত্রাক্ষন্দের প্রবর্তন না করিলে অপর কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা
করিতেন, প্রকৃতির কার্য কখনও অসম্পন্ন থাকিত না । বিদ্যাবূষণ মহাশয়ও
ঠিক এইভাবে মধুসূদনের কার্যের আলোচনা কবিয়াছিলেন । অমিত্রাক্ষন্দ
সন্মুখে তাঁহার অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব
১২৬৭ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

“বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতীবেক
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে । পয়ার, জিগদী, চৌপদী প্রভৃতি যে
সমস্ত পদ্য আছে তাহা মিত্রাক্ষর । কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা
উপযোগী নহে । দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস-দোষে হউক, আমাদিগের
দেশের লোকেরা আদিরস-প্রিয় । পয়ার আদি ছন্দ সেই আদিরসান্বিত
রচনারই প্রকৃত উপযোগী । এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই ।
প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক ; কিন্তু পয়ার
আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিস্তারিত করিলে উহার শোভা একেবারে দূর

প্রস্থান করে। কোমল, মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্ধ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অস্ত্রান্ত লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে; এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদ্যরস-সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রহসন রচনা

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে
রোঁয়া।

১১

[১৮৫৯—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

পদ্মাবতী ও তিলোত্তমাসম্বন্ধ, শর্মিষ্ঠার পরেই সমালোচিত হইলেও এই দুই গ্রন্থ শর্মিষ্ঠার অব্যবহিত পরে রচিত হয় নাই। ইহাদিগের সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা। পূর্বে মধুসূদন আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং দ্বিতীয় “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া”। দুইখানিই প্রহসন এবং দুইখানিই বেলগাছিয়া নাট্য-শালায় অভিনীত হইবার জন্য রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল।* দ্বিতীয় প্রহসনখানির অদ্ভুত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রই কল্পনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় অমিষ্টাঙ্গদের প্রবর্তক, তেমনই এই জাতীয় সাহিত্যেরও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার পূর্বে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় “নববাবু বিলাস”, “নববিবি বিলাস”, “আলালের ঘরের দুলাল” এবং “কুলীন-কুল-সর্বস্ব”, প্রভৃতি দুই চারিখানি ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজীতে বাহাকে Farce বলে, অভিনয়োপযোগী সেরূপ কোন নাটক তাহাতে প্রণীত হয় নাই। “একেই কি বলে সভ্যতা”ই এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিউরিটানিজমের দ্বারা প্রণীড়িত ইংলণ্ডে “হিউডিব্রাসের” (Hudibras) এবং নাইট এরাস্ট্রির প্রাতুর্ভাবে অস্থির স্পেনে ডন কুইক্সোটের আবির্ভাব ইহার উদাহরণ। রাবেলার (Rabelais) গ্রন্থ ভ্রষ্টাচারী ক্যাথলিক লম্বাসিগণের ও উচ্ছৃঙ্খল অভিজাতদিগের লাহনার জন্যই রচিত হইয়াছিল। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, গ্রন্থকারগণ সমাজের শিক্ষক; যখন সমাজে ধর্ম ও ন্যায়ের বিরাজ করে, তখন তাঁহারা শাস্ত মুর্তিতে অবস্থান করেন, কিন্তু যখন দুষ্কিয়ের ও কদাচারের প্রাবল্যে সমাজ উপদ্রুত হয়, তখন তাঁহাদিগকে, অপরাধীদিগের দণ্ডের জন্য হুতীস্থ কশা গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতেই সাহিত্যে প্রহসনের ও ব্যঙ্গাত্মক্যের সৃষ্টি। রাজপুত কবি চাঁদ বখাওঁই বলিয়াছেন,

* বিশেষ কারণে কোনখানিই অভিনীত হয় নাই।

প্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুদ্ধি? শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৩৩

“শত্রুর করবালাপেক্ষা, কবির কাব্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।” স্বদেশ-নির্বাসিত, কুটিরবাসী ভট্টেরারের মুখের এক একটি কথায় যুরোপের অনেক মুকুটধারীরও অন্তর্দর্শ হইত। বাস্তবিক সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবির মর্মভেদী বাক্যবাণের ভয়ে শত শত ক্ষমতাবান্ পাষণ্ড আপনাদিগের দুশ্চরিত্রি সংঘত বা গোপনে চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যেমন প্রকৃত বলবান্ পুরুষগণই মহাজ্ঞ ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কেবল প্রতিভাবান্ পুরুষদিগের প্রযুক্ত ব্যাক্যাই কাঁধকরী হইয়া থাকে। দুর্বল ব্যক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তাহা শুক ভেদ করে মাজ, মর্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবন সমাজের যে অবস্থায় অভিবাহিত হইয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে শাস্তি ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজের দুষ্টান্তে ও পাশ্চাত্য শিকার ফলে তখন কলিকাতা-সমাজ উপদ্রুত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কলিকাতা-সমাজে শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহার সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের নামে, বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মত্তপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কুপাপাত্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিদ্যাত্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইহাদিগকে “ইয়ং-বেঙ্গল” বলিত। এই ইয়ং-বেঙ্গলের ভয়ে কলিকাতা-সমাজ একদিন তটস্থ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী ও বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে এই “ইয়ং-বেঙ্গল” সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার “একেই কি বলে সভ্যতা” এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ;—

কলিকাতার কোন ধনী ব্যক্তির নবকুমার নামে এক পুত্র ছিলেন। ধনী ব্যক্তি প্রাচীন এবং ইংরাজীতে অশিক্ষিত। তিনি পরম একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয়।

বৈষ্ণব;—সর্বদা হরিনাম জপে এবং বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। কর্তার পুত্রটি ইংরাজী-শিক্ষিত আদর্শ “ইয়ং-বেঙ্গল”। বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া তিনি “জ্ঞান-তরঙ্গিনী” নামে একটি সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রতি শনিবার, সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া, সমাজ-সংস্কার, জ্ঞান-ব্যবহিত্য,

বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানাবিধ দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় বাইলে তাঁহার পিতার মনে কোন কারণে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি আপনার অঙ্গুগত এক বৈষ্ণব বাবাজীকে অনুসন্ধানার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। বাবাজী অনেক লাইনা ভোগের পর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চম্ভস্থির হইল। মদ, বেলফুল এবং বরফ লইয়া সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং আদর্শ ইয়ং-বেঙ্গল নবকুমার মহোৎসাহে, সেই সভায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবকুমারের বক্তৃতা হইতে পাঠক জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সমস্তই অবগত হইতে পারিষেন। সে বক্তৃতা এই;—

“Gentlemen, এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভা। আমরা সকলে এর member; আমরা এখানে meet করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি, and we are jolly good fellows. Gentlemen, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিজ্ঞাবলে Superstitionএর শিকলি কেটে free হয়েছি। আমরা পুস্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা, মন এক করে এদেশের Social reformation যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

Gentlemen, তোমাদের মেয়েদের educate কর—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা’হলে এবং কেবল তা’হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি, ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারিবে—নচেৎ নহে। কিন্তু Gentlemen, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের Liberty-hall অর্থাৎ স্বাধীনতার দালান; এখানে বার বা খুসী তাই কর, Gentlemen, in the name of freedom let us enjoy ourselves.”

আদর্শ ইয়ং-বেঙ্গল নবকুমারবাবুকে উৎসাহ দিবার জন্য সভার অভাব ছিল না। সভাগণ, “Hip Hip Hurrah”, “Be free”, “Let us enjoy ourselves”, “জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা for ever” ইত্যাদি আনন্দধ্বনিতে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীমান নবকুমারকে উৎসাহিত করিলেন। শেষে বারান্দা-দিগের নৃত্য ও হোটেল-সমানীত উপচারের সম্বাহারে সভার কার্য সমাপ্ত হইল। জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার কার্য এইরূপে সমাপন করিয়া নবকুমারবাবু গৃহে প্রত্যাপন করিলেন। ভ্রমার বিলাসী সভ্যতার অঙ্গকরণে ভরীকে চুপন

প্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুদ্ধো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৩৫
করিয়া, পত্নীকে বারাজনার জ্ঞান সম্বোধন করিয়া এবং পিতাকে “মদ লেয়াও”
আজ্ঞা করিয়া বখোচিত আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিলেন। নবকুমারের বৃদ্ধ
পিতা, “কলিকাতা মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, সেখানে কোন ভদ্র-
লোকের বসতি করা উচিত নয়” এইরূপ স্থির করিয়া পত্নী, পুত্র ইত্যাদি সকলকে
সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। “একেই কি বলে সভ্যতা” সমাপ্ত
হইল।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসনে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন বিষয়ে
বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ
এক সম্প্রদায় শিক্ষিত মহাপুরুষ প্রকৃতই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহারা সমকালবর্তিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। নানা বিষয়ে বঙ্গদেশ
ইহাদিগের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছেন; কিন্তু স্থনীতি ও সদাচার
সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে অনেকে যে কু-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, আমাদের কাছে
এখন তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে। একেই কি বলে সভ্যতায়
যে সকল চরিত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সে সময়কার অনেকগুলি সজীব ইয়ং-
বেঙ্গলের অবিকল প্রতিক্রিয়া মাত্র! মধুসূদনের সমসাময়িক ও স্বহৃদ, ডাক্তার
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, একেই কি বলে সভ্যতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;—

“ইয়ং-বেঙ্গল অভিধেয়—নববাবুদিগের দোষোদঘোষণাই বর্তমান প্রহসনের
একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল তইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা
এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায়
তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত
হইয়াছে।”

ডাক্তার মিত্র, নিজেও, তখনকার একজন ইয়ং-বেঙ্গল ছিলেন; সুতরাং
তাঁহার একরূপ মন্তব্য, মধুসূদনের গ্রন্থ যে সে সময়কার সমাজের অবিকল চিত্র
হইয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। বাস্তবিকও ইহার প্রত্যেক চরিত্র ও
প্রত্যেক ঘটনাই যেন সুপরিচিত ও দৃষ্টপূর্ব বলিয়া মনে হয়। ইহার
হোটেলের খাতিবাহক মুটিয়া হইতে আদর্শ ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার পর্যন্ত
সকলেই যেন স্মৃতিমান, সজীব এবং ক্রিয়াশীল। নবকুমারের মরণীড়িতা পত্নী
স্নেহপ্রবণদ্বন্দ্বা মাতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা প্রত্যেকেরই চিত্র অতি সূক্ষ্ম ও
স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহার অন্তঃপুত্রিকাগণের তালখেলা পাঠ করিলে মনে
হয়, যেন গ্রন্থকার, গোপনে বসিয়া, ক্রীড়াশীলা মহিলাগণের কথাবার্তাগুলি
লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় অনেক

সমালোচকের মতে “একেই কি বলে সভ্যতা” বঙ্গভাষার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থসন,* এবং বহুদিন পর্যন্ত ইহা এই শ্রেণীর গ্রন্থসনের আদর্শ থাকিবে। স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহারই আদর্শে তাঁহার “সম্ভাব্য একাদশী” রচনা করিয়াছিলেন। মন্ত্যপানের অপকাঁবিভা প্রদর্শনের জন্ত এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক বা গ্রন্থসন রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই প্রতিপাত্ত বিষয় সম্বন্ধে, “একেই কি বলে সভ্যতা” হইতে স্বল্লামিক উপকরণ লাভ করিয়াছে। ঙবিষয় সমাজ-চিত্রকরের নিকট ইহা এক রহস্য-ভাণ্ডার উন্মোচিত কবিবে।

কিন্তু “একেই কি বলে সভ্যতা” তাৎকালিক সমাজের একাংশ মাত্র চিত্রিত কবিয়াছিল; অপরাংশ চিত্রণেবও প্রয়োজন ছিল। কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাট; বকধর্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পরীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিবে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পবস্বাপহরণ, সামাজিক প্রতিপত্তিব জন্ত দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বাবান্ধনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগেব অনেকেব নিত্য ব্রত ছিল। বাহিবে হিন্দুধর্মীমোদিত ক্রিয়াকর্মের অলুষ্ঠান করিলেও ইঁহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহাব হিন্দুশাস্ত্র সমূহকে উপহাস মাত্র কবিত। ইয়ং বেঙ্গলদিগেব উপব ইঁহাদিগেব মর্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ যে সকল পাপ কল্লানাও করিতে পারিতেন না, ইঁহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সঙ্কচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় গ্রন্থসন “বুড়ো শালিকের ঙাড়ে রোঁয়া,” এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তাহার উপাখ্যান ভাগ এইরূপ,—

কলিকাতার নিকটবর্তী কোন পরীগ্রামে ভক্ত-প্রসাদ নামে এক প্রবীণ জমিদার বাস করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব; তাঁহার বাটীতে মহালম্বারোহে দেবসেবা হইত; তাঁহার মুখে সর্বদাই হরিনাম এবং হস্তে বুড়ো শালিকের ঙাড়ে রোঁয়া জপমালা, প্রতি সোমবার তিনি হবিষ্য করিতেন।

ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিয়া নব্য সম্প্রদায়, অনাচারে ও কদাচারে, হিন্দুধর্মের মহা অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। জমিদার বাবুর হানিকগাজী নামে এক মুসলমান প্রজা ছিল।

* “আমাদিগের ঙিবেচনার এরূপ প্রকৃতির বতগুলি পুস্তক হইয়াছে, উল্লখে এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট।” রামসক্তি ভারতব্রত “বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।”

“তাঁহার গ্রন্থসন দুইখানি আজিও গ্রন্থসনের অগ্রগণ্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীবিন্দু “সাক্ষী লাইব্রেরি” বক্তব্য।

প্রহসনা বচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৩৭

একবার চুবৎসব বশতঃ আপনাব দেয় খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সে জমিদারবাবুকে তাহার চুবৎস্বা জানাইবাব জন্ত আসিয়াছিল। জমিদারবাবু ভূত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহার নববিবাহিতা পত্নী পবমা স্তন্দরী। তিনি পত্নী নিবাসিনী একটি দুশ্চবিত্রা স্ত্রীলোককে, হানিফগাজীব পত্নীর সর্বনাশেব জন্ত, নিযুক্ত করিলেন। এই হতভাগিনী, ভক্তপ্রসাদ বাবুর অর্থ গ্রহণ করিয়া, পত্নীবাসিনী কুলবধুদিগেব সর্বনাশ করিত। সে হানিকেব পত্নীরও সর্বনাশেব জন্ত তাহার নিকট হাইয়া, ভক্ত প্রসাদবাবুর পাশাভিলাষ ব্যক্ত করিল, কিছু সাধ্বী মুসলমান বমণী স্বামীব নিকট সমস্ত কথা প্রবাস করিয়া দিল। তেজস্বী মুসলমান হানিক, ইহাব প্রতিবিধান করিবাব জন্ত, পত্নীব সহিত পবামর্শ করিয়, দৃতীকে এই বলিয়া পাঠাইল যে, পত্নীস্ব কোন ভয় শিব-মন্দিবে, নির্দিষ্ট দিনে তাহার স্ত্রী ফাতিমাব সহিত জমিদারবাবুর শুভ সাক্ষাৎ হইবে। বলা বাহুল্য যে, সেখানে আব একবার কীচবৎ-পর্ব অভিনয় করিবাব জন্ত হানিকেব ইচ্ছা ছিল। ইহার কিছুদিন পূর্বে দেব-ব্রাহ্মণ সেবক ভক্তপ্রসাদ বাবু পঞ্চানন বাচস্পতি নামক একজন দবিত্র ব্রাহ্মণেব স্বংকিঞ্চৎ ব্রহ্মোক্তব সম্পত্তি বাঞ্চেয়াপ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনিও, হানিকেব মুখে জমিদারবাবুর পাশ চেষ্টা অগত হইয়া, হানিকেব সাধ্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তপ্রসাদ বাবু, আতব গোলাপেব গন্ধে পলিত কেশ স্তগন্ধিত করিয়া, ‘বৎ শাস্তিপুরে ধুতি, জামদানেব মেবতাই ইত্যাদি বমণীমোহন বেষভূষায় স্তম্ভিত হইয়া, সন্ধেত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্রৌপদীকপী ভীম যদিও তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি ভীম অতি নিকটেই ছিলেন। ‘সমদূতাকৃতি’ হানিকেব লাজল পরিচালন কঠোব মুষ্টি-প্রহাবে তাহার এব’ তাঁহার নিযুক্ত দৃতীর পৃষ্ঠদেশ ন্যস্তভাব বারণ করিল। ভক্তপ্রসাদ বাবু, ইহাব পর আর কখনও, কোন কুলবধুব সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তিনি, হানিকেব বজ্রমুষ্টি উপভোগের পর, হাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাঠক তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতনা না হয়, তবে তাঁব বাডা গর্ভত আব নাই।” উপযুক্ত সময়ে এই রহস্ত উপভোগ করিবার জন্ত, পঞ্চানন বাচস্পতিও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রসাদ বাবু, তাঁহার লাজনা গোপন রাখিবার জন্ত, তাঁহাকে তাঁহার ব্রহ্মোক্তব জমি প্রত্যর্পণ করিতে এবং তাঁহার মাভূজাঙ্কের ব্যয়-নির্বাহার্থ পঞ্চাশটি টাকা দিতে প্রতিজ্ঞত হইলেন। হানিকেও, নিঃস্বার্থভাবে বজ্র-মুষ্টি বিতরণের জন্ত কৃতজ্ঞতা

প্রকাশার্থ, দুইশত টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। হানিকের অগ্রুণ্ডিত মহাধর্ম এইরূপে স্থসম্পন্ন হইল। ভক্তপ্রসাদ বাবু পকানন বাচস্পতিকে বলিলেন, “আমি বিবেচনা করে দেখ্লেম যে, এ কর্মের দক্ষিণাস্ত এই রূপেই করা উচিত। বাহোক্ ভাই, তোমাদের হাতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলাম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিকূলও পেয়েছি, এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্ভাগি আমার কখনও না ঘটে।” আমরাও ভক্তপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার সমজাতীয় অপর ভক্তবিটলদিগের চেতনা হয়। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থ নিম্নলিখিত রহস্যজনক কবিতায় শেষ করিয়াছেন।

“বাহিরে ছিল সাধুব আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম-ধোয়া,
পুণ্য খাতায় জমা শুল্ল, ভগ্নামিতে চাবুটা পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে হাড়ভাঙিয়ে থোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফল্গো ধম্ম, বুড়ো শালিকেব ঘাড়ে বোঁয়া।”

পণ্ডিত বামগতি ঞায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার “বাক্সালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” ভক্তপ্রসাদের চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া, মধুসূদনের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন হিন্দু জমিদারেব পক্ষে এরূপ ভাবে মুসলমান বর্মণীর প্রতি আসক্তি

মধুসূদনের গ্রন্থসম্বন্ধে
দোষভণ।

স্বাভাবিক নয়। ঞায়রত্ন মহাশয় কি জ্ঞাত এমন কথা বলিয়াছেন, বলিতে পারি না। আমরাদিগের বিবেচনায় বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার বর্ণিত ঘটনা কিছুমাত্রই অস্বাভাবিক নহে। নাটকীয় পাত্রগণের দুই একটি কথা আপত্তিজনক থাকিতে পারে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়টি বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। “একেই কি বলে সভ্যতা”র ঞায় ইহাও মধুসূদন তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এবং হানিকগাঙ্গী, পাঁচীতেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন, কোন স্ত্রী পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে, এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণ এখনও রাজত্ব করিতেছেন। উপদর্মের আক্রমণে হিন্দুধর্মের যে ক্ষতি না হইয়াছে, হিন্দুনামধারী এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণের দ্বারা তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতি হইতেছে। ইহারা, হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে কীটরূপে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মীন দিন অস্তঃসারশূন্য করিয়া কেলিতেছে।

প্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৩০

নব্য সম্প্রদায়ের শাসনের জন্ত যেমন একেই কি বলে সভ্যতার জায় গ্রহের আবশ্যক, তেমনই এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণেরও দণ্ডের জন্ত বড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোঁয়ার জায় প্রহসনের প্রয়োজন। নাটক্যাংশে বিচার করিলে বড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোঁয়া একেই কি বলে সভ্যতা হইতে নিকৃষ্ট। বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার শেষাঙ্গে ভক্তপ্রসাদের সহিত ক্রান্তিমার ও হানিকের ধীরতার সহিত ব্যঙ্গ, এবং গদা ও তাহার গুণবতী পিতৃস্বমার কথোপকথন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয় নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া এই সকল ক্রটি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। মধুসূদনের প্রহসনঘরের প্রধান দোষ এই যে, তাহাদিগের অনেক স্থান অঙ্গীলতা-দোষে দূষিত। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও মধুসূদন অঙ্গীলতা দোষ পরিহাব করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার সমর্থনের জন্ত একথা বল। ঘাইতে পারে যে, তাঁহার অঙ্গীলতা অসং প্রবৃত্তি উদ্বেকের জন্ত নয়। শারীরস্থানবিদকে যেমন উলঙ্গ নরদেহ ব্যবচ্ছেদ কবিতা শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাকেও তেমনই, বাববিনিতাসেনী নবকুমারের ও লম্পট-সাধু ভক্তপ্রসাদের চরিত্র চিত্রিত করিতে ঘাইয়া, অঙ্গীলতা দোষে দূষিত হইতে হইয়াছিল। দোষগুণ সমস্ত লইয়া মধুসূদনের প্রহসনঘর এখনও এক সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। সামাজিক অবস্থাব পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদিগের ক্রমশ অপ্রচলন হইলেও, গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ পটুতা। সন্দেহ, অতি অল্পসংখ্যক বঙ্গীয় প্রহসনই অতাপি ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে।

মধুসূদন কেবল তিন বৎসর মাত্র বাঙালা-সাহিত্যের সেবা আরম্ভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শর্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহার একেই কি বলে সভ্যতা, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, পদ্মাধতী-নাটক, এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, উপযুক্ত আর এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্মৃতরাং বাঙালা-সাহিত্যের এ বিভাগে তিনি সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি তখনও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিলেও প্রাচীন, নব্য সকলেই, একবাক্যে, তাঁহাকে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সাহিত্য-শিক্ষাশালায় তাঁহার শিক্ষাকালের এইরূপে অবসান হইল, এবং তিনি, স্বাধীনভাবে, নিজের উদ্ভাবনী-শক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইলেন। শিক্ষাবহায় তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্ত আমরা তাঁহার বাল্যের লিখিত অনেকগুলি পত্র সম্মিষ্ট

করিয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন বুঝাইবার জন্যও তাঁহার এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি। কবিকে বুঝিতে পারিলে কবির কাব্য সহজে বুঝিবার সম্ভাবন। আশা করি, মধুসূদনের লিখিত পত্র হইতে পাঠক মধুসূদনকে বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়িগণের মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ বসুর নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পঠদশায় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা সৌহার্দ্য ছিল না। জিলাস্কুলের শিক্ষকতা উপলক্ষ্যে রাজনারায়ণ বাবু যখন মেদিনীপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময় তিলোত্তমাদম্ভ ১ বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু, তাহার প্রশংসা কবিতা, পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার মিজ মহাশয়কে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই হইতে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়, এবং তদবধি তাঁহাদিগের মধ্যে কিস্তিদিন পত্র বিনিময় হইয়াছিল। নিম্নোক্ত পত্রগুলি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত।

সপ্তদশ পত্র।

No. 6, Lower Chitpur Road,

24th April, 60.

My Dear Raj Narain,

I have seen your two letters to our friend Rajendra and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is



स्वर्गीय राजनारायण बसु ।

being printed (for I am as poor as a good poet ought to be !), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good Blank verse should be sonorous and the best writer of Blank verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are any thing but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces,* but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, Classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha"

* একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁয়া ।

or if you have, what you think of it. There is another Drama of mine* which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed.†

* পদ্মাবতী।

† বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহল বিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বনে একখানি কাব্য-লিখিত রাজনারায়ণবাবু মধুসূদনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ ভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইবে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ প্রস্তত করিয়াছিলেন। সিংহল বিজয়-বৃত্তান্তটি যে বাস্তবিকই কাব্যোপযোগী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বিত্র মহাশয়কে লিখিত রাজনারায়ণবাবুর পত্রের নিম্নোক্ত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

The conquest of Ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions, is, I think, a nice subject for an Epic poem to be called the "Singhala-vijaya Kavya" and to be written in an easier style than "Tilottama". The expulsion of Vijaya by his father Singha vahu, the Raja of Lala, in Bengal, from his dominions, Vijay's pathetic leave-taking of his mother Singhavalli and other near relations and of Singhapura, the capital of his father's kingdom, his embarking with 700 followers, who, as well as their leader, take their wives with them in a separate vessel, Vijay's voyage, the cities and towns on the Coromandel coast by which his fleet passed and their historical associations, his landing at Suprapattana and his repulse by the natives, the separation of himself and his companions from their wives who are cast by a storm on the island Mahendra, the lamentation of the ladies at such separation, Vijay's arrival at Ceylon, his landing, faint, sick and exhausted on the sea-coast and sitting upon it with his tired hands pressed upon the copper-coloured soil (whence the name Tamrapani of that part and subsequently of the whole of the island, from which the Roman name Taprobane was apparently derived), Vijay's engagements with the aborigines (Yakshas) and his conquest of the island chiefly by the instrumentality of his Yakshini wife Kuveni (কুবেরী), his repudiation of Kuveni who walks forth to the wilderness with a little son and a daughter in utter sickness of heart, her murder by a Yaksha, her spirit still appearing at times on the mountain Kuvenigalla and "casting the withering glance of malignant power over the fair fields" and fertile plains of Bengal and "still inflicting misfortune on the race of conquerors by whom she was betrayed", Vijay's subsequent marriage to a princess of the Pandumandala country and that of his com-

But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Viraras (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.

Perhaps you do know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "Smit with the love of

panions to her female attendants, the shade of Kuveni appearing at deep midnight in the bridal chamber to reproach him for his infidelity, Vijay's sending an envoy to his brother Sumitra insisting him to come over to Ceylon from Bengal, Sumitra's refusal, Vijay's death, his ministers calling over from the continent Panduvasudeva, Vijay's nephew, who is crowned as king of the island which derives its present name Singhal from the Singha race to which Vijaya belonged, all these incidents furnish very good materials for an epic poem. The poet may institute in it a comparison between the present and former state of Bengal and while doing so he may allude to the Bengali King Bhagodatta, pompously styled in the Mahabhart as "the sovereign of the south and east", who, as the ally of the Rajah of Magadha, accompanied him to the wars of the Kurus and Pandus,—to the merchants Chand, Dhanapati and Srimanta, the last two of whom performed voyages to Ceylon,—to the kings of the Pal dynasty who, according to Ayen Akbari and certain inscriptions, conquered the whole of India,—to Dheesana the son of Adisoor who according to the said work took possession of Delhi which from his time for centuries continued to form a portion of the Bengali dominions, and to Pratapaditya of recent times who, with his 52,000 shieldsmen, coped with the generals of Jehangir. If there be no strong proof of one or two of the above facts, still there is no harm in availing one's-self of them in poetry. The aforesaid comparison and the contrast between the beauty and fertility of Bengal called by an Emperor of Delhi "The Paradise of Regions" and the timidity and servility of its present inhabitants, unworthy of such a beautiful country, would give much scope for such pathetic lamentation, as that of Derozio at the commencement of the "Fakir of Jangheera", with reference to India, and that of Filiciao with respect to Italy, and for passionate exhortation about our supine and unenergetic countrymen. The physical appearance of Bengal, the aspect of the Bay, in calm or in storm, as Vijaya sails over it, "the Eden of the Eastern wave" Ceylon rising as a lonely vision upon the view of the

sacred song", I should throw poetry to the dogs! I am studying Law for the Sudder. Law and Poetry! Do you remember the lines in 'Pope'?

"A clerk foredoomed his father's soul to cross,
Who pens a stanza when he should engross!"

Well—I am that man, though I have no father. I am besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "n importe" as the French say, I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now

tempest-tossed and heart-sick exile and cheering his sinking spirits, and the rich natural scenery of the cinnamon island, especially as described by Sir Emerson Tennent with such powers of minute and graphic delineation, would afford an extensive field for painting in words in which the personal observation of the poet, during his absence from his native land, would much assist him. The subject is also such as to enable the poet to allude to a good number of Sanskrit and Bengalee poets—to Valmiki, Sriharsa, Kavikankan and Bharata Chandra. He may introduce the gods and goddesses as taking a part in the events of the poem. He may represent Krishna (for it appears from the name of one of the princes that they were Vaishnavas) appearing in a vision to Vijaya, exhorting him to proceed on a distant exploratory voyage and promising him the crown of a beautiful country, and Varuna, offended at an impious act on the part of the future conqueror of Ceylon, and therefore, raising a storm and casting his wife in wrath on a distant shore. Like the *Lusiad* of Camoens the "Singhala Vijaya" would be a patriotic poem in the strictest sense of the word. In the short account of Vijaya's adventures given above, I have altered as well as invented an incident or two in order to adapt the story for poetical composition. Vijaya was not a virtuous though a heroic prince, but the poet, like another Valmiki, should pass over his faults or depict them in the softest manner possible. Poetry is different from history, I have reasons to suspect that Rama was not the personification of virtue nor Ravana the incarnation of wickedness, as Valmiki has represented them to be.

The story of Vijaya, as yourself and Madhu are well aware, is in the 4th, 7th, 8th and 59th chapters of the Mahavamsa. Had it not been for

গ্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঝাড়ে রোঁয়া ২৪৫

—I even go the length of believing that our Blank-verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank verse in our language quite as grand as in any other?

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of Odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am

Your affectionate old friend,
Michael M. S. Dutt.

the Singhalese historian, We would have remained ignorant of this most precious proof of the existence of military powers, naval skill, and a spirit of adventure in our nation in ancient times. The Bengalee conquerors left a permanent impression upon the island as a proof of which it may be stated that there is an affinity between the Ceylonese and Bengali dialects even in words not of Sanskrit origin, greater than between Bengali and the dialect of a country nearer to Bengal than Ceylon that is the Felegu country or the Tamil. Sir Emerson Tennent also speaks of the "Bengalee" conquerors of the Island. The poet may refer to his work as well as to Forbes's Ceylon.

An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen. It is true that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work. My impression is that the above subject is very well adapted for epic poetry; but if that impression be not correct I have no doubt that it is a highly poetical one and that an interesting poem, of some kind or other, can be written upon it, calculated to produce the good effects mentioned above.

রাজনারায়ণবাবুর পুরাণ অনুসারে রচনা করা "সিংহল-বিজয় কাব্য" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপর্যুক্ত হলে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

অষ্টাদশ পত্র ।

My Dear Raj Narain,

I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long ; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to ; I generally devote four or five hours to law ; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However, here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama ;* I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure, I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe, you are one of the writers of the Tattwabodhini

Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal ? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail !

I feel highly flattered by the approbation of your wife, She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal,* who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul !) mother. He is a touchy fellow, but I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feeling—some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts are gradually disappearing. I pray God to bless you and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool, you may rest assured that I am longing to see you. * *

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care

* পদ্মিনী উপাখ্যান গ্রন্থের রচয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the Characters, the sentiments and the language. You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism. What a vast field does our country now present for literary enterprise ! I wish to god, I had time. Poetry, the Drama criticism, Romance—a man would leave a name behind him “above all Greek, above all Roman fame.” I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya Darpana, Burke, Kames, Alison Addison, Dryden and a host of others, not for getting old Blair's lectures or the German Schlegel. If you don't read Sanskrit with ease get a Pundit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now ? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta ? By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school ? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I

lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their work and caring as little for the living world as possible. I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't expect me to keep pace with you. G— has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection.

Ever yours most sincerely,

Modhu Sudan Dutt

15th May 1860

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her,

M M S. D.

উনবিংশ পত্র ।

My Dear Raj Narain

The Tilottama is out. I have ordered Messrs I. C. Bose & Co, to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate" that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English let them read the *Paradise-Lost*, and they will find how the Verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about *Padmavati* is very gratifying, indeed. *Pabu J. M. Tagore* sticks out for *Sharmistha*. But as you have not seen the latter play acted, you can not be so warm in her favour as *J. M. T.* When *Sharmistha* was acted at *Belgatchia* the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of *Sharmistha* and shed tears with her. As for my own feeling, they were "things to dream of, not to tell." Poor old *Ram Chandra Mitter* was mad and grasped my hand, saying, "why my, dear *Madhu*, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

I sent your message to *Rajendra* some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to our last. Now, know, good youth; that the fault entirely mine. I have got that letter and refused to yield up to the jolly youth of *Sunro*, because it contains your

প্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোয়া ২৫১

suggestions about the “সিংহল-বিজয়-কাব্য”, and which said suggestions I wish to preserve for future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you ; pray, don’t let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation : of course, I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore & Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what “hills peep o’er hills”—what “Alps on Alps arise !” As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুস ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you.

With kind regards,

Yours As Ever,

July 1st, 1860

Modhu Sudan Dutt

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

M. S. D.

— — —
বিশ্ব পত্র ।

My dear Raj Narain,

Many thanks for your kind letter and the volume of sermons, for s i ‘suppose, I must call them O ! Rev’d Sir, I have read l f hem and like them very much

Rajendra once told me, you were a good Bengali writer ; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing, *mind* ! If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "Smit with the love of Sacred Song". There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto ! It won't cost you more than a couple of nights to get ever it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them ! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you, and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta. * *

I remember Kumar Shwami* Alas , What can I do for

* বিশাল কলেজের শিক্ষক । বধূহনন কিরদিন ইঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন ।

him ! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any, comparatively speaking. I dare say, I am quite as poor as he is ! I cannot afford to buy the book I wish to read, * *

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right !"

I have nearly done one-half of the Second book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs , but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent ! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry , for, If I do, I can never manage to put two ideas together ! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be of permanent interest. Nothing like it , we, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals ! * * * When we meet I shall have to say a hundred

thousand things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank verse—and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পরার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it, but of all that hereafter.

Excuse this rambling letter, and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity!

Adieu, Praying God to bless you and yours,

I am, my dear R,

Ever yours affectionately

14. 7. 60

Michael M. S. Dutt.

একবিংশ পত্র।

My Dear Raj Narain,

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem* than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed,

* রাজনারায়ণবাবু, ত্রিলোকনা সত্ত্বের সমালোচনা করিয়া মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্রখানি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিত।

is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II. 19—

O) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist “Fate”. Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular “Heroic Poem.” I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra* who is a thundering grammarian but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লক্ষা কহ, শুভকরি,
সারদে, প্রবালে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ ? কোন দেব, এাহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি ?) বাধেন কুমারে,
বন্দী সম, দূরে এবে—এ বিশক্তি কালে ?
মদন সর্বদমন । যে বীর কেশরী—
বাহুজালে ব্রহ্মাস্ত্র-অবি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তাব বীরদর্প হরি,
প্রেমডোবে বাধি দূরে রাখেন কোতুকে ।
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে ।

You will at once see whom I imitate ;

“Who of the gods impelled them to contend ?

Latona's son and Jove's. ”—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

“Who first seduced them to that foul revolt ?

The infernal serpent.—Book I.

* * *

As for my law-suits I have won one, an another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil ! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in

গ্রহণন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুদ্ধি? শালিকের ঘাড়ের রোঁয়া ২৫৭

my forest solitude ! But thank god, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know that the Rev. Dr. Vyasa did not march into beef and sip his brandypawny ?

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.*—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the “master-ringers” when the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill nature on the part of—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra think it is “clan-feeling” or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pandits, literary stars of equal magnitude, say—“ই উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি” But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song ! They regret his want of popularity, while, perhaps his heart swells within him in vision of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day ! It is getting late, so I must conclude. By the bye * * রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with rhyme ?

Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

* অধিকাংশ গবেষকই ধরে নিয়েছেন যে, এই “V” বিভাসাগর। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। —সম্পাদক

দ্বাবিংশ পত্র ।

My Dear Raj Narain,

Here is the First Book of the *Meghanad*. I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving, old boy. Whether you place the brightest latrel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on *Tilottama* has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes" ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review *Tilottama* for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

গ্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁয়া ২৫৯

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of *Meghanad*. I have since changed my mind, and the Second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see *Meghanad* finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu ! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse ! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says,—“I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali.” The writer is a Banian’s assistant in a mercantile firm.

It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R.,
Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

জরোবিশ পত্র ।

My Dear Raj Narain,

I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to ? Or what do you mean by alighting on Terra Firma ?

I am so happy you like my *Meghanad*. I mean to extend it to 9 सर्गs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the Second Book will enchant you ! The name is “বক্রগানী”, but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বাক্ৰগী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for this your letter. Have you seen Rajendra's critique on *Tilottama* in the *Vividhartha* ? I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Re-marriage. * * * I must pause here. Believe me, my dear R.,

Ever your affectionate,

August 3rd, 1860.

M. S. Dutt.

কিরূপ দৃঢ়তার ও প্রত্যয়ের সহিত মধুসূদন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সকল পত্র হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে যদি আমি জনসাধারণের উত্তরোত্তর সম্মান-ভাজন হইতে না পারি, তবে আমি আমার গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।” তিলোত্তমাসম্ভবের পর মেঘনাদবধে এবং সেইসঙ্গে ব্রজাবতীর ও বীরাবতীর তাঁহার এই আশা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথমার্ধ মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ইহার মুদ্রাক্ষর-ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন কৃতজ্ঞচিত্তে মেঘনাদবধের প্রথমার্ধ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে, মিত্রজীর মৃত্যু-প্রবাস-কালীন ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, তিনি তাহা

গ্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুদ্ধি। শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৬১

প্রত্যাহার করেন। মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট দোবে, শুণে, একুপ
স্থপরিচিত যে, ইহার সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু
মেঘনাদবধ-রচয়িতার অজ্ঞাত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া, মেঘনাদবধের আলোচনা
ত্যাগ করিলে এই জীবন-চরিত-রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। গ্রন্থই প্রকৃত-
প্রস্তাবে গ্রন্থকারের জীবন। মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থ-
সমূহের ইতিহাস বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেইজন্য
মধুসূদনের এই জীবনচরিতে, তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলীর জ্ঞান,
তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ঘটনাও আমরা গ্রথিত করিয়াছি। যে সকল পাঠক
কেবল তাঁহার পারিবারিক জীবনের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য উৎসুক,
আমরা তাঁহাদিগের নিকট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

মেঘনাদবধের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। শর্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমাসম্ভব রচনা হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ, রচনার গাম্ভীর্য এবং গ্রন্থোন্মিখিত চরিত্রসমূহের সৌষ্ঠব-সাধন প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ-রচনা।

ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাজনা এই সময়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর হইতে মধুসূদনের প্রতিভার পতনদশা ঘটিয়াছে। একদিকে, এই সময়, যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, অপরদিকে, তেমনই, তাঁহার পাশ্চাত্য-ভাব-প্রবণতাও এই সময় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিতেই সংস্কৃত ভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী এবং মেঘনাদবধ মধুসূদন প্রায় একই সঙ্গে আরম্ভ এবং প্রায় একই সঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে, সেইজন্ত, এককালে তিনখানি গ্রন্থের স্বল্লিখিত উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। আমরা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমে মেঘনাদবধের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মেঘনাদবধ রামায়ণের চিরপরিচিত, পুরাতন কথা অবলম্বনে বিরচিত। রাক্ষসরাজের পুত্র বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু ইহার প্রতিপাত্ত বিষয়। কিন্তু রামায়ণের সেই পুরাতন কথা লইয়া রচিত হইলেও ইহাতে কতকগুলি নূতন কথা আছে; মেঘনাদবধ বৃত্তিতে হইলে পাঠকের তাহা বিশেষরূপে স্বরণ রাখা

আবশ্যক। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়। রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎস-রসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন। বীরস্বৈ, গৌরবে, ঐশ্বর্যে এবং শারীরিক সৌন্দর্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আচার, ব্যবহারেও আদর্শমাত্র হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্ষ নরনারী-গণের স্তায় তাঁহারাও বজ্র ও দেবপূজা করেন; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং গন্ধাজল তাঁহাদিগেরও পূজার অঙ্গ; তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ, স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্ত, শিবারাধনা করেন, এবং সত্য পতির সঙ্গে সহন্যতা হন। তাঁহাদিগেরও

গৃহে পাখি ঐশ্বৰ্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। আৰ্য্য রামায়ণের যে নরমাংসাপী রাক্ষসরাজ, সীতাদেবীকে “প্রাতরাশ” রূপে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, মেঘনাদবধের পাঠককে, সর্বপ্রথমে, তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। রাক্ষসগণের ছায় মেঘনাদবধের বানরগণও মানব; বৃহন্নাঙ্গুল, রোমশ পশু নহেন; সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদিগের কোনও পার্থক্য নাই। মেঘনাদবধ-কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতাদেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব, মানবী এবং পৃথিবীর অপর নর, নারীগণের ছায় অথ-দুঃখভাগী। সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদিগের এই মাত্র বিভিন্নতা যে, তপোবলে ও কর্মবলে, তাঁহারা দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতে, এমন কি, সময়ে সময়ে, আপনাদের অসুস্থিত কর্মেরও অংশ গ্রহণ করাইতে পারেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অল্পলিখিত, এমন কি, রামায়ণ-বিরোধী, অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের ছায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা, পরিবর্তিত আকারে, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষির প্রদর্শিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষসপরিবারদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিন দিনের ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কর্তৃক মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক, প্রথম দিবসের ঘটনা।

হরপার্বতীর অসুস্থতাহে লক্ষ্মণের স্বপ্ন-দর্শন ও অঙ্গলাভ, রাত্রির কাব্যের সর্গ-বিভাগ।

ঘটনা। মেঘনাদবধের মধ্যে এই রাত্রিই সর্বাপেক্ষা ঘটনাপূর্ণ। দেবেন্দ্রের ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবীপূজা, প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ এবং সীতাদেবীর সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ এই রাত্রির ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা।

রামচন্দ্রের ধমপুরী-দর্শন, দ্বিতীয় রাত্রির এবং প্রমীলার চিতারোহণ, তৃতীয় দিবসের ঘটনা। কবির অল্পম কল্পনা-গুণে এই তিন দিবস মাত্র ব্যাপী ঘটনা অতি দীর্ঘ কালের কার্য বলিয়া আশ্বাদিগের মনে হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি, মিন্টনের আদর্শে, বাগ্‌দেবীর বন্দনা করিয়া তাঁহার কাব্যের বস্তুনির্দেশ

করিয়াছেন। ইহার পরই সভাসীন রাক্ষসরাজ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হন। কবি অতুল ঐশ্বৰ্যের অধিপতি এবং বিলাস-সুখ-প্রিয় রাক্ষসরাজের সভার অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার রাক্ষসরাজকে যে আদর্শে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি এবং তদানুযায়িক সামগ্রীগুলিও তাঁহারই উপযুক্ত করিয়া স্বজন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের আদর্শ স্বতন্ত্র; তিনি তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত করিয়াছেন। ত্রিভুবন ধাঁহার পদানত এবং ঐশ্বর্যলক্ষী ধাঁহার গৃহে মূর্তিমতীরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার ঐশ্বৰ্যের তুলনা কোথায়? কাঞ্চনসৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জায় রাক্ষসরাজ সভামণ্ডপে কনক-সিংহাসনে উপবিষ্ট। চাকুলোচনা কিঙ্করী চামর রাক্ষসরাজের সজা।

বীজন করিতেছে; কামদেবের জায় সুন্দরবপু ছত্রধর ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছে; রুদ্রেশ্বর শূলশাণির জায় ভীষণমূর্তি দ্বারপালগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে;—দূরস্থিত কোমল বন্ধধ্বনি, বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া, সভাসীনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে এবং রত্নসম্ভবা বিভা, ক্ষণপ্রভার জায় দীপ্তিতে মূহমূহ সভাগৃহ আলোকিত করিতেছে। কিন্তু হায়! এই দেবচূর্ণভ ঐশ্বৰ্যের মধ্যে রাক্ষসরাজের প্রাণে শান্তি নাই। সভাগৃহ নীরব, সভাসদগণ বিষন্ন; রাজদূত শোণিতসিক্ত, ধূলিধূসরিত কলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাক্ষসরাজের প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু সময়ে নিপতিত হইয়াছেন, দূত, সংবাদ দিবার জন্ত, রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছে। নীরব অশ্রুধারা, দয় দর প্রবাহিত হইয়া, রাক্ষসরাজের রত্নখচিত পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছিল; তাঁহার জায় মর্যাদিক বস্ত্রণা কে কবে ভোগ করিয়াছে? তাঁহার অদৃষ্টকমে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। দেবগণের সহিত সময়ে বিজয়ী বীরগণও একজন তুচ্ছ মানবের সহিত সংগ্রামে নিপতিত হইতেছিল। বিধাতা যেন তাঁহার অদৃষ্টগুণে কঠিন শাস্তিলিভকে পুশ্পদল দিয়া ছেদন করিতেছিলেন। তাঁহার কুসুমদাম-লজ্জিত, দীপাবলীতেজে উজ্জলিত, নাট্যাশালাসদৃশী পুরী, তাঁহারই দোষে, শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতেছিল। তাঁহার ভবনের কুসুমদাম বিগুজ, মুরজ, রবাবধ্বনি নীরব এবং দীপাবলী নির্বাণ হইয়া আসিতেছিল। চিরান্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্ত চতুর্দিকে প্রসারিত হইতেছিল। হায়! তাঁহার বস্ত্রণা কে বুঝিবে? অসংখ্য বাসনায় বিমূঢ় এবং লোভাগ্যমদে অন্ধ হইয়া তিনি পতিপ্রাণা নীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার কার্যের পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে। তিনি ধাঁহাকে সুখ-স্পর্শ কুসুম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেই

সিদ্ধ জ্যোতির্ষরী জানকী, দাবানল শিখার আকার ধারণ করিয়া, তাঁহার হৈমগৃহ দগ্ধ করিতেছিলেন। সমস্তই তাঁহার নিজের কার্যের ফল। পুত্র-শোকেরও অপেক্ষা নিদারুণ অস্থতাপের বজ্রণা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। ভূধর স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু, বজ্রণা অসহ্য হইলে, অগ্নিস্রোত, যেমন তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হয়, কোন পার্থিব শক্তি যেমন তাহা নিরোধ করিতে পারে না, হৃদয়ভেদী আতর্জনাদ, তেমনই গৈরিক ধাতু-নিম্ন্রাবের গ্রায়, রাক্ষসরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল। মধুসূদন যে ভাষায় পুত্রশোকাতুর রাক্ষসরাজের বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহার সমতুল্য কিছুই নাই।

ভয়দূত, রাক্ষসরাজের আদেশে, বীরবাহুর যুত্যাঘটনা আত্মোপাস্ত বর্ণন করিল। সে বর্ণনা অতি উত্তেজনাপূর্ণ। বীরত্বের বর্ণনায় বীরহৃদয় চিরদিন উত্তেজিত হইয়া থাকে। পুত্র বীরের গ্রায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া রাক্ষসরাজ, ক্ষণকালের জন্ত, পুত্রশোক বিন্ম্বত হইলেন; এবং সভাসদগণকে সঙ্গে লইয়া, রণক্ষেত্রশায়ী বীরপুত্রকে দেখিবার জন্ত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। স্থনিপুণ চিত্র-করের গ্রায় মধুসূদন ইহার একটি সুন্দর দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়াছেন। উন্নত প্রাসাদ-চূড়ায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দশানন, উদয়াচলস্থিত দিবাকরের গ্রায়, দণ্ডায়মান; তাঁহার পদতলে কাঞ্চন-সৌধ-

কিরীটিনী লঙ্কাপুরী প্রসারিতা, তাহার সৌন্দর্যে
রাক্ষসরাজের
লঙ্কাপুরী ও রণক্ষেত্র
দর্শন। অমরাবতীও পরাজিতা। কোথাও পুষ্পোচ্ছানস্থিত শ্রেণী-
বদ্ধ সৌধরাজী, কোথাও রজত সলিলোৎসারী উৎসসমূহ,
কোথাও কমলদলপূর্ণ সরোবর, কোথাও হীরকালঙ্কৃতশিরঃ

দেবগৃহ, এবং কোথাও বা নানা রাগে রঞ্জিত রত্নপূর্ণ বিপণিসমূহ শোভা পাইতেছে। ত্রিভুগং, যেন রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া, ভুবনস্বন্দরী লঙ্কাপুরীর পূজার জন্ত, সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশাল প্রাচীর এই রত্নময়ী পুরীকে বেটন করিয়া রহিয়াছে; এবং অস্ত্রধারী রক্ষকগণ সেই প্রাচীরোপরি অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। লঙ্কার গর্বিতে সিংহদ্বার এক্ষণে শত্রুভয়ে অবরুদ্ধ। নগর-প্রাচীরের বহির্দেশে শত্রুদল, সিদ্ধকুলস্থিত সিকতারাজির গ্রায় অগণিত সংখ্যায়, লঙ্কাপুরীকে বেটন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের অবিদূর্বে রণক্ষেত্র; সেই রণক্ষেত্রে নিপতিত অসংখ্য রক্ষাবীরগণের সঙ্গে তাঁহার প্রিয়ভ্রাতৃ-পুত্র বীরবাহুও, শত্রুসৈন্যকে বিমর্ষিত করিয়া, মহাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বীরপুত্রকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিলে বীরগিতার হৃদয়ে বেকর ভাব উদ্ভিত

হইবার সম্ভাবনা, রাক্ষসরাজ যত পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া, সেইভাবে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিলেন ; এবং রণক্ষেত্রের সেই মর্মভেদী দৃশ্য বিস্তৃত হইবার জন্য, দূরস্থিত মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অচল মেঘশ্রেণীর ত্রায় শিলাখণ্ডে নির্মিত সেতু, মহাসমুদ্রকে স্থিতিত করিয়া, প্রসারিত রহিয়াছে। কেনময় তরঙ্গরাজী তাহার উভয় পার্শ্বে নিরন্তর গম্ভীর নিধোষে আঘাত করিতেছে, এবং বর্ষাকালীন জলস্রোতের ত্রায় শত্রুসৈন্যস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে মহাসমুদ্র এতদিন ছন্দ্রজ্য পরিধার ত্রায় লক্ষাপুরীকে বেটন করিয়া রক্ষা করিতেছিল, আজ তাহাকে এইরূপ শত্রুদণ্ড শৃঙ্খল পরিধান করিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজের হৃদয় যন্ত্রণায় অধীর হইল। তিনি মহাসমুদ্রকে অতি কঠোর তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার তীব্র ব্যাকোক্তিভেত পূর্ণ। যে হুর্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, এই তিরস্কারের বর্ণে বর্ণে যেন তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মেঘনাদবধের অমৃতপ্ত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত রাক্ষসরাজের চরিত্র ইহা হইতে অতি সুন্দররূপ অঙ্কিত হইতে পারে।

রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া, রাক্ষসরাজ, পুনর্বার সভামণ্ডপে আসিয়া, উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অতি গম্ভীর রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ;
 এবং বীরবাহুর জননী, রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী,
 সঞ্জিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আলুথালু বেশে সভামণ্ডপে

রাক্ষসরাজ ও
 চিত্রাঙ্গদা।

প্রবেশ করিলেন। বীর-রসের ত্রায় করুণ-রসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার পরিচায়ক। যে কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসনাথের নিকট আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিগলিত হয়। হায় ! বিধাতা চিত্রাঙ্গদাকে একটি মাত্র রত্নের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। বিহগী যেমন সম্মুখে আপনার : টারে রাখিয়া দেয়, কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদাও তেমনি রাজার নিকট সে রত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। দরিত্র-ধনরক্ষণ রাজধর্ম। রাজকুলেখর লক্ষনাথ কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদার সে রত্ন কোথায় রাখিয়াছেন ? পুত্রশোকাতুরা জননীর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব ? রাক্ষসরাজের পক্ষে ইহার উত্তর দিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে হুর্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন ;—

“এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,

শত পুত্রশোকে বুকু আমার ফাটিছে

দিশা নিশি। হায় দেরি, বনে বধা বায়

প্রবল, শিমূল-শিহী ফুটাইলে বলে
উড়ি যায় ভূলা রাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে । বিধি প্রসারিছে বাহ
বিনাশিতে লক্ষ্য মম, কহিহু তোমায়ে ।”

চিত্রাঙ্গদা দেবী, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইলেও, বীরমাতা—বীরপত্নী ;
রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সান্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—

“এ বিলাপ কহু, দেবি, সাজে কি তোমায়ে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে । বীরমাতা তুমি ;
বীর-কর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনিরে ?”

বীরমাতার পক্ষে এরূপ সান্বনা অবশ্যই শাস্তিজনক । কিন্তু চিত্রাঙ্গদা
দেবীর পক্ষে এ সান্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না । স্বগন্ধিকুসুম যখন দেবোদ্দেশে
হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্প-জন্ম সকল হইল বলিয়া মনে হয় ।
কিন্তু সেই কুসুম যখন আবার প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল
কোভেরই কারণ হইয়া উঠে । সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ধর্মযুদ্ধে
নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্বনা আসিতে পারে সত্য ; কিন্তু
অপরের পাণ-তুষারপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আছতি রূপে অর্পিত হইতে
দেখিলে বীর-জননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে ? যে অগ্নিকুণ্ডে
চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের ধন সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের
অসংযত বাসনারূপ দাবানলেই তাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল ; জননীর প্রাণ শাস্তি
মানিবে কেন ? রাজসরাজকে দেশবৈরীর প্রসঙ্গ করিতে শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা দেবী
বলিলেন ;—

*** “দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষেপে জয় তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রস্থনের প্রস্থ ভাগ্যবতী ।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লক্ষ্য তব;

কোথা সে অধোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেস্ত্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে,
রজত-প্রাচীরসম শোভেন জলধি ।
তুনেছি সরযু তীরে বসতি তাহার
ক্ষুদ্র নর । তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধকণাফণী দংশে প্রহারকে ।
কে কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায় নাথ, নিজ কর্মফলে,
মজ্জালে রাক্ষসকুল, মজ্জিলা আপনি ।”

স্থনীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও কাদম্বিনী যেমন বজ্রাঘ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থাবিশেষে যে
চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের
মৌলিকতা।

তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়,
চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন ।
এ চিত্র বাম্প্রীকি-রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি ।
কৃতিবাসকৃত রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কেবল নাম মাত্রই আছে । মধুসূদন পরে
বীরঙ্গনা-কাব্যে দলিতা-কণিনী-রূপিনী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত
করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে ।
চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রবর্তন না করিলে রাক্ষসরাজের অবস্থা পরিষ্কৃত হইত না ।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া
আনিয়াছিলেন । বিধাতা যদিও তাঁহাকে তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতে-
ছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্ত হয় নাই । পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির দ্বারা
যে কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মধুসূদনের বড়
প্রবল । পাপের সমর্থন করিতে বাইয়া, মধুসূদন কত সময়ে, যে অঙ্গভেদ সকলকে,
এমন কি নিজের হৃদয়কেও বঞ্চনা করে, তাহার সংখ্যা নাই । রাক্ষসরাজ,
যেহেতু পাপাচারী হইয়াও বিধাতার নিকট বলিভেদে ;—

“কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই !”

যে অন্তর্ভক্ষে তিনি জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ করিয়া, তিনি আপনাকে দিষ্কার দিতেন ; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। আত্মবঞ্চকের ত্রায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, তাঁহার অভাগিনী ভগিনী শূর্ণগথার দুঃখে দুঃখিত হওয়াতেই তাঁহার সেই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন ;—

“কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগি,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ তুজগে ? কি কুক্ষণে তোর দুখে দুখী,
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিছ এ হৈম গেহে ?”

কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার এ ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। রাক্ষসরাজ, পুত্রশোকবিধুরা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সাধনা দিবার জন্ত, বলিলেন, “দেবি, তোমার বীরপুত্র, দেশবৈরীদিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ-গমন করিয়াছে ; বীরমাতা হইয়া তোমার পক্ষে এক্ষণ ক্রন্দন কি কর্তব্য ?” কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইল। যে ফণিনীর মণি তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে বিষদশনে দংশন করিয়া বলিল ;—“দেশবৈরী ? রাক্ষসরাজ কাহাকে দেশবৈরী বলিতে চান ? ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র কি লঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসনের জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন ? তবে দেশবৈরী কথা কেন ?” চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষস-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কে কহ এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি
লকাপুরে ? হায়, নাথ ! নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।”

পুত্রশোক-কাতর মহম্মদ, অনেক সময়ে, সমদুঃখভাগিনী পত্নীর সহিত একত্র রোদন করিয়া সাধনা লাভ করে ;—কিন্তু হতভাগ্য রাক্ষসরাজের পক্ষে সে আশা ছিল না। শতপুত্রশোকে অর্জরিত হইলেও পত্নীগণের নিকট তাঁহার সহানুভূতির আশা ছিল না। তাঁহার ত্রায় আত্মদ্রোহী ব্যক্তিকে সহানুভূতি করিবে কে ? সহানুভূতির প্রার্থনা করিতে বাইজে তাঁহার ভাগ্যে কেবল তিরস্কারই মিলিত।

আমরা সেইজন্ত বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রবর্তন করিয়া, মধুসূদন যজ্ঞা-
নিপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পুত্রশোক-কাতরা চিত্রাঙ্গদা দেবী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলে শোকে ও
অভিমান উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। বীরপুত্র-
ধাত্রী লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হইয়াছিল; লঙ্কেশ্বর নিজেই যুদ্ধে
রাক্ষসরাজের রণসজ্জা।

গমন করিতে সক্ষম করিলেন। কবি এই স্থলে রাক্ষসবীর-
গণের যুদ্ধ-সজ্জার অতি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে, এক
অভিনব দৃশ্যের প্রবর্তন করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।
রাক্ষস-বীরগণের পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জন
করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার তরঙ্গাভিঘাতে জলাধিষ্ঠাত্রী
বাক্ষী-চরিত্র।

বাক্ষী-দেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃ পুনঃ বিকম্পিত হইতে
লাগিল। তিনি অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লঙ্কেশ্বরের
সমর-সজ্জার বিষয় অবগত হইলেন এবং যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত
আপনার সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন।
মেঘনাদবধের এই বাক্ষী-চরিত্র হিন্দুপুরাণাহুমোদিত নহে। হোমরের থেটিস
(Thetis) হইতে মিটন তাঁহার কোমসের (Comus) স্যাব্রিনার (Sabrina)
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বাক্ষী-চরিত্র এই স্যাব্রিনা হইতে
কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্নের বিষয়
গ্রীক পুরাণের Aeolus and Winds হইতে কল্পিত হইয়াছে। মুরলা নামটি
কবি লম্ববতঃ, উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য এবং
যুদ্ধগামী রক্ষসৈন্তগণের রণসজ্জা মুরলার ও রাজলক্ষ্মীর কথোপকথনে অতি
সুন্দররূপ বিবৃত হইয়াছে। মুরলা, রণসজ্জায় সজ্জিত বীরগণের মধ্যে মেঘনাদকে
দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—

“প্রমোদ-উদ্যানে বৃক্ষি ভ্রমিছে আমোদে

যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে

বীরবাহু; যাও তুমি, * *

* * * বাই আমি যথা

ইচ্ছজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে

প্রাজনের ফল দ্বরা ফলিবে এ পুরে।”

কমলা, মেঘনাদের খাজীর বেশ ধারণ করিয়া, লঙ্কার বহির্দেপস্থিত মেঘনাদের
প্রমোদ-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ, খাজীর চরণে প্রণাম করিয়া,

লঙ্কার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বীরবাহুর মৃত্যুর ও রাক্ষসরাজের
রণসজ্জার সংবাদ প্রদান করিলে বিস্মিত মেঘনাদ ধাত্রীকে বলিলেন ;—

* * * “কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজ্ঞে ? নিশারণে সংহারিহু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিহু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে ; তবে
এ বারতা—এ অদ্ভুত বারতা, জননী,
কোথায় পাইলে তুমি ?”

কমলা বলিলেন ;—

* * * “হায় পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বাঁচিল ।
যাও তুমি, স্বরা করি, রক্ষ রক্ষকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষচূড়ামণি ।”

তেজস্বী বীর, শুনিবামাত্র, কর্ণের কুহুমদাম ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ
করিলেন, এবং আপনাকে দিক্কার প্রদান করিয়া বলিলেন ;—

* * * “ধিক্ মোরে
“* * * বৈরীদল বেড়ে
অর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে ;
এই কি সাজে আমারে ? দশাননায়ুজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ? আন রথ স্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপু দলে ।”

মেঘনাদ বীরসর্পে রথারোহণ করিতে যান, এমন সময় তাঁহার পতিগতপ্রাণা
পত্নী প্রমীলা আসিয়া তাঁহার করযুগল ধারণ করিলেন। যে
মেঘনাদ ও প্রমীলা।

ভাবী অমঙ্গলরূপ মেঘ মেঘনাদের জীবনাকাশে সঞ্চারিত
হইতেছিল, সাধবীর কোমল হৃদয়ে বৃষি পূর্ব হইতেই তাহার ছায়াপাত হইয়াছিল ;
তাই প্রমীলা, বীরপত্নী ও বীরাজনা হইয়াও বীরবর হেক্টরের পত্নী এণ্ড্রোমেদার
(Andromache) ভাষ্য কাতরভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীকে কহ চলিলা আপনি,
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ?”

কিন্তু বীরত্ব-দৃষ্ট মেঘনাদ প্রমীলার অশ্রুজলে দৃকপাত করিলেন না। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, তুচ্ছ মানব-শত্রু রামের সহিত সংগ্রাম তাঁহার নিকট শিশুর জীড়া মাত্র। তিনি অশ্রুশক্তি পত্নীকে সহাস্ত মুখে বলিলেন।—

“ভরায় আমি আসিব কিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে, বিদায় এবে দেহ বিধুমুখী।”

দেখিতে দেখিতে মেঘনাদের ব্যোমধান আকাশ-মার্গে উদ্ভিত হইল। ধমুটকার শব্দে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং নিরাশাপীড়িত লঙ্কাবাসী-দিগকে আশস্ত করিয়া মেঘনাদ যেখানে রাক্ষসরাজ সমরসজ্জা করিতেছিলেন, সেইখানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাক্ষসসৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেঘনাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া করষোড়ে বলিলেন ;—

“হে রক্ষকুলপাত,
জনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ;
কিন্তু অহুমতি দেহ, সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।”

পুত্রের এই বীরোচিত প্রার্থনায় সহসা সম্মতি দান করিতে রাক্ষসরাজের সাহস হইল না। অবস্থার বিভিন্নতায় মহুত্বের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। নবীন আশায় ও উৎসাহে অহুপ্রাণিত মেঘনাদ এবং শোকজর্জরিত, নিরাশ্বাসগ্রস্ত রাক্ষসরাজ উভয়ের ব্যবহারে, সেইজন্তু কতই বিভিন্নতা। একদিকে যৌবনের বল ও উৎসাহে মেঘনাদকে অনির্মুক্তবিধ ভূজঙ্গের জ্বালা তীব্র শ্বাসে জগৎ ভস্মীভূত করিতে প্ররুষ্ট করিতেছিল ; অপরদিকে শোকগ্রস্ত, মর্মপীড়িত রাক্ষসরাজ, মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের জ্বালা, কণামণ্ডল সঙ্কচিত করিয়া যেন পৃথিবীর সঙ্গে বলীন হইয়া বাইতেছিলেন। পুত্র রক্তপীড়কে যুদ্ধকাম দেখিয়া, সৌভাগ্য-গর্বিত ব্রজ উৎসাহে বলিয়াছিলেন ;—

“রক্তপীড়, তব চিন্তে বশ-অভিলাষ,
পূর্ণ কর, বশোত্তমি বাঁধিয়া কিরীটে ;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে বশঃপ্রভা, পুত্র বশোধর !
ত্রিলোকে হয়েছে ধন্য আরও ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জলিয়া দানব-তিলক ।”

কিন্তু মর্মগীড়িত রাক্ষসরাজ পুত্রকে বলিলেন ;—

“এ কাল সময়ে,

নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইঁতে তোমা
বারংবার ! হায় ! বিধি বাম মম প্রতি ।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোকে মরি গুন বাঁচে ।”

বৃদ্ধ ও রাক্ষসরাজ উভয়েই ত্রিভুবন-বিজয়ী ; কিন্তু অবস্থার পার্থক্যে উভয়ের
বৃদ্ধ ও রাক্ষসরাজ ।

লক্ষ্মীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন ।
শোকের অথবা নিরাশ্বাসের অভিজ্ঞতা কখনও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই । যে
উৎসাহে তিনি পুত্রকে যুদ্ধগমনে আদেশ দান করিয়াছিলেন, নিরাশাগীড়িত
রাক্ষসরাজের হৃদয়ে সে উৎসাহ ছিল না । তাই তিনি সামান্ত জনের স্ত্রায়,
পুত্রকে যুদ্ধগমনে সম্মতি-দান করিতে ভীত হইলেন । কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ের
ভাব স্বতন্ত্র । তিনি বীরদর্পে পিতাকে বলিলেন ;—

“কি ছার সে নর তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র । থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘৃষিবে জগতে,
হাসিবে মেঘবাহন, কৃষিবেন দেব
অগ্নি ! দুইবার আমি হারান্ন রাঘবে,
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে ।”

যে বলে মদমত্ত মাতঙ্গ বিশালকায় বনম্পতিকে শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করে,
মেঘনাদের হৃদয়ের এই উৎসাহ সেই পাশব বল-প্রসূত । কিন্তু রাক্ষসরাজ
বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় নিপতিত তাহাতে পাশববলে জয়ী হইবার
আশা থাকিলে অনেকদিন পূর্বেই তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন ; তাহা
হইলে কুন্তকর্ণের স্ত্রায় বীর একজন তুচ্ছ মানবের সঙ্গে যুদ্ধে নিপতিত হইতেন
না । তিনি বলিলেন ;—

**** “কৃত্তকর্ণ বলী—

ভাই মম, তায় আমি জাগাহ্ন অকালে
ভরে ; হায় ! দেহ তার, দেখে লিঙ্কুতীরে,
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ।”

এ অবস্থায় পাশববলে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি অন্তরে
বুঝিতেছিলেন, তাঁহার পাশাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া বিধাতা তাঁহার লক্ষ্যপূরী-ধ্বংস
করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছেন। দেবাত্মগ্রহ ভিন্ন এ বিপদে রক্ষার
অন্য উপায় নাই। তিনি পুত্রকে বলিলেন ;—

“তবে যদি একান্ত সময়ে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,
নিকুন্ডিলা যজ্ঞ সাক্ষ কর বীরমণি।
সেনাপতি পদে আমি বরিগু তোমারে ;
দেখ, অন্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে ।”

রাক্ষসরাজ, গজোদক গ্রহণ করিয়া পুত্রকে যথাবিধি অভিষেক করিলেন ;
বন্দীগণের আনন্দ-সঙ্গীতে চতুর্দিক পূর্ণ হইল। বন্দীগণের
মেঘনাদের অভিষেক।
এই সঙ্গীত অতি মনোহর। মেঘনাদের অভিষেকের সঙ্গে
প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গ।—দ্বিতীয় সর্গের অভিনয়ক্ষেত্র স্বর্গলোক, অভিনেতা ও
অভিনেত্রী দেবদেবীগণ। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া
হর-পার্বতী, জুপিটার ও উল্লিখিত হইলেও লক্ষ্যযুদ্ধে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতা
জুনো।
রামায়ণের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইলিয়াডের আদর্শে
মধুসূদন পৌরাণিক দেবদেবীগণকে মেঘনাদবধের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে
প্রবর্তিত করিয়াছেন। মহাদেবের ও পার্বতীর অঙ্গগ্রহে ইন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণের
জন্তু অজ্ঞেয় অঙ্কলাভ, দ্বিতীয় সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদনের প্রতিভা এই
সর্গে বাস্তবিক অপরূপ হোমরের দ্বারাই অধিকতর অঙ্গপ্রাণিত হইয়াছে। গ্রীক
পুরাণের জুপিটার ও তাঁহার পত্নী জুনো ইহাতে হর-পার্বতীরূপে কল্পিত হইয়াছেন,
এবং সৌন্দর্য্যধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রোদিসি (Aphrodity) এবং নিত্রাদেব
সম্ভল (Somsus) যথাক্রমে ইহার রতির ও কামদেবের স্থান অধিকার

করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যার অতি মনোহর চিত্র পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার পর পৌরাণিক স্বর্গের অতি বিমূর্ত্তকর দৃশ্য। গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে মধুসূদন তাহা কল্পনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ, ত্রিদশগণে বেষ্টিত হইয়া, আপনার বিলাসময় সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়, রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মেঘনাদের অভিষেকবার্তা প্রদান করিলেন। মেঘনাদ, নিকুন্তিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, ভাবিয়া দেবেন্দ্র অত্যন্ত উদ্বেগ হইলেন এবং ইন্দ্রানীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে হরপার্বতীর নিকট গমন করিলেন। মধুসূদন এইস্থলে কৈলাসপুরীর একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দেবচরিত্রের প্রবর্তন করিতে বাইয়া ট্যালো, মিল্টন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, তিনিও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দৈব এবং মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশে তাঁহার বর্ণিত দেবপ্রকৃতি, স্থানে স্থানে, বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। দেবরাজ ও শচীদেবী, উভয়েই, রামচন্দ্রের কল্যাণের জন্ত, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। মেঘনাদবধের শচী, পদ্মাবতী নাটকের প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রুরস্বভাবা শচীদেবী নহেন; তিনি তিলোত্তমাসম্ভবের স্বামীর সমদুঃখ-সুখভাগিনী এবং স্বামীর গোরবে গোরবিনী শচী। ভগবতী তাঁহাদিগের প্রার্থনায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, রক্ষকুল দেবাদিদেবের রক্ষিত; তিনি এক্ষণে যোগাসন-শূদ্ধে যোগমগ্ন, সেইজন্তই লঙ্কাপুরীর এক্রপ দুর্গতি। রাক্ষসদিগের অনিষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এমন সময়,

* * “গঙ্ঘামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি বাজিল চৌদিকে,
মঙ্গল নিকুণ সহ, মুহূ বখা যবে
দূর কুণ্ডবনে গাহে পিককুল মিলি ;
টলিল কনকালন”।

বিস্মিতা পার্বতী সখীর মুখে অবগত হইলেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসলার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যোগাসন-শূদ্ধে গমন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সৌন্দর্যধিষ্ঠাত্রী রতি দেবী তাঁহার মনোহর বেশ-জুবা করিয়া দিলেন। মোহনবেশ ধারণ করিয়া, এবং তপোনিমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্ত, কামদেবকে সঙ্গে লইয়া, ভগবতী যোগ-শূদ্ধে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত এই সকল বিষয়ে যে মূল রামায়ণে নাই, তাহা বোধ হয়, পাঠককে বলিতে হইবে না। ইলিয়াডের চতুর্থ সর্গের সঙ্গে কুমারসম্ভবের তৃতীয়

সর্গের সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন ইহা রচনা করিয়াছেন।

ইলিয়াড ও কুমার-
সম্ভবের ঘটনা
সংমিশ্রণ।

ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে, ট্রয়বাসীদিগের প্রতি জুপিটারের অমূল্য দর্শন করিয়া, একান্ত ঈর্ষাপরায়ণা

জুনো, কোশলে কার্ণোদ্ধার করিবার জন্ত, মনোহর বেশ-

ভূষায় সজ্জিত হইয়া এবং তিনসের বিশ্ববিমোহন কটিবন্ধ ধারণ করিয়া, আইডা (Ida) পর্বতস্থিত জুপিটারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জুপিটার, মোহনবেশধারিণী পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আলিঙ্গনপাশে নিম্নিত হইয়া পড়িলে, ক্রুরস্বভাবা জুনো, অবসর বুঝিয়া, হতভাগ্য ট্রয়বাসীদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মধুসূদন, ইলিয়াডের উপরি-উক্ত ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদন-ভঙ্গ্য বৃত্তান্ত পরিবর্তিত আকারে সম্মিলিত করিয়া, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ক্রোডের বিষয় এই যে, তিনি কুমারসম্ভবের হর-পার্বতী-চরিত্রের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মেঘনাদবধের মহাদেব ও দুর্গা গ্রীক পুরাণের কামুক জুপিটার ও নৃশংসা জুনো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কালিদাস কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর যে মহান চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মধুসূদনের গ্রন্থে তাহার ছায়াও লক্ষিত হয় না। মহাদেব যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন সহস্র কামদেবেরও এমন সাধ্য হইত না যে, তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় মহাদেবের তপোভঙ্গ কুমারসম্ভবে নাই। কালিদাস লিখিয়াছেন; “মহাদেব যোগান্তে, পরমায়ুসংজ্ঞক জ্যোতি দর্শন করিয়া, ধ্যান হইতে বিরত হইলে, পার্বতী, পূজার জন্ত, তাঁহার সমীপস্থা হইলেন, এবং, তাঁহার পদমূলে পুষ্পদাম বিকীর্ণ করিয়া, প্রণাম করিলেন। মহাদেব পার্বতীকে “অনন্তভাক্ পতি লাভ কর,” এই বলিয়া যেমন আশীর্বাদ করিলেন, কামদেব অমনি তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন! মহাদেবের এ অবস্থা কুমারসম্ভবের উচ্চ আদর্শ। ধ্যান-নিমগ্নাবস্থা নহে। কালিদাসের অঙ্কিত চিত্র যেমনই মহান, তেমনই স্বাভাবিক। কুমারসম্ভবে বিদ্রিততপ মহাদেবের অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

হরন্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তৈর্ধৈর্য্যচ্ছ্রোদয়্যারন্ত ইবামুরাশিঃ।

উমাযুগে বিশ্বকলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।’

কিন্তু পরবর্ত্তে—

অথেন্সিয় কোভময়ুখনেত্রঃ পুনর্বশিষ্যাবলবগ্নিগৃহ

হেতুং সচেতোবিকৃতেন্দিদৃক্ঃ দিশামুপাস্তেবু সসজ্জ দৃষ্টিম্ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রোদয় দর্শনে চঞ্চল সমুদ্রের জ্বায় মহাদেবেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য লোপ হইল। তিনি উমার বিষফলতুল্য অধরোষ্ঠ হুশোভিত মুখ-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জিনয়ন, জিতেদ্রিয়তা-গুণে, আপনার ইন্দ্রিয়বিকার বলপূর্বক নিবারণ করিলেন, এবং অকস্মাৎ একরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপন্ন হইল কেন তাহার কারণ অহুসঙ্কানের জন্ত, চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

“কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যঃ” ও “বলবগ্নিগৃহ” এই দুইটি কথায় কালিদাস সংঘমী মহেশ্বরের কি কঠোর আত্মসংযমই প্রকাশ করিয়াছেন! মধুসূদনের হরখ্যান-ভঞ্জে ইহার কিছুই নাই। কামদেবের অজ্ঞাঘাতমাত্র তাঁহার (মূর্ত্ত পূর্বে “বাহুজ্ঞান-হত”, “তপঃ-নাগরে-নিমগ্ন”) মহাদেব, অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্তে মধুসূদন কেবলই সংঘমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতা-সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিন্দু সঙ্কটে কুমারসম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি পবিত্রচিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্ত, তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য কামদেব, দেবকাঁধ উদ্ধারের জন্ত, তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিন্দু উৎপাদন করিয়াছিলেন। পার্বতীর তজ্জন্ত বিন্দুমাত্রও অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পার্বতী, উদ্বেগু সিদ্ধির জন্ত, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণীগণের

মেঘনাদবধে কুমার- অগ্রগণ্য এবং জগতে সহধর্মিণী নামের আদর্শস্বরূপা, সম্ভবের আদর্শ হইতে তাঁহার চরিত্র একরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে বিচ্যুতি।

সঙ্গত হয় নাই। গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে বাইয়াই তিনি একরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বাহা হউক, গ্রীকদেবী জুনোর জ্বায়, পার্বতীরও অভিলাষ সিদ্ধ হইল। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, দেবরাজকে ইন্দ্রজিতের বধের জন্ত, রক্ততেজে নির্মিত অস্ত্র, শস্ত্র প্রেরণের আদেশ দান করিলেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ, দেবেশ্বরের আদেশে, লক্ষণকে সেই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়া আসিলেন। এইখানে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। কল্পনাচ্ছটায় ও বর্ণনাগুণে মেঘনাদবধের এই সর্গ অপরাপর সর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কবি, নানাদেশীয় মহাকাব্যসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য

সার্থক হয় নাই। “শৈব কুলোত্তম” রাক্ষসরাজের পুত্রকে নিহত করিতে হইলে, অবশ্যই, মহাদেবের অমুগ্রহ লাভ আবশ্যক ; কিন্তু দেবেশ্বরের মায়াদেবীর নিকট গমন, অজ্ঞানতা, এবং চিত্তরথের দ্বারা সেই সমস্ত অজ্ঞপ্রেরণ প্রভৃতি আড়ম্বর-পূর্ণ বিষয়গুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যে ভাবে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাতে রুদ্রভেজে বিনির্মিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধের জগ্গই দেবাগুণাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন, হত্যার জগ্গ নহে। লক্ষ্মণকে যখন সেরূপ নরহস্তাক্রমে চিত্রিত করা কবির অভিপ্রেত ছিল, তখন তাঁহাকে রুদ্রভেজে নির্মিত মহাস্ত্র প্রদান না করিলেই ভাল হইত। দ্বিতীয় সর্গের অভিনেতা ও অভিনেত্রী, প্রধান দেব, দেবীগণের মধ্যে কাহারও চরিত্র উচ্চ আদর্শে চিত্রিত হয় নাই। মহাদেবের ও পার্বতীর বিষয় আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ; ইন্দ্রের ও লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রও নির্দোষ নহে। ইন্দ্রের চরিত্রে কাপুরুষতা এবং লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রে জিবাংসা ও ভক্ত-প্রোহিতা লক্ষিত হয়। কামদেব, রতি, মায়াদেবী, শচী এবং চিত্ররথ প্রভৃতি সামান্য সামান্য পাত্রগণের চরিত্রে বিশেষ আপত্তিজনক কিছু নাই। কিন্তু অপ্রধান পাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের কথা অধিক আলোচনা নিশ্চয়োজন।

তৃতীয় সর্গ।—তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন, এবং ইহা হইতেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। রামায়ণজ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, ভগবান বাম্মীকি রাক্ষসদিগকে নিতান্ত পশুবৎ চিত্রিত করিয়াছেন। রামায়ণ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হই, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু কার্যবিশেষের জগ্গ ঘূর্ণার হইলেও তাঁহাদিগের চরিত্রের যে একটি মধুর অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ সীতাপহারক হইলেও তাঁহাদিগের চরিত্রের যে একটি মধুর অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ সীতাপহারক হইলেও পতি, পিতা, স্বজন এবং রাজা ছিলেন। স্বামীরূপে, পিতারূপে, স্বজনেরূপে বা রাজারূপে তাঁহার চরিত্রের যে কোমলতাময়

অংশ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা, মহর্ষি তাহার উল্লেখ

রাক্ষসদিগের সম্বন্ধে
মহর্ষি ও মধুসূদনের
চিত্র আদর্শ।

করেন নাই বলিলেও হয়। সেইজন্য আমরা, তাঁহার
প্রকৃতির পশুভাব মাত্র দেখিতে পাইয়া, তাহাতে কোনরূপ
সন্দেহের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। রাক্ষসবংশের

এই পাঠকের সহানুভূতি-উদ্বীপন, মেঘনাদবধ রচয়িতার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল ;

সেইজন্ত তিনি তাঁহাদিগের পারিবারিক জীবনের ললিত চিত্র আমাদের সন্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, মেঘনাদবধের রাবণ, অতুল ঐশ্বৰ্যের অধিপতি এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ বীর ; তিনি যে সীতাপহারক, কবি তাহার উল্লেখ করিতে পরাশ্রয় হন নাই ; কিন্তু তিনি সেইসঙ্গে তাঁহাকে স্নেহবান্ পিতা, গৌরবশালী সন্ত্রাট এবং নিষ্ঠাবান্ ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা, শোকাকুলা জননীর এবং অভিমানিনী পত্নীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দোদরী, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়া মাতা ও শ্বশুর এবং স্বামী, পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিতা সন্ত্রাজীর আদর্শ। কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষা গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা মেঘনাদের ও প্রমীলার চরিত্র হইতেই মধুসূদন রাক্ষস পরিবারদিগের প্রতি পাঠকের অশ্রুকম্পার উত্থেক করিতে অধিক সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদ স্বদেশবৎসল বীর, স্নেহবান্ ভ্রাতা, পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র, ভক্তিমান উপাসক, এবং পত্নীগত প্রাণ, অকপট প্রেমিক। প্রমীলা তাঁহারই উপযুক্তা পত্নী। প্রমীলা বীধে ভৈরবী, কিন্তু কোমলতায় কুলবধূর আদর্শ-স্থানীয়া ; কোমলা বজ্ররীর শ্রায় স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবিতা ; কিন্তু, অবস্থা-প্রমীলা-চরিত্র।

বিশেষে, তিনি যে বীরপতির সহচারিণী হইবার উপযুক্তা, তাহারও পরিচয়দানে পরাশ্রয়ী নহেন। মেঘনাদবধ-রচনার সময়ে মধুসূদন অতি যত্নের সহিত ট্যাসোর “জেরুজালেম উদ্ধার” কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই তিনি প্রমীলা-চরিত্র রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমরা প্রথম সর্গে দেখিতে পাই, প্রমীলা বনদেবীর শ্রায় স্বামীর সঙ্গে প্রমোদোত্তানে ক্রীড়াপবায়ণা ; কবি প্রমীলার প্রমোদ-উত্তানের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। ট্যাসোর কাব্যের ষোড়শ স্বর্গ হইতেই কবি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম অঙ্কে প্রমীলা ও মেঘনাদকে সেই প্রমোদ-উত্তানে দেখিয়া আমাদের কুহকিনী (Armida) আর্মিডার ও প্রমোদ-নিরত (Rinaldo) রাইনাল্ডোর কথা স্মরণ হয় ; এবং আর্মিডার পুরীর শ্রায় প্রমীলার পুরীও মায়ানির্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহাবীর রাইনাল্ডো, যেমন কুহকিনী আর্মিডার সহবাসে, আশ্রয়বিস্তৃত হইয়া তাহার উত্তানে বাস করিতেছিলেন, বীরবর মেঘনাদও, তেমনই ইন্দ্রিয়স্থখে মুগ্ধ হইয়া, প্রমীলার বিহার-কাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কবি প্রথমে এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রমীলা-চরিত্রের উৎকর্ষ-হানি হইবে ভাবিয়া পরে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পক্ষে পাঠক ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। ট্যাসোর কাব্য হইতে মধুসূদন বদিও তাঁহার

প্রমীলা-চরিত্র নির্মাণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের। প্রমীলা তাঁহার কল্পনার মৌলিক চিত্র। প্রথম সর্গে প্রমীলা অশ্রুসিক্তা এবং যুদ্ধগামী পতিকে বিদায়দানে অনিচ্ছাবতী। প্রমীলা-চরিত্রের এই অংশে কোন নূতনত্ব নাই; কোমলতাময়ী কুলবধুর পক্ষে বাহা স্বাভাবিক, কবি ইহাতে কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কুলবধুর কোমলতার সঙ্গে বীরাজনার শৌর্ধের সম্মিলনেই প্রমীলা-চরিত্রের নূতনত্ব। তৃতীয় সর্গ হইতে কবি প্রমীলা-চরিত্রের এই নূতনত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মেঘনাদ বিষাদিনী পত্নীকে “ত্বরায় আমি আসিব কিরিয়া” বলিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন, তিনি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। পতির প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সাক্ষী প্রমীলার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যে যুদ্ধে প্রমীলার সহস্র সহস্র আত্মীয় নিহত হইয়াছিলেন, প্রমীলার জীবনসর্বস্বও সেই কাল-সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইলে সাক্ষীর প্রাণ যে অধীর হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। বৃদ্ধ-সংহারের কবি ষথার্থই বলিয়াছেন;—

“পতি যোদ্ধা ধার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়;
জানে সে ক’জন ভাবে সে ক’জন
বীর-পত্নী কিসে হয়।”

অশ্রুসিক্তা প্রমীলা

“কভু বা মন্দিরে গশি বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা, কভু বা উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে
এক দৃষ্টে চাহে বামা দূর লক্ষ্যপানে.
মুহমূহ চক্ষুজল মুছিয়া আঁচলে।”

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং রজনী, কালভূজঙ্গিনীর শ্রায়, প্রমীলাকে দংশন করিবার জন্ত, সমাগত হইল। জ্যোৎস্নাধৌত উপবনের সৌন্দর্য এবং সখীগণের প্রবোধবাক্যে সাক্ষীর হৃদয় সাশ্বনা প্রাপ্ত হইল না। প্রমীলার অশ্রুবিন্দু পুষ্পদলে নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তাদামে স্নশোভিত করিতে লাগিল। ভাবী বিপদের ছায়া, অতি প্রগাঢ়ভাবে, সাক্ষীর হৃদয়াকাশে পতিত হইয়াছিল। প্রমীলা, স্বর্ধ-প্রাণা স্বর্ধমুখীর নিকট বাইয়া, নিরাশ প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“যে রবির ছবি-পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি,
আর কি পাইব আমি (উবার প্রসাদে),
পাইবি, যেমতি, সতি, তুই প্রাণেশ্বরে ?”

পতির বিপদাশঙ্কা বুঝিলে সাধবীর প্রাণ পৃথিবীর এমন কোন বিপদ নাই,
যাহার সম্মুখীন হইতে ভীত হয়। স্বামীর বিপদ-ভয়-ভীতা প্রমীলা আপনার
সখী বাসন্তীকে বলিলেন ;—

“চল সখি লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ?”

কাদম্বিনী যে স্নিগ্ধ বারিধারার সঙ্গে ছন্দয়ে অশনিও বহন করে এবং
কলনাদিনী নির্ঝরিতা যে গিরিশৃঙ্গও উৎপাটিত করিয়া লইয়া যায়, বাসন্তী
তাহা জানিত না। বাসন্তী বিশ্বয়ের সহিত বলিল ;

“কেমনে পশিবে

লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীয় চম্ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-অরি কিরিছে চৌদিকে
অঙ্গপাণি, দণ্ডপাণি, দণ্ডধর যথা।

তেজস্বিনী প্রমীলা বাসন্তীর কথায় বলিলেন ,

“কি কহিলি বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষকুল-বধু,
রাবণ স্বস্তর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভূজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।”

প্রমীলার যে প্রমোদ-উজ্জ্বল বেগু-বীণা-স্বরারে মূর্ছিত থাকিত, মুহূর্ত-
মধ্যে তাহা সময়কোলাহলে পূর্ণ হইল। প্রমীলার সঙ্গিনী দৈত্যবালাগণ,

বীরভূষণে সজ্জিতা হইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন। প্রমীলারও
বরবপু কঠিন বীর্যভরণে সুশোভিত হইল। পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ
প্রমীলার রণসজ্জা ও লঙ্কা-প্রবেশ।

তুণ, উরুদেশে খরশান অসি, এবং করে সুদীর্ঘ শূল ধারণ
করিয়া প্রমীলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অকস্মাৎ শত ব্রজাঘাতের

শ্রায় ধনুষ্ঠকার-শব্দে ও শব্দধ্বনিতে লঙ্কার পশ্চিম দ্বার বিকম্পিত হইল। অন্তের কথা দূবে থাকুক, হুহুমানেরও বীরজয় প্রমীলার সেই বীরবেশ দর্শন করিয়া, স্তম্ভিত হইল। হুহুমান, উগ্রভাবে পরিত্যাগপূর্বক, প্রমীলার দূতীকে সঙ্গে লইয়া, রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। দূতী, রামচন্দ্রের নিকট, হয় যুদ্ধ না হয় লঙ্কাপুরে প্রবেশের পথ প্রার্থনা কবিল। রঘুরাজ-বংশধরের পক্ষে পতিপদ দর্শনোৎসুকা সাধবীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সম্ভব? রামচন্দ্র বিনয় ও সমাদরেব সহিত হুহুমানকে পথ উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। সাধবীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তেজঃ-প্রভায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া এবং রণবাণের গম্ভীর শব্দে রজনীর নিস্তরুতা বিমথিত করিয়া, প্রমীলা সজিনীগণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিম্বিত বধুসৈনিকগণ, চিত্তার্পিতের শ্রায় সেই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের মনে হইল, একি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? মায়াদেবী লক্ষণের সাহায্যের জ্ঞাত, আবির্ভূত হইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, একি তাঁহারই মায়া? কৈলাসে ভগবতী বিম্বিতনেত্রে প্রমীলার বীরজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। লঙ্কাবাসীগণ, সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জ্ঞাত, চতুর্দিক হইতে ধাবমান হইল। রক্ষাবধুগণ, পুষ্পনাম বর্ষণ করিয়া, এবং বন্দীগণ, জয়শব্দ উচ্চারণ কবিয়া, প্রমীলাকে অভ্যর্থনা করিল।

* * * * * “কতক্ষেণে বায়া

উত্তরিল প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে,

মণিহারী ফণী ঘেন পাইলা সে ধনে।”

প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ মেঘনাদবধের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। সুস্বভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহাতে কোন কোন ভ্রুটি লক্ষিত হইবে। বীররসের সঙ্গে তাহার “ব্যভিচারী” শৃঙ্গার রসের সন্মিলন করাতে স্থানে, স্থানে ইহার সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

প্রমীলা-চরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন এবং মধুসূদনের কল্পনাকাননের সর্বোৎকৃষ্ট কুসুম। যে বঙ্গভূমি, সাতশত বৎসরেরও অধিকাল, পরাধীনতায় নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহাতে কোন কবির কল্পনা হইতে প্রমীলার বিশেষণ। -

প্রমীলার শ্রায় বীরাননার উদ্ভব নিরতিশয় বিস্ময়কর। পৃথিবীর অনেক কবিরই কল্পনা বীররমণীর মহিমা বর্ণনা করিতে উদ্যোগিত হইয়াছে; কিন্তু অপর কোন কবিই এরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ডার্সিলের (Camilla) ক্যামিলা, ট্যালোর (Clorinda) ক্লরিণ্ডা, গিল্ডিপের (Guldippe) গিল্ডিপ, ও (Erminia) এরমিনিয়া এবং বাইরনের (Maid of

Saragosa) মেড্ অফ্ সারাগোশা, সকলেই প্রমীলা হইতে স্বতন্ত্র। কুলবধুর কোমলতা, প্রতিপ্রাণার আত্মবিসর্জন, এবং বীরাজনার শৌৰ্য, একসঙ্গে মিলিত হইয়া প্রমীলা-চরিত্রকে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় করিয়াছে। হুম্মানের সঙ্গে প্রমীলার কথোপকথন জীবন করিলে মনে হয়, সৌন্দর্য ও জ্যোতির সম্মিলনে উদ্ভূতা বিদ্যুৎস্রবের সঙ্গেই প্রমীলার তুলনা সম্ভব; পৃথিবীর অপর কোন পদার্থের সহিত তাহার তুলনা হয় না। অত্র দেশে এ চিত্র উদ্ভবযোগ্য নয়। প্রমীলার কোমলতা, প্রমীলার পাতিব্রত্যা, প্রমীলার শৌৰ্য স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র আধারে মিলিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষী ভিন্ন অত্র কোথাও একাধারে এই সকল গুণের সমন্বয় হয় না। প্রমীলা পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর লীলাক্ষেত্রে ভারত-ভূমিতেই প্রসূতা হইবার উপযুক্ত। যে প্রমীলা, বাহুবলে রঘুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার স্বপ্নর ভয়ে তটস্থা হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

* * * “হায় নাথ !

ভেবেছিলাম, ক্ষণ-গৃহে যাব তব সাথে,

সাজাইব বীর-সাজে তোমায় ! কি করি ?

বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা স্বাশুড়ী।

রহিতে নারিলাম তব পুনঃ নাহি হেরি—

পদযুগ।”

এইজগত্ই আমরা বলিয়াছি, বীরাজনার শৌৰ্যের সঙ্গে এইরূপ কুলবধুর কোমলতা অপর কোন দেশে প্রাপ্তিযোগ্য নয়। বোডিসিয়ার ও জোন অব্ আর্কের দেশে ক্যামিলা ও ক্লিগুই আদর্শ। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর জন্মভূমিতে প্রমীলা আদর্শ চিত্র।

যধুশূদন প্রমীলা-চরিত্র কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদবধের কোন কোন চরিত্র পাশ্চাত্য কাব্যের

প্রমীলা-চরিত্রের
উৎপত্তি।

প্রতিচ্ছায়া রূপে কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু প্রমীলা-চরিত্র

কবি তাঁহার স্বদেশীয় আদর্শে কল্পনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য

আদর্শে এ কোমলতা এবং এই বিনয়-নম্র ভাব বোধ হয়

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাসোর জেরুজালেম-

উদ্ধার কাব্য হইতে যধুশূদন তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন।

ইহার বীরাজনা এরুমিনিয়ার, ক্লিগুইর এবং গিল্‌ডিগের চিত্রে তাঁহার

বীরস্বামুরাগী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসজ্জার

সংজ্ঞিতা আথিনীর, (Athence) এবং ইনিয়াডের অস্বারোহণ-নিপুণা, সসজ্বিনী কেমিলার চিত্র তাঁহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিষ্কৃত করিয়াছিল। তিনি মেঘনাদবধে কোন বীরাদনার চরিত্র প্রবর্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল পাশ্চাত্য মহাকাব্যগণের জ্ঞান তাঁহার স্বদেশীয় একজন কবিও তাঁহার কাশীদাসের প্রমীলা।

কল্পনা পরিপোষণের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ-পর্ব হইতে মধুসূদন তাঁহার মনঃকল্পিতা নায়িকার একখানি রেখাচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ-পর্বে বীরাদনা প্রমীলা সম্বন্ধে কাশীরাম দাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

“মহাবনে আছেয়ে প্রমীলা নামে নারী,
পদ্মিনী তাঁহার সনে আছে লক্ষ চারি।

* * * *

মহাবলবতী তারা, শুন মহাঘশ,
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সাহস।
বণিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে,
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে ॥
অর্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিবাদ
এমন না দেখি কভু হইল প্রসাদ।
ঘোড়া নাহি দেখি পথে, চৌদিকে রমণী,
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি।
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধহুঃশর
কি বুঝিয়া নারী সঙ্গে করিব সমর।
দরশনে ভয় পাই যুঝিব কেমনে,
পরাজয়ে অপঘণ থাকিবে ভুবনে।

* * * *

বৃষকেতু বীর দিল ধমুকে টঙ্কার,
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার।
নানা বাজ বাজাইয়া চলে সুভাষিণী
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধাভিলাষিণী।”

রামচন্দ্রের বাক্যে মেঘনাদবধের প্রমীলার জ্ঞান অর্জুনেরও বাক্যে মহাভারতের প্রমীলা যুদ্ধ হইতে বিরতা হইয়াছিলেন এবং অর্জুনকে আশ্রয়-পরিচয় প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবন,
মোর ভয়ে কম্পিত যতেক দেবগণ ।
পার্বতীর বয়ে কারে ভয় নাহি করি,
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী ॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্ট লোকপাল ॥”

প্রমীলার নাম, প্রমীলার বীরাজনা সঙ্গিনীগণ, প্রমীলার পুরীতে পুরুষের অভাব, এবং পার্বতীর অহুগ্রহে প্রমীলার অজৈয়ব প্রভৃতি মধুসূদন কানীরাং দাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কানীরাং দাসের প্রমীলাই যে তাঁহার প্রমীলার আদর্শ, মেঘনাদবধে তিনি নিজেও সে সঙ্ক্ষে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রমীলার রণসজ্জা বর্ণনার পূর্বে তিনি লিখিয়াছেন ;

“যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সজে আসি উত্তরিল।
নারীদেশে ; দেবদত্ত শঙ্খনাদে ক্রবি,
রণরঙ্গে বীরাজনা সাজিল কোতুকে ॥”

কানীরাং দাসের ত্রায় তাঁহার স্বদেশীয় আরও একজন কবির নিকট প্রমীলা চরিত্র সঙ্ক্ষে মধুসূদন বর্ণী আছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, মধুসূদনের বাল্যস্বহৃদ বাবু রত্নলাল বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্মিনী-উপাখ্যান সঙ্ক্ষে রত্নলালবাবুর সঙ্গে মধুসূদনের অনেক সময় কথোপকথন হইত। নিজের মনঃকল্পিতা প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ, পরিবর্তিত আকারে, তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের উপযোগী হইয়াছিল। রত্নলালবাবুর পদ্মিনীর রণসজ্জার সঙ্গে প্রমীলার রণসজ্জার তুলনা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন তাঁহার বাল্য-স্বহৃদের নিকট লক্ষ আদর্শ আরও কত উন্নত করিয়াছেন। রত্নলালবাবু পদ্মিনীর রণসজ্জার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন ;—

“এখানে পদ্মিনী সতী, অন্তরে বিচারি,
ধরিলেন সাময়িক বেশ মনোহারী ॥
দুই সঙ্কে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন ;
কটিতটে খর করবাল সুশোভন ॥

করে ধরিলেন শূল খরশান ;
 পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম, বর্ম পরিধান ॥
 ধরণী চুম্বিত চাকু বেগী চিকনিয়া ।
 বিচিহ্ন কিরীটে বাঁধে করে বিনাইয়া ॥
 হইল অপূর্ব শোভা কি কব বিশেষ ।
 যেন অগন্ধাজী দেবী সমরে প্রবেশ ॥

মধুসূদন প্রমীলার রণলঙ্কার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

“রোষে, লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
 প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী উপরি,
 হায়রে শোভিল যথা কাদম্বিনী পরে
 ইন্দ্রচাপ । লেখা ভালে অঙ্গনের রেখা,
 ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
 শশিকলা । উচ্চকূচ আবরি কবচে
 স্নলোচনা কটিদেশে যতনে, আঁচিল
 বিবিধ রতনময় স্বর্ণ সরাসনে ।
 নিষজের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
 রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে ।
 ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায়রে বর্জুল
 যথা রম্ভা বন-আভা) হৈমময় কোষে
 শোভে খরশান অসি, দীর্ঘ শূল করে,
 ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ ।
 সাজিলা দানব-বালা হৈমবতী যথা ।
 নানিভে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে ।

পূর্বগামী কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মধুসূদন যে আদর্শ আভাস গ্রহণ
 ছিলেন, দেশ, কাল, অবস্থাও তাহার বিকাশ সম্বন্ধে অস্বতীকৃত করিয়াছিল ।
 মঘনাদবধ রচনার কিছুদিন পূর্বে সিপাহীবিদ্রোহের অভিনেত্রী স্বামীজী বীরাজনা
 দম্মীবাদ্যের বীরত্ব ভারতসম্মানদিকে চমকিত করিয়াছিল এবং যখন মধুসূদনের
 হৃদয়ে প্রমীলার চিত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, তখনও তাহা ভারতবাসীদের
 আলোচনার বিষয় ছিল । স্বাধীনতার অনভ্যাস এবং বহুশত বৎসরের
 পরাধীন আভির কল্পনা হইতে প্রমীলার জায় শূন্যতার সৃষ্টি যে আকস্মিক

কারণে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বিস্তৃত ভাবে প্রমীলা চরিত্রের উৎপত্তি-নির্ণয় করিয়াছি।

মধুসূদনের প্রথম কাব্যের নায়িকা, তিলোত্তমা, পার্শ্বিক পদার্থসমূহের তিল তিল সমুচ্চয়ে গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের নায়িকাও নানাদেশীয় কবিগণের কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হইয়াছেন। ট্যাসো, হোমর, ভার্জিল, কাশীরাম দাস এবং রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই ইহার দেহ-নিৰ্মাণোপযোগী উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবশিল্পীর স্নায়ু মধুসূদন অমৃতময়ী প্রতিভার সঞ্চার দ্বারা, তাঁহার প্রাণদান করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা যেমন সুররমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, প্রমীলাও যে তেমনই বীররাজগণের শীর্ষস্থানীয়া হইবেন, তাহা বিচিহ্ন নয়।

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ এরূপ বিস্তৃত ও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিবার কবির উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে হুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। পাঠকের মনে হইতে পারে যে, “এই উপাখ্যানের সহিত মূল উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মত যে অমনি ভাসিয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য কি?” প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ ব্যাপার মেঘের মত পাঠকের স্মৃতি হইতে ভাসিয়া যায় কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে একবার মেঘনাদবধের শেষাঙ্ক আলোচনা করিতে বলি। পাঠক সেই সাগর-ফুলবর্তী

মহাশ্মশানস্থ চিতা, সেই ফুল কিম্বদন্তিপাদপ সদৃশ রক্তাক্ত
প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা। বীরদেহ, সেই বিশদ-বস্ত্র উত্তরী-পরিহিত রাক্ষসরাজ

এবং সেই অশ্রুসিক্তমুখী রক্ষোবালাগণের কথা স্মরণ করুন; এবং সেই সকলের সঙ্গে সেই আলুলায়িতকুণ্ডলা, পুষ্পমালাভরণ, অশ্রুপূর্ণ-নয়না, দীনা, বিধবার কথা চিন্তা করুন। এই কি সেই বিদ্যাক্লান্তসদৃশী প্রমীলা? বিনি একদিন, রঘুসৈন্যকে সঙ্কল্প করিয়া পতিপদপূজার জন্য, লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অশ্রুসিক্তমুখী বিধবা কি সেই প্রমীলা? সেই মূর্তিমতী সমরলক্ষ্মীর পরিণাম কি এই হইয়াছে? তাঁহার বীররাজনা সঙ্গিনীগণ তাঁহার সমরসজ্জা, তাঁহার “বাড়বাগ্নিশিখা-সদৃশী বামী”, এই শ্মশান-শবায়ণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কিঙ্ক হায়! নিয়তি-চক্রের কি ভয়ানক আবর্তনই ঘটিয়াছে। পাঠক, তৃতীয় সর্গে প্রমীলার সেই রণসজ্জা এবং সেই ভৈরবী মূর্তি দর্শন করিয়াছেন, সখীগণের প্রতি সেই উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন; নবম সর্গে প্রমীলার চিতা-সজ্জা, এবং শোকমলিন মুখশ্রীও একবার দর্শন করুন; সখীগণকে সযোজন করিয়া তাঁহার সেই মর্যাদাঘাতিনী বাগীও, একবার শ্রবণ

করুন ; এবং তাহার পর চিন্তা করিয়া বলুন, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ শরতের মেঘের ত্রায় আপনার হৃদয় হইতে ভাসিয়া যায় কি না ? মধ্যাহ্ন-গগনের উজ্জলতা না দেখিলে সন্ধ্যাহ্নের ঘনঘটা কেমন করিয়া বুঝিবেন ? পৌর্ণমাসির সৌন্দর্য অল্পভব না করিলে অমানিশার ভীষণত্ব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবেন । মেঘনাদবধের নবম সর্গের বিবাদময় ভাব অল্পভব করিতে হইলে তৃতীয় সর্গের আবশ্যক । প্রমীলা সাধারণ নারীর ত্রায় চিত্রিতা হইলে পাঠক হৃদয়ের যে ভাব লইয়া মেঘনাদবধ সমাপ্ত করিতেন, তৃতীয় সর্গে বর্ণিতা প্রমীলাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা শতগুণ বিবাদের সঙ্গে গ্রহণ শেষ করিতে হয় । আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাক্ষসদিগের প্রতি পাঠকের সহানুভূতির উদ্দীপন, মেঘনাদ বধকাব্যের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল ; প্রমীলা-চরিত্রেই তাঁহার সে উদ্দেশ্য বিশেষ-রূপ সার্থক হইয়াছে । রাক্ষসরাজের অসংযত বাসনারূপ দাবানলে যে কত কোমলা বস্তুরী, কত গোভাসৌরভময় কুসুম ভস্মীভূত হইয়াছিল প্রমীলার জীবনে কবি-তাঁহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন । মনুষ্য সংসারে কেবল আত্মকৃত কার্যের জন্য, দণ্ড পুরস্কারের অধিকারী নহেন । সামাজিক জীবনরূপে অন্তের কৃত কার্যেরও জন্য তাঁহাকে পুরস্কার অথবা নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতে হয় । লঙ্কা যুদ্ধের জন্য রাক্ষসরাজই অপরাধী ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ কত যে নির্দোষী নরনারীকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, প্রমীলায় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । যে গভীর আবর্তে লঙ্কাপুত্রী নিমগ্ন হইতেছিল, রূপ, যৌবন, বাহুবল, নির্দোষিতা কিছুই তাহা হইতে অব্যাহতি ছিল না । প্রমীলা নিরপরাধ কুলবধু, গুরুজনে ভক্তিমতী, এবং রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম পাত্তিব্রত্যে পতি-ব্রতাগণের অগ্রগণ্য । প্রমীলা ভগবতীর প্রিয় উপাসিকা ; কিন্তু এই মহা দাবানল হইতে কিছুই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না । শৌর্ধে প্রমীলা হয়ত স্বামীর মৃত্যুর প্রতিবিধানে সমর্থ । কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে কুলবধু করিয়া এমনি কঠিন নিগড়ে তাঁহার হস্ত, পদ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সে, স্বামীর জন্য একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও তাঁহার সাধ্য ছিল না । প্রমীলার সাধ ছিল, মেঘনাদের সঙ্গে যজ্ঞাগারে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিবেন । বীরাজনার ও বীরপত্নীর পক্ষে এরূপ সাধ স্বাভাবিক । প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে লঙ্ঘন, বোধ হয় মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না । কিন্তু প্রমীলার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না । তাঁহার স্নেহপ্রবণহৃদয়া স্বামী তাঁহাকে বলিলেন ;—

“থাক মা আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব

ও বধু-বদন ছেঁরি এ পোড়া পরাগ ।”

সুশীলা কুলবধু পক্ষে স্বপ্নরূপে একরূপ অমুরোধ বা আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। স্বপ্নর কথায় একটি দ্বিগুণিত্তি করিবারও প্রমীলার শক্তি হইল না। প্রমীলাকে বীরবতী অথচ কুলবধু করিয়া চিত্রিত করাতে কবি নানাবিধে তাঁহার চরিত্রের এইরূপ মনোহারিত্ব প্রকটনের সুযোগ পাইয়াছেন। জেকবালেম উদ্ধার কাব্যের বীরাজনা রুরিগার বা গিল্ডিপের দ্বায় তাঁহাকে স্বাধীনা ও রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ পরায়ণা করিলে তিনি কখনই সেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। তাহা হইলে তেজস্বিতার সঙ্গে কোমলতার সম্মিলনে প্রমীলা-চরিত্রে যে অপূর্ব মনোহারিত্ব, আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না। ভুবনবিজয়ী ঋতুর ও বাসবদর্পহারী পতি জীবিত থাকিতে কুলবধু প্রমীলাব পক্ষে, শত্রুদমনের জন্ত, অস্ত্রধারণ নিতান্তই লজ্জাকর ও অস্বাভাবিক হইত। সেই জন্তই কবি তাঁহাকে পতি-পদ-দর্শনোৎসুক বীৰাজনারূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার লক্ষ্যপ্রবেশ বর্ণনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে বর্ণাবলিনীরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে মেঘনাদবধেণ এই তৃতীয় সর্গই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেঘনাদবধের সর্বপ্রধান দোষও এই তৃতীয় সর্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কবি, বাহ্যিক পরিজনগণের প্রতি অতিরিক্ত মহাভূত্ব বশতঃ রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ হইতে রামচন্দ্রের আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের বামচন্দ্র বিনীত ধর্মামুরাগী এবং দেবগণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ। চিত্রেরথের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে তাঁহার চরিত্রের কোমলতা ও মধুরতা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তৃতীয় সর্গে কবি এই সকল সদগুণের সঙ্গে, তাঁহার চরিত্রে ভীকৃত্য-দোষ আরোপ করিয়াছেন। আশ বামায়ণের রামচন্দ্রও

বিনয় ও কোমলতার অবতার ছিলেন; কিন্তু তিনি ভীকৃত্য মেঘনাদবধের প্রধান দোষ ছিলেন না। মহাপুরুষের পক্ষে ভীকৃত্য অপেক্ষা গুরুতর

দোষ আর কিছুই হইতে পারে না। রোগ, শোক, বিপদ বাহাই ঘটুক, পর্বতের দ্বায় অটল নির্ভীক ভাবই মহাপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। ভবভূতি তাঁহার নাটক সমূহে ইহাই রামচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন রামচন্দ্রকে বিনয়ী, ধর্মপরায়ণ এবং উদারস্বভাব করিয়াও তাঁহাকে ভীকৃত্য দোষে দূষিত করিয়াছেন। ব্রহ্মমালিনীর রণ-প্রার্থনার রামচন্দ্র যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশ অতীব সুন্দর। তিনি বলিয়াছিলেন :

* * “তুন স্বকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কতু অকারণে,
অরি মম রক্ষপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধু, কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লক্ষা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।”

ইহা তাঁহারই জ্ঞায় মহাপুরুষের উপযুক্ত। কিন্তু ইহার পরেই তিনি বলিলেন,—প্রমীলাকে বলিও,

“বিনা বণে পরিহাব মাগি তাঁর কাছে।”

এই কথাগুলি রামচন্দ্রের চবিত্ত্বে উপযুক্ত হয় নাই। বিনয় অবশ্যই অতি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু বিনয়ের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন পুরুষোচিত কার্য নহে। ইহাব পর রামচন্দ্র বিতীষণকে বলিলেন,

“দৃতীর আকৃতি দেখি ডবিহু হৃদয়ে

রক্ষাবর, যুদ্ধসাধ ত্যজিহু অমনি।

মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীয়ে।”

এই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, রামচন্দ্র, তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ব অথবা জীবাতির প্রতি সম্মান বশতঃ, প্রমীলার সঙ্গে উদার ব্যবহার কবেন নাই প্রমীলাব শোৰ্ধে ভীত হইয়াই বিনায়ুক্ষে, তাঁহাকে পথপ্রদান কবিয়াছিলেন।

“যুদ্ধসাধ ত্যজিহু অমনি,”

ইত্যাদি কথাগুলি নিতান্তই ভীষণ-জনোচিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের চরিত্রে একগুণ ভীকৃত্য দোষ আরোপ করাতে কাব্যেব সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে একেই ত রাক্ষসগণেব প্রতি অতিরিক্ত সহায়ভূতি মধুসূদনকে রামচন্দ্রের মহত্ব অহুভবে অক্ষম কবিয়াছিল, তাহার উপর তিনি কাশীরামদাসের মহাভারতে প্রমীলার সঙ্গে ব্যবহারে অর্জুনের যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও উন্নত নয়; অর্জুনও তাহাতে কাপুরুষের জ্ঞায় চিত্তিত হইয়াছেন। আদর্শকে উন্নত না করিয়া অন্ধের জ্ঞায় অহুসরণ করাতেই রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন একগুণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রমীলা-চরিত্রের গাভীর্বেব সঙ্গে রামচন্দ্রের চরিত্রের মহত্ব রক্ষিত হইলে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ সর্বাঙ্গস্বন্দর হইত।

চতুর্থ সর্গ—মধ্যাহ্নের উজ্জল আলোকের পর লক্ষ্যার স্তম্ভিৎ ছায়া যেমন চুস্তিদায়িনী, মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের পর চতুর্থ সর্গও তেমনই প্রীতিকর কাহার অল্পম চরিত্র এই স্তম্ভিৎ কাল, হিন্দুরনারীগণের প্রাণ অন্নতাতিবিস

করিয়া আসিতেছে, চতুর্থ সর্গে আমরা সেই দেবীর অথবা সেই মূর্তিমতী পবিত্রতার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। লঙ্কায়ুজের সময় নীতচরিত্র।

নীতাদেবী কারাগারে বন্দিনী; কিন্তু সেই বন্দীশালার অভ্যন্তরেও মধুসূদন তাঁহার শোকমলিন মুখশ্রীতে যে মধুরতা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বত হইবার নয়। আমরা চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই, লঙ্কাপুরী আনন্দোৎসবে মগ্ন। রত্নহার্য্য রাজমহিষীর স্তায় রাক্ষসরাজের কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী পুরী দীপমালায় স্বেশোভিত হইয়াছে; গৃহাগ্রে গৃহাগ্রে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতেছে; বাতায়নে বাতায়নে দীপাবলী সজ্জিত রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে কুসুমদাম বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার পরাক্রমে দেবগণও ভীত, সেই ইন্দ্রবিজয়ী বীর মেঘনাদ পুনর্বীর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসীগণ যে আনন্দমলিলে মগ্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত উৎসবমগ্না লঙ্কাপুরীর অতি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই আনন্দময়ী পুরীর মধ্যে কেবল একটিমাত্র উপবনে উৎসব ছিল না। শোকের ঘনাকার, রজনীর তিমিরকে দ্বিগুণিত করিয়া, ঘেন তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, পক্ষীর কণ্ঠে পর্যন্ত স্বর ছিল না। ঘননিবিড় পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া, চন্দ্রকিবণ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু অন্ধকারময় অরণ্যের অভ্যন্তরে যেমন একটিমাত্র কুসুম, বিকশিত হইয়া, বনভূমিকে স্বেশোভিত করে, তেমনই সেই আলোকশূন্য উপবনের মধ্যে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবীপ্রতিমা, চতুর্দিক আলোকিত করিয়া, তথায় বিরাজিত ছিল। রাশি রাশি কুসুম তাঁহার চতুর্দিকে বৃষ্টিচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল; সমীরণ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক একবার উজ্জ্বলিত হইতেছিল; এবং দূরস্থিতা প্রবাহিণী, তাঁহার দুঃখকাহিনী বীচীরবে গান করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছিল। দেবীর মুখ বিমলিন; অশ্রুধারা নীরবে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার কপোলদ্বয় অভিষিক্ত করিতেছিল; কিন্তু কি এক অপূর্ব জ্যোতি, সেই মলিন মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কাননভূমি সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবার নয়।

এই বনাধিপাত্রী দেবী কে, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক করে? দুরন্ত চেড়ীগণ, অশোকবনস্থিত। নীতাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্বক মেঘনাদের অভিষেক-উৎসব দর্শনের জন্য অন্তর্য্য গমন করিয়াছিল। কিন্তু নীতাদেবী একাকিনী ছিলেন না। শত্রুপূর্ণা লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও একজন তাঁহার সমদুঃখভাগিনী ছিলেন। বিভীষণ-পত্নী সরমা তাঁহাকে সাধনা দান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে

অশোকবনে আগমন করিতেন, তাঁহার ললাটে সধবা-লক্ষণ লিন্দুর-বিন্দু প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার মুখে তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথন আৰ্ঘ্য রামায়ণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু ছায়া ও দেহে যেরূপ সম্বন্ধ, মেঘনাদবধের সহিত তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক। যে বৃত্তান্তের “ছায়া” অবলম্বন করিয়া ভবভূতি তাঁহার অমর গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ রচনা করিয়াছেন, মেঘনাদবধের সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথন তাহারই প্রসঙ্গে আরও হইয়াছে। উত্তরব্রাহ্মচরিত ভিন্ন রামচন্দ্রের দণ্ডকাবাসের সেরূপ মনোহর, গার্হস্থ্য চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সরমার অহুরোধে সীতাদেবী তাঁহাকে আপনার পূর্বজীবনের স্মৃতি, দুঃখের কথা শুনাইতেন। সে কথা বলিতে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইত, পূর্বস্মৃতি মর্যাদিক শেলের ত্রায়, তাঁহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিত, কিন্তু বর্ষাজলপূর্ণা নদী, যেমন উভয়কূল প্রাবিত করিয়া, শাস্তি লাভ করে, সমদুঃখভাগিনীর নিকট অতীত কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তিনিও তেমনই শাস্তিলাভ করিতেন। হায়! বস্ত্র কপোত-কপোতী, যেমন, বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্মাণ করিয়া, স্থখে বাস করে, সীতাদেবীও তেমনই রামচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চবটীতে স্থখে বাস করিতেন। রাজহুহিতা ও রাজবধু হইলেও দণ্ডকারণ্য যেন তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা স্থখের হইয়াছিল। তিনি অরণ্য-ভূমিকে রাজ্য এবং অরণ্যচারীদিগকে প্রজারূপে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ত্রায় তাঁহার দিন স্থখে অতিবাহিত হইত। দণ্ডকারণ্য ঘাঁহাব ভাণ্ডার, তাঁহার অভাব কি? বন-রত্ন-কুসুমরাজি অপূর্ব শোভায়, তাঁহার কুটীরের চতুর্দিকে নিত্য নিত্য বিকশিত হইত, বনবৈতালিক পিকবর মধুর প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিত, এবং বননর্তক মধুর মধুরীগণ প্রতিদিন তাঁহার দ্বারে আনন্দে নৃত্য করিত। সীতাদেবী স্বহস্তে কত বিহগাণ্ডকে আহার দান করিতেন, কত কুরঙ্গশাবককে প্রতিপালন করিতেন, রাজগৃহের বিলাসে অভ্যস্তা রাজবধু, সরলা বনবালাগণের ত্রায় অকৃত্রিম বস্ত্রভূষণে ভূষিতা হইয়া, কতই আনন্দ লাভ করিতেন। সরসী তাঁহার মনোহর-দর্পণ এবং কুবলয় তাঁহার অমূল্য শিরোভূষণ হইয়াছিল। তিনি যখন বনকুসুমে সজ্জিতা হইতেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া বনদেবী বলিয়া ডাকিতেন। হায়! সে সকল কি বিস্মৃত হইবার কথা! তিনি কখন ছায়ায় সখীভাবে সন্ধ্যোদন, কখন কুরঙ্গিনীগণের

সীতাদেবীর
দণ্ডকাবাস।

সঙ্গে ক্রীড়া এবং কখন বা কোকিলের গীতে প্রতিধ্বনি করিতেন। তাঁহার স্নেহপালিত বৃক্ষলতা মঞ্জরিত হইলে তাঁহার আনন্দোৎসব হইত। অরণ্যচারিণী হইয়াও তরুলতার বিবাহ দিয়া তিনি গার্হস্থ্য স্থখ অহুভব করিতেন। তাঁহার লতাবধুর কলিকাকে তিনি নাতিনী এবং ভ্রমরকে নাতিনীজামাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুসুমিত বনভূমিতে জ্যোৎস্নাধোত নদীতটে এবং সহকারচ্ছায়া শীতল পর্বত শিখরে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে তাঁহার কতই আনন্দ ? কৈলাসপুরীতে মহাদেবের পার্শ্বে আসীনা ভগবতীর স্তায় রামচন্দ্রের মূখে তিনিও কত মধুর কথা শ্রবণ করিতেন। সে অমৃতময়ী বাণী, শক্রপূরীস্থ অশোকবনের অভাস্তরেও যেন তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। নিষ্ঠুর বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে সে সঙ্গীত চিরদিনের জন্ত কি সাজ করিলে ?

হায়! বিধাতা স্থখভোগের জন্ত সীতাদেবীকে সৃজন করেন নাই। বনবাসিনী হইয়াও তিনি যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন, অচিরে তাহার অবসান হইল। তাঁহার স্থখচন্দ্রমার রাহুলপিণী শূর্ণনখার দণ্ডকারণে আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহার সর্বনাশ ঘটিল। তিনি রাজদুহিতা ও রাজবধু; তাঁহাকে বনবাসিনী কবিয়াও যে বিধাতার তৃপ্তি হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন না। কুক্ষণে তিনি রামচন্দ্রের নিকট মায়ায়ুগ প্রার্থনা করিলেন; কুক্ষণে তিনি, মারীচের কপট আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, দেবর লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিলেন; ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ, অবসর বুঝিয়া, তাঁহাকে হরণ করিলেন। কতদিন কত কাননচারী জীবকে সীতাদেবী বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার বিপদের দিন কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলেন না। হাহাকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনি কাননের জীব, জন্তু, তরু, লতা এবং স্বর্গের দেবগণ সকলেরই নিকট, আশ্রয়ক্ষার জন্ত, প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল বীর জটায়ু, তাঁহার জন্ত, যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া বীরজন্ম সার্থক করিলেন। রাক্ষসরাজের বিমান তাঁহাকে বহন করিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল; দেখিতে দেখিতে নীলোর্মিময় মহাসমুদ্র তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে লঙ্কাপুরীতে কারাগারের বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। হায়! রাজবধু, রাজনন্দিনী হইয়া কে কবে তাঁহার স্তায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন? বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার কারাগারের দ্বার কি উন্মুক্ত করিবে না ?

সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথনে কবি, এইরূপে রামায়ণ-বর্ণিত অনেক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। জটায়ুর সঙ্গে রাক্ষসরাজের যুদ্ধ এবং মূর্ছিত

অবস্থার সীতাদেবী কর্তৃক ভাবী ঘটনার ছায়া দর্শন অতীব নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ধার্মিকবীর জটায়ু যেখানে রাক্ষসরাজের নিকট বজ্রগস্তীরস্বরে যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং “গিরি-পৃষ্ঠে কাল-মেঘের গ্ৰাস” বীর জটায়ুর ভৈরবমূর্তি আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করি। মেঘনাদবধের এই অংশের মূদ্রনাদর্শ (proof) দেখিবার সময় মধুসূদন বাবু রাজনারায়ণ বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “রাজনারায়ণ! মেঘনাদ কি আমাকে অমর করিবে না?” (Will not this make me immortal?) মধুসূদনের আশা নিফল হয় নাই। মেঘনাদবধ যথার্থই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু কেবল বর্ণনার মাধুর্যের ও গাঙ্গীর্থের জগ্ৰহ সীতা ও সরমা কথোপকথন প্রশংসা-যোগ্য নয়। মহর্ষি সীতাদেবীকে একরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা শর্বাঙ্গসুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহর্ষি-কল্পিত সীতাচরিত্রেরও যে অংশে একটু ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে, মেঘনাদবধে মধুসূদন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী মারীচের আর্তনাদ শ্রবণে লক্ষ্মণের প্রতি সীতাদেবীর অমুযোগ রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠককে ব্যথিত হইতে হয়। রামচন্দ্রের অশ্বেষণে লক্ষ্মণকে গমন করিতে দ্বিধাপরায়ণ দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—

* * * *

“অনার্যকরণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন,

অহং তব প্রিয়ং মন্ত্রে রামস্ত ব্যসনং মহং ॥

রামস্ত ব্যসনং দৃষ্টা তেনৈতানি প্রভাবসে ।

নৈবচিহ্নং সপত্নেযু পাপং লক্ষণ যত্নবেৎ ॥

স্বমিথেষু নৃশংসেযু নিত্যাং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥

সুদুষ্টিস্বং বনে রামমেকমেকোহু হৃগচ্ছসি ।

মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নং প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥”

এই ভৎসনার অস্ত্রাঙ্গ কথ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে রাজভোগ, স্নেহময়ী জননী এবং পতিপ্রাণা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যাহার নয়নযুগল কখনও ভ্রাতৃজ্ঞায়ার পদলগ্ন নৃপুত্রের উর্ধ্বে উদ্ভিত হয় নাই,—দেই চির-পবিত্রজীবন, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ, তাঁহার প্রতি পাপ-কাষনা বশতঃ, তাঁহাদিগের অমুসরণ করিয়াছিলেন, সীতাদেবীর মনে একরূপ চিন্তা উদ্ভিত হওয়া কি সম্ভব? লক্ষ্মণের গ্ৰাস দেবর কি ভ্রাতৃবধুর নিকট একরূপ সন্দেহের যোগ্য, না মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মুখ হইতে একরূপ হল্যহল

উদ্গীর্ণ হইবার উপযুক্ত ? সেক্ষণ অবস্থায় সীতাদেবী কর্তৃক লক্ষণকে কঠোর তিরস্কার করা অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু বহুদিনের বিশ্বাস, এক দিনের ব্যবহারে, অকস্মাৎ, এক্ষণ সন্দেহে পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। যাহারা বলেন যে, দেবকার্য সম্পাদনের জ্ঞাত, দৃষ্টা সরস্বতী কর্তৃক প্রণোদিতা হইয়াই, সীতাদেবী লক্ষণের প্রতি এক্ষণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। মেঘনাদবধের রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে মানব, মানবী ভাবে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা সম্ভব, আমরা তাহাই বলিতেছি। মধুসূদন সীতাদেবীর অমুখোপাঙ্গ এইরূপ লিখিয়াছেন—

“স্মিতা শান্তী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ! পাষণ দিয়া গডিলা বিধাতা
হিয়া তোরে। ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিছ দুর্ভাগি ;
রে ভীক, রে বীরকুলখানি। যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্বরে আমারে।”

এই তিরস্কার কঠোর হইলেও সীতাদেবীর উচ্চ প্রকৃতির অযোগ্য নহে। কিন্তু সীতাচরিত্র সম্বন্ধে কেবল স্মৃতির ও শিষ্টজ্ঞানোচিত ভাবের জগ্ৰহ মধুসূদনের প্রশংসা নয়। শাণবন্ধনির্মুক্ত মণির জায়গায় সীতা চরিত্র তাঁহার হস্তে আরও ঘেন একটু উজ্জল হইয়াছে। মেঘনাদবধে আমরা সীতাদেবীকে দুইবার মাত্র দেখিতে পাই। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পর। প্রথমবারের অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের চিত্র আশ্চর্য উজ্জল। প্রথমবার সরমা, সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জ্ঞাত লঙ্কেশ্বরকে নিন্দা করিলে সীতাদেবী রাক্ষসরাজকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“বৃথা গজ দশাননে তুমি, বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইছ দূরে
আভরণ, হবে পাণী ধরিল আমারে
বনপ্রসঙ্গে।”

আততায়ী শত্রুকে অকারণ নিন্দা হইতে এইরূপ নিমুক্তি প্রদানের চেষ্টা সীতাদেবীর চরিত্রেরই উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়বার সরমা আসিয়া সীতাদেবীকে

মেঘনাদের মৃত্যুর এবং প্রমীলার চিতারোহণের সংবাদ প্রদান করিলেন। বিধাতার অমুগ্রহে তাঁহার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া তিনি বিধাতাকে পন্থবাদ দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রক্ষাবংশের দুরবস্থা স্বরণ করিয়া তাঁহাব হৃদয় নিগলিত হইল। তিনি স্বয়ং নিরপরাধিনী; হায়! বিধাতা তবে তাঁহাকে রক্ষাবংশের কালরাত্রি স্বরূপিণী কবিলেন কেন? তাঁহারই জন্ত নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধা সাম্রী প্রমীলা যে চিতানলে উৎসর্গীকৃত হইতেছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহাব হৃদয় অধীৰ হইল। তিনি সজল নয়নে লবমাকে বলিলেন:

“কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি!
 স্থণের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সন্ধ্যা,
 প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারূপী
 আগি। পোড়া-ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
 * * * ছাদে দেগ হেথা
 মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
 আর রক্ষোরথী বত, কে পাবে গণিতে।
 মরিবে দানব বালা অতুলা এ ভবে
 সৌন্দর্যে। বসন্তাবশ্বে হায় লো শুকাল
 হেন ফুল।” * * * * *

অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি এক্রপ অমুগম্পা আৰ্ষ রামায়ণের সীতা-প্রকৃতিতে লক্ষিত হয় না, ইহা মধুসূদনেরই কল্পিত। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সাবাবণ পাঠকে ব নিকট প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা মেঘনাদবধের একটি অত্যাংকুষ্ট অংশ। যে দেবীর অমুগম চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়াই রামায়ণের এত গৌরব, মেঘনাদবধে তাঁহার কথা না থাকিলে ইহা অঙ্গহীন থাকিত। সীতাদেবীর সে অবস্থায় তাঁহার লক্ষ্যে অধিক কথা বলা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সীতাদেবী তখন কারাগারের বন্দিনী; কিন্তু সে অবস্থাতেও মধুসূদন তাঁহার প্রকৃতিতে যে সকল গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে। মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র মধুসূদনের হস্তে স্ফুটিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সীতাচরিত্র তাঁহার কাব্যের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। ষাঁহার মনে করেন যে, মধুসূদন, প্রকৃত মহত্ব অমুভাবে অক্ষম ছিলেন বলিয়াই, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ওরূপ ভাবে বিচিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

সত্য হইলে আমরা মেঘনাদবধেব সীতা এবং বীরাঙ্গনার ঋগ্নিগী দেবীকে দর্শন কবিত্তে পাইতাম না।

পঞ্চম সর্গ—মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গের দৃশ্য স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় স্থলেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মায়াদেবীর কোশলে লক্ষ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার জননী স্মিতাদেবী, তাঁহার শিরোদেশে আবিভূত হইয়া, তাঁহাকে লঙ্কার উত্তর দিকস্থিত মন্দিরে বর্তমান। লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়ার পূজার জন্ত আদেশ দান কবিত্তেছেন। মাতৃবৎসল বীর, জাগ্রত হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভাতা ও লক্ষ্মণেব দেবীপূজা।

প্রস্থান করিলেন। দেবানুগ্রহ লাভ করিতে হইলে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, সকল সমাজেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল। মধুসূদনও এই বিশ্বাস অনুসারে, দেবীপূজার জন্ত প্রস্থিত বীরবর লক্ষ্মণকে নানাবিধ প্রলোভনের ও বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রথমে দ্বাররক্ষক ঋতুদেবের সঙ্গে লক্ষ্মণেব সাক্ষাৎ হইল। মেঘনাদবধে গম্ভীর ভাবোন্মীপক যে সমস্ত চিত্র আছে, মহাদেবেব সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার তাহার মধ্যে অন্ততম। লক্ষ্মণের বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব দ্বাব ত্যাগ করিলেন। তখন লক্ষ্মণকে ভীত কবিবার জন্ত কখনও মায়াময় সিংহ, কখনও বা দাবানল আবিভূত হইল। কিন্তু নিভীক বীর, পবতের গায় অটলভাবে তাহা অতিক্রম করিলেন। অকস্মাৎ কুঞ্জবনবিহারিণী সুরবমণীগণেব মধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল এবং ভূপতিত তারকাসুন্দরীগণের স্তায় জ্যোতির্ময়ী, জলজীড়াশীলা দেববমণীগণ, চতুর্দিক হইতে, তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের এই অংশ পাঠ করিলে “জেকজালেম-উদ্ধাব” কাব্যের পঞ্চদশ সর্গ পাঠকের স্মরণ হইবে। বীরবর রাইনাল্ডোর অদেষণে প্রেরিত দূতগণকে জলজীড়াপয়ায়ণ অপসরাসুন্দরীগণ যাহা বলিয়াছিলেন,—

“—স্বাগত ওহে রঘুচূড়ামণি।

* * * *

অমরী আমরা, দেব! বরিত্ত তোমারে—

আমালবে; চল, নাথ আমাদের সাথে।

কঠোর তপস্তা নয় করে যুগে যুগে

লভিতে যে স্বধভোগ, দিব তা তোমারে,

গুণমণি ! রোগ-শোক-আদি কীট বত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব মণ্ডলে,
না পশে সে দেশে, মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন।” * * *

কিন্তু ব্রহ্মচারী বীরের মাতুলস্বোধনে লজ্জিত হইয়া দেবাজনাগণ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এইরূপে সমস্ত বিশ্ব অতিক্রম করিয়া বীরবর, নীলোৎপলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক, বিশ্বজননীর পূজা করিলেন। লক্ষণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার কঠোর সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া মহামায়া আকাশবাণী দ্বারা তাঁহাকে মনোমত বর প্রদান করিলেন। দেবদ্রোহী রাক্ষসরাজের এই বিপদ-সম্বাদে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষদল কুসুমবাশি বর্ষণ করিতে লাগিল ; এবং বিহঙ্গমগণ, প্রাভাতিক সঙ্গীতচ্ছলে এই আনন্দ-সংবাদ দেশে দেশে ঘোষণা করিল।

বীরবর ইন্দ্রজিৎ, যেখানে, সাক্ষী প্রমীলার সঙ্গে কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া-
ছিলেন, বিহঙ্গমগণের এই আনন্দ-গীতি, সেখানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকেও উদ্বোধিত করিল। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার নিম্নাভঙ্গ বর্ণনা অতি মনোহর।
প্যারাডাইসলষ্টেব পঞ্চম সর্গে বর্ণিত আদম ও ইভের নিম্নাভঙ্গের অনুরূপে কবি
তাহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনার সৌন্দর্যে তাহা মৌলিক বলিয়া মনে
হয়। পাশ্চাত্য মহাকাব্যগণের কাব্যের আদর্শ স্বদেশীয়দিগের সম্মুখে স্থাপিত
করিবার জন্তই মধুসূদন বিদেশীয় ভাবের এইরূপ অনুরূপ বা শাঙ্গীকরণ
(assimilation) করিতেন ; ভাবাপহরণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার এই
অনুরূপগদ্যকতা সত্বে বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
যথার্থই বলিয়াছিলেন,—“Whatever passes through the crucible
of the author’s mind receives an original shape,” বাস্তবিকও
গৃহীত বিষয়গুলিকে তিনি এরূপ নবীন আকার প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা
সম্পূর্ণ রূপেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। মধুসূদন যে সকল স্থলে অল্প
কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমবা তাহা নির্দেশ করিতে ক্রটি করি নাই।
মধুসূদনকে অল্পের ভাবাপহরণ বলিয়া যদি কাহারও অশ্রদ্ধা জন্মে, তবে
তাঁহাকে মেঘনাদবধের সেই সকল স্থলের সহিত উল্লিখিত কাব্যসমূহের প্রয়োজনীয়
অংশগুলি তুলনা করিতে বলি। তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধিতে পারিবেন যে,
অনেক স্থলে, কিরূপ অস্পষ্ট আদর্শ হইতে মধুসূদনের কল্পনা কি সুন্দর চিত্র
অঙ্কিত করিয়াছে।

অপ্তোস্থিত মেঘনাদ, যুদ্ধে গমনের পূর্বে, জননীর পাদবন্দনের ভক্ত, সশস্ত্রীক, মাতার নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা মন্দোদরীর এবং পতিপ্রাণা প্রমীলার নিকট ইন্দ্রজিতের বিদায়-গ্রহণ-কালীন কথোপকথন অতীব সুন্দর। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে রাক্ষস পরিবারবর্গের চরিত্র যেরূপ

ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে পশুপ্রকৃতি মাতা ও পত্নীর নিকট জীব ভিন্ন আমাদের আত্মা-দিগের আর কিছু মনে হয় না। মাতৃভক্তি, মেঘনাদের বিদায়-গ্রহণ।

অপত্য-বাৎসল্য এবং দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি গার্হস্থ্য গুণ যে তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে সম্ভবপর, আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারি না। সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা ভল্লকে যে সকল ভাব লক্ষিত হয়, মহর্ষি প্রণীত-রামায়ণের রাক্ষস, রাক্ষসীতে আমরা সেই সকল ভাবই কল্পনা করি। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য পাঠকের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। পুত্রগতপ্রাণা জননীর অনিষ্টায় ও অনাহারে পুত্রের কল্যাণের ভক্ত শিবারাধনা, মাতৃবৎসল বীরপুত্রের যুদ্ধে গমনের পূর্বে, মাতার চরণ বন্দনার্থ সশস্ত্রীক আগমন, এবং পরম্পরের প্রতি প্রণাট অমুরাগবান দম্পতির, অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে পরম্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ—রাক্ষসোচিত ভাব নহে—মানব হৃদয়ের অতি কোমলতাময় ভাবের নিদর্শক। প্রমীলার প্রতি মন্দোদরীর ব্যবহার এবং মেঘনাদের ও প্রমীলার পরম্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ কাণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর গার্হস্থ্য ভাবে পূর্ণ। মেঘনাদ, জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, যজ্ঞশালায় দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা প্রণয়িনীর চিরপরিচিত নৃপুরুষ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দম্পতি পরম্পরকে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন। দাক্ষী প্রমীলা বলিলেন—

* * হায়, নাথ, * * *

ভেবেছিহু—যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর সাজে তোমায়। কি করি
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী ;
রহিতে নারিহু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি শশিকলা নাকি
রবিতেছে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও ভেমতি
হে রাক্ষসকুলরবি ;—তোমারি বিহনে
আঁখার জগৎ, নাথ, কহিহু তোমারে।”

প্রমীলার মুক্তামণ্ডিত বক্ষ উজ্জলতর মুক্তাদামে শোভিত হইল। কিন্তু মেঘনাদের পক্ষে তখন আর পত্নীর অশ্রুজলে দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না।

তিনি, অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সাহসনা পূর্বক, বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই বিদায় যে তাঁহার শেষ বিদায় হইবে, মেঘনাদ অথবা প্রমীলা কেহই তখন তাহা জানিতেন না। প্রমীলা, মেঘনাদের কল্যাণের জন্ত, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ;—

“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেজ্ঞনম্বিনী,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লক্ষ্যপানে
কৃপাময়ি ! রক্তশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে ;
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত ;
জীবন তাহার জীবে ঐ তরুরাজে ;
দেখ মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে।”

সাধবীর নিজের কিছুই নাই। সাধবী স্বামীর গোরবে গোরবিনী, স্বামীর তেজে তেজস্বিনী। “সুনিয়াছি, শশিকলা নাকি রবিতেছে সমুজ্জ্বলা”, এবং “যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত” ইত্যাদি কথাগুলির দ্বারা মধুসূদন সাধবীর চরিত্রের এই নির্ভরশীলতা যে কি সুন্দররূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। কিন্তু হায় ! প্রমীলার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। যে করাল কুঠার তার আশ্রয়তরুর উদ্দেশে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা নিপতিত হইল। অবলম্বনহীনা ব্রততীর গ্রায় তিনিও সেই ছিন্ন তরুর সঙ্গে ভূতলশায়িনী হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, দৈব ও মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যাইয়া ভার্জিল, ট্যাণো এবং মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, মধুসূদনও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমীলার প্রার্থনায় দেবরাজকে ভীত দেখিয়া মধুসূদন সেই প্রার্থনা বায়ুদেবের দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রার্থনা যে স্থল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামগ্রী নয়, এবং যিনি সর্বাঙ্গধামিনী তাঁহার নিকট প্রার্থনা যে দূরে নিক্ষেপ করাইবার বস্তু নয়, মধুসূদনের বোধ হয় তাহা স্মরণ হয় নাই। স্মরণ থাকিলেই বা কি হইবে ? পুরাণ রক্ষা করিতে বাইলে সত্য রক্ষা হয় না এবং সত্য রক্ষা করিতে বাইলে, পুরাণ রক্ষা হয় না। সকল দেশেরই পৌরাণিক কাব্যে এইরূপ ভ্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের চরিত্র সম্বন্ধে কবি যে একটু বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদের প্রকৃতির

প্রধান লক্ষণ তাঁহার ভীতিশূন্যতা, পিতা, মাতা এবং পত্নী প্রত্যেকেরই সঙ্গে মেঘনাদের চরিত্র। ব্যবহারে তাঁহার এই গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। লঙ্কাব

কালরূপী সমরে সহস্র সহস্র রক্ষাবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে তজ্জন্ত উদ্বেগমাত্র ছিল না। বীরাগ্রগণ্য বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ কবিত্তা স্বয়ং বান্ধববাজও বিন্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে বিন্ময় জন্মে নাই। বীরবাহু তাঁহার দিকট বালক মাত্র; রামচন্দ্র সেই বালককে নিহত করিয়াছেন, তাহাতে আবার বিন্ময় কি? সেই জন্ত আমবা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই;—

“শিশু ভাই বীরবাহু, বসিয়াছে তাবে

পায়র, দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?”

যে রামচন্দ্রকে তিনি যুদ্ধে নিহত কবিত্তাছিলেন, তিনি আবার পুনর্জীবিত হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্টোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিয়া তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন;—

* * “হে বন্ধু! পতি,

শুনেছি মবিত্তা নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ

বাঘব, এ মাত্তা, পিতঃ! বুদ্ধিতে না পারি।

কিন্তু অহুমতি দেহ সমূলে নিমূল

কবিত্তা পায়রে আজি, ঘোর শবানে

করি ভস্ম, বায়ু অঙ্গে উড়াইব তাবে,

নতুবা বাঁচিয়া আনি দিব রাজপদে।”

জননীৰ নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও তাঁহাৎ এই ভীতি-শূন্য ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন,—

“কি হার সে রাম তারে ডবাও আপনি?

* * * * *

আপন মন্দিরে, দেবি, যাও কিয় এবে

স্বরায় আসিয়া আমি পূজিব বতনে

ও পদ-রাজীব যুগ সময়বিজয়ী।

পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।

কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।”

পত্নীর পতি তাঁহার সাহনাবাক্য আরও নির্ভীকতা ব্যক্ত। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁহার নিকট বেন শিশুর ক্রীড়ামাত্র, তিনি শ্রমীলাকে বলিয়াছিলেন;—

* * * * “এখনি আসিব,

বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনী।”

যতদিন নিরাশার অথবা দুঃখের অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে চিন্তার বা ভীতির সঞ্চার হয় না। মেঘনাদের জীবনে নিরাশার বা দুঃখের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে ভীতিশূন্য এবং আত্মশক্তিতে অটল প্রত্যয়শীল। বীরাগ্রগণা, ত্রিভূবনবিজয়ী শিতা, স্নেহপ্রবণহৃদয়া, সম্রাজ্ঞী জননী, পতিপ্রাণা, বীরবতী পত্নী, অতুল ঐশ্বর্যময় লঙ্কার যৌবরাজ্য, এবং সর্বোপরি ইষ্টদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া মেঘনাদ নবীন শালতরুর গ্রাম, সগর্বে মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ, বাতাক্রূপে উদ্ভিত হইয়া তাঁহাকে ভূমি-সাং করিয়াছিল, কিন্তু বিনত করিতে পারে নাই। রাক্ষসরাজও বীর, এবং মেঘনাদও বীর; অবস্থা ভেদেই উভয়েই মধ্যে তাদৃশ পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বীরোচিত ভীতিশূন্যতারই জন্ত মেঘনাদের প্রশংসা নয়; তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন পাষণবৎ কঠিন, অপরদিকে তেমনই কুসুমবৎ কোমল। তিনি স্বদেশ-বংশল, পিতৃমাতৃভক্ত, অমূল্যগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুরও প্রতি শিষ্টাচারপরায়ণ। লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্ত, অসি উত্তত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন;—

* * * * “আতিথেয়-সেবা

তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে,

রক্ষরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।”

মেঘনাদের এই নিভীকতা ও মহাপ্রাণতা, বর্ষ সর্গে অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যজ্ঞাগারস্থিত তপোনিষ্ঠ মেঘনাদকে দেখিলে আদর্শ কজ্জিবীর বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদন ঐয়-রাজকুমার হেষ্টিরকে মেঘনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্র একরূপ উন্নত হইয়াছে।

বর্ষ সর্গ।—মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা বর্ষ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। বিভীষণের ও মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিধন এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও প্রতিনায়ককে আমরা এই সর্গেই প্রথম একত্রে দেখিতে পাই। উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। যিনি ভূজবলে ব্রহ্মা-সুপ্রমাতী দেবরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি কাব্যের নায়ক, এবং

লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ।

এবং যিনি ত্রিপুরাসুন্দরী সাক্ষাৎ রুদ্রদেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি কাব্যের প্রতিনায়ক। এই অভূত-পরাক্রম বীরদ্বয়কে একত্রে করিয়া কবি তাঁহাদিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য

কিরূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা অবগত হইবার জন্ত আমাদিগের স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রক্ষাবংশের প্রতি অতিরিক্ত অধুরাগ বশতঃ, কবি এই সর্গে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে মর্মান্বিত হইতে হয়। ষষ্ঠ সর্গই মেঘনাদবধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট; কবি যে, তাঁহার কাব্যের এই অংশ সংশোধন করিবার জন্ত জীবিত নাই, ইহাই পবিত্রতাপের বিষয়।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, বীরবর লক্ষ্মণ, মহামায়ার পূজাস্তে, শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভগবতীর প্রসাদ লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দেবী পূজার তিনি যে বিবরণ প্রদান করিতেছেন, তাহাব বর্ণে, বর্ণে যেন তাঁহার হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশিত হইতেছে। হৃদয়ের উৎসাহ সংযত করিতে না পারিয়া, দৃষ্ট সিংহশিশুর শ্রায়, সগর্বে তিনি ভ্রাতাকে বলিতেছেন;—

“—কি ইচ্ছা তব কহ

নৃমণি, পোহায় রাত্তি, বিলম্ব না সহে।

যারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে ॥”

লক্ষ্মণের এই বীরস্বগর্ত উৎসাহ অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় কবি রামচন্দ্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ কাপুরুষোচিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বীর ভ্রাতার উৎসাহে উৎসাহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তিনি বরং, সীতা উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বীর বনগমনে প্রস্তুত, তথাপি লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ দিতে প্রস্তুত নহেন। লক্ষ্মণ বীরোচিত দৃঢ়তার ও বিনয়ের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রের ভীতি অপসারিত হইল না। তখন মিত্রবর বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ পূর্বরাজিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, রক্ষ:কুলরাজলক্ষ্মী, তাঁহার শিবিরে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে লঙ্কার শূন্ত রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহার স্বপ্ন যে উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নহে তাহার প্রমাণার্থ তিনি বলিলেন যে, তিনি ভগবতীকে কেবল স্বপ্নে নয়, স্বপ্নান্তেও, মুহূর্তের জন্ত, স্বশরীরে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভীতি তথাপি দূরীভূত হইল না। তিনি জীলোকের শ্রায়, বিনাইয়া বিনাইয়া, কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাঙ্গিরের বনগমনের সময়ে স্কুমারী উর্মিলা অবরোধ মধ্যে কিরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং স্থমিত্রা দেবী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

লক্ষণকে কিরণে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সমস্তই তখন তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। তিনি শেষ বিভীষণকে বলিলেন ;—

“নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি,

ফিরি যাই বনবাসে * * *

* * * হায় মায়াবিনী

আশা, তেঁই কহি, সখে, এ বাক্ষস-পুবে

অলঙ্ঘ্য সাগর লজ্জি আইলু আমরা।”

ভ্রাতা, বন্ধু, কেহই যখন রামচন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না, তখন দেবগণ তাঁহার সহায়ার্থ অবতীর্ণ হইলেন। আকাশে দৈববাণী হইল ;—

“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,

সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুল-প্রিয়

ভূমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?

দেখ চেয়ে শূন্য পানে,—”

রামচন্দ্র দেবমায়ায় আকাশে দেখিতে পাইলেন যে, এক সর্প ও ময়ূবে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ; কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পব, এরূপ যুদ্ধে বিজয়লাভে চিরাভাণ্ড ময়ূর, নিহত হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল ; এবং বিজয়ী সর্প গর্জন করিয়া উঠিল। কবি এই সর্প ও ময়ূরের সংগ্রাম ইলিয়াডের দ্বাদশ সর্গ হইতে, পরিবর্তিত আকারে, গ্রহণ করিয়াছেন। বিভীষণ সেই দেবমায়ার অর্থ রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহার ভীতি দূর হইল। তিনি ভ্রাতাকে দেবরাজপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টাতে এবং দেবমায়াতেও তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্রিত হইল না। মৃতবৎসা জননী, যেমন, একমাত্র শিশুপুত্রকে, বিদেশ গমনের সময়, রোদন করিতে করিতে, আত্মীয় বিশেষের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনিও তেমনই লক্ষণকে বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

“সাবধানে যাও মিত্র ; অমূল্য রতনে

রামের ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,

রথিবব, নাহি কাজ বৃথা বাক্যবাহু ;

জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।”

বাহা হউক, কোনরূপে, (জ্যেষ্ঠভ্রাতার অহুমতিলাভ করিয়া লক্ষণ, “শূন্যবৃত্ত ব্যাত্তের এবং নদীগর্ভস্থিত নজ্জের” স্তায়, মেঘনাদকে বধ করিবার জন্ত,

বিভীষণের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। মায়াদেবী অদৃশ্য ভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার স্পর্শে লঙ্কায় দুর্ভেদ্য সিংহদ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল। কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত প্রভাতকালীন লঙ্কার রাজপথের দৃশ্য, নাগরিকগণের কপোপকথন, এবং মেঘনাদের যজ্ঞশালায় শোভা বর্ণন কবিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়াদেবীর অহুগ্রহে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলে ধ্যাননিরত মেঘনাদ, তাহাদিগের পদশব্দে চক্ষু উন্মীলিত কবিয়া, ইষ্টদেব ভ্রমে লক্ষ্মণকে প্রণাম কবিলেন। লক্ষ্মণ, আত্মপবিচয় প্রদান পূর্বক, যুদ্ধ প্রার্থনা কবিলেন, কিন্তু বিস্মিত মেঘনাদ কিছুতেই তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাবই বা অপবাধ কি? লঙ্কার সেই যোদ্ধ-পুরুষ পবিত্রত দুর্লভ্য প্রাচীর অতিক্রম কবিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ কবা কি মনুষ্যের সাধ্য? মেঘনাদ, ইষ্টদেব ভ্রমে গৃহাগত শত্রুর পদতলে পুনবার পতিত হইয়া, অভিলষিত বব প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ, যখন, তাঁহাকে আঘাত কবিবাব জ্ঞত, সত্য সত্যই উলঙ্গ কৃপাণ উত্তোলন কবিলেন, তখন তাঁহাব

ভ্রম দূর হইল। তিনি মুহূর্তব্যাপী বিস্ময়ের ও উদ্বেগের যজ্ঞাগারস্থিত-মেঘনাদ।

সহিত প্রহাবোদ্ধত শত্রুর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। যে ভীতিশৃঙ্খতা মেঘনাদের চরিত্রের প্রদান লক্ষ্মণ বলিয়া আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, এখানেও মেঘনাদের ব্যবহারে তাহা সত্যক পবিস্মৃষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের মেঘনাদ মায়াবী বীর, মায়ায়ুদ্ধেই তাঁহার বীরত্ব; মায়ী সীতা ছেদন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের উপর বিজয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদে মায়ী নাই, কপটতা নাই, লক্ষ্মণকে অসি উত্তত কবিতো দেবীয়া, তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের গ্রায় বলিলেন,—

“সত্য যদি রামানুজ তুমি ভীমবাহ
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব। বিরত কি কহু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিত? আতিথের-সেবা
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে,
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীর সাজে আমি; নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, নহে অবিদিত
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; কি আর কহিব?

কবি, এ পৰ্বন্ত লক্ষণকে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার হইতে তাঁহার চরিত্রে কালিমালেন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর মহাপ্রাণ মেঘনাদের ঔদার্য ও নির্ভীকতা যেমন প্রশংসনীয়, “ক্লমতি” লক্ষণের কাপুরুষতা ও নৃশংসতাও তেমনই নিন্দনীয়। লক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরোচিত প্রার্থনায় সন্মত হইলেন না; তিনি তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করিলেন। কবি যে কেবল বীরোচিত ঔদার্যে ও মহত্বে লক্ষণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন। ক্লম মেঘনাদের নিকৃষ্ট শব্দ, ঘট। প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সে অবস্থাতেও,—

“—মায়াময়ী মায়্যা বাহুপ্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে স্থল স্থত হ’তে
কর-পদ্ম-সকালনে।”

ইহাতেও কবির তৃপ্তি হয় নাই। মেঘনাদ, যখন, শূন্যহস্তে লক্ষণকে আক্রমণ করিবার জন্ত, অগ্রসর হইলেন, তখনও সেই দেবাজ্ঞধারী বীরকে রক্ষার জন্ত, দেবমায়ার প্রয়োজন হইল। মেঘনাদ মায়াদেবীর কোশলে দেখিতে পাইলেন যে, দণ্ডধারী ষম, শূলপানি মহাকাল এবং গদাচক্রধারী বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং লক্ষণ সেই অবস্থায়, তাঁহাকে খড়গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। যে দুর্জয় দর্পে মেঘনাদ রামচন্দ্রকে ও লক্ষণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন,

তাঁহার অস্তিমকালীন আর্তনাদেও তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে।
লক্ষণ-চরিত্রের হীনতা।

একদিকে ইলিয়াডের মুমূর্ষুবীর হেক্টরের অভিসম্পাত ও অপরদিকে রামায়ণের মেঘনাদের ভৎসনা মিলিত করিয়া কবি লক্ষণের ও বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের শেষ বাক্যাবলী রচনা করিয়াছেন। অস্তিম জনক-জননীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীর নিকট মানস-বিদায় গ্রহণ করিয়া মেঘনাদ নরনরুগল মুগ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজের পাণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লক্ষার পঞ্চজরবি, অকালে অন্তিমিত হইল।

এইরূপে ইন্দ্রজিতকে বধ বা হত্যা করিয়া লক্ষণ রামচন্দ্রের শিবিরে প্রত্যাপন করিলেন। বর্ণনীয় বিষয় পরিমূর্ত্ত করিবার জন্তই কবিগণ অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্বর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন এখানে যে দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন

তাহা ঘারা লক্ষণ যে প্রকৃতই একজন নয়হস্তা, তাহা যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রথমেই লক্ষণকে ব্যাজীর অবর্তমানে ব্যাজ-শিশুর প্রাণহস্তা নিবাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং তাহাতেও যেন পরিতৃপ্ত না হইয়া, শেষ তাঁহাকে নিম্নিত পাণ্ডবশিশুদিগের প্রাণহস্তা, ব্রহ্মকুলাকার, কাপুরুষ অশ্বখামার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। লক্ষণের বীরত্ব এইরূপ; কিন্তু ইহার পর আমরা শুনিতে পাই রামচন্দ্র নৃ-বাতক ভ্রাতাকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন,

“লভিহু সীতার আজি তব বাহুবলে
হে বাহুবলেস্ত্র, ধন্ত বীরকূলে তুমি ;
সুমিত্রা জননী ধন্ত ! রঘুকুলনিধি,
ধন্ত পিতা দশরথ, জয়দাতা তব ;
ধন্ত আমি তবাগ্রজ ! ধন্ত জয়ভূমি
অযোধ্যা। * * *

এই ধন্তবাদের শ্রোতে আমরা প্রাবিত হইয়া যাই। কিন্তু লক্ষণ যে অল্পময় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের অবিদিত ছিল না। রামচন্দ্রের এই অত্যধিক অভিনন্দনের পর যদি তাঁহার কিছুমাত্র আশ্বাসমান বোধ থাকিত তাহা হইলে হয়ত তিনি মনে করিতেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। যাহা হউক মেঘনাদকে কোনরূপে লক্ষণের হস্তে নিহত করা কবির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; রঘুশৈলিকগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং সুপ্রোখিতা লঙ্কাপুরী সেই বিকট শব্দে চমকিত হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকট। যে জন্ত মধুসূদন এই সর্গে একরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রথম কারণ রক্ষোবংশের প্রতি কবির অত্যধিক সহানুভূতি এবং দ্বিতীয় কারণ, বান্দ্রীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা। রাক্ষসবীরদিগের বীরত্ব মধুসূদনকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষগণও যে বীর, সে কথা তিনি একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসও তাঁহার ভ্রমের অপর কারণ। জাতীয় ধর্মে বিশ্বাস থাকিলে, যে মহাপুরুষের বহু সহস্র বৎসর অবধি হিন্দুজাতির হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়া আলিতেছেন, তিনি তাঁহাদিগকে একরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু বান্দ্রীকিকে পরিত্যাগ করিয়া হোমরকে অনুসরণ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ভ্রমের প্রধান কারণ। ভগবান্ মহাবীর চরিত্র-সন্নিবেশ এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর যে, রামচন্দ্র

ও লক্ষ্যণকে অভুলপরাক্রম বীর বলিয়া বলিয়া মনে করিলেও আমরা রাক্ষসরাজ ও ইন্দ্রজিতকে তাঁহাদিগের অধোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করি না। কিন্তু হোমরের আদর্শ অন্তরূপ। গ্র্যাড্‌টোন হোমরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব এত অধিক যে, তিনি একজনও প্রসিদ্ধ গ্রীক বীরকে ট্রোজানদিগের দ্বারা হত্যা যুদ্ধে নিহত করান নাই। হেক্টর প্যাট্রোক্লসকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের প্রধান নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার মৃতদেহ অধিকাংশ করিতে সমর্থ হন নাই। গ্র্যাড্‌টোন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;

“It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos ; and Sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclus.”

ক্ষত্ৰমতি ট্রয়বাসিগণ মহাপ্রাণ গ্রীকদিগকে হত্যায় যুদ্ধে বিনাশ করিবে, অথবা শোষণে অতিক্রম করিবে, ইলিয়াডের কবি ইহা কিছুতেই সম্বন্ধ কবিত্তে পারেন নাই। সেইজন্য ট্রয়রাজকুমার হেক্টর, অন্ত্যাত্ম স্থলে মহাবীররূপে চিত্রিত হইলেও

যখনই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আকিলিসেব সম্মুখীন হইয়াছেন, হীনতার কারণ।

তখনই কবি তাঁহাকে বিকলাঙ্গের হত্যায় করিয়া তুলিয়াছেন।

আকিলিসেব ভয়ে, ট্রয়-নগর-প্রাচীরেব সম্মুখে হেক্টরেব কাপুরুষোচিত পলায়ন পাঠ করিলে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। হোমরকে অবিকল অন্তরূপ করণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল নয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব, তিনিও মেঘনাদের ও লক্ষ্যণের সম্বন্ধে হোমরের হত্যায় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। “ক্ষত্ৰ নর” লক্ষ্যণ যে তাঁহার ইন্দ্রবিজয়ী প্রিয়বীর মেঘনাদকে হত্যায় যুদ্ধে বধ করিবে, মধুসূদনের পক্ষে ইহা যেন অসম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি তাঁহাকে বালিকাৰ অপেক্ষা দুর্বল করিয়া কেলিয়াছেন। লক্ষ্যণ অপর সকল স্থলে ভীতিশূন্য, মন্ত্রস্তোর কথ্য দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ কল্পদেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে ভীত নহেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রই তিনি যেন একবারে মন্ত্রমুগ্ধের হত্যায় অবসর। মেঘনাদের অস্ত্র, শস্ত্র দূরে থাকুক, শব্দ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতে, এমন কি নিরস্ত্র মেঘনাদের করগ্রহণ হইতেও আতঙ্কিত করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। নারকের গৌরব বর্ধিত করিতে হইলে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীরও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে

হয়, মেঘনাদবধের কবিবোধ হয় তাহা স্মরণ হয় নাই। আর্ষ রামায়ণের অনুসরণ করিলে তাঁহাকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। আর্ষ রামায়ণের লক্ষণ, তত্ত্বের আয় গৃহে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা দূবে থাকুক, ইন্দ্রজিৎ যে তাঁহাদিগের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিতেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে তিবন্ধাব করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“অস্ত্রধান গতেনার্জো যস্ত্রাচরিতস্তদা।

তস্ত্রাচরিতোমার্গো নৈষবীরনিষেবিতঃ ॥

যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোহস্মি তব রাক্ষস।

দর্শয়স্বাত্ত তন্ত্বেজো বাচাত্ত্বং কিংবিকথসে ॥”

“তুমি বণক্ষেত্রে অস্ত্রহীন থাকিয়া বাহা করিয়াছ, তাহা তত্ত্বেরই উপযুক্ত, তাহা বীরোচিত নয়। আমিও যেমন তোমাবাণ-যুগ্মে অবস্থান করিতেছি, (সাধ্য থাকে) তুমিও সেইরূপে স্বতেজ প্রদর্শন কর ; অনর্থক গর্গর করিতেছ কেন ?”

রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষণের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মেঘনাদবধের অনেক স্থলে মধুসূদন কৃত্তিবাস হইতে উপাদান সংগ্রহ কবিয়াছেন ; কিন্তু কৃত্তিবাসও লক্ষণকে এরূপ কাপুরুষের আয় চিত্রিত করেন নাই। তিনিও মেঘনাদকে লক্ষণের হস্তে সমুখযুদ্ধে নিহত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বধর্ম ও স্বসমাজ পবিত্র্যাগ পূর্বক, পরধর্ম ও পরকীয় সমাজের আশ্রয় লওয়াতে মধুসূদনের জীবন যেমন দুঃখময় হইয়াছিল, স্বদেশীয় কবিকুলগুরুকে ত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শ করিবার চেষ্টাতেও, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যও তেমনই কলঙ্কময় হইয়াছে। মধুসূদন জ্ঞানতঃ তাঁহার কাব্য এরূপ দোষস্পৃষ্ট করেন নাই ; তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও তাঁহার অনুকরণেছাই তাঁহাকে নিজের ভ্রম সন্দেহে অন্ধ করিয়াছিল। তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—“আমি এরূপ কঠোর সাবধানতার সহিত মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছি যে, কোন ফরাসী সমালোচকও ইহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।” * সুতরাং এ দোষ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃতই হউক, আর অনিচ্ছাকৃতই হউক, মেঘনাদবধের এই সর্গই কাব্যের কলঙ্করূপে বর্তমান থাকিবে।

* I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with it.

সপ্তম সর্গ। অতি সুন্দর প্রভাত-বর্ণনার সঙ্গে মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গ আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষার গৌরবরবি চিরদিনের জন্ত অন্তর্মিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির তাহাতে আক্ষেপ নাই। দিনমণি পূর্বেরই স্তায়, মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার। উজ্জ্বল আলোকে ভগৎ উদ্ভাসিত করিয়া উদ্ভিত হইলেন ; কুসুম-ভূষণা ধরণী, মুক্তামালা পরিধান করিয়া, পূর্বেরই স্তায় হাস্য করিতে লাগিলেন ; এবং নিরুজ্জস্ব পূর্বেরই স্তায় বিহগকুলের মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধিত হইল। প্রকৃতির সঙ্গীত, হাস্য, এবং উল্লাস, সকলই অপরিবর্তনশীল। পুঞ্জশোক-বিধুরা মন্দোদরী এবং পতিবিরহিতা সাধবী প্রমীলা, কাহারও দুঃখে প্রকৃতির সমবেদনা নাই ;—এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ তখনও লক্ষাপুরীতে প্রচারিত হয় নাই। সাধবী প্রমীলা অস্ত্রান্ত দিনের স্তায় সেদিনও, প্রভাতে, আনান্তে বেশবিশ্রামে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু কি জানি কেন, সাধবীর হস্তের কঙ্কণ দৃঢ় বোধ হইল, কণ্ঠের মালা পরিধানের সময় কণ্ঠ ব্যথিত হইল, কি একটি অক্ষুট রোদনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া সাধবীর হৃদয়কে উবেলিত করিতে লাগিল। প্রমীলা ব্যাকুল হৃদয়ে সখীকে বলিলেন, —

“* * * কেন লো সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লক্ষাপুরে কেন বা শুনিছি
বোদন-নিলাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?
বামেতর ঐখি মোর নাচিছে সতত,
কাঁদিয়া উঠিছে গাণ। না জানি, সজনি,
হায়লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে।
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে
বাসন্তি, নিবার, যেন যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি ! কহিও জীবশে
অহুরোধে, দাসী তাঁর ধরি পা ছুখানি।”

প্রমীলা-চরিত্রের মাধুর্যের জন্ত আমরা মধুসূদনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। গ্রন্থের সর্বত্রই তিনি এই মাধুর্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে প্রমীলা রঘুসৈন্তরূপ মহাসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভীতা নহেন, তিনিই আবার দক্ষিণ আক্ষির স্পন্দনে ভীতা। ভারত-নারীর পক্ষে এই উভয়ই স্বাভাবিক। প্রমীলার স্তায় অতুল বীরবতীর মুখে

“অহুরোধে, দাসী তাঁর ধরি পা ছুখানি।”

কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি তাঁহার প্রকৃতির বিনয়-মধুর ভাব অতি সূক্ষ্মর পরিচ্ছূট করিয়াছেন। আধুনিক ভারতে প্রমীলার ত্রায় রমণী লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত সমাজে যদি কোনদিন প্রমীলার ত্রায় কোমলভাময়ী বীরাজনা আবির্ভূতা হন, তবেই এ দেশের নারীহিতৈষীগণের আশা সার্থক হইবে। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর দেশের কবি তাঁহার স্বদেশের উপযোগী অতি মনোহর নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ ধীরে ধীরে লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হইতেছিল, কিন্তু রাক্ষসরাজকে এ সংবাদ দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। কৈলাসে মহাদেব মেঘনাদের মৃত্যুতে বিষন্ন; ভক্তবৎসলের হৃদয় ভক্তের বিপদে ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি ভগবতীকে বলিলেন,—

“এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
তাহার আঘাত হ’তে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক, চিরস্থায়ী হয় সে বেদনা,
সর্বহব কাল তাহে না পারে হরিতে।
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত বণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যত্নপি
নাহি রক্ষি বন্ধে আমি রুদ্রতেজোদানে।”

মহাদেব, পবে, বীরভদ্রকে লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া, রাক্ষসরাজকে বীরভদ্রের আগমন। রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন।

লঙ্কাপুরীতে আগমন এবং শোকার্ত রাক্ষসবাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ অতি গম্ভীরভাবোদ্দীপক। মহাদেবের আদেশে

“চলিল আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি, বোমচব নমিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্য তেজে হীনতেজা ববি,
সুধাংশু নিরাংশু যথা সে রবিব তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অমুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উত্তরিলা বখী
রক্তপুরে, পদচাপে থর থর থরি
কাপিল কনকলহা; বৃক্ষশাখা যথা,
পক্ষীকুল গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।”

মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে, ইন্দ্রজিভেব মৃত্যুর পর, সীতাদেবীকে হননোক্ত রাক্ষসরাজ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ও নৃশংসের জায় চিত্রিত হইয়াছেন মেঘনাদবধে তাঁহার চিত্রমাত্র নাই। বীরভক্তের আবির্ভাবে লঙ্কেশ্বরের হৃদয় আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। তিনি সংঘতচিত্তে, রক্ষসৈনিকদিগকে বণ-সজ্জায় সজ্জিত হইবার জ্ঞাপন আদেশ দান করিলেন। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত রক্ষাবীরগণের রণসজ্জা বর্ণন কবিয়াছেন। প্রথম সর্গে রাক্ষসরাজ ও মন্দোদরী। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কথোপকথনে, মধুসূদন রাক্ষসরাজের চরিত্রের একাংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সপ্তম সর্গে, মন্দোদরীর সঙ্গে কথোপকথনে, তাহার অপর অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম সর্গে রাক্ষসরাজ অতুতপ্ত এবং মনস্তাপে ও আত্মসম্মানিতে জ্ঞানশূন্য। কিন্তু সপ্তম সর্গে তাঁহার ব্যবহার অগ্নিরূপ; মেঘনাদেব জায় পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে তিনি স্থির ও সংযত। পুত্রশোককাতরা মন্দোদরীকে সাহসনা দিবার জ্ঞান তিনি বলিলেন,

* * “বাম এবে, রক্ষকুলেন্দ্রাণি,
আমা দৌহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি.
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিংশিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘবে তুমি,
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাবে,
* * যাও কিবি, কেন নিবাইবে
এ রোষাশ্বি অশ্রুণীরে, রাণি মন্দোদরী।”

এই সাহসনাবাক্য হইতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অনুমান করা যাইতে পারে। রাক্ষস-সৈনিকগণের প্রতি তাঁহার উৎসাহ-বাক্যও ইহার উপযুক্ত। সপ্তম সর্গে যুদ্ধ বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি এক নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। লঙ্কায়ুগ্মে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকাবিতা খায রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের একবিংশতি সর্গের অনুরূপে কবি ইহা মেঘনাদবধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বামচন্দ্রের সহায়তার জ্ঞাত দেবরাজ, কার্তিকেয় প্রভৃতি অরসেনানীদিগকে সঙ্গে লইয়া, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ এবং রামচন্দ্র, উভয়েই তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রণসজ্জায় ভীতা হইয়া পৃথিবী বিক্ষুব্ধ পরণামত হইলে ভক্তবৎসল পৃথিবীকে রসাতলে গমন হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান পরাক্রমে দেবভেজ হরণার্থ আদেশ দান করিলেন। মহারাজ ইতিপূর্বেই রাক্ষস-রাজকে স্বভেদে পূর্ণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিজয়লাভ অনিবার্য হইল।

নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ বেমন, ক্ষণকালের জ্ঞান, পূর্ণপ্রভায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ধ-
কারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, রাক্ষসরাজেরও সৌভাগ্যদীপ তেমনই চিরনির্বাণ
হইবার জ্ঞান মুহূর্তকাল সমুজ্জল হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধ কাব্যে এই একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া
যায়। বামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের শক্তিশেল-বৃত্তান্ত ইলিয়াড-বর্ণিত ঘটনাবলীর
শব্দে সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি এই সর্গ রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ যেরূপ
লক্ষ্মণ ও রাক্ষসরাজ। কাপুরুষের ছায়া চিত্রিত হইয়াছেন, সপ্তম সর্গে তাহার
নিদর্শন মাত্র নাই। এই সর্গে নবযৌবন দৃষ্ট সিংহশিখর
ছায়া বর্ণক্ষেত্রেস্থিত লক্ষ্মণের বিক্রম দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হই। লঙ্কেশ্বর,
তুমুল সংগ্রামে দেবরাজ, কার্তিকেয়, হনুমান, এবং স্ত্রী-ব প্রভৃতি বীর-পুরুষ-
দিগকে পরাজিত করিয়া, লক্ষ্মণের সম্মুখবর্তী হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন ;—

“এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ, * * *

* এ রণক্ষেত্রে পাইছ কি তোরে

নরাদম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?

শিখিধ্বজ শক্তিবর ? রঘুকুলপতি

ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা স্ত্রী-ব ? কে তোরে

রক্ষিবে পামর আজি ? এ আময় কালে

স্মিদ্ধা জননী তোর, কলত্র উন্মিলা

ভাব্ দৌহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে

দিব এবে ; রক্তশ্রোত শুবিবে ধরণী।

কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্নতি !

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি,

হেরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।”

কজ্রিয়-বীর লক্ষ্মণেরও প্রত্যুত্তর ইহার উপযুক্ত। লক্ষ্মণ পুত্রশোকাতর,
জিহ্বাংস্থ শত্রুর তিরস্কারে বলিলেন ;—

“কক্কুলে জন্ম মম, রক্ষকুলপতি,

নাহি ভরি ঘমে আমি ; কেন ডরাইব

তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,

বখালাখ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব

শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর বখা।”

ইহার পর লক্ষণের সহিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ-স্বর্ণনা পাঠ করিলে লক্ষণ যে মেঘনাদকে অকজিৎবৎ নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্বরণ থাকে না। তাঁহার অল্পম বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু বীরত্ব, বিক্রম আজ লক্ষণকে রক্ষা করিতে পারিল না। দেববলে বলীয়ান রাক্ষসরাজের মহাশক্তির আঘাতে লক্ষণ ভূপতিত হইলেন। মহাদেবের আদেশে, শক্রর মৃতদেহ পরিভ্রাণ করিয়া, রাক্ষসরাজ মহোন্মাদে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম সর্গের ভাষা, বর্ণনীয় বিষয় এবং আত্মবৃত্তিক ঘটনা, সমস্তই অতি সুন্দর। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সর্গকেই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।* কিন্তু বীররসের উদ্দীপনার জন্য ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কবি ইহাতে পূর্বেরই ভ্রায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রবিজয়ী রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রকে রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া বলিলেন;—

“ * * * * না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহী নাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অমৃত তব কপট সমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও কিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ । ”

আততায়ী শত্রুর এই গর্বিত ও ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে বিকঙ্কিত মাজ না করিয়া রামচন্দ্র সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ ব্যবহার রামচন্দ্রের ভ্রায় মহাপুরুষের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক নয়। যে ব্যক্তি, রামচন্দ্রের চরিত্রের
হীনতা। পত্নীর সতীত্বনাশের প্রয়াসী হইয়া, মর্মে শেলাঘাত করিয়া-
ছিল এবং যে প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণ-সংহারের জন্য রক্ত-

পিপাসু ব্যাত্রের ভ্রায় তাহার দিকে খাবিত হইতেছিল, মনুষ্য-হৃদয় লইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের চেষ্টায় পরাভূত থাকিতে পারে ? রামচন্দ্রের ভ্রায় মহাপুরুষের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যও কি এরূপ অবস্থায় ঔদাসীন্য় প্রকাশ করিতে পারে ? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন যেখানেই রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামচন্দ্রে বিনয় অথবা কোমলতার অভাব নাই, কিন্তু কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার সামঞ্জস্যই যে রামচন্দ্রের চরিত্রের সৌরভ, তিনি তাহা অমুখ্যাবন করিতে পারেন

* The Seventh Book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature—
Literature of Bengal, page 183.

নাই। তাঁহার রামচন্দ্র প্রমীলার বীরত্ব-দর্শনে ভীত; ভ্রাতাকে যুদ্ধে প্রেরণের সময়ে রোদনপরায়ণ এবং আততায়ী শত্রুকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত। রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র লব্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।

অষ্টম সর্গ। শক্তিশেলাহত বীরবর লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভ এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। রামায়ণের মূল ঘটনা বর্তমান রাখিয়া কবি ইহাতে ইনিয়াদের

ও ডিভাইন কমেডির কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছেন। সে

ইনিয়াদের ও
রামায়ণের ঘটনাবলীর
সংশ্লিষ্ট।

দিনের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে দিবাকর অন্তমিত
হইয়াছিলেন; এবং নিশা-সমাগমে রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে

শত শত অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। (রামচন্দ্র লক্ষ্মণের

পার্শ্বে মৃতপ্রায় নিপতিত; বহুশৈনিকগণ তাঁহার শোকে শোকাহুত। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত, অতি হৃদয়ঙ্গমিণী ভাষায় রামচন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সীমাত্রিহীন দীর্ঘ হওয়াতে তাহার শৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। রামচন্দ্রের জ্ঞান লব্ধগাঢ়িত মহাপুরুষের নিকট আমরা, শোকের অবস্থাতেও, অপেক্ষাকৃত সংযম ও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করি। কৈলাসে ভক্তবৎসলার হৃদয় রামচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত। মহাদেব তাঁহার উপরোধে মায়াদেবীকে লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র মায়াদেবীর সঙ্গে প্রেতনগরে গমন করিয়া, রাজা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভের উপায় অবগত হইলেন। এই সকল ঘটনা যে মূল রামায়ণে নাই তাহা বলা অতিরিক্ত। ইনিয়াদের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শে কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। বীরবর ইনিসের জ্ঞান রামচন্দ্রও গভীর স্তম্ভপথে প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার পরলোকগত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনিয়াদের প্রেতনগরের বহির্দেশে যেমন ভীষণকায় কামরূপী মূর্তিসমূহের অবস্থান বর্ণিত আছে, মেঘনাদবধেরও প্রেতপুরীর বহির্দেশে তেমনই বিবিধ মূর্তির সমদূত ও সমদূতীর্ণের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইনিয়াদের “Acheron” আকিরণ বা “Styx” মেঘনাদবধের বৈতরণীরূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহার “Sybil” সাইবিল ইহাতে মায়াদেবী-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। Styx-এর নাবিক “Charon” কারণ ইনিসকে পথপ্রদানে অসম্মত হইলে সাইবিল যেমন তাহাকে আপনার মায়াদও প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মায়াদেবীও বৈতরণীরূপক সমদূতকে পথপ্রদানে অনিচ্ছুক দেখিয়া তেমনই জিহবের জিশূল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিসের জ্ঞান রামচন্দ্রও আপনার

পূর্বপরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রেতনগরীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় ব্যতীত কামুক নরনারীগণের অতৃপ্তি-জনিত দণ্ড, বজ্রনাথ, মাংসাহারী পক্ষিগণ কর্তৃক পাপীদিগের অঙ্গবিদারণ, প্রেতক্রিয়া না হইলে যমপুরীতে গমনের প্রতিষেধ ইত্যাদি আবণ্ড অনেক কথা কবি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের আদর্শ মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে সমাবেশ করিয়াছেন।

স্বর্গ ও নরক-বর্ণন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয়দেশীয় মহাকাব্যগণেরই প্রিয়। ভাস্কিল, দাস্তে, মিল্টন প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য মহাকাবি এজন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই অনুকরণে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে স্বর্গ ও নবকের চিত্র সম্মিলিত করিয়া-

স্বর্গ ও নরক বর্ণনার
কারণ।

ছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে পূর্বে ইহাব সূত্রপাত হইয়াছিল, মেঘনাদবধে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরলোকের অন্ধকারময় গর্ভে যে ঘটনাবলী নিহিত আছে, তাহা অবগত হইবার জন্ত মনুষ্য-জন্মদয়ে স্বভাবতঃ যে আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হয়, তাহারই পরিতৃপ্তির জন্ত বোধ হয় স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যবানের পূবস্কারেব এবং নরক পাপচারীর দণ্ডভোগের ক্ষেত্র, এই বিশ্বাসও স্বর্গ ও নরক কল্পনার অগ্রতম কারণ। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে জ্ঞানের ষতই উন্নতি হইতেছে, ততই এইরূপ কল্পনা-প্রসূত স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে লোকের অবিশ্বাস জন্মিতেছে। প্যারাডাইস-লস্টের যে নরক বর্ণনা এক সময় মিল্টনের সমকালবর্তী পণ্ডিতদিগকে ভীত ও বিস্মিত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কেবল বিজ্ঞানযেব বালকদিগেব কোড়ক উৎপাদন কবিত্তেছে। গন্ধকাগ্নিময় অথবা তুষারহ্রদপূর্ণ নরকের দিন গত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অত্র কিছু আবশ্যক।* বৈজ্ঞানিক বৃত্তি অনুসাবে বিচার করিলে মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গ অসার কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হইবে, কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিত্তে হইবে যে, মধুসূদন বিজ্ঞান লেখেন নাই, পুরাণানুসারেবিত কাব্য লিখিয়াছিলেন।

মধুসূদন মেঘনাদবধে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু নরক অপেক্ষা স্বর্গ-বর্ণনাতেই তিনি অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার

মধুসূদনের কল্পিত
স্বর্গ ও নরক।

স্বর্গ অন্তান্ত স্থলেও যেমন, এখানেও তেমনি, কাম্য বস্তু উপভোগের স্থান মাত্র; নিধাম, ধার্মিক পুরুষের ও শাস্তির ও উন্নতির ক্ষেত্র নহে। মানবসাধারণের নিকট পৃথিবী ও স্বর্গ সকলই উপভোগের স্থল। তাঁহারা সেইজন্য সর্বত্র—এমনকি ত্রফলোকেও

* কথিত আছে যে, কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক, শ্রোতৃবর্গের ক্ষমদেয় কিছুতেই নরকভীতি দ্বিষ্টকর না দেখিয়া, বলিয়াছিলেন, “নরক এমন স্থান, যেখানে সংবাদপত্র নাই।”

—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সামগ্রী অন্বেষণ করেন। ইন্দ্রিয়সুখই সাধারণ মনুষ্যের নিকট সুখের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদন এই চিরপ্রচলিত ও সর্বজনব্যাপী সংস্কারের অতীত হইতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহার কল্পিত স্বর্গে উপভোগ সামগ্রীর আভিযা লক্ষিত হয়। কিন্তু যে সুখ ইন্দ্রিয়জনিত নহে এবং সেই অমৃত-পুরুষ নিমগ্ন হইয়া দেবতাগণ যে স্থখ উপভোগ করেন, তাঁহার স্বর্গে তাহার উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। 'মেঘনাদবধের নরকে বীভৎস-রসেরই প্রাধান্য। ইহার নাবিকীয় দৃষ্ট, ডিভাইন্ কমেডির (Divine Comedy) নরক বর্ণনার স্তায় আমাদের কাছে ভীত ও ভয়ঙ্কর বোধে না; হৃদয়ে বীভৎস-রসেরই উদ্দীপন করে।' মধুসূদন এই স্বর্গে বর্ণনা-নৈপুণ্য ও কবি-শক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বর্গ ও নরক বর্ণন অপেক্ষা অল্প কোন বিষয়ে নিয়োজিত হইলেই তাঁহার শক্তি ও পরিশ্রম অধিক ফলপ্রসূ হইত। মেঘনাদবধ কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়াই আমরা একথা বলিতেছি; কবি পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করিলে এরূপ বলিতাম না। তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গ ও নরক বর্ণনার স্তায় মেঘনাদবধ বোধ হয় একখানি মহাপুরাণ রূপে পরিগণিত হইত।

নবম সর্গ। যে বিষাদময় সঙ্গীত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে আরম্ভ হইয়াছিল, নবম সর্গে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অনেকে মেঘনাদবধকে বীরবস-

প্রধান কাব্য বলিয়াই 'অবগত' আছেন; কিন্তু প্রকৃত-মেঘনাদবধ কাব্যে
৪৪৭ রসের প্রাধান্য। প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীরবসের অপেক্ষা করুণ-বসেবই

প্রাধান্য। বর্ণনায় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস নির্ণয় করিতে হয়, তবে মেঘনাদবধকে করুণ রস-প্রধান কাব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইত। যে অশ্রুধারা রাক্ষস পরিজনদিগের নয়ন হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের বীরবন্ধের শোণিত-রেখা ধৌত করিয়া দেয়; হাহাকারে রণকোলাহল নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ পাঠকই মধুসূদনকে বীররস বর্ণনায় নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মূর্তিময়ী বিরহব্যথারূপিনী জানকীর এবং শ্রম-শয্যা স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার অল্পম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবেন যে, মধুসূদন কেবল বীররসেরই কবি? মধুসূদনের নিজের জীবনের স্তায় তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যও করুণ-রসাত্মক।

যে করাল রজনীতে রামচন্দ্র, লঙ্কার সমুদ্রকূলস্থিত রণক্ষেত্রে ভ্রাতার মৃতদেহ কোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, লঙ্কণের পুনর্জীবন লাভের সঙ্গে তাহা প্রভাত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের শিবির আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ; রঘুনন্দনকল্পের

বিক্রমনার্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই আনন্দ-কোলাহল সমুদ্র-কল্লোলকেও পরাজিত করিয়া, মনস্তাপে ভূ-শয্যা উপবিষ্ট রাক্ষসরাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মন্ত্রীর মুখে লক্ষণের পুনর্জীবন লাভ যেমনাদের প্রেতকৃত্য।

সংবাদ শ্রবণ করিলেন। পুত্রহস্তা শত্রুর পুনর্জীবন লাভ পুত্রশোক অপেক্ষাও অধিক মর্মভেদী; কিন্তু এই মর্মভেদী সংবাদে লক্ষের এবার মুহুর্তি হইলেন না। পৃথিবীর সকল আশা বিলুপ্ত হইলে নিরাশাই মানব-হৃদয়ে আশা দান করে; রাক্ষসরাজ আজ নিরাশায় আশাবিত। স্বয়ং কৃতান্তও বথন তাঁহার ভাগ্যক্রমে স্বধর্ম বিন্যস্ত হইলেন, তখন আর আশা কোথায়? তিনি বুঝিলেন, বাক্সসংঘের গোরব-রবি সত্য সত্যই চিরাক্ষকারে আবৃত হইলেন। কুলগোরব পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্ত তিনি মন্ত্রীর দ্বারা বামচন্দ্রের নিকট সপ্তাহব্যাপী সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। উদারহৃদয় রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য-প্রাপীড়িত শত্রুর প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন না। বলা নিশ্চয়োজন যে, যেমনাদের প্রেতকৃত্য এবং সাত দিবসের জন্ত লক্ষ্যযুদ্ধের বিরাম আর্থ রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন ইহা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইলিয়াডের কবি যে দৃষ্ট কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই, যেমনাদবধের কবি তাহা প্রদর্শন করিবার স্বেচ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাবতললনা পতির পদ-প্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া অনেক সময় কিরূপ সহাস্ত মুখে চিত্তানলে জীবন উৎসর্গ করিতেন, সাধবী প্রমীলার চিত্ত-রোহণে কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবতববায়ী সহমরণ-প্রথা এবং যুনানীর অস্ত্রোষ্টিক্রিয়াকালীন সমর-সজ্জা উভয়ের সম্মিলনে কাব্যের এই অংশ রচিত হইয়াছে। আমরা তৃতীয় সর্গে বলিয়াছি যে, যিনি প্রমীলা-চরিত্রের মনোহারিত্ব বুঝিতে চান, তিনি যেন যেমনাদবধের নবম সর্গ পাঠ করেন। অশান-শয্যা উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার বিষাদিনী মূর্তি না দেখিলে তৃতীয় সর্গের সেই রণরঙ্গিনী মূর্তির গাভীর্ষ অল্পভব করিবার সম্ভাবনা নাট। প্রমীলার চিত্ত-রোহণের ভ্রায় গভীর ও করুণভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও নাই। কবির বর্ণনা-শ্রুতি সেই কল্পনাস্রষ্ট দৃষ্ট, যেন প্রকৃতির ঘটনার ভ্রায় আমাদের মানস-চক্র সমুখে উপস্থিত হয়। লক্ষ্য সেই সমুদ্রকূলবর্তী অশান, সেই অশানস্থিত অস্ত্রপূর্ণনয়না রকোবালাগণ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নিশ্চিন্ত শশিকলার ভ্রায় প্রমীলাকে আমরা প্রত্যক্ষের ভ্রায় দর্শন করি। এই কি সেই প্রমীলা? বসন্তলগ্নে যত যাতকিনীর ভ্রায় দর্শে যিনি একদিন রঘুসৈনিকদিগকে দলিত করিয়া পতিপদ পূজা করিয়াছিলেন, এই কি সেই প্রমীলা? প্রমীলার সেই রণভিন্না লজ্জিনীগণ, সেই ভীষণ সমর-সজ্জা এবং সেই

অয়িশিখাসদৃশী বড়বা আজ এই শ্মশান-ভূমিতে তাহার অঙ্গগমন করিয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার সেই বিদ্যুততানুদৃশী প্রভা আজ কোথায়? প্রমীলার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে জ্যোতি নাই, প্রমীলার ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, কর্ণে পুষ্পদাম, করে সখবা-চিহ্ন কঙ্কণ, প্রমীলা পতির পদতলে উপবিষ্টা,

.... “মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী,
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাদ্দ ছাড়ি
গেছে যেন, যথা পতি বিরাঞ্জন এবে,
সুকাইলে তরুরাজ শুকায় রে লতা।”

কিন্তু কেবল প্রমীলাবই কি এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে? যেদিন বক্ষোব্রাজ, দেব, নব লকলকে পরাজিত করিয়া, পুত্রঘাতী শত্রুর প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন, সেদিনের সেই লোমহর্ষণ ঘটনা পাঠকের স্মরণ আছে। বাক্সরাজের অঙ্গ চক্রের পরিবর্তন। বক্ষোনাথ, নবোদিত দিবাকরের স্তায়, স্বর্ণচক্র বথে আরোহণ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইতেছেন, তাঁহার রথচক্রের ঘর্ষ শব্দে, ভুরভ্রমগণের হ্রোষধ্বনিতে, দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাঁহার মহিমা-মণ্ডিত, দেব-প্রদাদ লাভে উজ্জল মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া রক্ষসৈনিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে, এ দৃশ্য কেমন স্তম্ভর! কেমন বিস্ময়কর! কবি লিখিয়াছিলেন,—

“বাহিরিলা বক্ষোব্রাজ পুষ্পক আরোহি,
ঘঘরিল রথচক্র, নিঘোষে উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ, সূক্ষ্ম হ্রৈষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা নয়ন বাঁধিয়া
ধায় অগ্রে, উষা যথা একচক্র বথে,
উদেন আদিত্য যবে উদয় অচলে,
নাদিল গম্ভীবে রক্ষ হেরি বক্ষোনাথে।”

তাঁহার রক্তভেজ-ভাস্কর মূর্তি দর্শন করিয়া,—

“পলাইল বসুসৈন্ত পলায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি উর্দ্ধ্বাঙ্গে
বনবাসী, কিবা যথা ভীমাকৃতি ঘন
বজ্র-অগ্নি-পূর্ণ, যবে উড়ে বায়ু-পথে
বোর নায়ে, পশু-পক্ষী পলায় চৌদিকে
আজকে।”

আর আজ এই ঋশান-ভূমিতে আর এক দৃশ্য,—

“বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষকুল রাজা
বারণ, বিষদ বস্ত্র, বিষদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা বেন ধুজ্জটির গলে ;
চারিদিকে মস্তিঙ্গল দূরে নতভাবে ।
নীরব কর্করুপতি অশ্রুপূর্ণ আঁধি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী স্বত,
বক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
বক্ষঃপুরবাসী রক্ষ, আবাল বনিতা,
বৃদ্ধ, শূন্য করি পুরী আঁধার রে এবে ,
* * * * *

ধীরে ধীরে সিদ্ধমুখে তিতি অশ্রুনিরে
চলে সবে, পুরি দেশ বিবাদ নিনাদে ।”

মোভাগ্যলক্ষ্মীর সেই প্রিয়তম পুরুষের পক্ষে একদিনের মধ্যে কি এই পৰিবর্তন ঘটা সম্ভব ? কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে ! বাক্সবাজের অবস্থা অল্পভব ভিন্ন বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই ।

বর্ণনা-গুণে মেঘনাদবধের এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্তনিপুণ চিত্রকরের চিত্রবচনার উপযুক্ত । সেই সাগরকূলবতী ঋশানে, মেঘনাদের ৬ ঋশানাহিতা প্রমীলা ।

প্রমীলার পবিত্র দেহ ভয়ীভূত করিবার জন্ত, চন্দন-কাঠে চিতা নির্মিত হইয়াছিল । আলুলায়িতকুন্তলা, কুতল্লান সাদ্বী পরিধেয় অলঙ্কারগুলি, একে একে উন্মোচন পূর্বক, সখীদিগকে বিতরণ করিলেন এবং তাহার পর পুশ্পাঘার জায় চিতাশাঘায় আরোহণ পূর্বক, প্রফুল্লমুখে পতির পদতলে উপবিষ্টা হইলেন । সাদ্বীর কণ্ঠে পুশ্পমাল্য এবং কেশ-পাশে অন্নান কুসুমদাম ;—চিতার চতুর্দিক বেটন করিয়া রক্ষাবীরগণের অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান ; প্রমীলার সজিনীগণের হাহাকারে সেই মহাঋশান প্রতিধ্বনিত ; আর এই সকলের মধ্যে জিহুবনবিজয়ী, বাসবদর্পহারী রাজসরাজ, পাষণ-নির্মিত মূর্তির জায়, বিরাজিত ; এ দৃশ্য কি গভীর ! কি হৃদয়ভেদী । রাজসরাজ আজ মেঘনাদের জায় পুত্র এবং প্রমীলার জায় পুত্রবধূকে চিত্তানলে আহুতি দিবার জন্ত আসিয়াছিলেন ; তাহার মনের ভাব কি বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে ? চিতারোহণের পূর্বে সজিনীগণের নিকট প্রমীলার বিদায়গ্রহণ এবং পরলোকগত বীরপুত্রকে সন্মোহন করিয়া রাজসরাজের

মর্মভেদী বিলাপ পাঠ করিলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিগলিত হয়। এমন স্বাভাবিক এমন হৃদয়ঙ্গবকারী বিলাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়; প্রমীলা, চিতারোহণের পূর্বে সখীদিগকে সোধোদন করিয়া বলিলেন;—

—“লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুঁরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যান্নেণে
কহিও পিতার পদে এসব বারতা।
* * * এই দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা বাহা তাইলো ঘটিল
এতদিনে; যার হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিছে লো আজি তাঁব সাথে।
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব সাথ, তুলনা লো তাঁরে,
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সব কাছে।

বিধাতা: ! হতভাগ্য রাক্ষসরাজকে কি এই সকল শুনাইবার জন্তই জীবিত রাখিয়াছিলে? ইহার নিকট রামচন্দ্রের শাণিত শরের তীক্ষ্ণতা কোথায়? বাক্যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার রাক্ষসরাজের শক্তি ছিল না, অথচ আত্মসংযমেরও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। ধীরে ধীরে, পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সম্মুখে অগসর হইয়া, তিনি বলিলেন;—

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্ত্রিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে স্থখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষ:কুল-রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমাতে,
বামে রক্ষ:কুললক্ষ্মী রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা! পূর্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দৌড়ে আজি এ কাল-আগনে।
কবুঁর গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।

সেবিহ্ব শিবেরে আমি বহু বস্তু করি,
 লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,
 হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে,
 শূন্য লঙ্কাধামে আর । কি সাধনা ছলে
 সাধনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
 'কোথা পুত্র পুত্রবধু আমার ?' হৃদিবে
 যবে রাগী মন্দোদরী, "কি হৃথে আইলে
 রাধি দৌড়ে নিহুতীরে, রক্ষ:কুলপতি ?"
 কি করে বুঝাব তারে ? হায়রে কি করে ?
 হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে ।
 হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
 এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

রাক্ষসরাজ অপরাধী মত্য় এবং তাঁহার অপরাধও যে সামান্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ ; কিন্তু কবি তাঁহার যে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপরাধের অপেক্ষা লঘুতর হয় নাই । নবম সর্গের পুত্রশোক-কাতর রাক্ষস-রাজকে দেখিলে, তাঁহার অপরাধ বিন্মত হইয়া, তাঁহার দুঃখবহায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি জন্মে । আমরা বলিয়াছি, রক্ষোবংশের প্রতি সহানুভূতি উদ্দীপন, গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য । কবির যাহা উদ্দেশ্য, এই কাব্যের সার্থকতা ।

সর্গে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । রাক্ষসরাজের ঘোরতর বিবেচীও এই সর্গে তাঁহার দুঃখে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন না । শোক-জর্জরিত রাক্ষসরাজের ব্যবহারে কবি মানব-জগতের একটি গুঢ়তত্ত্বও প্রকাশিত করিয়াছেন । প্রথম সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি । ষতই অপরাধী হউক, মানব, অনেক সময়, নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে না । বিধাতার দ্রায়দণ্ডে দণ্ডিত হইলেই আতর্জনাদ করিয়া বলে—“বিধাতঃ । কি অপরাধে আমায় এই দণ্ড দিতেছ ?” মেঘনাদেব ঋশান-শব্দাতেও আমরা, সেইজন্য, নীতাপহারক রাক্ষসরাজের মুখে শুনিতে পাই ;—

*** কি পাপে লিখিলা

এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

এইরূপ আত্মবঞ্চনাই মানব-প্রকৃতির ধর্ম । কিন্তু রাক্ষসরাজ, আত্মবঞ্চক ও অলংঘ্যেতেপ্রিয় হইলেও, ইষ্টদেবে তত্ত্বিপরাধ : তাঁহার মর্কভেদী আতর্জনাদে

কৈলাসে ভক্তবৎসলের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনয়নের জন্ত, হতাশনকে আজ্ঞা দান করিলেন। ইরম্বরুপী অগ্নির স্পর্শে সহসা চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। স্বদেশবৎসল, পিতৃ-মাতৃভক্ত বীর মেঘনাদের এবং পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল; কিন্তু তাঁহাদিগের অমর আত্মা, দিব্যদেহ গ্রহণ করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্বক, উর্ধ্বলোকে প্রস্থান করিল। বিস্মিত লঙ্কাবাসীগণ,

“দেখিলা আয়েয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্তি; বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবন-কান্তি শোভে তহুদেশে,
চির সুখ হাসি রাশি মধুর অধরে;—

* * * *

বরষিলা পুষ্পসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।”

যেখানে মেঘনাদের ও প্রমীলার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে এক অতি সুন্দর মঠ নির্মিত হইল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া, এবং দাহস্থান মন্ডাকিনী-সলিলে ধৌত করিয়া;—

“করি স্নান সিকুনিরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্জ অশ্রুনিরে,
বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে;
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিবাদে।”

কবি অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, অশ্রুজলের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্দ্রানদের সঙ্গে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণের কাব্য-সমাপ্তি।

সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত, সমস্তই, বিবাদপূর্ণ; সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মেঘনাদবধে বীররত্নের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্ত লক্ষিত হইবে। কবির হেমচন্দ্রের সুন্দর সমালোচনার পর ইহার ভাষা ও ছন্দ লক্ষ্যে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কাব্যের মধ্যে বাহা সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য, আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি; সাধারণভাবে

ইহার দোষ, গুণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা মেঘনাদবধ সমালোচনা শেষ করিব।

কাহারও কাহারও মতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে
 পাণ্ডীর চিত্র পুণ্যবানের চিত্রের অপেক্ষা উজ্জলতর রূপে
 মেঘনাদবধ কাব্যের
 দোষ গুণ। অঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় কবি মিণ্টন যেমন শয়তান

বা পাপ-পুরুষকেই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক করিয়া কেলিয়াছেন, মেঘনাদবধের কবিও তেমনই, রাম লক্ষ্মণকে বিলজ্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষস-রাজ ও তাঁহার পরিজনদিগকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক, নায়িকা করিয়া তুলিয়াছেন। পাপাচারীর প্রতি কবির বখন এত সহ্যহুত্ব, তখন নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, সহস্র গুণ সম্বন্ধে, তাঁহার কাব্য নিন্দনীয়। এই সকল কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে, মধুসূদন পাণ্ডীর প্রতি সহ্যহুত্ব প্রকাশ করিলেও, পাপের প্রতি সহ্যহুত্ব প্রদর্শন করেন নাই। যে অসদাচারের জন্য রাক্ষসরাজ সাধু সমাজের স্বর্গাহ, কবি কুজাপি তাহার সমর্থন করেন নাই; বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাঁহারই পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্বনাশ ঘটিতেছিল, প্রতি পদেই তাহাব উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া কাহারও মনে রাক্ষসরাজের অহুচিত কার্যের অহুকরণ সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা, যেমন, রক্ষোবংশের ঐশ্বর্য, বাহুবল, সৌভাগ্য, এবং রূপ-গুণ দেখিয়া, বিস্মিত হই, অন্যদিকে আবার, তেমনই, তাঁহাদিগের অবিমুগ্ধকারিতার শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া, সন্ত্রস্ত ও উপদ্রষ্ট হই। সুতরাং অসং দৃষ্টান্তের সমর্থন করিলে যে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমন কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সম্বন্ধে, পাপাচারের ফলে, মহুগ্নের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে পাপাচারী রাক্ষসরাজের নিজের কোন দণ্ড বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু দণ্ড আর কাহাকে বলে? মেঘনাদের জ্ঞান পুত্র এবং প্রমীলার জ্ঞান পুত্রবধূকে চিতানলে সমর্পণ করিয়া রাক্ষসরাজ যে ক্রেশ ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের শরে জ্বলিও বিদারিত হইলে, কি তিনি তদপেক্ষা অধিক ক্রেশ ভোগ করিতেন? “ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়” বখন মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ ও পরিণাম, তখন রাক্ষসরাজের প্রতি কবির সহ্যহুত্ব সম্বন্ধে, নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহার দ্বারা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই।

আবাব কেহ, কেহ মনে করেন যে, কবি যখন তাঁহার কাব্যে আৰ্যবংশীয়-গণের অপেক্ষা অনার্যবংশীয়গণেরই প্রতি অধিকতর অনার্য স্রীতি।

সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইতে পারে না। মেঘনাদবধ জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইবে কি না, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু মধুসূদনকে, অনার্য বংশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্ত, নিন্দার পবিবর্তে, বিশেষ প্রশংসাই করি। রামায়ণকাব মহর্ষি ভারতীয় সমাজের যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহারই উপযুক্ত ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তখনও অনাথ সমাজের প্রতি আৰ্য-সমাজের প্রগাঢ় বিদ্বেষ ছিল; বৈদিক ঋষিগণের নিখাসে, নিখাসে অনার্যগণের প্রতি যে বিষ উল্লসিত হইয়াছিল, রামায়ণে তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি হইয়াছে। মধুসূদন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাঁহারই উপযোগী হইয়াছে। এখন আর আৰ্য ও অনার্যগণের মধ্যে সেই পূর্ব বিদ্বেষ বা জেতা-জিত-ভাব বর্তমান নাই। আৰ্য ও অনার্য, সকলেই এক্ষণে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। আৰ্য-প্রপীড়িত বলিয়া ববং অনার্যগণের প্রতি এখন লোকেব সহানুভূতির উল্লেখ হইতেছে। এ অবস্থায় মধুসূদনের উত্তম সম্পূর্ণই সময়োপযোগী হইয়াছে, এবং এইজন্য, বোধ হয়, তিনি ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের নিকট অধিক সমাদর লাভ করিবেন। মধুসূদনের বহুদিন পূর্বে বীর-চরিতের সঙ্কল্প কবি ইহার সূচনা করিয়াছিলেন; বাজালা ভাষায় মধুসূদনই ইহাব পথপ্রদর্শক। তাঁহারই প্রমীলাব আদর্শে বৃদ্ধসংহারের ও বৈবর্তকের কবিত্বয় তাঁহাদিগের দৈত্য ও নাগবালকদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিতের কবি, রাক্ষসরাজকে উন্নত করিতে যাইয়া, রামচন্দ্রকে অবনত কবেন নাই; মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই, ইহা অবশ্যই কোন্ডের বিষয় হইয়াছে। রাক্ষস-পরিবাবদিগের দ্বায় রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র স্ফুটিত হইলে মেঘনাদবধের গৌরব শতগুণ বর্ধিত হইত। মহর্ষি একদিক দেখাইয়া-ছিলেন, মধুসূদন আর একদিক দেখাইয়াছেন; কোন ভবিষ্যৎ মহাকবির দ্বারা, বোধ হয়, এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে।

মেঘনাদবধ মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য, তাহার আলোচনা করিয়া সময় ও পরিশ্রম অপব্যয় করা নিশ্চয়োজন। মধুসূদন নিজে ইহাকে মেঘনাদবধ কোন, শ্রেণীর কাব্য? পাশ্চাত্যরীতির মহাকাব্য (Epic) বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে যদিও ইহা মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না, তথাপি ইহার, অনেক

হল যে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাব্য পাঠ কবিতে করিতে আমরা বিস্মিত, শুভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের স্তায় অবলোকন করি, তাহা যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্যই একখানি মহাকাব্য। ইহাতে মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য বর্ণনারও অভাব নাই। কবি ইহাতে যে উদ্দাম কল্পনা, বর্ণনাশক্তি ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহাকাব্য রচয়িতারই উপযুক্ত। কবির হেমচন্দ্র ইহার সযত্নে বাহা লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এক্ষণে তাহা অল্পমোদন করিতেছেন। মেঘনাদবধ সত্যই বঙ্গভাষার কণ্ঠভূষণ রূপে আদৃত হইয়াছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

“যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ-সমূহ, সম্মিলিত করিয়া, পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রকলকের স্তায় চিত্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ কবিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিজ্ঞমানের স্তায় জ্ঞান হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য-কলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমান্বিত হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ-রসে আর্জ হইতে হয় এবং বাস্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষুঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিন্তা কি? সত্য বটে, কবিগুরু বাঙ্গালিকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানা-দেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোত্তান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্বক, এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুহুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।”

মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক ঘটনা ও ভাব যে অন্যান্য কাব্য হইতে গৃহীত

হইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। কেহ

মেঘনাদবধের
মৌলিকতা।

কেহ, এইজন্য, মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার
করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মেঘনাদবধের

প্রতিপক্ষে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্তমান, তখন ইহাতে কবির
গুণগণা বা উদ্ভাবনী শক্তি কোথায়? কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা কবা কর্তব্য।

যে, কতকগুলি মৃত জীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, একটি অভিনব
জীব সৃষ্টি করা বেক্লপ কটিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, একখানি

নব্য কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কটিন। তাঁহাদিগের আদর্শ অল্পসারে
বিকার করিলে অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, মিস্টন অথবা সেন্সপীয়ারকেও গৌরবচ্যুত

হইতে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকবিগণের কাব্যের ভাব এখনও ত অক্ষুণ্ণ মহানুজের স্মার বর্তমান রহিয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, বঙ্গ সাহিত্যে আর একজন মধুসূদন জয়গ্রহণ না করিলে আর একখানি মেঘনাদবধ রচিত হইবে ? প্রকৃতির রাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল উপাদান হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া নূতন কিছু স্বজন করাতেই প্রতিভার পরিচয়।

মেঘনাদবধ-কাব্যে কবির যে সকল ত্রুটি আছে, আমরা তাহা প্রদর্শন করি নাই। অন্বেষণ করিলে ইহাতে আরও শত শত ত্রুটি লক্ষিত হইবে। প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার তাঁহার মাতুল সুপ্রসিদ্ধ “কাব্য-প্রকাশ” প্রণেতা মন্নটভট্টকে তাঁহার রচিত কাব্য দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ; “বৎস, তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইলে আমার অলঙ্কারের দোষ-পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় আমাকে নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না। এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।” মন্নটভট্ট নৈষধ-কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদবধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্বেষণ করিলে তাহার প্রত্যেকটিই ইহাতে লক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মেঘনাদবধ বাঙ্গালা ভাষায় মহামূল্য রত্নরূপে চিরদিন সমাদৃত থাকিবে। ইহাতে যে প্রতিভা ও যে মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গা করিলেও ইহা বাঙ্গালা মেঘনাদবধের ভাষা।

ভাষায় যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্ত ইহা অমবতা লাভ করিবে। বৈষ্ণব কবিগণ এবং তাহার পর ভারতচন্দ্র বঙ্গভাবাকে যে আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা শিশুর, প্রেম-পিপাসুর এবং বিলাসীর উপযুক্ত। যে অর্ধ-সুপ্ত ও অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বঙ্গভূমি তখন বর্তমান ছিল, তাহা তাহারই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে উদ্বেষিত হইয়া বঙ্গভূমি আজ যে জাতীয় জীবন-লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মেঘনাদবধের ভাষা তাহারই উপযোগিনী হইয়াছে। সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে স্বদয়ে যে ভাব লইয়া উপনীত হওয়া আবশ্যিক, মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেকস্থলে সেইভাবে উদ্দীপিত হই। জাতীয় প্রবণতা, জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতার নিষ্পেষিত বঙ্গভূমিতে জয়গ্রহণ করিয়াও মধুসূদন যে তাঁহার কাব্যে বীরোচিত ভাষা ও বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট

করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সৰ্ব্বদা আশাপ্রদ। কীৰ্ত্তিকার, নিজীব বাঙ্গালীর অভ্যন্তরে শৌৰ্য ও তেজস্বিতা অন্তর্নিহিত না থাকিলে একগুণ কাব্য কখনই রচিত হইতে পারিত না। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। মধুমক্ষিকার জ্বায় নানা দেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূৰ্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গোড়ীয় জনগণ তাহাতে সত্যই,

“অনন্নে করিবে পান স্নান স্নান মিরবসি।”

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদবধ সৰ্ব্বদা বথার্থই লিখিয়াছিলেন,—

“The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas : Homer, Dante or Shakespeare.”*

তিলোত্তমা-সম্ভব বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধেরও সমাদর সৰ্ব্বদা দুই

একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

মেঘনাদবধ কাব্যের
সমাদর।

বল্লেব শ্রামল ভূগাঙ্গাদিত সমতল ক্ষেত্রে অকস্মাৎ কোন

পর্বতশৃঙ্গের অভ্যুত্থান দেখিলে দর্শকদিগের হৃদয়ে ধৈর্য

বিস্ময় জন্মে, মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে একদিন সেইরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যেন বীণাধরনি শ্রবণ করিতে করিতে তন্ত্রালস কর্ণে গম্ভীর ভেরী-নির্নাদ প্রবেশ করিল; যেন নিখবীণীর কুলু কুলু নিনাদে অভ্যন্ত প্রবেশে জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জন শ্রুত হইল। শত্রু মিত্র সকলেই চমকিত হইলেন। যে শ্রেণীর পাঠকগণ, তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিয়া মধুসূদনকে উন্মাদ-প্রলাপী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখনও তাঁহাকে উপহাস করিতে নিরন্তর হইলেন না। কিন্তু চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি যাত্রাই বৃষ্টিতে পারিলেন যে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে কি উপহার প্রদান করিয়াছেন। অমিত্রজ্ঞান সৰ্ব্বদা বিদ্যালগ্ন মহাশয়ের অভিপ্রায় যে প্রথমাভ্যাস অল্পকাল ছিল

না, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া তাঁহার পূর্ব-
সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল ; তিনি মধুসূদনের গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া-
ছিলেন। কলিকাতার তাত্‌কালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যে তাঁহার মধুসূদনের
প্রতিভার সন্ধান করিয়া সম্মানিত ও বক্তৃতাভাষণাদিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন
হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহাবাজা
তীক্ষ্ণমোহনের নাম আমবা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধের সঙ্গে

মহাভারতের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ
কালীপ্রসন্ন সিংহ
হোদয়ের অভিনন্দন। মহোদয়েরও নামোল্লেখ আবশ্যিক।* মধুসূদন যখন পুলিশ

আদালতে কার্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন
ঘনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই
ইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যয়োগত পার্থক্য
পাকিলেও হৃদয়গত কোমলতা ও মধুরতা সম্বন্ধে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। দুই-
দনেরই প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সরল ও স্নেহপ্রবণ ছিল ; স্বতরাং অল্পদিনের
ধ্যেই তাঁহার পরস্পরের প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন।† প্রতিভা-
পানের সমুচিত সমাচরণ-প্রদর্শন এবং নির্ভীক চিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ
দ্বারা কালীপ্রসন্ন বাবুর চিরন্তন অভিাস ছিল। অমিত্রোচ্ছন্দের প্রবর্তন হইতেই
তিনি মধুসূদনের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং লঘুচেতা লেখকগণ তাঁহাকে
বদ্রূপ করিতেন দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহে
তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

“হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাশয়কে চিনিতে পারেন
ই। সংসারের নিয়মই এই। প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার
প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদুপ রাস্তার পরিচয় প্রদান করে ;
তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদের
বীর্য জর্জরিত করে, তখন তাঁহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতা-
ন্থায় তাহা মনেও আইসে না।

* মহাভারতের অনুবাদ হইতে কালীপ্রসন্নবাবুর নাম বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যক্তিরই পরিচিত
হইয়াছে। মাতৃভাবার সেবার জন্য, তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অর্থব্যয়
রিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। ত্রিশৎবর্ষ মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়,
কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশীয় নাট্যাঙ্গানের উন্নতির ও মাতৃভাবার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য,
নাটক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

† অষ্টাদশ বর্ষের অনুবাদের উপসংহার হলে কালীপ্রসন্নবাবু লিখিয়াছিলেন, “হৃদয়ের প্রীত-
ইকেল মধুসূদন দত্ত, অনুবাদিত ভাগ হইতে প্রভাব সকল সংগ্রহ করিয়া, অমিত্রোচ্ছন্দ পড়ে ও
টকাকারে পরিণত করিতে প্রকৃতপ্রসন্ন হইয়া, আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।”

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবিত থাকিয়া বহু দিন বহু কাব্য রচনা করিবেন, ততই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্বক বহুমান্যে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহ মধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতেও মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণ্যে লজ্জিত হইব।*

মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বাবু মধুসূদনকে প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি বিজ্ঞোৎসাহিনী-সভা নামক একটি সাহিত্য সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু এক্ষণে সেই সভা হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ কবিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, বাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু রমাপ্রসাদ বায়, এবং মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন প্রভৃতি মধুসূদনের গুণানুসরণী ব্যক্তিগণ, সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু, তাঁহাদিগের ও বক্তার সাধারণ শিক্ষিত মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে, মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র ও একটি রোপ্য-নির্মিত মূল্যবান পানপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু, বিজ্ঞোৎসাহিনী সভা হইতে অভিনন্দন কবিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রকাশ্য রূপে সম্মানিত করিলেন।† সাধারণ রঙ্গসমাজও কালীপ্রসন্ন বাবুর কার্যের অল্পমোদন করিতে পরাভূত হইলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই মেঘনাদবধের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইল; এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় স্বর্গীয় কবিবর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা এক স্বদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত কবিলেন। তন্নিম্ন বাবু বাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সভাস্থলে তাহার দোষ, গুণ আলোচনা কবিয়া, গ্রন্থের ও গ্রন্থকাবের প্রতিষ্ঠা বর্ধিত কবিলেন। মধুসূদনের বাল্যাবধি পরিপোষিত আশা এতদিনে চবিতার্থ হইল। নিম্না, উপহাস এবং

* বিবিসার্ধ সংগ্রহ, শকাব্দা ১৭৮৩ আষাঢ়, মেঘনাদবধ-সমালোচনা।

† কালীপ্রসন্নবাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার অতি গৌরবজনক পুরস্কার। সে দিনের ঘটনা চিত্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলে আমরা স্মৃতি হইতাম। কলনার সহিত বাগেশ্বরী পুস্তিকার ভায় হুসন কৃত পুঁথিতে আর কিছু নাই।

কটুক্তিতে অক্ষিপ না করিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহার চরমসীমায় উপনীত হইলেন। ধর্মে হউক, সামাজিক কার্কে হউক, বা সাহিত্যে হউক, তাঁহাবা কোনরূপ পরিবর্তন কবিত্তে চান, তাঁহাদিগকে প্রায়ই লাঞ্চিত ও অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পরই লোকে, তাঁহাদিগের কাষের গুরুত্ব বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে সন্মান করেন; জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই যশ ঘটে না। কিন্তু মধুসূদনকে এ বিষয়ে, কিয়ৎপরিমাণে, সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। নিজের কর্মদোষে, জীবনের শেষাবস্থায় কষ্ট ভোগ কবিলেও, এ কথা স্বীকার কবিত্তে হইবে যে, তাঁহার স্বদেশীয় ও সমকালবর্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতিভাব সন্মান কবিয়াছিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদন মেঘনাদবধের সঙ্গে তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমাৰী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে; এইবার অপৰ গ্রন্থ দুইখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক ।

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

১৩

মধুসূদনকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব' একসঙ্গে রচনা করিতে দেখিয়া ডাক্তার বাঞ্ছেন্দ্রলাল মিত্র বাবু বাঙ্গানারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

“গ্রন্থকার যখন এক হস্তে একুপ হান্তরসোচ্ছ্বীপক চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি অপর হস্তে কিরূপে তিলোত্তমাসম্ভবে মিষ্টনের জায় গাভীর্ষ প্রকটিত করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাব বিশ্বয় জন্মে।” * তিলোত্তমাসম্ভব ও একেই কি বলে সভ্যতা একসঙ্গে বচনা যদি বিশ্বয়েব বিষয় হয়, তবে যেমনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা একসঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিশ্বয়কর। † একদিকে রণভেদীর দিগন্তভেদী স্তম্ভভীর নিনাদ, অপর দিকে মলয়-মারুত-সমানীত সুরধর বংশীধ্বনি, একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিশ্বয়কব দৃশ্য, অপর দিকে বাসন্ত-কুসুম-সুশোভিত, পিককুলনিনাদিত বৃন্দাবনের চারু-চিত্র যুগপৎ প্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না কবিতা মিত্রচ্ছন্দে, এবং বীববসের প্রবর্তন না কবিতা আদরসে গ্রন্থবচনা করিলেও মধুসূদন বাঙ্গালি কবিদিগেব মধ্যে কিরূপ স্থান লাভ করিতেন, ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পাবি। যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণেব পদাবলী উদগত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ভাবাবেশ বঙ্গসমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন তান আব কোথা হইতে উঠিবে? তথাপি ব্রজাঙ্গনার দুই একটি পদ প্রবণ করিলে সেই বহুপূর্ব-জ্ঞাত, সুপরিচিত কণ্ঠস্বব মনে পড়ে। ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আব কাহারও বাধাক্ষ-তত্ত্ব লিখিবার

* “It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilotama.”

† এই উক্তি ভুল। মধুসূদনের চিঠি থেকে জানা যায় যে, যেমনাদবধ কাব্য রচনার আগেই ‘ব্রজাঙ্গনা’র রচনা শেষ হয়েছিল। ‘ব্রজাঙ্গনা’ কিছুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে থাকবার পর ‘যেমনাদবধ’-এর প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তার থেকেই সকলের ধারণা হয় যে, দুটি গল্প একই।—সম্পাদক।

আধকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই প্রাচীন ও আধুনিক তাঁহাদিগের সঙ্গীত মাধুর্যের ও ভাবের সম্মিলনে মর্মস্পর্শী বৈষ্ণব কবিতার হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও, ভক্ত ছিলেন না। পার্থক্য।

সেইজন্য তাঁহার কবিতা, কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও, মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য উষার শিশির-সিক্ত কুসুমেরই সঙ্গে তুলনীয়, সেই বিকাশোন্মুখ, পরিমলোৎসারী, স্বকোমল সন্তোঃস্নাত ভাব পৃথিবীর অপর কোন সামগ্রীতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা প্রভাতের কুসুমের তুল্য; তাহাতে পরিমলের ও সৌন্দর্যের অভাব নাই: কিন্তু অরুণ কিরণের সংস্পর্শে তাহার শিশির-বারি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য একই সামগ্রী হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক।

ব্রজাঙ্গনা আদিরস-প্রধান কাব্য। বাঙ্গালি আদিরসেরই কবি; অল্প বয়স বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থায়ী হয় না, আদিরসের প্রাবনে বাঙ্গালির হৃদয়ে অল্প ভাব ভাসিয়া যায়। মধুসূদন যদিও জাতীয় প্রবণতা অতিক্রম করিয়া, মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি আদিরসের মাধুর্য বিস্তৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লেখনী, যুবিয়া আসিয়া, আদিবসের পথে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ তাঁহার বিজাতীয় শিক্ষার ফল, ব্রজাঙ্গনা তাঁহার জাতীয় প্রবণতার নিদর্শক। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালিকে, সর্বপ্রথমে, আদিরসের মাধুর্য আশ্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাদিগেরই কাব্যের আদর্শে ব্রজাঙ্গনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদন প্রেমিক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম পৃথিবীতেই নিবদ্ধ ছিল। স্তত্রাং জয়দেব অথবা বিজ্ঞাপতি, শ্রীরাধিকাকে যে ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনায় সে ভাব নাই।

মধুসূদনের রাধা, ভক্ত বৈষ্ণবের পরমা-প্রকৃত রাধা নহেন; ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের আদর্শ। বিরহ-বিধুরা রমণী মাত্র। তাঁহার বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক

বৃন্দাবন নহে, স্রবস্ত্র উপবন মাত্র। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নহেন, প্রেমিক মনুষ্য মাত্র। ব্রজাঙ্গনার প্রেমপিপাসু কবি, বৃন্দাবন-লীলা এই ভাবে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার বিরহাবস্থা বর্ণনাতেই আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া, মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন; রাধিকা বিরহিনী—উন্মাদিনী। রাধিকার এই উন্মাদভাব ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের দ্বায় ইহাতে ভাববৈচিত্র্য নাই। পূর্বরাগের বা সঙ্কোপ-মিলনের কথা নাই। কবি একবারে

বিগলিত-ধারা রাধিকার বিবাদিনী মূর্তি পাঠকের সমক্ষে অবতারণিত করিয়াছেন। আঠারটি কবিতায় ব্রজাঙ্গনা সমাপ্ত হইয়াছে; বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা তাহাদিগের অধিকাংশেরই লক্ষ্য। গ্রন্থের অবলম্বনায় বিষয় কি তাহা বুঝাইবার জন্য কবি “পদাঙ্ক-দূত” হইতে “গোপী-ভর্তৃ-বিরহ-বিধুরা উন্মত্তেব” এই শ্লোকার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাগলিনী সহজেই কৃপাপাত্রী, যে বিরহে পাগলিনী, তাহার জ্ঞায় কৃপাপাত্রী জগতে কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ত্যাগ কবিতা, মধুরায় গমন করিয়াছেন। বৃন্দাবন শূন্য;—বৃন্দাবনের সকলই আছে;—সেই কল-কল নাদিনী বমুনা, সেই শ্রামশোভাময় তমাল-কুঞ্জ, সেই চিরপরিচিত মধুর-মধুরীগণ, সেই কুসুমগন্ধবাহী মলয় সমীরণ—সকলই আছে। এখনও সেখানে,

“মুঞ্জরয়ে তরুণলা, গুঞ্জরয়ে হৃথে অলি,
প্রেমানন্দ মনে”

এখনও,

“এমর গুঞ্জরে মেধা, গায় পিকবর (আহা)
সুমধুর বোলে।”

“মরমরে পাতাদল, মুহুরবে বহে জল,
মলয় হিলোলে।”

সকলই আছে। কেবল একজনের অভাবে,

“ভূতলে নন্দনবন আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পুরিছে আজ হাহাকার রবে।”

এই শূন্য বৃন্দাবনে রাধিকা আজ উন্মাদিনী;—যে অবস্থায় এককে আর বলিয়া বোধ হয়, বিরহের সেই দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় রাধিকা আজ উদ্ভ্রান্ত। পূর্বস্বতীই এখন রাধিকার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তাহা প্রতিপদেই তাঁহাকে আত্মবিশ্বস্তা করিত। মলয়-মারুতের হিলোলে উন্মাদিনী রাধিকার মনে হইত যে, আবার যেন, সেই বংশী-তেমনই স্বরে—যে স্বর শুনিয়া তিনি বলিতেন,

“গোকুল নগর মাঝে আর কত রমণী আছে
তাঁহে কেন না পড়িল বাধা।

নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁধী কেন বলে রা—খা—রা—খা ॥”*

—সেই স্বরে এখনও তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি, সখীকে ডাকিয়া,
এবং তাঁহার কল্লনাস্ত্রের স্বর শুনাইয়া, বলিতেন ;

“ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মনরে
মুরারীর বাঁশী।

স্বমন্দ-মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে
আমি শ্রাম-দাসী।”

বিহগের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রাবিকার মনে হইত, তাঁহার প্রিয়তম নিশ্চয়ই
বৃন্দাবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাই বিহঙ্গমগণ এত আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে।
সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহার প্রিয়তমেরই দেহ-
সংস্পর্শে তাহা সুরভিত হইয়াছে। যমুনার কল-কল শব্দে তিনি ভাবিতেন
যে, তাঁহার প্রিয়তমের সন্মিলনে প্রফুল্লিতা যমুনা অশ্রুট ভাষায় তাঁহাকে আহ্বান
করিতেছে। যমুনার নির্মল হৃদয়ে চন্দ্ররশ্মির ক্রীড়া দেখিয়া তিনি মনে করিতেন
যে, তাহা চন্দ্রালোক নয়, তাঁহারই প্রিয়তমের হস্ত যমুনা-সলিলে প্রতিবিম্বিত
হইতেছে। মিলনে প্রিয়তম কেবল এক। মাত্র; বিরহে বিশ্বসংসার তন্নয়
হইয়া যায়। বিরহে তাঁহার নিকট জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, ভালবাসার
সামগ্রীতেই জগৎ অভিন্ন হইয়া যায়, তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। আকাশের
নীলিমায়, কুসুমের কোমলতায়, সরসীর হিল্লোলে, নদীর কল কলে, ভ্রমরের
ঝঙ্কারে, কোকিলের কুহুস্বরে, চন্দ্রের কিরণে, উষার সমীরণে, যে প্রিয়তমকে
দর্শন করিতে ও তাঁহার সাধিত উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহার প্রেম—প্রেম
নয়—ইন্দ্রিয়বিকার মাত্র। যিনি কখন ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসার
সামগ্রী তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থাতেও যেমন,
স্বপ্নেও তেমনই, সন্মুখেও যেমন, অন্তরালেও তেমনই, প্রেমিকের হৃদয়
প্রেমাস্পদেব সত্যায় পূর্ণ হইয়া থাকে ;—বাহিরে যে প্রাণময়, তাহাকে হারাই-
বার সম্ভাবনা কোথায় ? রাধিকা তাই, উচ্ছ্বাসভরে, সখীকে ডাকিয়া বলিতেন ;

“স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন লই,

গহন কাননে।

হেরি শ্রামে পাই প্রীত, গাহিছে মঙ্গল-গীত
বিহঙ্গম গণে ॥

কুবলয়-পরিমল, নহে এ স্বজনী, চল,

ও সুগন্ধ দেহ-পঙ্খ বহিছে পবন।

হায়লো শ্রামের বণু সৌরভ-সদন ॥

উচ্চ বীচি-রবে শুন, ডাকিছে যমুনা ওই,
 রাখায় স্বজনি।
 কল, কল, কল, কলে, স্ততরঙ্গ দল চলে
 যথা গুণমণি ॥
 স্খ্যাকর কর-রাশি সম লো শ্রামের হাসি
 শোভিত তরল জলে, চল স্বরা করি ;
 ভুলিগে বিরহ-জালা দেখি প্রাণ হরি ॥
 ভ্রমর গুঞ্জে যথা, গায় পিকবর, সেই,
 স্খমধুর বোলে।
 মরগরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল
 মলয় ছিন্নোলে।
 কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দণ দিশ বাসে
 কি স্তম্ভ লভিব সখি, দেখ ভাবি মনে
 পাই যদি হেনস্থলে গোকুল-রতনে ॥”

বাণিকাব এই উদ্ভাস্ত অবস্থাই প্রধানতঃ ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। কবি
 ইহার সঙ্গে রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্যও ব্যক্ত করিবার
 রাধিকার প্রকৃতিগত
 মাধুর্য।
 প্রয়াস পাইয়াছেন। যিনি স্বয়ং ঐকৃষ্ণকৃপী প্রেমময়ের
 হৃদয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত, মাধুর্যই তাঁহার প্রকৃতির
 সবপ্রধান লক্ষণ। সেইজন্য ব্রজাঙ্গনার কবি তাঁহার শ্রীরাধিকায় অপর গুণের
 অপেক্ষা মাধুর্যেই অধিক সমাবেশ করিয়াছেন। অবচিত কুসুম দর্শনে রাধিকা
 বলিতেন ;—

“কেন এত ফুল ভুলিলি, স্বজনি,
 ভরিয়া ডালা।

মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
 তারার মালা।

* * * * *

কেনেলো হরিলি ভূষণ লতার
 বন শোভিনী—

অলি বঁধু তার—কে আছে রাখার
 হৃদভাসিনী ?”

অচেতন কুসুমের প্রতি যাহার এত করুণা, সচেতন প্রাণীর সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় কি উদাসীন থাকিতে পারে ? শিঞ্জরাবদ্ধা শারিকাকে দর্শন করিয়া রাধিকা সখীকে বলিতেন ;—

“নিজের যে দুখিনী পর দুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিছ তোমায়ে ।

আজিও পার্থীর মন বুঝি আমি বিলক্ষণ,
আমিও বন্দীলো আজি ব্রজ-কারাগারে ॥
শারিকা অধীর ভাবি কুসুম কাননে,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদনে ॥

* * * * *

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোব অমরোদে রে,
হইয়া সদয় ।

ছাড়ি দেহ, থাক চলি, হাসে যথা বনস্থলী ;
শুকে দেখি, স্থখে ওব জুড়াবে হৃদয় ॥

পৃথিবীর অচেতন, সচেতন সকল পদার্থের প্রতি যাহার এইরূপ প্রেম, প্রেম-ময়ের হৃদয়ে তিনি স্থান পাইবার যোগ্য বটেন । প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে আদর্শ রাধিকাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনার কবি সে আদর্শ ত্যাগ করেন নাই । রাধিকা সর্বত্যাগিনী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণে অহরক্তা ;—তাঁহার লজ্জা, ভয়, কুল-মান কিছুই বোধ নাই । ব্রজাঙ্গনার রাধিকার মুখে সেইজন্য আমরা শুনিতে পাই ;

“ভাল যে বাসে, স্বজন কি কাজ তাহার রে
কুল, মান, ধনে ?

* * * * *

যাক্ মান, যাক্ কুল মন-তরী পাবে কুল
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণে ॥”

যে সর্বত্যাগিনী হইয়া ভালবাসে, তাহার প্রতি পলে চিন্তা, পাছে প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলি ; পাছে আর কেহ আসিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লয় ; এইজন্য সে অসহনা । রাধিকা অসহনা এবং বিরহে উন্মাদিনী ; উন্মত্তের চেতনাচেতন বিচার থাকে না । রাধিকা অচেতন প্রকৃতিরও প্রতি, সেইজন্য, অভিমান করিয়া বলিতেন ;

“কুটিছে কুসুমকুল মজুক বনেরে
যথা গুণমণি ।

হেরি মোর শ্রামচাঁদে পীরিতের ফুল-কাঁদে
পাতিছে ধরণী ।

কি লজ্জা ! হা ধিক তারে, ছরস্তু বরে বারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে কামিনী ।
চল সখি, শীঘ্র বাই, পাছে মাথবে হারাই
মণিহারী কণিনী কি বাঁচেলো স্বজনি ।”

একদিকে এই ক্ষণিক অভিমান ও উদ্ভ্রান্ত ভাব, এবং অপর দিকে ভারত-নারীর চিরাত্মক মধুরতাগুণ, উভয়ের সম্মিলন হওয়াতে ব্রজাঙ্গনার রাধা-চরিত্র অতি স্বন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ভারতে রমণী কোন দিন পুরুষের সম-কক্ষতা করে নাই। “হারাই হারাই” আশঙ্কা ভারত-মহিলাকে চিরদিন লঙ্ঘ্যচিত্তা ও নম্রমুখী করিয়া রাখিয়াছে। অভিমানে ভারতনারীর নয়নে হরিণীর গ্রায় জলধারা বিগলিত, সিংহীর গ্রায় বক্ষি গ্রীবাভঙ্গি বা তীত্র কটাক্ষ ভারতনারীর অভ্যন্ত নয় ;—সে চিত্র বিদেশীয়। পূর্বরাগ ও বিরহ-বর্ণনায় ভারত-কবি বৈষ্ণব পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, মান-বর্ণনায় সেরূপ পারেন নাই। খণ্ডিতার তিরস্কারের তীব্রতা তাহার নয়ন-জলে কোমল হইয়া যায়।

“আওত বর বঞ্চক—শঠ নাগর শত ঘরিয়া” ।

তিরস্কার তীব্র বটে, কিন্তু সোহাগশূন্য নহে। যেন “শত ঘরিয়া” কথাটি প্রিয়তমের গৌরবসূচক। যে আমার প্রিয়তম, পাছে তাহাকে হারাইয়া ফেলি, সেইজন্যই অভিমান। কিন্তু সে যে, নিজগুণে, আমার গ্রায় আরও সকলের প্রিয়তম, এ চিন্তাতেও যেন একটু স্বেচ্ছা আছে। ব্রজাঙ্গনার রাধিকা অসহন্য হইলেও, সেইজন্য, মধুরীর প্রতি তাঁহার সন্ধাননে আমরা শুনিতে পাই ;

“তরুশাখা উপরে, শিখিনি,

কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?

না হেরিয়া শ্রামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে,

তুইও কি দুঃখিনী ?

আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?

কার না জুড়ায় আঁধি শব্দী, বিহ্বলিনি !”

রাধিকা অসহন্য ও অভিমানিনী ; কিন্তু তাঁহার অভিমান প্রিয়তমের প্রতি নয়। যিনি প্রকৃত প্রেমিক, প্রেমাস্পদের প্রতি তিনি অভিমান করিতে পারেন না। প্রেমমুখ্য ভারতনারী অভিমান কাহাকে বলে জানেন না। অভিমানিনী ভারতমহিলার তিরস্কারের

তীব্রতার মধ্যেও একটু মধুরতা এবং আত্মভাগ্যের উপর একটু দোষারোপ থাকে। বিরহে কোন বৈষ্ণব কবির রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার না করিয়া আপন ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া, বলিয়াছিলেন ;

“তাবত অলি গুঞ্জরে বাই ফুল ধুতুরাবে,
 বাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে ।
 মোরা গ্রাম্য গোপবালিকা তত হ' পশুপালিকা
 হাম কিরে ভ্রাম সম ভোগ্যে ॥”

ব্রজাঙ্গনার রাধিকায় এরূপ আত্মবিস্ময়নার কথা নাই ; কিন্তু মাধুর্যে তাঁহার রাধিকা বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকার অপেক্ষা নিকটী নহেন। ঘেব নাই, অভিমান নাই, রূপ-গুণের গর্ব নাই, ভালবাসার স্রোতে রাধিকার সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। সখীর নিকট রাধিকার এইমাত্র অস্বরোধ ;

“কাদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
 চল স্বরা করি ।
 দেখিব কি মিষ্ট হাসে শুনিব কি মিষ্ট ভাষে
 ভোষেন শ্রীহরি ॥

আমরা বলিয়াছি যে, অন্ত্যস্ত বৈষ্ণব কাব্যের ভ্রাম, ব্রজাঙ্গনায় ভাববৈচিত্র্য নাই ;—সুতরাং মধুসূদন ইহাতে তাঁহার নিপুণতা সর্বাংশে প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রাধিকার দিব্যোন্মাদ অবস্থাই তাঁহার কাব্যের অবলম্বনীয় বিষয় ; সে অবস্থায় বাহা কিছু বলা সম্ভব, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন। জয়দেবের অথবা বিভাপতির কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া ব্রজাঙ্গনার দোষ, গুণ বিচার করিলে মধুসূদনের প্রতি ভ্রাম-বিচার হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার জয়দেবের বা বিভাপতির আবির্ভাব সম্ভব নয়। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যহীন নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী হইয়াও যে মধুসূদন ইহাতে বৈষ্ণব মহাজনোচিত ভাবের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্যজনক। জয়দেব, বিভাপতি, অথবা চণ্ডীদাসের ভক্তিভাবপূর্ণ গ্রন্থের সহিত ব্রজাঙ্গনার তুলনা করিলে পাঠক বঞ্চিত হইবেন ; কিন্তু প্রেমভাবপূর্ণ কাব্য বলিয়া বিচার করিলে ব্রজাঙ্গনা অতি সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইবে

ব্রজাঙ্গনার ভাষা মধুসূদনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মৃধুর ও সংস্কৃত-ভাবাপন্ন। জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ভাবার আদর্শে তাহা গঠিত হইয়াছে। মধুসূদন এই দুইজন ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব কবির কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ব্রজাঙ্গনার বলস্বত সমাগমে,

“বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে

পিককুল কল কল চঞ্চল অলিদল

উছলে সুববে জল চললো বনে।”

ইত্যাদি পঙ্ক্তিগুলি, আমাদের কাছে বিদ্যাপতির

“ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীব বন

কোকিল পঞ্চম গাওইবে।”

ইত্যাদি কবিতা স্মরণ করা হয়। মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনাব জন্ত, “বিহার” নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। নিম্নে সেই অসম্পূর্ণ সর্গের কয়েকটি পঙ্ক্তি সম্মিলিত কবিতা আমরা ব্রজাঙ্গনার সমালোচনা শেষ করিব।

(১)

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঞ্জে তরা করি।

মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,

বাঁধ লো হুপূর পায়ে, কুসুমে কবরী।

লেপ স্ফটিক দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?

ওই গুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী।

(২)

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।

শিখণ্ড-মণ্ডিত শির ধীরে ধীরে শ্রাম ধীর,

হুলিছে লো, বর গুঞ্জমালা বর গলে,

মেঘ লনে সৌদামিনী সম রূপে, লো কামিনি,

ঝলে পীতধড়া রূপে ঝল ঝল ঝলে।

(৩)

হৃদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,

তব আশা-শশী আলি শোভিছে নিরুজ্জ্বল হাসি,

কেনে মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে।

দেব, দৈত্য মিলি বলে মখিলা সাগর জলে
 যে স্থান লোভে তাহা লভিবে সুন্দরী ;
 স্থানমাখা বিধাধরে, আছে স্থা তব তরে,
 যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে ।

একদিকে ব্রজাঙ্গনাব এই স্তম্ভু বংশীধ্বনি এবং অপরদিকে মেঘনাদবধের গম্ভীর ভেরীনিাদ, সমকালীন, শ্রবণ করিলে মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয় ।

ইহার সঙ্গে কুমারী কৃষ্ণাব মর্মভেদী বিষাদোজ্জ্বল ও কবির কৃষ্ণকুমারী নাটক ।

লেখনী দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল । কল্প-রসের উদ্দীপনে মধুসূদন দ্বিধা নিপুণ ছিলেন, মেঘনাদবধ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন । কৃষ্ণকুমারী নাটকেও তাঁহার এই কল্পরসোদ্দীপন-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । শর্মিষ্ঠা বচনার সময় মধুসূদন বঙ্গলাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী রচনার সময় তাঁহার নাম বঙ্গভাষাভূরাগী ব্যক্তি নামেই পরিচিত হইয়াছিল । নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । প্রাচীন রীতিব অনুসরণ না করিলে তাঁহার নাটক “নাটকই হইবে না” এইরূপ সগর্ব বাক্যে কেহ তখন তাহাকে ভীতি-প্রদর্শনে সাহস করিতেন না । প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ পূর্বক অভিনব রীতিতে নাটক রচনার অভিলাষ পূর্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল । কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি তাহা চবিতার্থ করিয়াছেন । কৃষ্ণকুমারীর বর্ণনীয় বিষয় ও দোষ, গুণ উল্লেখের পূর্বে যেরূপ অবস্থায় এবং যাহার উৎসাহে ইহা রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক ।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা ষষ্ঠীজ্যোত্স্নের নিকট মধুসূদন নাটক-রচনা সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি । ইহাদিগের দুইজনের সঙ্গে বেলগাছিয়ার সর্বপ্রধান অভিনেতা বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ কর্তব্য । কেশব বাবুর নাম সাধারণের নিকট সুপরিচিত নয় । কালের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু যাহারা তাঁহার অভিনয় ক্রিয়ার সাক্ষী, তাঁহার একবাক্যে বলেন যে, তাঁহার জ্ঞান অভিনয়ে পারদর্শী ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় যে তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য হয়েছিল, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই

গুণে! * কেশব বাবুর অভিনয় নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার-
শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। ‘শর্মিষ্ঠা’ ও
‘একেই কি বলে সভ্যতা’ রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর
পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন নাটক রচনার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদ্ভিত হইলে
মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় সুভদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচন্দ্রে লিখিয়া তাহা
কেশব বাবুকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যাংশ সুন্দর হইলেও,
তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু সুভদ্রা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহাব পর
রিজিয়া নাটক রচনার
সঙ্কল্প। সম্রাট আলটামাসের চুহিতা, স্থলতানা রিজিয়ার চরিত্র
অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার

সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা স্বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান চরিত্র
অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া
রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহার। কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। **
রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে
তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার। মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ
দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, “রাজপুত জাতির
ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে মধুসূদনের জ্ঞান প্রতিভাবান পুরুষ
তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।”
ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রাণোদ্ভূত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে
লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল, —

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia¹ was made over to Jotindra
babu the day that I received it from you, with a request

* বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র রত্নাবলী অভিনয়ের এসঙ্গে কেশববাবুর সম্বন্ধে “কলিকাতার
রিজিউ” পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

“The gem of the actors was Pasantaka who was represented by Babu
Keeshob Chandra Ganguly. His ready wit, his brilliant *bonmots*, and in-
imitable comic humour may fairly entitle him to the praise of being the
best actor in Bengali. He kept up the interest of the play most success-
fully, and was the life and soul of the performance.”

** সে দিন এক্ষণে অতীত হইয়াছে; রিজিয়ার অভিনয় দর্শনে এক্ষণে অনেকেই প্রীতিলাভ
করিয়া থাকেন। মধুসূদনের কল্পনা নিম্নলিখিত হয় নাই।

† মধুসূদনের কল্পিত রিজিয়ার সংক্ষিপ্ত আদর্শ নিয়ে প্রেরিত হইল।

that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a

PERSONS OF THE DRAMA.

Men.

Byram (বাইরাম) Rizia's brother—afterwards emperor.

Altunia (আলতুনিয়া) Governor of Sind.

Kabirc (কেবর্ক) A nobleman, Altunia's friend.

Balin (বালিন) Do

Jammal (জাম্মাল) Rizia's Favourite (a slave).

Munher Sing (মুনোহর সিংহ) A Rajpoot officer of the imperial household troops.

Must (মস্ত [প্রমত্ত]) A Drunken fellow in the employ of the emperor.

A Broker or Money-lender (দালাল) ।

Women.

Rizia (রিজিয়া) Empress.

Sherin (শেরী) A Persian maid.

Leela (লীলাবতী) A Hindu maid. } Favourites of the empress.

Mehdee (মেহদী) Must's wife, maid to the two young ladies.

(Noblemen ; Soldiers ; Officers , Heralds , Citizens , Slaves , a Fakcer).

During the life of the Emperor Altamush, Rizia's father, that Princess was engaged to be married to Altunia, Governor of Sind. He comes to Delhi—finds the emperor dead, and Rizia regining in his stead. He also finds his intended wife quite changed and in love with a slave (Jammal) whom she had made the "Master of the Horse"—Here the play opens.

Act I. Sc I. (A ROOM IN THE PALACE—DELHI).

Conversation between Altunia and Kabirc. Altunia proposes to throw off his allegiance. To them enter Balin. The empress passes over the stage with her maids and Jammal. The three noblemen go to the Prince Byram, confined in his palace.

Sc II. (THE LAHORE GATE OF THE CITY).

Sentry—another soldier—Mehdee brings in Must drunk. Afterwards enter Altunia and Kabirc—They part.

Act II. Sc. I. (THE AUDIENCE CHAMBER).

Rizia—maids—nobles—citizens—news has been received by the Empress that Altunia has "erected the standard of Rebellion." She proposes in person to go and chastise him.

Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শর্মিষ্ঠা and ভিলোভমা। They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself.

Yours affectionately
Keshob Chandra Ganguly.

So II. (PRINCE BYRAM'S PALACE).

The Prince, Kabirc, Money lender, afterwards some other nobles.

Sc III. (HINDU TEMPLE GROVE).

Leela—to her enter Balin—he attempts to insult her—she is rescued by Must, enter Munher Sing—Leela's Lover—they talk and then part—enter Sherin.

Sc IV. (THE EMPRESS'S PRIVATE CHAMBER).

Rizia—Jammal—Leela—Sherin.

Act III. Sc I. (THE CAMP OF RIZIA).

Her soldiers rebel and take her captive—Jammal is slain—Munher Sing kills Balin for insulting Leela—Munher's message to his parents.

Sc II. (ALTUNIA'S CAMP).

Rizia is delivered over to Altunia—She persuades him to restore her throne. Must and Mehdee come from Delhi.

Act IV. Sc I. (THE CAMP OF BYRAM NOW EMPEROR).

Preparations for battle against Altunia and Rizia

Sc II. (ON THE BANK OF THE CHUMBU).

Leela, Sherin, and messenger—They hear of Altunia's defeat and death—of Rizia's captivity—Soldiers come and take them away to join the empress.

Act V. Sc I. (PRISON).

Rizia, Sherin, Leela, Fakeer, Murderers,—Rizia put to death. The lamentation of her maids. A soldier (Hindu) enters with news of Munher's death and gives to Leela his wooden-Sandals and sword.

Sc II. (ON THE BANK OF THE JUMNA).

Leela—mad! The funeral of the empress. Leela burns herself with her lover's wooden-shoes (behind the stage). Sherin and Fakeer leave India for Persia.



स्वर्गीय कालीप्रसाद सिंह महोदय।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সংকলিত রত্নলাল বাবু পদ্মিনী-উপাখ্যান পূর্বেই কেশব বাবুর কথা সপ্রমাণ করিয়াছিল। মধুসূদন কেশব বাবুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত টড্ (Tod) প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস কৃষ্ণকুমারীর উৎপত্তি।

অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে, তাঁহার অভিজ্ঞ প্রেত নাটকের জগৎ, কৃষ্ণকুমারীর বৃত্তান্ত নির্বাচিত করিয়া লইলেন। একবার হৃদয়ে ভাবাবেগ হইলে মধুসূদন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বর্ষাকালীন পার্বত্য শ্রোতস্বতীর জায় তাঁহার কল্পনা-শ্রোত অবাদে দাবিত হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট আরম্ভ কবিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি কৃষ্ণকুমারী সম্পূর্ণ করেন। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে মধুসূদন কেশব বাবুর নিকট যে সাহায্য ও সংপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাঁহার পক্ষে তাহা দেখিতে পাইবেন। তিনি কৃষ্ণকুমারী কেশব বাবুকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

“আপনি আধুনিক নটকুল শিরোমণি, কৃষ্ণকুমারীর দোষ, গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষতঃ আমার এই বাসনা যে, ভবিষ্যতে এদেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শনকাব্য বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য প্রকাশ করিতেন।” তাঁহার একখানি পত্রেও মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

Here is Kissencumari. Your Kissencumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friend-ship I proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours.

কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত। কৃষ্ণকুমারী মৃত্যুদানের ব্যয়ও তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অমিত্রকল্পে রচিত কাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিষাদাস্ত নাটক যে, তাঁহার উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা উত্তরকালবর্তিগণের নিকট মহারাজার সাহিত্যানুসরণের প্রমাণ রূপে তাঁহার গৌরব বর্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণকুমারী বালালা ভাষার প্রথম বিবাদান্ত নাটক। নীলদর্শণ ইহাব অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিবাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন

কৃষ্ণকুমারী ক্রেশকর ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া সংস্কৃত অবলম্বনীয় বিষয়। আলংকারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু

মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাজ ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিবাদান্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহের বংশধর, উদয়পুরাধিপতি মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর বিবাদময় জীবনের আখ্যায়িকা, কৃষ্ণকুমারী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। সীতা ও দময়ন্তী যে বংশের কুলবধু, কৃষ্ণকুমারী সেই পবিত্র সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া, রাজস্থানের কুসুম বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকুমারীর রূপ-গুণে মোহিত হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর, লম্পট প্রকৃতি রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হন, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে প্রাপ্ত না হইলে, উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগের হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল, স্থির করিয়া, তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার জন্ত আদেশ দান করেন। চারুশীলা কৃষ্ণা, বংশের মর্যাদা বক্ষার জন্ত, বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংক্ষেপে ইহাই কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক কথা। মধুসূদন, ইতিহাসের সামান্য পরিবর্তন করিয়া, কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু খড়গাঘাত দ্বারা ঘটাইয়াছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মধুসূদনের নাটকসমূহের মধ্যে

কৃষ্ণকুমারীই সর্বোৎকৃষ্ট। চবিত্ত-চিত্রণ সম্বন্ধে তিনি কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক মূল। ইহাতে যে রূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার অপর

কোন নাটকে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। অন্ত্যান্ত নাটকীয় পাত্তের অপেক্ষা উদয়পুরের রাজপরিবারবর্গের চরিত্র চিত্রণেই তাঁহার দক্ষতা সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে আমরা উদয়পুরের রাজপরিবারগণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। রাজগৃহ বিবাদময়, রাজা ভীমসিংহের প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ, রাজকোষ উৎকোচ-প্রদানে একেবারেই শূন্য, দুর্দান্ত মহারাজপরিবারগণের লুণ্ঠনে উদয়পুরের প্রজাগণ হতভরত। রাজমন্ত্রী সর্বদাই উৎকণ্ঠিত, বাগ্মীরাও এর বিপুল বংশের মান কিসে রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই। রাজার অন্তঃপুরে পদার্পণ করিবার অবসর হয় না,

রাজ-মহিষী সর্বদাই মিয়মাণা, আমীর বিরস বদন দেখিয়া সাক্ষীরও জীবনে স্থখ নাই। পুরবাসিগণ কোন্ মুহূর্তে কি অনিষ্ট সংঘটন হইবে, এই আশঙ্কায় দিবারাজি সশঙ্কিত। বিবাদের ঘনাক্কার উদয়পুরের রাজ-অট্টালিকা আবৃত করিয়া কেলিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারময় জীর্ণ পুরীতে যেমন কখন কখন, একটি মাত্র প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোকে পুরীটিকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সেই বিবাদ-ভ্রমোন্ময় রাজপুরীতে একমাত্র কৃষ্ণকুমারীই পিতামাতার হৃদয় উজ্জ্বল করিতেন। বালিকা তখনও সংসারানভিজ্ঞা, প্রভাতেব কুসুমের গ্রায় পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় হৃদয় বিকশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। সংসারের কঠোর উত্তাপ বালিকার হৃদয়ের কোমল ভাব তখনও বিস্তৃত করিতে পারে নাই। পিতার উত্তানের কুসুমকে সখীরূপে বরণ করিয়া এবং উপবনের বিহগের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনি করিয়া সরলা বালিকার দিন স্নেহে গত হইত। কিন্তু সরলা বালার সে স্নেহের দিন অচিরেই অন্তর্হিত হইল। বিবাহের প্রস্তাবেব সজে বালিকার হৃদয়ের শাস্তি অন্তর্ধান করিল। যে দিন রাজা জগৎসিংহের এবং মানসিংহের দূত, কৃষ্ণার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া, উদয়পুরে উপস্থিত হইল, সেই দিন হইতেই উদয়পুরের রাজপরিবারের সর্বনাশ ঘটিল। মহেশ্ব, নিয়তির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। এক অবস্থায় পিতামাতা, পুত্র-কন্তার জন্ত, হৃদয়ের শোণিত দান করেন, আবার অল্প অবস্থায় তাঁহাদিগেরই সন্তানেব হৃদয়শোণিতে ছুরিকা রঞ্জিত করিতে হয়। অবস্থার নিপীড়নে একদিন, রোমান পিতা, কন্তার বক্ষে ছুরিকা নিমগ্ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীক পিতা কন্তাকে বলিরূপে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুণ্ড্রমি রাজপুতনাতেও, একবার সেই হৃদয়ভেদী দৃষ্ট অভিনীত হইয়াছিল। কি অবস্থায় কুমারী কৃষ্ণার জীবন আহুতি রূপে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার জ্ঞান পাঠকে একবার তাৎকালিক ভারতবর্ষের অবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। সমরপ্রিয় ভারত-শাসনকর্তা, লর্ড ওয়েলেসলির সামরিক নীতিতে বিরক্ত হইয়া ডিরেক্টরগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ অথবা অত্যাচার বাহাই ঘটুক, ভারত গবর্নমেন্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এইরূপ ঔদাসীন্যের কালে মধ্যভারত ও রাজস্থান এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাশ্মশানে লুণ্ঠনব্যবসায়ী মহারাষ্ট্রীয়দল শ্মশানচণ্ডালের দ্বায় যত ও মুমূর্ষু প্রজাগণের অঙ্গ হইতে পরিধেয় বস্ত্র, ছিন্ন কপট পর্বত উন্মোচন করিয়া লইতেছিল এবং আমীর খাঁর দস্তানৈকগণ তাহাতে ক্ষেপালের দ্বায় শ্মশাননিষ্কিন্ত দেহের অস্থিমাংস চর্বণের জন্ত অবসর

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। হতভাগ্য রাজপুত্রগণ এই অশাস্ত্রভূমিতে বাস করিয়াও আপনাদিগের দুর্বশা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাবা সে অবস্থাতেও আত্মকলহে পবম্পরের সর্বনাশ করিতেছিলেন। কমলা

চিরদিনই চঞ্চলা; রাজস্থানের প্রাচীন রাজগণের মণো উদয়পুরের রাজ-
পরিবারের অবস্থা। রাণা প্রতাপসিংহের বংশধরগণই এখন সর্বাপেক্ষা শ্রীভ্রষ্ট।

হলকার, সিক্কিয়া, পাঠানদস্যু আমীর ঐ প্রভৃতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি, উদয়পুরের শামল উপত্যকার উপর নিক্ষিপ্ত। যিনিই যখন যুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই তখন উদয়পুরবাসকের নিকট নিজস্ব গ্রহণ করেন। মহাবাণা প্রতাপসিংহের বংশধরের পক্ষে ইহাব অপেক্ষা অধিক লাজবাব বিষয় আব কি হইতে পারে? উদয়পুরের প্রজাগণ সর্বস্বান্ত; পুনরানুগণ, এমন কি দেবমূর্তিসমূহও, লুণ্ঠনে আভবণশূন্য। বাজা ভীমসিংহ অপমানে উন্মত্তপ্রায়; কিন্তু প্রতিকার করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। একমাত্র কুমাবী কৃষ্ণাই তাঁহার শক্তির স্থল ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহারও সম্বন্ধে এক অভাবনীয় বিপদ সংঘটিত করিলেন। মনুষ্য, যন্ত্রণা সহ্য কবিতো না পারিলে, নিজহস্তেই নিজেব ছুঁপণ্ডি বিদারিত কবে। যন্ত্রণায় অদীর ভীমসিংহ কৃষ্ণার মৃত্যুতে সম্মতিদান করিলেন।

উদয়পুর রাজপরিবারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা মধুসূদন অতি সুন্দররূপে চিত্রিত কবিয়াছেন। যে অবস্থায় ভীমসিংহ কৃষ্ণার মৃত্যুতে সম্মতিদান কবিয়াছিলেন, তাহাও অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সরলা কৃষ্ণাব প্রাণনাশের জন্য রাজসভায় যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, বাজযযিহী অথবা কৃষ্ণা কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন, সেই ভাবী বিপদের ছায়া তাঁহাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল। মাতাব প্রাণ শতষোজ্ঞন দূর হইতেও সন্তানের বিপদ জানিতে পারে। কৃষ্ণার প্রাণনাশের চক্রান্ত জানিতে না পারিয়াও রাজ্যীর হৃদয় কৃষ্ণার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণাকে কোথাও একা রাখিয়া তিনি স্থস্থির থাকিতে পারিতেন না। মনের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার কৃষ্ণাকে খজাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই অবধি তাঁহার প্রাণ সর্বদা কৃষ্ণার জন্য অস্থির থাকিত। ভাবী বিপদের ছায়া কৃষ্ণারও হৃদয়াকাশ আবৃত করিয়াছিল।
কক্ষুধারী।

মাতার উদ্বেগ, পিতার দীর্ঘনিবাস এবং পুরবাসিগণের বিষম ভাব বালিকার হৃদয়ে শেলের জায় বিদ্ধ হইত। কৃষ্ণা আর সেই সরলতাময়ী বালিকা রহিলেন না। লজ্জিত, দুঃখ, পুণ্ড্রাটিকায় জলসেক,

সকল সাধই, ক্রমে, বালিকার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। দাবানলবেষ্টিত কাননে কুরঙ্গশিশু খেমন সরল নয়নে মাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সরলা বালিকা কৃষ্ণাও তেমন জননীর মুখপানে চাহিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সেখানেও শান্তি পাইতেন না। একদিন, অন্তপুরস্থিত উদ্যানে এমন করিতে করিতে কৃষ্ণা মুর্ছিতা হইয়া পতিত হইলেন; এবং সেই অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে অতি কোমল বায়ু তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; যেন স্বর্গীয় সৌরভে তাঁহার নাসিকা পূর্ণ হইতেছে এবং যেন একটি দেবকুমারী, আলিয়া, তাঁহাকে বলিতেছেন; “দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়া রাখে, স্বরপুরে তাহার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলেরই বধু ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম কর, তাহা হইলে আমারই মত বশস্বিনী হইবে।” রাজপুত্র-বালিকা কি মৃত্যুর জন্ত ভীতা? কৃষ্ণা অজ্ঞাতভাবে আপনার শোচনীয় পরিণামের জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

যে করাল নিশীথিনীতে রাজভাতা বল্লভসিংহ কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা সমাগতা হইল। সেই বিভীষিকাময়ী রজনীও যেন সেই ভয়ঙ্কর দুর্কর্মের উপযোগিনী হইয়াই ভীমসিংহ। পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইল। উন্নত ভীমসিংহের মখে কবি সেই রজনীর ভীষণ ভাব অতি সুন্দর রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজা ভীমসিংহ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন;

“রজনী দেবী, বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করিয়া চামুণ্ডা রূপে গজ্ঞন করছেন। উঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কাল স্বরূপ অন্ধকার! হে তম, তুমি আমাকে গ্রাস করতে উত্তত হয়েছ? ডঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন বিগুণ ক্রোধান্বিত করেছেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! একি প্রলয় কাল; তো আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হোক না? (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল! আমাকে গ্রাস কর! হে বজ্র, এ পাশাপ্রাণকে বিনাশ কর, হে নিশাদেবী! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে কেন রাখ? বিনাশ কর।”

কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্কে উন্নত ভীমসিংহের ব্যবহার পাঠককে “কিং লিয়ারের” (King Lear) শেষাঙ্ক স্মরণ করাইবে। রাজা ভীমসিংহের অবস্থা ত এইরূপ

ওদিকে রাজমহিবীর এবং কুমারী কৃষ্ণারও হৃদয়ে সে রাজিতে শান্তি ছিল না। দয়ালীলা কৃষ্ণা, আপনার অট্টালিকায় শয়ন করিয়া, চিন্তা করিতেছিলেন ;—

“এ মন্দির পর্বতের স্থায় অটল, প্রবল ঝড় বহিলেও এতে কোন ভয় নাই, কিন্তু বাহারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে। হা পরমেশ্বর! তাদের রক্ষা করুন। * * * ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হ’ল কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগছে না। আমার মন যেন পিঙ্গরবদ্ধ পক্ষীর স্থায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হ’তে পারি। * * * হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া ক’রে মনের চঞ্চলতা দূর কর; প্রভু! এ দানী নিতান্ত তোমার শরণাগত।”

কিয়ৎকণ এইরূপ চিন্তার পর কৃষ্ণা নিদ্রাগত হইলেন। সেই সময় একজন অজ্ঞধারী পুরুষ, নিঃশব্দে, কৃষ্ণাব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; ইনি কুমার বলেঙ্গ-সিংহ। বলেঙ্গসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার কথোপকথন, উন্নত ভীমসিংহের ও উম্মাদিনী, বৎসলা রাজমহিবীর অবস্থা মধুসূদন ধেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, আত্মোপাস্ত উদ্ধৃত না করিলে, তাহার সৌন্দর্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্ক পাঠ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। সরল হৃদয়া কৃষ্ণা পূর্ব হইতেই মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। আজ অজ্ঞধারী পিতৃব্যকে একপভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; “কাকা, আমাব পিতারও কি ইচ্ছা যে—”

বলেঙ্গসিংহ বলিলেন, “মা, আমি আর কি বলব? তাঁর অহমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম কর্তে প্রস্তুত হই?”

কৃষ্ণা শুনিলেন যে, তাঁহার পিতারও ইচ্ছা যে, তিনি জীবন উৎসর্গ করুন। তবে আর জীবন কাহার জন্য? ক্ষত্রিয়-কুমারী কবে মৃত্যুমুখে পতিতা হইতে ভীত হন? কৃষ্ণা, বলেঙ্গসিংহকে কাতর দেখিয়া বলিলেন;

“কাকা! তা এর নিমিত্ত আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মত বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী, রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে; আপনি বীর-কেশরী, আপনার ভাইঝি, আমি, মৃত্যুকে ভয় করি কি?”

যে ছারামরী মূর্তি ইহার পূর্বে একবার কৃষ্ণাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার মনে হইল, যেন এখনও তিনি তাঁহার শয়ন শিল্পির ঘারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেইরূপ স্বর্গীয় সৌরভ তাঁহার নালিকায় এবং সেইরূপ স্বর্গীয়বাস্ত তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষ্ণা বিষন্ন-বিস্মারিত নেজে

শিত্ত্বাকে বলিলেন, “কাকা, একবার ঐ ছুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন, আছা, কি অশরুপ রূপলাবণ্য। উনি পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে একবার দেখা দিয়াছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো। দেখ কাকা, এ মন্দির নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আছা! আমার কি সৌভাগ্য।” উন্নত ভীমসিংহ এই সময় কৃষ্ণার অধেষণে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণা পিতার চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া, বিনায় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জ্ঞানশূন্য রাজা, কৃষ্ণার স্নেহ-সম্ভাষণে প্রত্যাভ্রত দান করিলেন না। বালিকার হৃদয় ব্যথিত হইল। সেই পূর্বলক্ষিতা মূর্তি, অঙ্গুলিসঙ্কেতে কৃষ্ণাকে আহ্বান করিয়া, তখনও বলিতেছিলেন; “কুল, মান বন্ধার জন্ত যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, স্বরলোকে তাহার আদরের গীমা নাই।” কৃষ্ণা, বলেন্দ্রসিংহের ভূমি-নিষ্কিপ্ত অসি পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। “জননি! এই আমি এলেম,” এই বলিয়া কৃষ্ণা, সেই অসি লইয়া, সহসা আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন, এবং ছিন্নমূল স্ববর্ণলতার জ্বায় শয্যার উপর নিপতিত কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু।

হইলেন। পাঠকের হৃদয়ে বিবাদ-রেখা অঙ্কিত করাই বিবাদান্ত নাটকের উদ্দেশ্য। মধুসূদন সে উদ্দেশ্য-সাধনে কতদূর কৃতকাৰী হইয়াছেন, বিনি তাহা বৃত্তিতে চান, তাঁহাকে একবার কৃষ্ণকুমারীর শোবার্ধ পাঠ করিতে বলি।

ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিয়া কবি, কৃষ্ণকুমারীর আভ্যন্তরীণ ঘটনা-সমূহ বৈরাগ্য কৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। বিরূপ সাম্রাজ্য কারণে হিন্দুরাজগণ, পরম্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের সর্বনাশ করিতেন এবং আধুনিক রাজপুত্ররাজগণের সভায় বারাজনা ও বারাজনা-চরদিগের বিরূপ প্রাধান্য ছিল, কবি ইহাতে তাহার সুন্দর আভাস প্রদান করিয়াছেন। বারাজনা-চরিত্র কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিতেই গ্রহকারগণের সাধারণ প্রবণতা এবং তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু অনেক সময় বারাজনা চরিত্রেও এমন ছুই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা কুলললনারও পক্ষে অতুলকরীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বসন্তসেনার চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তহল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বারাজনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন, লভবতঃ, যুদ্ধকটিক নাটকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকটিক নাটকের মদনিকার জ্বায় কৃষ্ণকুমারীর মদনিকাও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী, এবং সেইসঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ক্রুরস্বভাব। স্বতঃসর্বঘননসেয় হ্রস্বস্বায় মদনিকার অল্পকম্পাপূর্ণ ব্যঙ্গ পাঠ করিলে স্বভাবকোমল নারীস্বভাব

চরিত্রদোষে কিরূপ বিকৃতভাব ধারণ করে, তাহা অস্বপ্নান করিতে পারা যায়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিলাসবতীও, মুচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ত্রায়, প্রণয়াম্পদেব বিলাসবতী ও ধনদাস।

প্রতি আন্তরিক অগ্রগাণী। যুদ্ধগামী রাজা জগৎসিংহেব সদক্ষে বিলাসবতীর আচরণ কুলললনার উপযুক্ত। নিজের সতীত্বনাশেব জ্ঞাত হতভাগিনী বিলাসবতী যখন ধনদাসকে বলিতেছিল, “আমি যদিও দুঃখীলোকেব মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলাম, তুমিই অর্থেব লোভে আমাব ধর্ম নষ্ট করালে,” তখন তাহার কথাগুলি শুনিলে তাহাব অবস্থায় অস্বপ্না প্রকাশ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। পাণিষ্ঠ ধনদাসেবও চবিত্র দম্পত্যার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কুলললনাদিগেব সর্বনাশ করিয়া লম্পট জগৎসিংহের পাণাভিলাষ পবিত্র কবাই ধনদাসেব ব্যবসায় ছিল। কিন্তু পাণিষ্ঠেব হুবভি-সন্ধির ও দুষ্ক্রিয়তার উপযুক্ত প্রাশস্তিত হইয়াছিল। ধনদাস বাহাদিগেব সর্বনাশ করিয়াছিল, তাহাদিগেবই মধ্যে একজনের হস্তে ধনদাসকে উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ধনদাস একদিন সগর্বে বলিয়াছিল যে, “রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাদে সকলকেই পড়িতে হয়”, সেই ধনদাসকেই আবার বিধাতার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিতে হইয়াছিল, “হে বিধাতঃ, আমি এককাল রাজসংসারে থেকে, নানাবিধ সুখভোগ ক’বে অবশেষে অম্মাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুবেব ত্রায় আমাকে কি দ্বাবে দ্বাবে ফিৎতে হ’ল।*** প্রভো! আমার অশ্রুজল দিয়া, তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আম্মাকে ধৌত কর।” হতভাগ্যেব এইরূপ কাতবোক্তি শ্রবণ করিলে, তাহাব পূর্বাপরোধ বিন্ধত হইয়া তাহাব প্রতি পাঠকের অস্বপ্না জন্মে। কৃষ্ণকুমারী আরও অনেকস্থলে কবি এইরূপ গুণপণা প্রদর্শন কবিয়াছেন, কিন্তু ইহাব একটি প্রধান দোষ এই যে, রাজপুত নরনারী-গণের চরিত্র চিত্রিত কবিত্তে যাইয়া কবি স্থানে স্থানে, আপনার স্বদেশীয় নরনারী গণেরই চরিত্র চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাব অগ্রাণ্ড নাটকের ত্রায় ইহাবও চরিত্রগুলি পূর্ণাবয়ব হয় নাই, এবং ইহারও ভাব, স্থলে স্থলে, কৃত্রিমতা-দোষে দূষিত। শর্মিষ্ঠা নাটক সমালোচনার সময় আমরা বলিয়াছি, যে সংস্কৃত বা যুরোপীয় নাটকসমূহের সহিত তুলনা করিলে মধুসূদনেব নাটকসমূহ অনেক নিম্নস্থানীয় হইবে। সংস্কৃত বা যুরোপীয় নাটকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, বাঙ্গালা নাটকের এখনও সে অবস্থা আসে নাই। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া কৃষ্ণকুমারীর সবক্ষে এই মাত্র বলাই সম্ভব যে, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল বিবাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।



স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।

মধুসূদনের কাব্যসমূহের স্থায়ী তাঁহার নাটকগুলি কখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এক্ষণে, দিন দিনই, বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটকসমূহের কার্য। তাহার অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মধুসূদন যে ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিলেন, বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা হইতে তাহা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে; লোকের কচির ও মানসিক প্রবণতারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। স্বতরাং তাহাদিগের লুপ্ত গৌরব আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জীব-জগতে যেমন এক শ্রেণীর কার্য শেষ হইলে আর এক শ্রেণীর জীব তাহাদিগের স্থান অধিকার করে, সাহিত্যে জগতেও তেমনই এক জাতীয় গ্রন্থের বিলোপ ঘটিলে, আর এক জাতীয় গ্রন্থ তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত জীবের বা বিলুপ্ত গ্রন্থের কার্যকারিতা ফলহীনা হয় না। মধুসূদনের নাটক-সমূহের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময়ে তাহার নবোদ্ভিন্ন বঙ্গ-সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছিল, তাহা উত্তরকালীন নাট্যকীর ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হইবে।

মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; আরও কয়েকখানি পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা একই সঙ্কে রচিত বলিয়া, পাঠক অনেকগুলি পত্রে তিনখানি গ্রন্থেরই সমকালীন উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। নিম্নোক্ত পত্রগুলি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। মধুসূদন কিরূপে কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন এবং নাটক-রচনা সঙ্ক্ষে সাধারণতঃ তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, এই সকল পত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনার পর, মধুসূদন স্ভট্টা-চরিত্ত অবলম্বনে যে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, চতুর্বিংশ সংখ্যক পত্রে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

চতুর্বিংশ পত্র।

My Dear Keshab Baboo,

Some weeks ago, I sent you the First Act of স্বভট্টা through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem".*

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell you that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank Verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

In reading over my poem, you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence.* * I submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine" containing 6 feet. The *longest* verse in our language is

* হুজুরা-চরিত এইরূপ সূত্রন হুজুরা লিখিতে সকল কবিতাছিলেন বলিয়াই, মধুসূদন পণ্ডিত চতুর্দশশতাব্দী কবিতাবলীতে লিখিয়াছিলেন।

"কেবেজিহু নব ভানে গাব বদান্যরে
তোমার ধরণ-পীত, হুজুরা হুজুরী।" ইত্যাদি

the 7 footed পদ্য—but that is, like the Greek and Roman Hexameter, *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our “heroic” measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write, my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank Verse, and its melody and power *astonish me*. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more “অল্পশ্রম” and “স্বয়ং” than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank Verse. Take my word for it, that Blank Verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, our classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly life. If we have no “genius” among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman’s play, called “Gordobuc” first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, “Fire away, my boys !” The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—our Pope, who has—

“Made Poetry a mere mechanical art,

And every warbler has his tune by heart !”

may frown or laugh at us, but I say—“Be hanged” to them !

How are you getting on with “Sharmistha”—my Garrick ? Have you seen “Padmavati” ? Will it do as Sharmistha’s successor ?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the “ভয়শিবমন্দির” ?*

With kind wish, I am, my dear Keshab Baboo,

Ever yours

Sincerely,

Michael M. S. Dutt.

পঞ্চবিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

Last Sunday, I submitted another “Synopsis” of a Drama on an entirely Hindu Subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful ? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last Saturday, the Muses smiled ! As a true realizer of the Dramatist’s conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am, Lord ! What a romantic Tragedy it will make ! I have made the List of Dramatis Personae as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy ! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4 !

I wish you would stir them up, লগে মাথব্য ! It is a downright shame that such a theatre, as that at Belgachia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men ! as the boatswain says in the “Tempest”.

“Heigh, my hearts ; cheerly, cheerly, my hearts ; yare yare. Take in, the top-sail ; tend to the Master’s whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough !”

* “বুড়ো শাস্ত্রিকের কাছে রেঁটা”—এখানে এই নামে অভিহিত হইয়াছিল ।

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half way. ধীমা তেভাণা is not the ভান for me.

If you have *not* seen the "Synopsis", run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend!
Deenoo Meah,

Yours very Sincerely,
Michael M. S. Dutt.

P. S. We must have a farce with the Tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

M. M. S. D.

ষড়্বিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me proud of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once ! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravana, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may

be called up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man ! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I sincerely hope he is, you shall have *Krishna Koomari* before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you. O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick !—But it will involve the necessity of two more females. The story of *Krishna*, though tragic, is barren of incident. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me,

Ever yours affl'y,
Michael M. S. Dutta.

সপ্তবিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well-supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This अगस्त्य of अगस्त्य had a favourite mistress. Tod gives her name as the 'Essence of Camphor', I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or मयी ।

A "Synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the अगस्त्यिनी । And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards", labour under, with reference to Females characters :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look

at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmistha, I often stepped out of the Dramatist, for that of the mere poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry, if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read it with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice:—"If there be", says he, "What I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, with-

out the ambition of elegance." And he commends Shakspeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the play, and I must at the same time beg of you to treat me with the utmost candour. No human being is infallible, and I am the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me,

Ever yours most sincerely,

Michael M. S. Dutt.

P. S. Blank Verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank Verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.

M. M. S. D.

অষ্টাবিংশ পত্র ।

My dear Gangooly.

Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That যদনিকা will play the Deuce with ধনদাস । I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the

world are combination of Tragedy and Comedy. I have not given any verse—of that, by and bye. Let me know by Monday, what you think of this act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste,

Ever yours sincerely,

Michael M. S. Dutt.

উত্তর পত্র ।

My dear Gangooly,

Here you are. This is Act no. 3. The fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one at him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the MSS at once to the Printers and then read over the proofs with you.

Yours as Ever,

Michael M. S. Dutt.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that every thing will end in smoke !

ত্রিংশ পত্র ।

My dear G,

Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgachia Amateur Company, I am doing what I can

to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove ! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting ! I shall soon finish the Last act ; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die !

Your, in haste,
Michael M. S. Dutt.

একত্রিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done. when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are as a matter of course, a first rate dramatic critic ; but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for “variety of action” there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is your province ; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success ; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakesperean Dramas were no better acted, at first I suspect, than

ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheemsing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yoga. The plot does not admit of such a character, even if I could invent it—which I gravely doubt ! I wish *Ballender* to be serious and light-like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirable, if you take him by the hand.

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheemsing, cannot but be sad and grave ; the princess, I hope, is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Cumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our ancient History of Fable ; the name of Rukmini will occur to you at once ; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors ; but we must make the most of what we have. That is a misfortune I can not remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy, you like the language. Ease can be only obtained by practice ; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal*. As the play is a tragedy I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play.—But whenever in the course of the dialogue a

pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—*never* strive to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence ; a little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better !

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible , such an aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare ; and even he would suffer considerable damage !

A WORD ABOUT THE SCENES :—

I am very fond of busy and varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for

it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place, if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country ! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders !

If not, we must strike our heads and say,—“alas ! born an age too soon” !

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-mussulman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl ! Hoping you are quite well personally and domestically,

1st September, 1860.

Yours most Sincerely,
Michael M. S. Dutt.

P. S. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

Michael M. S. Dutt,

P. S. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once ;—I am so impatient ! After this, we must look to “Rizia”—I hope, that will be a drama after your own heart ! The prejudice against Moslem names must be given up.—If you like. I can pick up other

subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

M M. S. D.

ষাতিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

You must not fancy that I have been idle. *Kissen Cumari* was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September,—rather quick work, old fellow ! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times ! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager ? What saith the man of Millions ? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing *Kissen Cumari* acted at *Belgachia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese ! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at *Belgachia*, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says

"nay" to any thing you wish to do—This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves ! Ha ! Ha !"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed ! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long.

What more ?—as we say in Sanscrit—কিমধিকং ?

With most sincere regards,

Yours affectionately,

Michael M. S. Dutt.

ত্রয়োজিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours ! Glod bless you, old boy !

Your ever affectionately,

Michael M. S. Dutt.

চতুস্ত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you had better once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Singh as "Joggut Singh", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ; Deeno সত্যদাস, Jodoo বাহুবল্লভ; Sreenath the other যন্ত্রী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready, you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethren of the Buskin,

Yours as ever,
Michael M. S. Dutt.
16th January, 1861.

পঞ্চস্ত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your Holidays.

And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. Tagore done; what does he intend doing? What says our "Manager"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity, I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love", how will you answer at the bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in the rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সরস্বতী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!

With kind regards,

Believe me, ever yours truly,

Michael M. S. Dutt.

Tuesday

— — —

এইসক্কে বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত কয়েকখানি পত্রও সন্নিবিষ্ট হইল। মধুসূদনের পত্রগুলি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের অলিখিত ইতিহাস; কবি ও নাট্যকার রূপে মধুসূদনের নাম সর্বত্র পরিচিত; পত্র রচনাতেও তিনি কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, এই সকল পত্র তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

ষট্টিজিংশ পত্র।

My dear Raj,

It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. 1. P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz., the fifth. Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is

so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name शिव written शीव or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.

The *Tilottama* is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub la! ho jaga*" I say "*Sub Blank verse ho jaga*". I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular; he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned

and said "N'importe". I did not care a cawry when it became popular provided I knew that some day or other, it would become popular.

I hope my dear Raj, you won't imitate me in the matter of correspondence, that is to say, never write to a fellow if you can help it. You are a hard-working systematic fellow, and I as lazy a dog as ever wore leather shoes. I shall look out for a long letter from you—biographical, historical and critical.

Gour is in Calcutta, pretending to be hard at his legal studies, but in reality idling, I am afraid. Pray let him know that I say so. He gives me the benefit of his company, almost every day, when returning home from the Society's Rooms. He is a good fellow and I wish him success.

I say, old fellow. I have often thought of asking you your opinion as to the advisability of introducing Blank verse in our dramas. Upon my soul, my heart aches to think that I am obliged to write in prose; and yet what can I do? I can't get any one to consent to act a piece in verse. Give me some of your solid arguments and convince me that prose is the thing for the drama, so that I may have rest.

How are you getting on with your grand theological work? I know a young friend of yours—some Gangooly, D—'s son-in-law, whom I often meet at the Supreme Court and we generally have a talk about you. He tells me that your work is all about the origin of the human race or some such tremendous subject. He is a fine young fellow [serious and, I believe and hope, not vicious.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the বৃত্তি instead of being confined to the 8th

Syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th Examples :—

“জয় জয় অমরারি বার ভূজবলে,
পরাজিত আদিত্যে দিতিস্তৃত রিপু,
বজ্রী।” —তিলো—৪।

“চল বঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।” —মেঘ—২।

“কেহ কহে দুঃস্বপ্ন কৃতান্তে গদা মাঝি
খেদাইলু।” —তিলো—৪।

“আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জর গামিনী।” —তিলো—২।

And so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.

I must now conclude. I hope you have not changed your mind as to your contemplated Durga-puja-visit.

Believe me,
Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

নিম্নলিখিত পত্রখানি কৃষ্ণকুমারী সমাপ্ত কবিতার পরে লিখিত। পাঠক ইহাতে মধুসূদনের প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা দেখিতে পাইবেন। মাতৃভাষার সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব ক্রমশঃ কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল, এই কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সপ্তত্রিংশ পত্র।

Sunday

My dear Rajnarain,

Several weeks ago I forwarded to your address, the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe. I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Baboo J. M.

Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic ; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view ? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following :—

কবি-শ্রাভুভাষা ।

নিজাগাবে ছিল মোব অমূল্য বতন
 অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা কবি,
 অথলোভে দেশে দেশে কবিছ ভ্রমণ,
 বন্দবে বন্দবে যথা বাণিজ্যেব তবী ।
 কাটাইছ কত কাল সুখ পবিহবি,
 এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
 অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
 তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন ।
 বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোবে নিশার স্বপনে
 কাহলা—“হে বৎস, দেখি তোমাব ভকতি,
 সুপ্রসন্ন তব প্রীতি দেবী সর্বস্বতী ।
 নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
 ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
 কেন নিবানন্দ তুমি আনন্দ সন্নে ?”

What say you to this my good friend ! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding *Tilottoma*. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.—either reads or can appreciate Milton, otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh ! What a luscious poetry. If God spares me, for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like his. Perhaps I shall write your "सिंहल-विजय" in that measure.

I have no news to give you. I read no newspaper and seldom stir out of home, but you may rest assured that I am looking out, with great impatience, for the Durga-Puja Holidays, because then I hope to see you in town. Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country !"

I must now conclude. Write to me boy, and believe me.

Ever your most affectionate,
Michael M. S. Dutt.

নিম্নস্মিবিষ্ট পত্রগুলি মেঘনাদবধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত। পাঠক এই সকল পত্রে মধুসূদনের বচনা পদ্ধতি এবং মনের ভাব সঙ্ক্ষে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় দেখিতে পাইবেন। রাজনারায়ণবাবু মেদিনীপুর হইতে আসিয়া মধুসূদনের সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়া যাইবাব পব, নিম্নস্মিবিষ্ট পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল।

অষ্টাঙ্গিংশ পত্র

My dear Rajnarain,

You will have by this time reached the old nest Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him However, you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton, many say it licks Kalidasa, I have no objection to that I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets, Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.

Write to me, and never for a moment cease to believe that I am in all sincerity,

Your most affectionate,
Michael M. S. Dutt.

উনচত্বারিংশ পত্র ।

My dear Rajnarain,

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man ? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author ?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিজ্ঞানসাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can “stand near this man” meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and “that his imagination goes as far as imagination can go”.

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage though with an unaltered love for you.

Yours Ever,
Michael M. S. Dutt.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name ! What a nice man ! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.

Thanks for that article in the Field.*

M. S. Dutt.

* বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field.

চত্বারিংশ পত্র ।

My Dear Rajnarain,

I suppose you base your jolly little theory about my anger on my somewhat long silence ; you are mistaken my friend ! The fact is I have been very busy ; besides, the heat of the weather is enough to cool down a man's ardour, epistolary, as well as poetical. An insatiable thirst for iced beer completely engrosses the whole system. The second and last part of Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the odes* are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit ever for doing so much in this really fearful weather. I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his School call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent". My printer Babu I. C. Bose (a very Intelligent man and once

* অঙ্গাদনা কাব্য ।

a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank verse. A great victory that, old boy.

I am going to print a plain edition of *Tilottama*. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.

I have already heard myself called both "Milton and Kalidasa" How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better ! for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between *Tilottama* and *Meghanad*. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after *Meghanad*. A fresh attempt would be something like a repetition But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again ? Alas ! for the Drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. When you read Kissen Kumari you will probably think that practice would make the author tolerable in that department also. But encouragement is the food that Practice grows upon. But where is that encouragement ? However, I hope you will like the play, imperfect though it be for want of poetical numbers I, a most hardhearted rascal, have cried over many scenes while correcting the proofs. It beats both *Sarmistha* and *Padmavati*. I must now conclude. You will be glad to hear that my law-suits are prospering. I am at present living at

Khiderpore, for the house in town is undergoing repair. However, continue to address me as usual and do not forget to send your letters bearing postage, as I intend doing. Then the rescally Post officers will not rob and cheat. With kindest regards,

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

P. S. They say poor Hurish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought.

একচত্বারিংশ পত্র ।

My dear Rajnarain,

It is now my turn to complain. Why haven't you replied to my last ? But perhaps it never reached you Curse that Post office ! How regular it is ! Let me however try again.

You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it. As for Brajangana, I really do not know what Boykanta Dutt is doing with her. But Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O ! that you were with me, my dear fellow ! Wouldn't we sit together and read ? Wouldn't we ? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious-

Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Laksbana. But I won't tantalise you. Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.

Have you heard that I have won my Kidderpore-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the judge has only decreed 1300 rupees. But then he has given me *wanlot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God. But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies, Good bye, my friend.

Believe me,

Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

দ্বিচত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

Many thanks for your kind letter that came to hand yesterday. Continue to send bearing postage. If the rascals should throw away our letters, we shall have the satisfaction, a poor one no doubt, of knowing that they have not been able to add insult to injury,—to take our money and not give us some equivalent.

You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III, which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think, England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. -We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII, and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English:—

"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"Why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shop-keeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid you

wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II, that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him,

"* * * * * বাঁচলে দাসীয়ে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank-Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."

I must now conclude. I have to write other letters. Besides a visitor has just come in. Good bye, old Raj, believe me.

Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

ত্রিচত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

I don't know how it is, but I fancy that you have been writing to me a long letter but that I have lost it through the carelessness of the Post-Office folks. If I am correct, then you must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

The "Odes" are out, and I have requested Babu Baikuntha Nath Dutta (a co-religionist of yours) who is

the proprietor of the copy-right, to send you a copy. You must also tell me what you think of them. We are now printing the last Book (IX) of *Meghanad*. So you may expect him by the beginning of the next month (English).

How are you, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one-half of a real Epic poem ! All in the course of one year , and that year only half old ! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog*. I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors ! "Great authors !! great *fiddle sticks* !! " But of that by and by. You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake. Pray, what are you doing ? Where is that grand Theological Book of yours that is to convert all manner of Sinners to *Brahmoism* ?

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what ,—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in *Meghanad* is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble , but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination , he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet ! But *De gustibus non est disputandum*.

I must now conclude. Pray, hereafter address your letter to the "care of James, Frederick Esqr., Kidderpore" or at the Police office. I have given up "No. 6 Lower Chit-

pur Road". Hoping you are quite well, old boy, with a affectionate regards,

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

P. S. Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship". Fie ! Why not a statue ? However, I shall subscribe. I loved and valued the man. *Vale* as the Latins used to say or *aurevoir* as the French say.

M. S. D.
Kidderpur.

চতুঃস্বাক্ষরিত পত্র ।

My dear Rajnarain,

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me , for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue. I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

Have you received a copy of the Odes (Brajangana) ?

Pray, why then are you silent ? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

Your verses are good ; if you go on practising, you will succeed. Don't forget that the 8th should be a long foot. We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *lancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her. Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তাবাকুস্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ ।

How if you throw out the তাবাকুস্তলা and substitute সূচাক-তারা you improve the music of the line, because the double syllable স্ত mars the strength of লা, Read—

আইলা সূচাক তাবা, শশী সহ হাসি
শর্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

“আইলা সূচাক তারা, শশীসহ হাসি
শর্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
স্বসনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুঁষি কি ধন পাইলা ।”

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

“And whisper whence they stole
Those balmy spoils”—

of Milton, and the lines

“Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour”—

of Shakespeare. Is not the “চুষন” a more romantic way of getting the thing than “stealing” ?

* * * * *

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful. It is getting late ; so I must conclude. In my next, I shall give you some idea of my prose doings. I am going on with the rapidity of a mountain torrent.

God bless you and yours, my dear Raj ! I have got a little son. Write soon and oblige

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

পঞ্চচত্বরিংশ পত্র ।

Kidderpore, 29th August, 1861.

My Dear Rajnarain,

Some days ago, I wrote rather a long letter to your friend, Kedar Nath Dutt,* containing a brief biographical notice of the author of Sarmistha. I should like to know if he has received it. The letter was written at his own request,

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject ? Jotindra proposes the battles of the *Kaurava* and *Pundub* princes ; another friend, the abduction of,

* বৈকুণ্ঠ-দেবের আলোচনার জন্য ইহার নাম অনেকেরই পরিচিত। নবদ্বীপস্থ বাগাশুকে কীৰ্ত্তিতব্যবোধের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ।

Usha (উষাহরণ). Now I am for your সিংহলবিজয়; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it, kindly enlighten me on the subject. I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying. What say you? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope.

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.* Adieu! Write soon to your

Affectionate,
Michael M. S. Dutt.

* রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে বাগবতারাম বাবুর মনের ভাব পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। দৈবকথ-বর্ষের পূর্ব পর্যন্ত উপলব্ধি করিয়া, পরিশুদ্ধ বয়সে, তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম পূর্ণ এবং ভূগার চক্রে বেষ্টিত নহা।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনায় আমরা, অনেক কাল, তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোনও প্রসঙ্গ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল

উদ্দীপিত হইতে পারে, তাহাতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য পারিবারিক কথা।

ঘটনাও ছিল না। পূর্বের জ্ঞায় তিনি পুলিশ আদালতে কাব্য কবিতেছিলেন, বাজকাধি, পুস্তক বিক্রয়ের আয়, এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জ্ঞায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইত। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পূর্বে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, এবং বাঙালা ভাষায় একজন অধিতীয় লেখক বলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল। স্ত্রতনাং, সাধাবণতঃ, যে সকল সামগ্রী লইয়া মনুষ্য পারিবারিক জীবনে সুখী হয়, তাহার কিছুই তাঁহার অভাব ছিল না, অথচ তিনি একদিনের জন্যও সুখী ছিলেন না। সুখ বাহিরের কোনও সামগ্রীর উপর নির্ভর করে না, সুখ মনুষ্যের নিজের মনে ও আত্মসংযমে। কিন্তু মনকে কেমন করিয়া সংযত ও সমাহিত রাগিতে হয়, মধুসূদন তাহা জানিতেন না, স্ত্রতনাং ধন, যশ, পরিবাববর্গের প্রেম, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। বাহিরে লোকে দেখিত, মধুসূদন বিলাসী, আমোদনিরত ~ উদ্বেগশূন্য, কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয় বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইত। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অহুরোধে তিনি এই সময়কার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* “আত্মবিলাপ” নামক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কবিতাটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ অহৃষ্টির ও অশান্তির মধ্যে মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইত। শাস্তিদাতার উপর নির্ভর না করিয়া তিনি যে সাংসারিক সামগ্রীতে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রেমের কুসুমহার, নিগড়রূপে তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ করিয়াছিল, মণি আহরণ করিতে বাইয়া বিষম বিবে তাঁহার শবীর জর্জরিত হইয়াছিল এবং কুসুম সংগ্রহ কবিতার সময়ে মাংস-কীট বিষদর্শন দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। নিজের আত্মবিলাপ।

জীবনের এই বিষাদময় অভিজ্ঞতা মধুসূদন তাঁহার আত্মবিলাপ কবিতায় অতি মর্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্দশশতাব্দী

কবিতাবলীর শ্রামাপক্ষী নামক একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছিলেন যে, বিহগের আৰ্ত্তনাদ, মনুষ্য, অনেক সময় সজ্জীত বলিয়া ভ্রম করে।* তাঁহাব এই আত্মবিলাপও অনেকে কেবল অমধুর কবিতা বলিয়া উপভোগ কবেন, কিন্তু যাহারা কবির জীবনের ঘটনাবলীর সঠিত পরিচিত, তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহা ঐতি-সুখকর কবিতা মাত্র নহে। ইহা যন্ত্রণা-নিপীড়িত কবির মর্যাস্তিক আৰ্ত্তনাদ। আত্মবিলাপ কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

আত্মবিলাপ।

(১)

“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলু, হায় ! তাই ভাবি মনে ।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়, ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না,—একি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে গোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উজ্জানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি কতদিন ববে ?
নীববিন্দু দুর্বাদলে নত্যা কিবে বলমলে,—
কে না জানে অমৃবিষ অমৃ-মুখে সন্তা:পাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন স্নেহে স্নেহী যে কি গুণ তার ? জাগে সে কাঁদিতে
কণপ্রভা প্রভা দানে বাডায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তুষা ক্লেশে,
এ-তিনের ছল সম ছল বে এ কু-আশার ।

(৪)

প্রেমের নিগড় গডি' পরিলি চরণে সাধে, কি ফল লভিলি ?
জলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল-ফাদে উড়িয়া পড়িলি ।
পতঙ্গ যে রকে ধায়, গাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে বে পরাণ কাঁদে ।

রোদন বিনাদ কিরে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি অজ্ঞানে বিচারি ।

চতুর্দশদশী কবিতাবলী—শ্রামাপক্ষী ।

(৫)

বাকী কি রাখিলি, তুই ! বৃথা অর্থ অধেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
 ক্ষত মাত্র হাত তোর যুগল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে !
 নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী,
 এ বিষম বিষজালা ভুলিবি, মন ! কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে !
 স্নগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, কাটিতে তাহাবে,—
 মাৎসর্য-নিষদশন, কামড়ে রে অমুক্ষণ !
 এই কি লভিলি ফল অনাহারে, অনিদ্রায় ?

মুক্তা-ফলেব লোভে ভুবে বে অতল জলে যতনে ধীবব,
 শত মুক্তাধিষ্ঠ আয়ু কালসিদ্ধ-জলতলে ফেলিস পামব !
 কিবি দিবে হাবাদন, কে তোরে, অবোধ মন ?
 হায় বে ভুলিবি কত আশাব কুহকছলে ।”

মনেব এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও মধুসূদন যে, ধীবভাবে গ্রন্থবচনায় সময়ক্ষেপ করিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু গ্রন্থবচনাই তাঁহার সাক্ষ্যনাং একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মর্যাস্তিক যাতনা বিন্মৃত হইবাব জগ্গট তিনি, অনেক সময়, বাগ্গেবীব চবণে শবণাপন্ন হইতেন। বে সময় অসহ যজ্ঞণায় তিনি এইরূপ আত্ননাদ কবিতেছিলেন, সেই সময়ই তাঁহার আর একখানি অত্ম্যক্লষ্ট গ্রন্থ বীরাঙ্গনা কাব্য বচিত হইতেছিল। তাঁহার পারিবাবিক জীবনের আলোচনা অপেক্ষা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেব আলোচনাই অধিকতর প্রীতিজনক। আমবা, সেইজগ্গ, তাঁহার পারিবাবিক কথা ছাড়িয়া, তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মেঘনাদবধে যেমন মধুসূদনের প্রীতিভার গভীর এবং ব্রজাঙ্গনায় যেমন তাহার কোমল অংশের পরিস্ফুটন হইয়াছে, বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনা কাব্যে গভীর ও কোমল ভাবের সন্মিলন। তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, “মেঘনাদবধের পর বীররস বিষয়ে অভিনব উজ্জম কেবল পুনরুক্তি মাত্র হইবে, গীতিকবিতারও দিকে আমার প্রবণতা আছে, আমি সেই দিকে

চেষ্টা করিব।” মধুসূদনের সেই প্রবণতার ফল তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য। অসামান্য প্রতিভাশ্রুতি বীররসপ্রধান কবিতার দ্বারা গীতিকবিতাতেও যদিও তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বভাবতঃ বীরস্বাস্থ্যবাহী হৃদয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুনর্বার বীররসের দিকে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়াছিল। ললিত পদাবলী সৃজন করিয়া তিনি বিরহ-বিধুরা স্ত্রীবাধিকার মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদবধের যে গম্ভীর ভেরি-নিনাদ একবার তাঁহার লেখনী হইতে উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনার মৃদুমধুর বংশীধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হয় নাই। গোপবালাগণের রোদন-নিনাদের মধ্যে, যমুনা-কলকল শব্দের অভ্যন্তরে, এবং বৃন্দাবনের তামলরাজিব মর্মব-ধ্বনিতে কখনও তাহা তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে বিরত ছিল না। তাঁহার প্রতিভা মেঘনাদবধেব গান্ধীর্ঘ্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে, সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাজনা কাব্য। বীরাজনায় সেইজন্ত একদিকে বনবাসিনী শ্বশি-বালিকা শকুন্তলার করুণ মর্মবেদনা এবং অপর দিকে বীর-প্রসূতি, তেজস্বিনী জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হইয়াছে। বীরাজনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগসূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলন-স্থল।

অপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীর পত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার বীরাজনা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বীর বীরাজনার আদর্শ। পত্রাবলীর দ্বারা বীরাজনা কাব্যও প্রসিদ্ধা পৌরাণিক বীরাজনার আদর্শ।

মহিলাগণের পত্রাঙ্কলে গঠিত এবং পতিপরায়ণা সাধবীর, কলঙ্কিনী প্রেমিকার, এবং অভিমানিনী সতীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে পূর্ণ। যে সমস্ত দোষগুণ ওভিদের পত্রাবলীর বিশেষ লক্ষণ, বীরাজনাতেও তাহা লক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থের প্রেমিক-হৃদয়ের রহস্য পরিজ্ঞানে অসামান্য নৈপুণ্য, উদ্ভাস কল্পনা এবং সেই সঙ্গে ধর্মনীতির ও সমাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বীর পত্রাবলীর সহিত বীরাজনার এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বীরাজনায় মৌলিকতার অভাব নাই। পত্রাকারে কাব্য-রচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাহাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাঁহার গ্রন্থের ভাবাপহরণ করেন নাই। ইংরাজী সাহিত্যে উপদ্রাস আছে বলিয়া যদি দুর্গেশ-নন্দিনী প্রণেতার গৌরবের হ্রাস না হয়, তবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে পত্রাবলীর দ্বারা কাব্য আছে বলিয়া বীরাজনা সন্দেহে মধুসূদনেরও গৌরবের হ্রাস হইবে না।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারা বীরাজনা নাম সন্দেহেও মধুসূদন ওভিদের অনুসরণ করিয়াছেন। বীরাজনা শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদিগের সমরাজন-

বিহারিণী রাণী দুর্গাবতীর অথবা কান্ধীর রাণী লক্ষ্মীবান্ধয়ের শ্রায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুসূদন বীরাঙ্গনা শব্দ এক্ষণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সাধ্বী পেনিলোপ (Penelope), কলঙ্কিনী ক্যানেস (Canace) এবং প্রোমোয়াদিনী দিদো (Dido) ইহাদিগের প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী “Heroic Epistles” এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শে কলঙ্কিনী তারা, পতিগতপ্রাণা দেবী রুক্মিণী এবং তেজস্বিনী জনা ইহাদিগের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম প্রদান করিয়াছেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত এবং পব বৎসরের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। যাহার নিকট যত্নশূন্য পঞ্চম মধুসূদন আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, “বঙ্গকুল-চূড়া” সেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানার্গরের “চিরস্মরণীয়”-নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্য—হৃদয়ের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, ষারকা-নাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্ণপথা, অজুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্ধোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়তথের প্রতি দুঃশলা, শাস্ত্রহর প্রতি জাহ্নবী, পুরুষবার প্রতি উর্বশী এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা এই একাদশ সর্গে বিভক্ত। শ্রেণী অনুসারে বিভাগ করিলে এই একাদশ খানি পত্রিকা নিম্নলিখিত কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম, প্রেম-পত্রিকা;—প্রেমাশ্বদেব অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া প্রেমিকাব পত্র। তারা, শূর্ণপথা, উর্বশী এবং রুক্মিণীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান-পত্রিকা;—ইন্দ্রিয়-সদ্বন্ধ-মূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ত পত্র। জাহ্নবী দেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, স্মরণার্থ-পত্রিকা;—স্বামীব অদর্শনে ব্যাকুলা অথবা স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় উৎকণ্ঠিত। প্রোষিতভর্জকার পত্র। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী এবং দুঃশলা এই চারিজননের পত্র এই শ্রেণীস্থ। ৪র্থ, অনুযোগ-পত্রিকা;—স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপিড়িতা, মুখরা বামার পত্র;—কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহার পরিষ্কৃতি করিয়া যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাভাব্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়। মধুসূদন এই সকল সমজাতীয়া রমণীগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতির স্বাভাব্য কিরূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিলেই আমরা তাঁহার গুণপনা বুঝিতে পারিব।

বীরাঙ্গনা-কাব্যের তারা, শূর্ণপথা, উর্বশী এবং রুক্মিণীদেবী, চারিজনই প্রেমিকা। হুতরাং ইহাদিগের প্রত্যেকেরই পত্রে প্রেমিক হৃদয়ের আকাজক:

ও উজ্জ্বল বর্তমান আছে। কিন্তু ইহার সকলেই প্রেমিকা হইলেও ইহাদিগের প্রেম-পত্রিকা।

অবস্থা পরস্পর বিভিন্ন। প্রথমা জীবিতভর্তৃকা, দ্বিতীয়া বিধবা, তৃতীয়া বারাজনা এবং চতুর্থী কুমারী। নারী জীবনের সামান্যতঃ যে চারি প্রকার অবস্থা হওয়া সম্ভব, এই চারিজনই তাহা সূচিত হইয়াছে। প্রেম একদিকে যেমন পাত্রাপাত্র বিচার করে না, অপর দিকে তেমনই প্রেমিক, প্রেমিকার অবস্থাব উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য তারা গুরুপত্নী হইয়া শিশু, শূর্ণগণা, রাজসহোদরা হইয়া জটাজুটধারী সন্ন্যাসীতে এবং রুক্মিণী দেবী, লক্ষ্মীশীলা কুলবালা হইয়া অপরিচিত জনে আত্মসমর্পণের জন্ত ব্যাকুলা; এবং রূপ-ব্যবসায়িনী হইয়াও উর্বশী, সেইজন্য অত্নের রূপে বিমুখা। তারার ও শূর্ণগণার প্রেম রূপজ মোহ হইতে উৎপন্ন; উর্বশীর প্রেমে রূপজ মোহের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা এবং নারী স্বভাবোচিত বাবদ্বান্ধবরাগ সাম্মিলিত; কেবল রুক্মিণীদেবীর প্রেমে রূপজ বা ইন্দ্রিয়জ বিকার নাই। যিনি পতিব্রতা ধর্ম সীতার ও শাবিত্রীর তুল্যা এবং আমাদের পুরাণকাবগণ যাহাকে লক্ষ্মী-স্বরূপিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রেম ইন্দ্রিয়পিপাসামুগ্ধ এইরূপ প্রদর্শন করিয়া মধুসূদন নিজের স্মৃতিচরিত্র পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রত্যেকেরই অবস্থোচিত ভাব স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। উর্বশী বারাজনা; তাহাব লক্ষ্মী-ভয় নাই, সমাজ-নিন্দার জন্ত চিন্তা নাই, ক্ষম্যের ভাব যে সংযত রাখা কর্তব্য, সে চিন্তা একবারও তাহার মনে উদিত হয় না, উর্বশী মুক্তকণ্ঠেই আপনার ক্ষম্যের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত। সেইজন্য আমবা তাহার পক্ষে দেখিতে পাই

“* * * কহিলু যে কথা।

মুক্ত কণ্ঠে কালি আমি দেব সভাতলে

কহিব সে কথা আজ, কি কাজ সবমে?”

কিন্তু তারা ঋষিপত্নী এবং ঋষি-দুহিতা;—উন্মাদগামিনী হইলেও, আজন্ম-সিদ্ধ সংস্কার পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আত্মকৃত কাথের জন্ত অমৃতপ্তা। প্রমাথী ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে তারার শাধ্য ছিল না, কিন্তু অমৃততাপের দংশনে তাহার ক্ষয় অধীর হইত। তারা যজ্ঞশায় আপনাকে ও বিধাতাকে থিকার দিয়া বলিত;—

“* * * * হা থিক! ক পাপে

হায় রে কি পাপে, বিধি, এ তাপ সিগিলি

এ ভালে; জনম মম মহাঋষি-কুলে

তব চণ্ডালিনী আমি।”

শূর্ণপথা বালবিধবা ;—ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রিয় রাক্ষসরাজ বাবণের সহোদরা,—এবং
বাল্য হইতেই রাজপ্রাসাদের ভোগে ও বিলাসে অভ্যস্তা । শূর্ণপথার হৃদয়ে
অহুতাপ নাই, শ্রানি নাই । শূর্ণপথার বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত পাত্র পাইলে
রাক্ষসরাজ তাহার বিবাহ দানে অসম্মত নহেন, শূর্ণপথা সেইজন্য হৃদয়ে আশ্রিতা ।
আশার বস্তুরে যে নৈরাশ্র ঘটিতে পারে, ত্রিভুবন-বিজয়ী বাক্ষসরাজের পরিবাব-
বর্গের মধ্যে কাহারও সে অভিজ্ঞতা থাকি সম্ভব নয় । সৌভাগ্যে অভ্যস্তা শূর্ণপথা
প্রত্যাখ্যান কাহাকে বলে জীবনে জানিত না, সেইজন্য প্রিয়তমকে পত্র
লিখিবার সময় শূর্ণপথার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ । ভাবী সুখের প্রত্যাশায়
আনন্দাশ্র তাহাব নয়ন হইতে উৎসৃত হইতেছিল । শূর্ণপথা লিখিয়াছিল ;—

“কম অশ্রুচিহ্ন পত্রে, আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা ।”

উর্বশী রূপব্যবসায়িনী, নিজেব রূপ ও যৌবনই তাহার সর্বস্ব ; উর্বশী,
প্রিয়তমকে রূপ যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া লিখিয়াছিল ,

“কঠোর তপস্যা নব কবি যদি লভে
স্বর্ণভোগ সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুজিতে
যে স্থিবে যৌবন-সুখ—অর্পিত তা পদে ।”

শূর্ণপথা কাঞ্চন-সৌধ-কিবীটিনী লঙ্কাপূর্বাব অধীশ্বরের সহোদরা । তাহাব
ধন, জনেব অভাব কি ? শূর্ণপথা লিখিয়াছিল ,

“রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল ভগতে
* * * * *
যুঝিবে তোমার হেতু আমি আদেশিলে ।
“চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাধি আনি তারে
দিব তব পদে শুর ! * * *
* * * * * যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র, অলকার ভাণ্ডার খুলিব ।”

কুটিরবাসিনী, বহুলবসনা তারার এ সকল কিছুই ছিল না । তাহা
প্রিয়তমের জন্ত, কৃত্রিম চয়ন করিয়া গুরুর প্রসাদ অন্নের সঙ্গে স্মৃষ্টি ত্রব্য
বাখিয়া, আপনার ভালবাসা ব্যক্ত করিত । তারা লিখিয়াছিল ;

“* * * ভোজনান্তে আচমন হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে

বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
 চুরি কবি আমি আমি পড়ে কিহে মনে ?
 হবিতকী স্থলে, সখে পাইতে কি কড়
 তাম্বুল গয়নদামে ? কুশাসন তলে
 হে বিধু, স্মৃতিকুল কত কি দেখিতে ?”

বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলি বিবেচনায় কবিলে প্রত্যেক স্থলেই কবিব এইরূপ
 নৈপুণ্য লক্ষিত হইবে। তাহা, শূর্ণপথা প্রভৃতির পত্রে যেমন রূপজ মোহেব
 প্রগাঢ়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রেমের লালসাহীন, উচ্চ আদর্শও তেমনই
 কল্পিণীদেবীর পত্রে প্রকটিত হইয়াছে। কল্পিণীদেবীর পত্রে ইন্দ্রিয়-বিকাবেব
 চিহ্ন নাই, রূপ, ঘোবনের প্রসঙ্গ নাই, যে হৃদয়, প্রিয়তমকে না দেখিয়া, কেবল
 তাঁহাব গুণকাহিনী শুনিয়াই, আত্মসমর্পণ কবিতো পাবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়-বিকাব
 থাকিতে পাবে না। হৃদয়ে যে অল্পরাগ উদ্ভিত হইলে ভক্ত, আবাধ্য দেবতাকে,
 প্রভু, পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি নিম্নতর ভাব ভুলিয়া প্রাণেশ্বরভাবে ভালবাসিবাব
 ক্ষম ব্যাকুল হন, কল্পিণীদেবীর প্রেমের মূলে সেই অল্পরাগ বর্তমান। কি জল্প
 লজ্জাশীলা কুলবালা হইয়াও কল্পিণীদেবী আপনাব প্রিয়তমকে পত্র লিখিতে
 সাহসী হইয়াছিলেন, কবি তাহাব অতি সুন্দর কারণ প্রদর্শন কবিয়াছেন।
 মল্ল্যাসিনী যেমন, নিজের বন প্রদেশে ইষ্টদেবের মূর্তি স্থাপন কবিয়া গোপনে পূজা
 করেন, কল্পিণীদেবীও তেমনই নিজের হৃদয়মন্দিরে ইষ্টদেবরূপী প্রিয়তমের
 স্মৃতি স্থাপন কবিয়া ভক্তিভাবে পূজা কবিতেন। কেহ জানিত না, কেহ
 দেখিত না, তাঁহাব হৃদয় তাহাতেই গবিতৃপ্ত ছিল, কিন্তু কল্পিণীদেবীর নির্জন
 পূজাতে ব্যাঘাত ঘটয়াছিল। কালরূপী শিশুপাল তাঁহাকে গ্রাস কবিতো
 আসিতেছিল, তাই তিনি সেই বিপদভঙ্কনকে লিখিয়াছিলেন,—

“তাব, হে তাবক তাবে এ বিপত্তি কালে”

কল্পিণী-পত্রিকায় ভাগবত-বর্ণিত যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, কবি
 তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণন কবিয়াছেন যে, পাঠ কবিলে মনে হয়, যেন
 কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তেবই রচনা পাঠ করিতেছি। ঐষ্ট্যবর্ষ গ্রহণ কবিলেও
 হিন্দুভাব মধুসূদনের হৃদয়ে কিরূপ বাজত কবিত, এই সকল স্থল হইতে আমরা
 তাহা অনুমান করিতে পাবি।

বীরাঙ্গনা কাব্যের তারা ও শূর্ণপথা প্রভৃতির প্রেম-
 প্রত্যাখ্যান পত্রিকা।

পত্রিকা যেমনই আবেগময়ী, জাহ্নবীদেবীর প্রত্যাখ্যান-
 পত্রও তেমনই কঠোর। জাহ্নবীদেবী যেখানে রাজা শাস্ত্রকে বলিয়াছিলেন,

“—পূবকথা ভুলি,
করি ধোত ভক্তিবলে কামগত মন
প্রথম সাষ্টাঙ্গে রাজ্য। শৈলেন্দ্র-নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।”

তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, প্রেম-ভিক্ষা বর্ণনার দ্বায় প্রেম-প্রত্যাখ্যান-বর্ণনেও কবি সমান পাবদশী। চবিত্ত-চিত্ত্রণ সম্বন্ধে বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রেম-পত্রিকাগুলিই কবির মৌলিকতাব ও নৈপুণ্যের অবিক পবিচয় দান করে। কিন্তু অপরগুলিতেও নৈপুণ্যের অভাব নাই। দ্রোপদী, শকুন্তলা, ভানুমতী এবং

দুঃশলা, চাবিত্ত্রেনই প্রোথিতভক্তকা। প্রথমা ও দ্বিতীয়া
প্রোথিতভক্তকার
পত্রিকা। স্বামীব বিশ্ববণে উৎকণ্ঠিতা, তৃতীয়া ও চতুর্থী স্বামীব

অমঙ্গলভয়ে ভীতা। প্রত্যেকেরই পত্রে কবি প্রত্যেবেব অবশ্যোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মধুসূদনেব দ্রোপদীর আদর্শ, কাশীরাম দাস হইতে গৃহীত। কাশীরাম দাস দ্রোপদীকে পঞ্চপতি সম্বন্ধে, কর্ণেব প্রতি অনুবাগিনী কবিতা তাহাব চবিত্ত্রের হীনতা সাধন করিয়াছেন। বীরাঙ্গনাও দ্রোপদী কাশীরাম দাসেব আদর্শে কল্পিত বলিয়া আমরা তাঁহার পক্ষে একটু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চাক্ষুণ্যেব চিহ্ন দেখিতে পাই এবং যে দুজয় ক্রোধান্নি কুণ্ডল ভঙ্গ না কবিতা পাবত্ব হয় নাই, ইহাতে তাহাব স্ফুল্জ না দেখিয়া স্বভাবতঃ নিরাশ হই। মধুসূদন “ভীমসেনের প্রতি দ্রোপদী” নামক অপব একখানি পত্র আবিস্ক করিয়াছিলেন। তাহাব প্রথম দুইটি পংক্তি এইরূপ, -

মুক্তকেশী আজ দাসী রূপদনন্দিনী, -
বুকোদর।

ইহা হইতে আমাদের বোধ হয় যে, দ্রোপদী-চরিত্রের তেজোময় অংশ এই পত্রিকায় প্রদর্শন করিবার জন্য কবির ইচ্ছা ছিল বলিয়াই, সম্ভবতঃ তিনি অজুর্নেব প্রতি দ্রোপদীর পত্রিকায় তাহার সমাবেশ করেন নাই। দ্রোপদীর কুমারী অবস্থা এবং অল্পবয়স প্রভৃতি তাঁহার পক্ষে অতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অজুর্নের প্রতি যে অতিরিক্ত পক্ষপাতিতার জন্য দ্রোপদীকে মহাপ্রস্থানকালে পতিত হইতে হইয়াছিল, দ্রোপদী পত্রিকায় কবি তাহাব উল্লেখ করিয়াছেন। অজুর্ন, জিতেন্দ্রিয় হইলেও, বহুবিবাহিত ছিলেন। দ্রোপদীকে বিবাহ করিবার পরেও তিনি চিত্রাঙ্গদা, উলুপী এবং সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বহুভাষ্য স্বামীর ভাষান্তর-গ্রহণসুহা নিবারণ করা দ্রোপদীর সাধ্যাত্ত না হইলেও তাঁহার দ্বায় তেজস্বিনী মহিলার পক্ষে, মুক্তের দ্বাব

নীরবে, স্বামীর ব্যবহার সহ্য করাও সম্ভবপর ছিল না। বোধ হয়, কঠোর ব্যঞ্জে তিনি স্বামীর বিবাহ কণ্ঠ্যনের প্রতিশোধ তুলিতেন। সেইজন্য আমরা জ্যোপদী-পত্রিকায় দেখিতে পাই,

“অপ্সরা-বল্লভ তুমি, নরনারী দাসী ;—

তা ব’লে করে। না স্রণা, এ মিনতি পদে ।

স্বর্ণ অলঙ্কার ঘার। পরে শিরোদেশে,

কণ্ঠে, হস্তে, পবে না কি রজত চরণে ?”

অন্ত এক স্থলে—

“রসিক নাগব তুমি, নিত্য রসবতী

স্বরবালা ;—শতফুল প্রফুল্ল যে বনে,

কি স্থখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?”

জ্যোপদীর ছায় শকুন্তলাও প্রাণিতভর্তৃকা এবং বহুপত্নীক স্বামীর পত্নী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষিবালিকা,--ব্যঙ্গবাণে কাহারও মর্মভেদ করা তপোবন-পালিতার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কুটীববাসিনী বালিকাকে পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর যে চরণে স্থান দান করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট, বালিকা তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী হইবার আশা করিবে কেন? গাঁহাব পিতার উপদেশ,

—“কুরু প্রিয় সখীবৃন্তিং সপত্নীজনে,

ভর্তৃকিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মান্য প্রতীপং সমঃ ।”

স্বামী বহুপত্নীক হইলে তাঁহাকে যে ব্যঞ্জে লাঞ্চিত কবিত্তে হয়, তাঁহার পক্ষে সেরূপ ভাব ব্যক্ত কবিবাব সম্ভাবনা নাই। “ঘন-নিবাসিনী” “বঙ্কল-বসনা” বালিকা রাজাধিরাজের সহধর্মিণী হইয়াছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার মনে দুই একটি উচ্চাভিলাষ উদ্ভিত হওয়া অসম্ভব নয়। য়ায়াবিনী স্বপ্নদেবী তাঁহাকে নিজাধোগে তাঁহার প্রিয়তমের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু বালিকার তাহাতে লালসা ছিল না। ফল-মূল আহায়ে তৃপ্তা এবং কুশাসন-শয়নে অভ্যস্তা বালিকা রাজভোগ লইয়া কি করিবে? সপত্নীগণের প্রতি স্বামীর অহুসার? তাহাতেও বালিকার উদ্বেগ ছিল না। স্বামীর পদপ্রান্তে কিঙ্করী ছায় অবস্থান করিবে, ইহাই বালিকার একমাত্র আশা। শকুন্তলা তাই লিখিয়াছিলেন;—

“আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধার

রোহিণী, কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্যতলে ;

কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে।”

শকুন্তলার পত্র করুণ বিলাপে পূর্ণ। কাননের কুসুম কাননে প্রক্ষুটিত

হইয়াছিল, রাজা হুম্মত কি পদদলিত করিবার জন্তই তাঁহাকে বৃত্তচ্যুত করিলেন ? শকুন্তলা, নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া, বৃক্ষের পত্রসমূহকে বলিতেন ,

“—শোন্ পত্র, সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোবে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কিরে ত্যজিল। নপতি ?”

প্রোষিতভর্তৃকা দ্রৌপদী ও শকুন্তলা যেমন স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিত। ৭
অভিমানিনী, দুর্ধোধনপত্নী ভানুমতী এবং ভয়দ্রুথপত্নী দুঃশলাও তেমনই
স্বামীর অমঙ্গল-ভয়ে ভীত। ভানুমতীর পত্র কুরুক্ষেত্র সময় আরম্ভ হইবার
সঙ্গে এবং দুঃশলার পত্র অভিমত্যাগেব অব্যবহিত কাল পবে লিখিত। উভয়েই
বীরপত্নী এবং উভয়েই সময়গ্নির উত্তাপে অভ্যস্তা, কিন্তু স্বামীর অমঙ্গলভীতি
উভয়কেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জগ্ৰ, স্বামীকে পরামর্শদানে বাধ্য
করিয়াছিল। ভানুমতীর পত্রে কবি কোরবরাজাস্তঃপুরের অতি স্নান্ধষ্ট চিত্র
প্রদান করিয়াছেন। দুঃশলার পত্র মধুসূদনের বীরবল-বর্ণনশক্তিই উৎকৃষ্ট
প্রমাণস্থল। পুত্রশোককাতন অর্জুনের জয়দ্রুথবধের প্রতিজ্ঞা যে স্থলে বর্ণিত
হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর বোমাঞ্চিত হয়। কবির বর্ণনাগুণে পাঠক
সেই অতীত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষেন ত্রায় অবলোকন করেন। ভানুমতী
কোরবকুলেব বধু ; স্বামীর কল্যাণেব ত্রায় কোরবকুলের কল্যাণও তাঁহার চিন্তাব
বিষয়, তিনি দুর্ধোধনকে লিখিয়াছিলেন .

এস তুমি, প্রাণনাথ ! রণ পবিহরি ;
পঞ্চথানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী
কি অভাব তব কহ ! তোষ পঞ্চজনে
তোষ অঙ্ক বাপ, মায় ; তোষ অভাগীয়ে ;
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

কিন্তু দুঃশলা কোরবকুলের দুঃখিতা, স্বামীর কল্যাণের জন্তই তিনি অধিক
উৎকণ্ঠিতা, শিশুকুলের জন্ত তাঁহার স্বেকপ চিন্তা নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন ;

“—অবিলম্বে যাব
এ পাণনগর ত্যজি সিদ্ধ-রাজ্যলয়ে

ঘটক বা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডুলে ।”

ভাষ্কর্য্যমতী দুর্ধোধনের পত্নী ; সাধবীর পক্ষে স্বামীর নিন্দা থাকা সম্ভব নহে । ভাষ্কর্য্যমতী সমস্ত দোষ শকুনির এবং কণ্ঠের স্বক্বে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃশলা দুর্ধোধনের ভগ্নী, তিনি দুর্ব্বল ভ্রাতার ব্যবহারের উল্লেখে নিরস্ত হন নাই । অবস্থা বিবেচনায়, উভয়ের মনেব ভাব যেরূপ হওয়া সম্ভবযোগ্য, উভয়ের পক্ষে তাহা স্বন্দররূপ ব্যক্ত হইয়াছে ।

বীরাজনার অমুযোগ-পত্রিকাগুলি অনেকেব মতে কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । নীলমঞ্জের প্রতি জনার এবং দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর পত্রিকা এই শ্রেণীর অমুযোগ-পত্রিকা ।

অন্তর্গত । হৃদয়ভেদী আত্মনাদ, মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং কঠোর তিরস্কার সম্মিলিত হওয়াতে এই দুইখানি পত্রিকা অতি উপাদেয় হইয়াছে । জনা-চরিত্র মূল মহাভারতে নাই, কালীরাম দাস হইতে মধুসূদন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্কনায় মধুসূদন পূর্বে পুত্রশোকাতুরা মাতার যে রেখাচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন, বীরাজনার জন্য তাহারই সম্পূর্ণতা হইয়াছে । কৈকেয়ী এবং জনা উভয়েই স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা, কিন্তু উভয়েব অবস্থায় বিশেষ পার্থক্য আছে । সপত্নীর ও সপত্নীপুত্রের সোভাগ্যই, কৈকেয়ীর যন্ত্রণার কারণ ; কিন্তু জনার দুঃখ ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ মর্ম্মভেদী । সেইজন্য তাঁহার পত্র গৈরিক ধাতু-নিশ্রাবের ন্যায় জলন্ত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ । একদিকে কাপুরুষ স্বামীকে তিরস্কার, অন্যদিকে আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং সেইসঙ্গে বীরপুত্রের জন্ত হৃদয়ভেদী বিলাপ সম্মিলিত হওয়াতে জনা-পত্রিকা এরূপ হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে যে, তাহা আত্মোপাস্ত উদ্ধত কবিতা ইচ্ছা হয় । বীব-জননী জনার পত্র প্রকৃতই বীরাজনা নামের উপযুক্ত হইয়াছে । মধুসূদন ওভিদকে আদর্শ করিয়া বীরাজনা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার কাব্য সৌন্দর্য্যে আদর্শের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, বলিলে, কিছুমাত্র অত্যাক্তি হইবে না ।

ওভিদকে আদর্শ করিয়া মধুসূদন একটি নিন্দনীয় গ্রামে পতিত হইয়াছেন ।

ওভিদের অনেকগুলি পত্র অতি কলুষিত প্রেমের চিত্র বীরাজনার দোষ ।

অবলম্বনে কল্পিত । ওভিদ একদিকে যেমন সাধবীকুল-গৌরব পেনিলোপের (Penelope) এবং পতিপ্রাণা লাডামিয়ার (Laodamia) পবিজ প্রেম বর্ণন করিয়াছেন, অন্যদিকে আবাব তেমনই সহোদরের প্রতি অহুরাগিনী পাণিষ্ঠা ক্যানেসের (Canace) এবং সপত্নী-পুত্রের প্রেমে মুগ্ধা ফিড্রার (Phaedra) সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তি বর্ণনে আপনার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন । এই অপবিজ আদর্শ হইতেই মধুসূদন উর্ব্বশী, শূর্ণপথা

এবং তারা এই তিনজনের প্রেম-পত্রিকা রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র ধরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই উপযুক্ত উপাদান দিয়া, নৈপুণ্যের সহিত তাহা চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি যে কদম্ব রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহার নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারি না। উবশীর ও শূৰ্পণখার প্রেম-পত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন থাকিতে পারে, কিন্তু তারা-পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন নাই। “গুর্ভঙ্গনাগমন” আমাদিগের শাস্ত্রে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সেই মহাপাতক-মূলক ঘটনাকে তিনি কেমন করিয়া রুক্ষিণীর ও শকুন্তলার জীবনের ঘটনার সঙ্গে গ্রথিত করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ তারা-চরিত্র তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মূলপুরাণ-বিরোধী। বীরাঙ্গনা কাব্যের তারার সেই প্রেম-ভিক্ষার সঙ্গে পাঠক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের তারার রোষপ্রদীপ্ত ভৎসনা বাক্যগুলির তুলনা করিলে মধুসূদন তারা-চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। পৌৰাণিক তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অসদৃশ ব্যবহারে উচ্চত চন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন :

“তাজমাং তাজমাং চন্দ্র, সুরেশু কুলপাংশক।

গুরুপত্নীং, ব্রাহ্মণীঞ্চ, পতিব্রত-পরায়ণাং ॥

গুরুপত্নী সঙ্গমেনে ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ ॥

পুত্রস্বং, তব মাতাহং, ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর ॥

ধিক্ ত্বাং শ্রদ্ধা স্তরগুরুভক্ষীভূতং করিষ্যতি ॥

গুরুপত্নী, বিপ্রপত্নী, যদি সা চ পতিব্রতা ॥

ব্রহ্মহত্যা সহস্রঞ্চ তস্তাঃ সঙ্গমেনে লভেৎ ॥

পুত্রাধিকশ্চ শিষ্যশ্চ প্রিয়ো মৎস্বামিনো ভবান্ ॥

স্বধর্ম্মং রক্ষ পাশিষ্ঠ মামেব মাতরং তাজ ॥

দাস্তামি জীবদং ভূভ্যং যদি মাং সংগ্রহিষ্যসি ॥

এইরূপ তিরস্কারের পরও চন্দ্রকে নিরস্ত না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিয়াছিলেন ;—

শশাপ তারা কোপেন নিকামা সা পতিব্রতা ;

রাহগ্রস্তো, ঘনগ্রস্তঃ পাণ্ডুস্তো ভবান্ ভব ॥

কলঙ্কী বস্মণাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥*

* ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণসংখণ্ডে। ১০-১১ অধ্যায় :

উভয়ের কি স্বর্গ, মর্ত্য প্রভেদ ! পৌরাণিক ঘটনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজনীতির প্রতি সম্মান থাকিলে মধুসূদন, বোধ হয়, তারা-চরিত্র একরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না।

ওভিদের পত্রাবলীর জ্ঞায় বীরাঙ্গনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাঠকবর্গেব কোতৃহল নিবারণার্থ বীরাঙ্গনার অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম দ্বতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, দ্বিতীয় অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, তৃতীয় যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, চতুর্থ নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী এবং পঞ্চম নলের প্রতি দময়ন্তী।

দ্বতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী।

“জন্মান্ত নৃমণি, তুমি এ বারতা পেয়ে
দূত মুখে, অঙ্কা হ’লো গান্ধারী কিস্করী
আজি হ’তে। পতি তুমি ; কি সাথে ভুজিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর ! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাতবার বেড়ি
আন্ধব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব নৃষ্টি ধারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি ;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে ?
দেবাদেশে নয়বর বরেছি তোমারে !

* * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবহু
তব বিভায়াশি দাসী এ ভবমণ্ডলে ;
তুমিও বিদায় কর হে রোহিণীপতি,
চাক চন্দ্র : তারাবুন্দ তোমরা গো গবে।
আর না হেরিবে কভু সখীমলে মিলি
প্রদোবে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন

অম্বর-সাগরে, কিন্তু স্থির কান্তি ; যবে
 বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
 বাসুকীর কণারূপ পথ্যকে স্তম্ভরী—
 বস্তুঙ্করা, যান নিজা নিঃশ্বাসি সৌরভে ।
 হে নদ তরঙ্গময়, পবনের বিপু
 (যবে ঝরাকারে তিনি আক্রমেণ তোমা)
 হে নদী, পবনপ্রিয়া, স্তম্ভঙ্কর সহ
 তোমার বদন আসি চুষেন পবন,
 হে উৎস গিরি-ভহিতা জননী মা তুমি ,
 নদ, নদী, আশীর্বাদ কব এ দাসীরে ।
 গাঙ্কার-রাজনন্দিনী অঙ্কা হলো আজি ।
 আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
 তোমাদের প্রিয়মুখ । হে কুসুম কুল,
 ছিহ্ন তোমাদের সখি, ছিহ্ন লো ভগিনী,
 আজি স্নেহহীন হ'য়ে ছাড়িহ্ন সবারে ,
 স্নেহহীন একি কথা ? ভুলিতে কি পারি
 তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
 এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে ।”

অনিরুদ্ধের প্রাতি উষা ।

“বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
 উষা, কৃতাকলি পুটে নমে তব পদে,
 যত্নবর ! পত্রবহ চিত্রলেখা সখি—
 দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে ।
 প্রাণের রহস্য কথা প্রাণের ঈশ্বরে ।

অকুল পাথারে নাথ চিরদিন ভাসি
 পাইয়াছি কুল এবে ! এত দিনে বিধি
 দিয়াছেন দিন আজি দীন অধিনীরে !
 কি কহিহ্ন ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
 হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

হেরিয়া আকাশ দেশে দেব নিশানাথে
 চিরবাহা ; চাতকিনী কুতূকিনী যথা
 মেঘেব স্তম্ভাম মূর্তি হেরি শূন্যপথে ।
 তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে প্লুকে,
 আনন্দ-জনিত জল বহিছে নয়নে ।
 দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী সমূহে
 গাইছে মধুর গীত, মিলি তাবা সবে
 বাজায় বিবিধ যন্ত্র । উষার হৃদয়ে
 আশালতা আঙ্গি উষা রোপিব কোতুকে
 শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব কাহিনী ।”

যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা ।

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্মিষ্ঠা সূন্দরী
 বলিতে মোহাগে যাবে, নরকুল রাজা
 তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ’ল,
 ভবস্থখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি ।
 দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
 কুবঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
 না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে ।
 হে রাজন্ ! শিশুজয় লয়ে নিজ সাথে
 চলিল শর্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
 আশ্রয় পাইবে তাবা ? মনে রেখ তুমি ।
 নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
 আঁচল, বুকিয়া তবু দেখে প্রাণপতি,
 কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইছ
 দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি ?
 কি হেতু বা থেকে গেছ তোমার সদনে,
 দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে ।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্যে ।

আব কতদিন, সৌরী, জলদিব গৃহে
 কাঁদবে অধীনী বমা, কহ তা রমাঝে ।
 না পশে এ দেশে নাথ, ববিকব বাশি,
 না শোভেন স্তবানিধি স্মরণে বিতর্ক ,
 স্থিৎপ্রভা ভাবে নিত্য কণপ্রভা কুণী ।
 বিভা, জগ্নি বত্নজালে উজ্জলে পুরী ।
 তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দ্রিরা দুঃখিনী ।
 বাম দামোদব , তুমি লষেছ হে কাড়ি
 নয়নেব মণি তাব পাদপদ্ম তব ।
 ববি এ দাসীক কব ও কব-কমলে
 কহিলে দাসীয়ে যবে হে মধুভাষী,
 “যাও পিয়ে, বৈনতেয় কৃতান্তলি পুটে —
 দেখ দাঁড়াইয়া ওই , বসি পৃষ্ঠাসনে
 যাও সিন্ধুতীবে আশ্রি” হায় । না জানিহু
 হইত বৈকুণ্ঠচ্যুত তবীলাব বোঝে ।

নলের প্রতি দময়ন্তী ।

পঞ্চদেবে বন্ধি সাধে স্ববন্দর স্থলে
 পুজিল বাজীক পদ তব যে কিকরী,
 নবেন্দ্র, বিজন-বনে অর্ধ বস্ত্রাবৃত
 তাজিলে তুমি হে যাবে, না জানি কি দোষে,
 নমে সেই বৈদর্ভী আশ্রি তোমাব চরণে ।

বীৰাজনাব বর্ণনীয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে , ইহাব ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি
 কথা বলিয়া আমরা বীৰাজনা-সমালোচনা শেষ কবিব । ভাষার লালিত্যে
 বীৰাজনা মধুসূদনের অমিত্রচন্দ্রের বচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । শব্দের
 জটিলতা, তরুহাৰ্ঘতা, ক্লিষ্টতা এবং বতিভঙ্গ প্রভৃতি যে
 বীৰাজনার ভাষা ।

সমস্ত দোষ তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের সৌন্দর্য-হানি
 করিয়াছে, বীৰাজনা কাব্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না । যাহাদিগের বিশ্বাস
 অমিত্রচন্দ্র গভীর রচনার এবং বীররসের পক্ষে উপযোগী হইলেও, মধুর

কোমল ভাবের উপযুক্ত নয়, বীরাজনার ভাষা তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূর করিবে। বীরাজনার ভাষা মধুর অথচ ওজস্বী, প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর, এবং কবির কল্পনা-ভরজের সঙ্গে যেন উত্থান ও পতনশীল। ইংরাজী ভাষায় যিনি অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার উৎকর্ষসাধন তাঁহার দ্বারা হয় নাই; তাহার পরবর্তী কবিগণেরই দ্বারা হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন এবং তাহার উৎকর্ষ-সাধন, এই উভয় গৌরবই মধুসূদনের প্রাপ্য। বীরাজনা রচনার পর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিভাবান লেখকগণ অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাষা বীরাজনার ভাষা অপেক্ষা উন্নত হয় নাই। ইচ্ছা বহুদিন পর্যন্ত চতুর্দশাক্ষরী অমিত্রচ্ছন্দের ভাষাব আদর্শ স্বরূপ থাকিবে।

বীরাজনা কাব্য মধুসূদনের প্রতিভা-বিকাশের উন্নতন সীমাস্বরূপ; ইহার পর হইতে তাঁহার প্রতিভার অধোগতি আবদ্ধ হইয়াছে। পাঠক মধুসূদনের পত্রে দেখিয়াছেন যে, মহাবাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেব অনুরোধে, মহাভাবতীয় কোন ঘটনা এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে, সিংহল-বিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, তিনি দুইখানি কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দুইখানিরই প্রথম অংশ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কোনখানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। মেঘনাদবধে যেমন তিনি ইলিয়ডের অন্তঃসরণ কবিয়াছিলেন, সিংহল-বিজয়-কাব্যে তেমনই ইলিয়ডের অন্তঃসরণ করিবার তাহাব ইচ্ছা ছিল।* সিংহল-বিষয় অবলম্বনে লিখিত কবিতাটির প্রারম্ভ-অংশ নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল;—

* মধুসূদন কিরূপভাবে সিংহল বিজয় রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নোক্ত ইংরাজী মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

Book I—Invocation, description of the voyage. They near Ceylone, when মুরজা excites পবন to raise a storm which disperses the fleet. The ship, with বিজয় and his immediate followers, is wrecked on an unknown island. The hero lands and after worshipping the দেবত of the place, and eating the প্রসাদ wanders out alone to explore the island. লক্ষী prays বিষ্ণু to defeat the ill designs of মুরজা. He consoles her and by a favourable gale directs the other ships to the same port. The chiefs alarmed by the absence of the prince send messengers all around to seek him. On the return of the messengers without the prince, they set sail and retire to a neighbouring island and encamp there.

Book II—The adventures of বিজয়। মুরজা on finding বিজয় separated from his companions, sends a বক্ষ to lead him to the city of the king of the island [Andaman]. He marries বিম্বোহনী the king's daughter and has a castle in a distant wood assigned for his residence. In the society of his wife he forgets the purpose of his voyage, as well as his companions.

সিংহল-বিজয় ।

স্বর্ণ-সৌধে সুখাধরা বসেন্দ্র-মোহিনী—
 মূরজা, তুনি সে ধনি অলকা নগরে,
 বিন্ময়ে সাগর নিরপিনেখ দেখিলা,
 ভাসিছে স্তম্ভর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
 পতাকা, মঙ্গল-বাণ বাজিছে চৌদিকে ।
 রুষি সতী শশীমুখী সখীরে কহিলা, —
 “হেদে দেখ শশীমুখী আঁখি ছুটি খুলি,
 চলিছে সিংহলে এই রাজ্যলাভ লোভে
 বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে ।
 কি লক্ষ্য, থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
 বাজ্য ওরে আমি সহি । উজ্জান স্বরূপ
 সাজাহু সিংহলে কি লো দিতে পবজনে ?
 জলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশীমুখি,
 কমলার অহঙ্কার, দেখিব কেমনে
 স্বদাসে আমার দেশ দানন ইন্দ্রিরা !
 জলধি জনক তাঁর, তেই শাস্ত তিনি
 উপরোধে । যা লো সহি, ডাক সারথিরে
 আনিতে পুষ্পক হেথা ; বিরাজেন যথা
 বায়ুরাজ, যাব আজি প্রভঞ্নে লয়ে,
 বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে ।
 স্বণতেজঃপুঞ্জরথ আইল হুয়ারে
 ঘর্ঘরি, হ্রৈবিল অশ্ব পদ-আক্ষালনে,
 স্ত্রি বিস্মুলিঙ্গ বৃন্দ । চড়িলা স্তম্ভনে
 আনন্দে স্তম্ভরী, সাজি বিমোহন সাজে ।

মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কবিতাটি এই ;—

দেখ, দেব ! দেখ চেয়ে, কাতরে কহিলা
 কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে ; “আসিছেন ধীরে

Book III—লক্ষ্মী sends বিজয় a vision. He prepares to leave his home, in search of the companions of his voyage, as also, of the Island-Kingdom, promised to him and his descendants.

নিশীথিনী, নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,
না শোভে ললাটদেশে চাক নিশামণি।
শিবির বাহিরে মোরে লহ ক্রপা করি
মহারথ, রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূ-নত শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশু-শিরে অবিরল বহি
জননীৰ অশ্রুজল, কাল গ্রাসে যবে
সে শিশু।” লইয়া সবে ধরাধরি কবি
শিবির বাহিরে শূরে—ভয় উরু রণে।

মহাযত্নে ক্রপাচার্য্য পড়িলা ভূতলে
উত্তরী; বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি।
“কার হেতু এ সূশ্য্য ক্রপাচার্য্য রথী?
পড়িল ভূতলে প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি,
সেই বালাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অস্ত্রমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় স্থপ্ত আজি কুরুবীৰ্য্য ক্রপী—
গাজেয়? কোথায় গুরু, দ্রোণাচার্য্য রথী?
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ, আর রাজা যত
কক্ক-ক্ষেত্র পুষ্প দেব? কি মাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্ঘ্যোধন আজি?
যথা বনমাঝে বহি জলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মন তা সবে
সর্বভুক—বাজমলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিহু আমি, দেব! নিঃক্ষেত্র করিহু
কক্কপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্মদোষে।
কি কাজ আমার আর যথা সূত্ৰভোগে
নির্বাণ পাবক আমি, তেজ-শূন্য বলি,
ভস্মমাত্র, এ যতন যথা কেন তবে?”

সরায়ে উত্তরী, শূর বসিলা ভূতলে;
নিকটে বসিলা ক্রপ, কৃতবর্মা রথী;—
বিষাদে নীরব দোহে। আসি নিশীথিনী

মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
 উচ্চবাসু-রূপ-খাসে সঘনে নিশ্বাসি,
 বুষ্টিছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে ।
 কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ষা পানে
 রাজেন্দ্র ;—এ হেন ক্ষেত্রে ক্ষত্রচূড়ামণি,
 ক্ষত্রকুলোদ্ভব কহ, কে আছে ভারতে
 যে না ইচ্ছে মরিবাবে ? যেখানে যে কালে
 আক্রমণ স্বমরাজ, সম পীড়ানায়ী
 দণ্ড তাঁর ;—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
 সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূর্তি ।
 কিন্তু হেন স্থলে তারে আশঙ্কা না কবি
 আমি ; এই লাঘ ছিল চিবকাল মনে ।
 যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
 উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
 ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিহু স্ববলে
 ভূভারতে ;—ভূশতিত এবে কালে আমি ।
 দেখ চেয়ে, চারিদিকে ভগ্ন শত ভাগে
 সে স্ত-অট্টালিকা চূর্ণ এ ঘোর পতনে ।
 গড়ায় এ ক্ষেত্রে পড়ি গৃহ-চূড় কত !
 আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
 কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ,
 রকত বরণে দেখ, সহস্র আকাশে
 উদ্ভিচ্ছেন এ কোরব-বংশ-আদি ঘিনি
 নিশানাথ ! হৃষ্যধনে ভূ-ণব্যায় হেরি
 কুবরন হইলা কি শোকে স্থানিনিধি ?
 পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি,
 উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—“হে কোরবপতি,
 নহে চন্দ্র বাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
 কিন্তু বৈজয়ন্তী তব, সর্বভূক রূপে ;
 দ্বিপুংকুল-চিতা দেব, অলিয়া উঠিল,
 কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে

অগ্নিতাপে ছটকটি ভীম দুইমতি ;
 পুড়িছে অর্জুন, হায়, তার শরানলে
 পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব !
 অস্ত্রমে পিতায় অরে যুধিষ্ঠির এবে,
 নকুল ব্যাকুল চিত, সহদেব সহ ।
 আর আর বীর বত, এ কাল সমরে
 পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাব-দঙ্ক বনে
 আশে পাশে তরু যথা,—দেখ মহামতি ।”

অনিপুণ ভাষকের খোদিত মূর্তির ভগ্নাংশ হইতেও যেমন শিল্পীর নৈপুণ্য অনুমান করা যাইতে পারে, এই সকল অসম্পূর্ণ কবিতাতেও আমরা তেমনই মেঘনাদবধ-রচয়িতার হস্তচিহ্ন দর্শন করিতে পাবি। মধুসূদনের অনেকগুলি অসম্পূর্ণ কাব্যে ও কবিতার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যেক্ষণ মানসিক অশান্তিতে মধুসূদনের অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আরক্কা কাব্য অসম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই না। তিনি যে এতগুলি গ্রন্থ দীর্ঘভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, বরং ইহাই আশ্চর্য। তাঁহার আত্মবিলাপ কবিতা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; তাঁহার স্ববর্ণার্থ লিপিরও দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইতেছে। সেই দুইটি মন্তব্য হইতে পাঠক অনুমান কবিতা পারিবেন যে, যিনি মেঘনাদবধ বচনা করিয়া শত শত নব-নারীবৃন্দ হৃদয় পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের দিন কিরূপ অতৃপ্তিতে অতিবাহিত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত স্ববর্ণার্থ-লিপিতে বীরাজনা কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,

It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাজনা কাব্য) in XXI Books But I must print the XI already finished, the proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. “Born an age too soon”—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, booksellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to “Shell out.”

বীরাজনা কাব্যের জনা-পত্রিকা শেষ করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;

The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now.

‘God knows in what all this trouble, anxiety, and vexation will end.

যে সকল কারণে মধুসূদনের জীবনে শাস্তি ছিল না, অর্থাভাবই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। পুলিশ-আদালতের কার্খ, শৈল্পিক সম্পত্তি এবং পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহার ক্লেশ ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ত্রায় তাহাতে সচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইতে পারিত। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি, কিছুদিনের জ্ঞাত, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কিছু সাংসারিক কথা।

কিছু অর্থাগম হইত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ব্যয়-সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতি ঘেঁরুপ ছিল, তাহাতে অতুল ঐশ্ব্যের অধিপতি হইলেও, তাহাব অর্থাভাব ক্লেশ দূর হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার মনে হইত, অর্থক্লেশ দূর করিতে পারিলেই, তিনি সুখী হইতে এবং অবাধে সাহিত্যের সেবা করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড গমনের জন্ত বাল্য হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল। ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সংকল্প করিলেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যপুত্রগণের সঙ্গে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি এক্ষণে তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে তাঁহার পিতার প্রতিপালিত জনৈক ব্রাহ্মণকে সেই সম্পত্তি পত্তনি দিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সংকল্প করিলেন। এইরূপ স্থির হইল যে, মহাদেব মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের ব্যয়-নির্বাহার্থ ক্রিয়ৎপরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন, এবং তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির ব্যয়-নির্বাহার্থ, মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপ কার্খ করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর বাল্য হইতে মধুসূদনকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, স্মরণ্য তাঁহার ত্রায় সম্ভ্রান্ত ও হিতৈষী ব্যক্তি মহাদেবের প্রতিভূ হওয়াতে মধুসূদন ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অথবা তাঁহার পত্নীকে অর্থাভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে মধুসূদনকে পরে ক্লেশ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। বৈষয়িক এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২২ জুন মধুসূদন ক্যাণ্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা

করিলেন। বঙ্গ-সাহিত্য সেইদিন হইতে একটি প্রতিভাবান্ সন্তানের পূজ্য বঞ্চিত হইলেন। মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত তিনখানি

পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। প্রথম দুইখানি বীরাজনা রচিত হইবার সমকালে এবং তৃতীয়খানি তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে লিখিত। যে কবিতায় মধুসূদন তাঁহার “শ্রামা-জয়দার” নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষ পত্রখানিতে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

ষট্চক্রাংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear and valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud.* But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of my wife's ill health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan. Thank God, her health appears to be quite re-established now, and I am at your service, my boy.

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic.† In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called ‘বীরাজনা’ i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chunder Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmantra (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarakanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumati to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Nila-

* মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে।

† মিহেল-বিজয় কাব্য।

dhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururavas ; a goodly list, my friend. Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better. You will have a copy soon.

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized, some don't like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language".

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and I must bid adieu to the Muse ! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection ! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine-character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Madhu the 'कवि', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed.

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist. And now God bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England

next month. If I live to come back, we shall meet ; If not,
what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.

And be hanged for it. I have no time to rhyme and
just space enough to subscribe myself

Ever yours affectionately,
Micheal M. S. Dutt.

সপ্তচত্বরিংশ পত্র ।

My Dear Raj,

The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality, as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read !

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know I shall finish it. Perhaps it will take me months, perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow ! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.

I don't think I shall be able to go to Enland quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogues or fools under the sun ! Though well nigh ruined, they are yet backward to listen to terms.

I must conclude here. Interrupted. Write at your earliest convenience and believe me

Ever yours affectionately,

Michael M. S. Dutt.

অষ্টচত্বারিংশ পত্র।

Wednesday, 4th June, 1862.

My Dear Rajnarain,

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia". You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B. A.* has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain ! Heaven alone knows if we are to see each other again ! But you must not forget your friend. It's a long separation ;—four years ! But what is to be done ? Remember your friend and take care of his fame.

* কবিবর হেৰচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

“My native Land Good-Night !”

Byron.

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেবে মনে, এ মিনতি করি পদে ।
 সাধিতে মনেব সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
 মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে ।
 প্রবাসে দৈবের বশে, জীব তাবা যদি খসে
 এ দেহ আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে ।
 জন্মিণে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
 চিবস্থি কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
 কিন্তু যদি বাথ মনে, নাহি, মা, ভরি শমনে ;
 মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-ভ্রদে ।
 সেই ধন্য নরকূলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
 মনেব মন্দিবে সদা সেবে লব্ধজন,—
 কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাঁচিব যে তব কাছে,
 হেন অমবতা আমি, কহ গো শ্রামা জন্মদে ।
 তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
 অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্ববরদে !
 ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
 মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে ।

Here you are, old Raj—All that I can say is—

“মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে ।”

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life,

I remain,

Ever your affectionate friend,

Michael M. S. Dutt.

যুরোপ প্রবাস - চতুর্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬২—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

১৫

অষ্টাদশবর্ষ বয়স হইতে মধুসূদন হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতে-
ছিলেন, এতদিন পরে তাহা পূর্ণ হইল। শস্ত্র-শ্রামলা জন্মভূমি, বর্ষাগমপ্রফুল্লা
ভাগীরথী, এবং প্রথম জীবনে ক্রীড়া-নিকেতন
ইংলণ্ড-গমন।

“প্রাসাদনগরী” কলিকাতাব নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,
মধুসূদন অর্ণবপোতে আবোহণ করিলেন। সেক্সপীয়ার, মিল্টনের জন্মভূমি,
এবং ভার্জিল, দান্তের লীলাক্ষেত্র যুরোপভূমি দর্শনের জন্ম, তিনি চলিয়াছেন,
তাঁহার হৃদয়ের ভাব বর্ণন কবা নিশ্চয়োজন। দেখিতে দেখিতে সেন্টপল ধর্ম
মন্দিরের উচ্চ শৃঙ্গ নিমগ্ন হইয়া গেল, গঙ্গাকূলবতী নারিকেল বৃক্ষরাজি অদৃশ্য
হইয়া আসিল, এবং গঙ্গাব বর্ষাজল সংস্পর্শে ঐশদাবল্লভ বারিষ পবিবর্তে স্নানীল
সাগরাস্থ ক্রমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মধুসূদন মহাসমুদ্রে উপস্থিত
হইলেন। মহাসমুদ্র তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। মাস্ত্রাজে অবস্থান-
কালে তাহার গভীর গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং বিশাল মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি
পুলকিত হইয়াছিলেন। আবার যে কখনও তিনি তাহার গাভীষ উপলব্ধি
করিয়া ক্লতার্থ হইতে পাবিবেন, তাঁহার সে আশা ছিল না। কিন্তু বিধাতার
বিধানে তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল। মহাসমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার
অর্ণবপোত দিন দিন ইংলণ্ডের নিকবতী হইতে লাগিল। কলিকাতা
পরিত্যাগের প্রায় একমাস কাল পরে তিনি জিব্রাল্টরে উপনীত হইলেন।
জিব্রাল্টর হইতে তিনি তাঁহার সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বাবু গোঁর দাস বশাককে
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

উনপঞ্চাশৎ পত্র

S. S. Ceylon, off Malta
11th. July 1862 : Friday.

My Dear Gour,

I sit down to scribble a few lines to you, my good old
friend, from on board the good steamship 'Ceylon'—quite
a fairy-castle afloat, my boy. You have no idea of the

magnificence that characterizes almost everything on board. The saloon is worthy of a palace ; the cabins fit for Princes. But of all that by and bye—when I am in England and able to afford time for an elaborate description of the voyage. I am at this moment floating down the famous Mediterranean sea with the rocky coast of north Africa in view ! Yesterday we were at Malta, last Sunday at Alexandria. In a few days more, I hope, we shall be in England. Just 32 days ago, I was in Calcutta ! Is not this travelling with wonderful rapidity ? But the journey has its dark side also. Patience, my friend, and you will hear everything. I intend drawing up a long account of the trip for the Indian Field and asking the Editor to send you a copy of his paper, in case you are no subscriber to it. What are you doing with yourself, old fellow ? I wish I had half a dozen of our countrymen on board. We would form a party by ourselves. Do you know where our Harry is ? If so, kindly remember me to him. Don't reply to this till you hear from me from England. As soon as I get there, I shall give you my address ; then you can fire away to your heart's content, though, I fear, I shouldn't have much time to devote to my friends, for I am bent upon learning my profession and winning honours.

Off the Coast of Spain.

Sunday

I have suffered this letter to lie idle these two days ; but I must finish it to-day. We expect to be at Gibraltar to-morrow morning and I must despatch it from that station. You cannot imagine how calm the sea is to-day ; it is, for all the world, like our own Hooghly. The weather is somewhat like the middle of November with us, neither very cool nor very hot. I thought we should find it much colder. But people say, it will be different when we get into the Atlantic and the famous Bay of Biscay ! As for news, I have scarcely any to give you now, though I hope to satisfy you when I get to London. I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land

of which I have thought so much even from my boyhood.
But truth is stranger than fiction !—Let me now hasten to
conclude, but not before I have assured you, how sincerely,
I am, my dear Gour, ever yours affectionately

Michael M. S. Dutt.

১৮৬২ খৃষ্টাব্দেব জুলাই মাসের শেষভাগে মধুসূদন ইংলণ্ডে উপস্থিত
ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও হইলেন, এবং ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষার জন্ত, গ্রেস্ ইন
গ্রেস ইন ব্যারিষ্টার (Gray's Inn) নামক ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ করিলেন।
সমাজে প্রবেশ। তাঁহার ব্যারিষ্টারী শিক্ষা-কালের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান
অনাবশ্যক। তিনি যে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার
উপযুক্ত ছিল না। প্রকৃত অনুরাগ না থাকিলে, কেবল মাত্র সাংসারিক
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত, যদি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ
পরিণাম হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের পরিণামও সেইরূপ
হইয়াছিল। কি পরীক্ষাসম্বন্ধে, কি কর্মক্ষেত্রে, কোথাও, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র
সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের
পর, কোনও রূপে, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন
করিয়াছিলেন ; কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও সম্মান তাঁহার ভাগ্যে কখনও
ঘটে নাই। তাঁহার এই ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও চরিতাখ্যায়ক
যথার্থ ই লিখিয়াছেন ;

“চন্দ্রগ্রহের ত্রায় ব্যবহার-শাস্ত্রেরও একদিকে আলোক এবং অপরদিকে
অন্ধকার সঞ্চিত থাকে। দূর হইতে ব্যবহার-শাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে
মোহিত হইয়া দূরাশামন্ত কবিগণ উহার দিকে ধাবমান হন এবং অবশেষে,
নিকটবর্তী হইয়া, সকলেই উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন করিয়া থাকেন।”*

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক কবির ত্রায় আশামন্ত মধুসূদনও, ব্যবহার-শাস্ত্রের
আলোক দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, উহার দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও
ভাগ্যে শেষে চিরান্ধকার ঘটিয়াছিল। মধুসূদন, যদি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত
না হইয়া, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার
স্বদেশীয়গণই যে কেবল উপকৃত হইতেন তাহা নহে ; তিনি নিজেও, বোধ হয়,
সুখী হইতে হইতে পান্নিতেন। কিন্তু বিধাতার বুদ্ধি তাহা ইচ্ছা ছিল না ;
মধুসূদনের দ্বারা যতটুকু কার্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছিল ; তিনি তাঁহাকে
অন্তপথ অবলম্বনে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

* মেঘনাদবধ-কাব্যে প্রকাশিত বাবু গঙ্গরামদাস দ্বারা প্রণীত মধুসূদনের জীবনচরিত।

মধুসূদন প্রধানতঃ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষার জুগুই ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। যুরোপীয় ভাষা সমূহে অধিকারলাভও তাঁহার যুরোপ গমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ক্রুরূপ স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, এবং স্বদেশে অবস্থানকালেও তিনি কতকগুলি বিভিন্ন ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইংলণ্ডে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরান্তিলম্বিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার যুরোপ-প্রবাস কালে লিখিত যে সকল পত্র আমরা বর্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব, পাঠক তাহা হইতে মধুসূদনের নিজের কথায় তাঁহার ভাষাশিক্ষার ও যুরোপ-প্রবাস কালের বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

মধুসূদনের প্রস্থাবলী সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের ত্রায়, তাঁহার নিজের জীবনও এক বিমাদান্ত কাব্য। কি জন্মভূমি বঙ্গদেশে, কি মাদ্রাজে, কি যুরোপে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাঁহার ভাগ্যে কোনও স্থানেই ঘটে নাই। তাঁহার যুরোপ-প্রবাস কালে আমরা তাঁহার বিবাদময় জীবন-কাব্যের এক নতুন অধ্যায় দেখিতে পাই। যেরূপ দুর্দশায় তাঁহার প্রবাসকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে অতি অল্পলোকেই তাহা অবগত আছেন। “দয়ার সাগর” বিভ্রাসাগর মহাশয় তাহাকে সাহায্য না করিলে মধুসূদন, কখনই, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না। হয়ত, অর্থাভাবে, বিদেশের কোন কারাগারে বা দরিদ্রনিবাসে তাঁহার জীবন শেষ হইত। নিজের অবস্থা না বুঝিয়া সহসা একটি অর্থসাহায্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মধুসূদনের সেরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা নয়। মনুষ্যপ্রকৃতি না বুঝিয়া তিনি যে অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাকে সেরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কি অবস্থায় তিনি যুরোপযাত্রা করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যাহাদিগের উপর তিনি নিজের বৈষয়িক কার্যের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহারা আপন আপন কর্তব্য পালনে পরাভুত হইলেন। নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ-সাহায্যে বঞ্চিত হওয়াতে মধুসূদনের পত্নীর বিপদের সীমা রহিল না। স্বামীর অসাক্ষাতে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি স্বামীর নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মধুসূদনের স্বদেশ ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে, আপনার শিশু দুইটিকে সঙ্গে লইয়া, যুরোপে

স্বামীব নিকট উপস্থিত হইলেন। অবশ্যই এইরূপ বায়বুদ্ধিতে মনুষ্যদন বিষয় বিপদে পড়িলেন। সপরিবারে যুরোপে বাস একেই ত সহজ নয়, তাহাও উপর মনুষ্যদন আবার পরিস্থিতবানী ছিলেন না। স্ততঃ তাঁহার সঙ্কিত অর্থ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া আসিল, এবং প্রয়োজনীয় বায় নিবাহার অনাবস্থা, লক্ষ, গৃহসামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই ক্রমে গবর্ণমেণ্ট বন্ধক আফিসে আবদ্ধ হইল। অমিত্রচ্ছন্দ প্রবতনের জগা বাব বানীপ্রসন্ন সিংহ মনুষ্যদনকে যে সন্দেহ বোধ পান পাত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহাও পরিত্যক্ত বন্ধক দিতে বাধ্য হইলেন। তাহা বিক্রয় সুবিধা হইবে বলিয়া ১০০ তাহাও পত্রীক আদায়ের জগা, মনুষ্যদন ফাল্গুন অশুভগত ভবমেলস নগরে আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাও বিক্রয় যাহতে পারেন না। ভবমেলসে অবস্থানকালে তাহার তদশা চব্বিশমাস উপনীত হইয়াছিল। সেখানে কোন কোন দিন সত্যই তাহাকে অনশনে দিনপাত করিতে হইত। পনের জগা পাছে তাহাকে কাবাগারে যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় মনুষ্যদন সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিলেন। একটি দাবাতলী করাসী মজিনা, তাহার দলবস্ত্র অবগত হইয়া, এই সময়, তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশ, দরিদ্র ব্যক্তিগণ, মাদ্যভক্ষণ ভগে, পাছে সাহায্য গ্রহণ না করেন, এইজগা কোন কোন করাসী দাতব্য-সমিতি, অতি সঙ্কোপনে, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। মনুষ্যদনের তদশার বিষয় জ্ঞাত হইয়া এইরূপ একটি দাতব্য সমিতি, তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার গৃহের দ্বারে আহার্য সামগ্রী ও শিশুদিগের জগা দুগ্ধ রাখিয়া যাহতেন, তাহাও কোনরূপে দিনপাত হইত। কিন্তু একদা অবস্থায় কতদিন চনিতে পাবে? যাহাদিগের কথাও ও প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যুরোপ গমন করিয়াছিলেন, এ সময় সাহায্য প্রেরণ দূরে থাকুক, বাবস্ত্র পত্র লিখিলেও তাহাও প্রত্যাহার দিতেন না। মনুষ্যদন, উপাষান্তর না দেখিয়া, সেই অশ্ববর্ণের শবণ, “দযাব সাগব” বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের শবণাপন্ন হইলেন। মনুষ্যদনের যুরোপ গমন সময়ে বিজ্ঞাসাগর মহাশয় ক্রিপা উৎসাহ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, মনুষ্যদনের পত্রে পাঠক তাহা অবগত আছেন। আপনার তববস্ত্র জ্ঞাপন করিয়া মনুষ্যদন এক্ষণে বিজ্ঞাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন। যে অদ্য, কোনদিন, অন্যথের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবে না, মনুষ্যদনের তথ্য যে তাহা উদাসীন থাকিবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। মনুষ্যদনের পত্র পাইবামাত্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয় তাহার আভাবিক মহত্বের ও সন্মুখতা উপযুক্ত

কাৰ্য্য করিলেন। তাঁহার নিজের নিকট সে সময় মধুসূদনের প্রয়োজনান্তরূপ অর্থ ছিল না ; তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনরশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি মধুসূদনকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণেব ক্রিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপবিশোধিত ছিল। আমরা মধুসূদনের এই সমর্থকার নিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি ; পাঠক তাহা হইতে মধুসূদনের দুরবস্থা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানসাগর মহাশয় তাঁহাকে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, অবগত হইতে পারিবেন।

পঞ্চাশৎ পত্র।

France, Versailles, 12 Rue des Chantiers,
2nd June, 1864.

My Dear Sir,

If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart, and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men one of whom, at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher.**

When I left Calcutta, my wife and two children remained behind, and it was arranged between my *Patneedar* and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated, I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England, on the second of May 1863. From that day to the present, we have not received a pice

from India, although there has been money due, some for the year 1862 and some since December last, from the Talooks, and the only letter which was written to me came just ten months ago. We have since written no less than 8 letters, but not a line have we received in reply.

I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, though I have fairly 4,000 Rs. due to me in India. The benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 250 Rs. to Monu*, who, poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

I have got landed property which gives me at present 1,500 Rs. a year. All law-suits have been extinguished and my rights are undisputed. The Land-Mortgage-Society in Calcutta lends money at 10 per cent. You will thus be able to raise 15,000 (fifteen thousand) rupees for me. Babu Degumber Mitter and Buddy Nath Mitter are my legally constituted agents and they will no doubt sign all the deeds necessary for the completion of the loan and furnish you with all the necessary papers.

There is due to me Rs. 4,000 in Calcutta. As soon as you get this letter, I hope you will send me a part of this money to save me from starvation. Out of the 15,000 you will be pleased to pay the following debts.

Mothoor Mohun Kundu	1,700
Saugore Dutt (about)	800
Yourself	1,000
Modhu Sudan Mozumder	500
			<hr/> 4,000

* ব্যাটলার বাবু মনোমোহন ঘোষ। মধুসূদন তাঁহাকে সঙ্গেহে মনু বলিয়া ডাকিতেন।

As all these gentlemen are more or less my friends, they will probably wait for the interest till my return, but should any of them insist upon being paid, pray exercise your own judgment. You will then have to send me about 11,000 Rs. making 3,000 Rs. payable at sight and the balance at six months after sight, for then I shall get more for exchange. If you do this before October next, I shall go back to Gray's Inn and return to India in time. If not, I must perish, and I do not think you will suffer me to do so.

With the money already due to me, you will, after paying my debts, have to send me about 15,000 Rs. unless a part has already been sent.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think so; for I know you well enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God and you under God, help me to do so.

I am, my dear Sir,
Ever yours faithfully
Michael M. S. Dutt.

P. S. I am, and have been, too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself to write from dictation. I wish to God, you were near enough to see us. It would break your tender heart.

M. M. D.

একপঞ্চাশৎ পত্র

Versailles—France, 12 Rue des chantiers.
9th June, 1864

My Dear Sir,

I hope you will have, by this time received my letter of the 2nd instant, forwarded Via Bombay, and commenced operation on my poor behalf.

sure you are, old Ray! — all that I can say
is — "স্বপ্নের দিনে মন ওর ঠিক: লোকের মন।"
Praying God to bless you & yours & wishing
you all success in life, —

Remain
Ever your affectionate friend
Michael W. D. D.

অমর, মনের হৃৎকলিণির প্রতিরূপ।

You will be pleased to hear that I have been saved the disgrace of a French jail by a young, beautiful, and gracious French lady whose acquaintance I made in a Railway carriage and who has ever since taken great interest in us, consoled us in our misfortunes, and assisted us with her purse. She went with me to our Land-lord and spoke to the man, as only a French woman can speak, and got him to consent to take the security of a friend of mine in London and to let us remain here till the end of the current month. Most of our Trades-people have stopped, and I am obliged to raise money, by appealing to the charity of a few friends here, to prevent ourselves from starving. We have no property whatever ;—every thing is gone to the “Mont-de-Piete” or Government Pawn-broking offices, and what adds to the horror of my situation, is that my poor wife is expecting to be *confined* about the beginning of the next month. What shall we do without money ?

God alone knows, how we shall contrive to live if they have not sent us some money, at least, by the mail of the 9th or 25th of May. Alas ! what reasons have I to hope that they have done so ?

Now, my dear sir, I hope you will feel interested in me. I have lost three terms ; of course, I shall have to remain in Europe a year longer than I had calculated upon, if I can yet save Gray’s Inn. Perhaps people will try to throw impediments in your way, but I hope you will overcome everything. Unless you make me independent of those Calcutta people, by the end of October next, I am lost for ever.

If they have not sent any money for me, it will be your first care to realize the money due to me, at least a couple of thousand rupees, and to forward the same to me through the French Bank in Calcutta. My heart sinks within me, when I remember that I cannot expect a reply from you, even if you lost no time before the *third* Mail of August. My God ! what will become of us ?

I must explain to you what makes me name the *third* Mail of August. This will reach you about the 12th or 13th of next month (July). If you write by the Bombay express which leaves on the 28th, I shall get your letter about the 20th or 21st of the following month ! I hope, my dear friend, we shall not perish of starvation before that.

You must know that there are four mails that leave Calcutta for Europe every month. Two *via* Bombay, namely on the 5th and 18th days of the month ; and two by the ordinary route, namely on the 9th and 23rd days of the month. I am sure you will make a good use of this bit of intelligence if it be new to you.

Just two years ago I left calcutta. How little did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering. People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us ; do not believe them and have faith in me, I pray you. When you conclude the loan-transaction with the "Land-mortgage Society" I hope you will bind down the *patnidar* to pay the interest regularly, or to be answerable to me in damages, if I should suffer any loss owing to his default.

This is my second letter to you. I hope to write to you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a real friend and righteous man.

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

The French do not generally love foreign Languages, yet our Sanskrit is not a stranger here, and you see half a dozen young fellows, even in this Provincial town, eager to know something about it. I have seen a capital Grammar by a French Savant and met one man who talks of "বহু" ।

I am not in a mood of mind to think of anything but of my own distressing situation. Otherwise, I can write a volume to amuse you.

With best regards,
Ever yours most affectionately
Michael M. S. Dutt.

দ্বিপঞ্চাশৎ পত্র ।

12, Rue des Chantiers, Versailles—France,
18th June, 1864,

My Dear Friend,

This is my third letter this month to you. When I wrote my last, I had hopes of hearing from those people of Calcutta by its first regular mail that left Calcutta on the 9th of May last ; but alas ! I have been again disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Franes, that is about 9 Rs. God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month. I am afraid we shall perish.

* * * *

Just see how my money ought to have been paid to me ;

		Rs.	As.	Are not these months past
Pous	...	374	11	and gone, yet where is the
Magh	...	749	6	money ? Have I some zamin-
Falgon	...	1124	1	dari here, some situation that
Chayt	...	749	6	gives me an income ?
		2,997	8	But a truce to all complaints.

You must step forward and save me from the grave which those people have nearly finished digging for me.

I send this letter to you through Pran Kissen Ghose of police office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows if my last two letters have found you ? Alas ! my dear friend, I cannot possibly

expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you? If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

In my two last letters, I have, at considerable length, explained to you how I wish you to go to work on my behalf;—how to raise Rs. 15,000 from the “Land-mortgage-Society” or rather Company;—how to obtain all the documents connected with my property from Buddy Nath Mitter and Digumber Mitter and how to get these two to sign all papers for me, as they are my legally constituted agents in India; and how to pay certain debts of mine in India and then to remit the balance to me in France through some of the Banks in Calcutta, especially a French one; how to recover for me Rs. 4,000 due to me from Mahadeb Chatterjee and others, and how to send me at least 1500 Rs. directly you get my letters. I do sincerely hope that my letters have safely reached you and that long before this one arrives at Calcutta, a powerful steamer will be marching majestically towards Europe with a letter for me from you, with glad tidings of great joy for my poor afflicted heart!

Last night Trinity term ended and the Inns of Court will remain closed till 2nd of November next. You must help me to rejoin Gray’s Inn, my good and great friends.

Alas! I have already lost three terms; if the people in Calcutta had been faithful to their trust, I should have been a barrister long before this day next year; as it is,

I shall have to prolong my stay in Europe a year longer. I hope I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, “বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিত্ত তোমাবে”।

My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse mistakes and the dull tone of this letter
With my best regards,

I remain, My dear Vidyasagar,
Your affectionate, but unfortunate
Michael M. S Dutt.

P. S. I hope you will write to me in France and that I shal live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Korunasagara (করুণাসাগর) also.

নিম্নলিখিত পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত অর্থ প্রাপ্ত হইবার পরে
লিখিত।

ত্রিপঞ্চাশৎ পত্র

France, Versailles, 12 Rue des Chantiers.
2nd September, 1864.

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said “the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs ; why do those people in India treat us this way ?” I said—“The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother.” I was right ; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ? You have saved me. My late letters have, no doubt, given you some idea of our position ; so, I shall not dwell upon it, and I think, I may now safely say that my troubles are at an end for the future, since I am in your hands.

I must tell you again that unless you raise money for me by mortgaging my property, it is impossible for me to get on here or go out to India as a Barrister, for I was without a pice from Calcutta for nearly a year and my debts are many and I must have money to pay them off. If those men had kept faith with me all this would not have happened, for we are not extravagant and my wife is a capital manager ; but what could we do without money ? Chatterjee still owes me above 300 Rs. ; but that money would not suffice. I must have more.

I must enter into details :—I have already told you that we were without money for many many months and had to live in the best way we could. Our debts were about Rs. 2,600—for it costs us about 250 Rs. a month, when we live together, including everything. I have since the end of June received Rs. 2,300, adding Digamber's 800 to your 1,500. Out of this sum I have paid Rs. 1,200 towards the discharge of my debts ; so that there is a balance still against me of about 1,400. I had with me scarcely any thing, so that the 500 Rs. or so that it cost me to live and pay the expenses of my wife's confinement, I paid out of the money sent by you. I have now about 600 Rs. with me ; when I go to London it will cost us about 350 Rs. a month and I must live apart from my family till July next, after which I can live in France, for as you know, I have no occasion to live among English people to improve my knowledge of that language. I have not money enough to do all this unless you get me a great deal from the mortgage of my property ;—besides, I wish to leave my children behind, they being too young to go backwards and forwards ; and I want them to be thoroughly Europeanized. I cannot conceive what difficulty you could find in carrying out my views.

I suppose the amount of Rs. 1,000 sent by you, is the money I had in the Alipore Court ; I cannot sufficiently thank you for the draft on the French Bank. Am I not

right in thinking that you have the heart of a Bengalee mother ? I must reserve whatever else I have got to say for my next.

Till then. Yours most sincerely,
Michael M. S. Dutt.

এইরূপ আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, মধুসূদন পুত্র কল্যাণদিককে যুরোপে বাথিয়া বহুবায়-সাধা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। তিনি যে অর্থাভাবে এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আয়, ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ অবিবেচনাই তাহার কারণ। বিজ্ঞাসাগর মহাশয়কে লিখিত তাঁহার আব একখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

চতুঃপঞ্চাশৎ পত্র।

12 Rue des Chantiers, France, Versailles.
18th December, 1864.

My Dear Friend,

Your kind letter with a draft for 2,420 Francs, reached me in due course and in very good time too, for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue,

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনির্দেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদ-জালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই যে, তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমত্ভার মতন মহাব্যাঘ্র ভেদ করিয়া কোরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণপথে থাকে।

If I could write Bengali like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so. But let me repeat it to you, that I am indeed and truly sorry

for the trouble I am giving you ; but what can I do ? To whom can I go ?

You will see that I have availed myself of your friendly suggestion with reference to a "Power of Attorney"; and I assure you, it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands, and I repeat, that I shall never again show my face in India if I cannot accomplish my object.

I hope, Buddy Nath has shaken off his usual apathy and given you the papers you allude to in your letter for the satisfaction of your friend, and, that gentleman is already satisfied. The document, I send, ought to invest you with sufficient power to do anything necessary on my behalf.

You will have seen from my late letters that I have lost the Michaelmas Term, and I fear that I shall have to lose a couple of Terms yet, that is to say, I shall probably return to Gray's Inn when I should have left it for Calcutta, as a Barrister.

Allow me to pause for a moment and tell you what these "terms" are. There are four of them in a year : (1) Hilary Term begins on the 11th and ends on the 31st of January. (2) Easter term, from 15th April to 13th of May. (3) Trinity Term, from 27th May to 17th June. (4) Michaelmas Term from the 2nd to the 25th of November. To keep a Term you must eat six dinners in hall. To be made Barrister, you must keep twelve Terms, or eat 72 dinners in hall. You must also attend a course of lectures, from November to July with intermediate vacations. I have eaten 30 dinners and have 42 to do yet. There are examinations but you are not bound to go up to them. You may read yourself blind in your "Chambers" or go to the devil, no one will ask you how you pass your time.

I must now come to my poor self. The balance of my debts amounted to Rs. 1400. Out of the money sent by you, I have paid Rs. 400 to my creditor and laid out Rs.

100 for warm clothing for my children, for the winter this year is dreadful. I have Rs. 500 to keep us till the end of January at the rate of Rs. 280 a month. If you have sent more money by the mail of the 23rd November, I shall not fail to account to you for it, faithfully, in due course ; but to London I cannot return before you have enabled me to free myself from all my liabilities and placed a sufficient sum in my hands to go on for 3 months, whether here or in London. I am quite ready to go back to London with my family, but you must help me to do so. I shall want Rs. 1250 including the month of February, for I cannot expect to hear from you before the middle of March); it will cost me about Rs. 800 to furnish a cheap little cottage for ourselves, about Rs. 100 to transport ourselves, and money at the rate of 250 for three months —altogether 2900 Rs.

I hope your friend will put this sum in your hands for my use at once and in one lump ; for otherwise I could do nothing ; pray, remember this, my dear friend. Alas ! this sending of money, by dribs and drabs, does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণ পথে থাকে ।

I write this Via Bombay and expect it will reach you about the 20th of January next. If you reply by 9th of February or the 5th of that month, Via Bombay, I shall hear from you about the beginning or middle of March. As I do not know how much money you have sent by the mail of the 23rd, if you have sent any at all, I must beg of you to address as follows—

Care of Grindlay & Co.,
East-India Agents
55, Parliament-Street,
London.

You can get a draft from the Oriental Bank Corporation. The value of the property, I am sure, will secure your friend from any loss and I shall make it a point to pay him his money as early as I can, on my return. I do not think we shall draw more than 9 or 10,000 Rs. from him and

I shall look upon him always as a true friend and benefactor. If he wants a policy on my life I can get that done ; but the loan of the sum I have mentioned above must not be delayed on that account. I must go to England to insure my life. I do not believe French Companies have agent in India. Apologising for this long letter.

I remain my dear friend,
Ever yours faithfully,
Michael M. Dutt.

মধুসূদনের যুরোপ-প্রবাসকালের লিখিত এইরূপ অনেক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। নিজের ভববস্থা, দেনা, পাওনাব হিসাব, এবং তাঁহার কপট স্বহৃদগণের ভাবাবতার ইত্যাদির উল্লেখে সেই সমস্ত পত্র পূর্ণ। সাধাবণ পাঠকের পক্ষে সেরূপ পত্র প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তাহা আর আছোপাস্ত উদ্ভূত করিতে বিরত হইলাম। কোন কোন পত্রে সাংসারিক কথাই সঙ্গে মধুসূদন নিজের সাহিত্যিক জীবনের এবং স্বসমকালিক অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ স্থানগুলি নির্বাচন করিয়া আমরা দৈনন্দিন লিপির আকারে নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি। নির্বাচিত স্থানগুলি সমস্তই বিজ্ঞাসাগর মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে গৃহীত :—

I hope you have, by this time, received all my letters and commenced operations on my behalf. You will be
Versailles Franco, pleased to hear that satyendra has passed
19 Rue des and will go out in the course of a few
Ohanlies 11th months. Poor Manu is trying again. I
July, 1864 have no idea as to what will be the result
this year. At one time, I thought that Manu was the
cleverer youth of the two, but, I find, I was mistaken.

I hope to be a capital sort of European Scholar before I leave Europe. I am getting on well with French and Italian I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You can not imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but

he has replied in English. I wonder why ; I know he did a little Italian last year.

I know that it is not yet time for me to expect to hear from you even a reply to the earliest of the many letters with which I have troubled you of late.
2nd August, 1864 But you must excuse this anxiety which induces me to inflict another letter on you. You cannot imagine how unhappy I am ! Alas ! the men I have left behind, are, in the emphatic language of the Bible, “a generation of Vipers.” My poor wife expects to be confined every day and I have not got twenty Rs. in the house. If I were inclined to joke, I would quote ভাবত and sing.

দেবে কল লো যে জানা আশাব ।

কেমনে হবে ঘবে এত জানা যাব ।

But I am not in a mood of mind to be gay. God help me ! My great hope is now in you and I am sure you will not disappoint me If you do I must work my way back to India to commit one or two murders—Wilful, premeditated murders and then be hanged.

I scarcely know how to thank you for your kind help in undertaking to look after my affairs and to see that I am not again left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe.
18th Spetember, 1864 I hope I shall live to show the world how I appreciate such noble friendship.

From the month of November next till July 1865, I shall have to live in England and I cannot take my family there, for England is a much dearer country than France and I am more known there than here. I am a stranger among the French, but there are many persons whom I know in England and who would be a source of great expense to me—that is to say, I should have to exchange all sorts of social courtesies with them.

I am anxious that you should not misunderstand my object in wishing to leave my family behind me in France.

There are many reasons for the step I wish to adopt. House rent is very high in London or its vicinity. Then we shall have to incur the expenses of removing a petty large household all the way to the other side of the channel and the thing would interfere with the education of my children; and in England, I shall have to lay out a large sum in furnishing a house. The saving of a little money does not strike me as being an advantage sufficiently great to counterbalance the attendant disadvantages. I really do not see how that would enable me to save any money at all.

"You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Manomohan is spending a few days with us and goes back to London next month to resume his studies. I hope he will succeed next year. The probabilities are in his favour for he is going to add". Italian to his stock of subjects and three years' hard reading ought to give him sufficient strength for the great battle before him.

You will have, by this time, seen Satyendra Nath Tagore, the first covenanted civilian of pure native descent.

8rd October,
1864

Manomohun has been staying with us for some time. He goes back to London next week to resume his studies. I think I have already told you that Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before. Manomohan must take his chance. He is a good fellow and I wish him success for the sake of his old father as well as his own.

We are on the eve of a winter which threatens to be severe. You can have no idea of a European winter.

8rd November,
1864

This is still autumn and yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable "মোট" in our country! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month! Do you remember the line of ভারতচন্দ্র?

"বাস্বেৰ বিক্রম সম বাস্বেৰ হিমালী"

What would he have said if he had been here ? You must not fancy, my good friend. that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers. This German is a curious language. The alphabet as you know, I dare say, is not Roman. But of all this hereafter, I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shop-keeper "This author is a great friend of mine." "Ah sir" said he, "We thought he was dead." "God forbid" said I—"His country and friends cannot spare him" Fancy this on the banks of the famous Seine.

Last night the Inn's of Court in London closed for the Christmas season, they will remain so closed till the 11th of January next. There are four terms every year, viz., Hilary, Easter, Trinity and Michaelmas. A student must keep 12 of these terms to qualify him to be called to the Bar. The term, just over, would have been my ninth, if I had not been exiled from England by the force of circumstances ; and I should have been in India by this time next year. But regrets are vain now. I only hope that you have taken steps to enable me to return to my legal studies next year. I do not wish to tire you by repetitions, and shall pass over all that I wish you to do on my behalf : my last two letters exhaust the subject ; do they not ? this moment I am exactly on the position of the "চাতক" of our poets, looking out for the cloud that is to allay my thirst !

The accounts of the frightful storms which visited you on the 5th of October last have filled me with alarm. The Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture, and pass over, the native portion with a slight glance of apathy. The English paper follow suit, so that it is difficult to guess what has really taken place ! I hope all our friends have escaped the terrible visitation.

Two days hence, the first Term (Hilary) of this year will commence. I see no earthly chance of my being able to return to London. God alone knows, how many more terms I shall yet have to lose. If I had gone on uninterruptedly I should have been called to the Bar next June and returned home by the end of the year. But I am not a man to give way to despondency. I am making the very best use of my unfortunate exile and I think I may without vanity say, that I know more languages than any Bengali now living. But learning is not money, and money is all in all amongst a degraded people like ours. Only help me to get out of this scrape, my dear Vidyasagar, and I shall know how to treat the fellows "la bas" as the French say.

The Winter, this year, is very severe and yet at times you have days that might be called "hot". A few days ago, it snowed the whole night and the sight was splendid in the morning. Streets, house tops, gardens were all covered over with snow ; one might say if poetically disposed that our "দুধ-সাগর" had overflowed its shores and inundated the country.

Things, Alas ! are getting on very badly with us ! I have had to apply to the British charitable Fund in Paris for the loan of 200 Rs. (5000 Francs). You cannot imagine how degraded I felt when I had to appear before the committee. Such a lot of ragged and stinking devils were there ! But as the proverb says, "Adversity makes us acquainted with strange bed-fellows" The members, I am bound to say, treated me with great consideration—especially, Sir Joseph Cliffe (brother of the late Roman Catholic Bishop of Calcutta) and Lord Degrecy. They have not yet complied with my request. They have kept your last letter to me to have it translated. I do not know whom they will find in Paris able to read Bengali. There are two Calcutta men, Messrs. De souza and Mendes, but they are যেটে ফিরিঙ্গী men who say "বাবু তুমি ভাল আছি ?"—I shall know their decision next Monday.

I am taking every necessary step to get myself in a position to return about the end of the present year. I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus. We spoke about you (he knows you well by name) and the remarriage of widows. He thinks that a well educated Bengali ought to be in England for the benefit of the Civil Service and through it of the Country at large.

We are now in the midst of a rigorous winter. For a poor man like myself London is dreadful. The Rinderpest or Cattle-disease, of which you have, no doubt, read in the papers, has made meat scarce and frightfully dear and we can scarcely manage to live for less than £. 36 or rupees 360 a month.

Excuse bad writing, for my fingers are quite stiff. I have just come out of a cold bath, which I take every day in spite of the weather. It is a fearful trial to one's nerves.

Poor Manmohan has heard of his father's death. The blow, though expected, does not seem to have fallen upon him with mitigated severity. He is going to apply to the Benchers of his Inn (Lincoln's) to call him to the bar next terms, so that he might leave for India in July next. He has sent a Telegram to Djendra Tagore for £. 300 to enable him to leave Europe. The Telegram cost him Rs 75. I am sorry for the poor fellow.

You will be pleased to hear that I have finished keeping 9 (nine) Terms and that there is every prospect, humanly

speaking, of my being called to the Bar in November next,
 10th June, 1866 provided I am ready with the necessary
 funds. The steward of our Inn tells me
 that as my name was on the list, I shall have to pay for the
 Teams I have not kept, just as if I had done so and that I
 must be prepared to satisfy all demands by the beginning of
 October next in order to have a right to petition the
 Benchers for a call in the ensuing term. I need scarcely
 say that everything will now depend upon yourself and
 the friend who has been helping me so kindly up to this
 time.

The failure of the Agra Bank has spread ruin and
 dismay in London. If the Bank had gone down a few
 weeks earlier, I should have been a sufferer, for your last
 draft would have been (for a time at least) so much waste
 paper, Who could have even believed that a Bank like
 this should burst in this way ? But you have no idea of
 the "stock exchange" here and the rascality that goes on
 there. Men are said to have made less at the expense of
 the poor Agra ! How they managed to do all this, is more
 than I can explain to you. Many retired Anglo-Indian
 families have been almost ruined. The consequences of
 all this are, no doubt, highly disastrous but I earnestly hope
 that they will not affect us :—If I am obliged to remain in
 Europe longer than December next, I shall be ruined.
 London is so dreadfully dear this year !

Manmohan was called to the Bar a few days ago ; the
 death of his father gave him a good plea whereon to have
 his petition for the indulgence and Sir E. Ryan helped him.
 I am sorry for poor Manmohan. He has had no opportunity
 of learning law ; but he is an intelligent fellow and will,
 no doubt, try to make up. He leaves in August next. Of
 course, he will be my senior, I might have helped him to
 some extent. That fellow G. M. is too selfish to assist any
 body. He has written to some one in London to say that
 he makes £.20 every day ; this I can scarcely believe
 for I don't think there is much in that fellow. But he

knows how to boast. No doubt he is making for there is a good opening for a good native Barri

I regret that he should be the first man of our race out to be followed by so কাচা a hand as Manmohan, patience, my dear friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.*

I do not know that I can give you any London-news to interest you. We have heard of your labours in connection with the petition on polygamy, and there was a very handsome mention made of you in Saturday Review, not long ago, in the course of a critique on some new Sanskrit work. But the article, I suppose, will be reproduced by some of your Indian papers.

I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death."

9th December, 1866 Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself. You must sell all I have and, after paying all just debts, transmit the money to my wife here, and advise her what to do. I am sure you will take same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother. You must be the friend and Guardian of these I leave behind.

I suppose you are not aware that my books bring in a considerable sum of money. The income is likely to increase. If you call upon I. C. Bose to submit an account to you, you will be surprized to see at during the half year ending in July, they brought about Rs. 1000. Now I wish to make a gift of that income to Mademoiselle Henrietta Eliza Sarmistha Dutt and her heirs till the continuance of the same appointing you and the other gentlemen associated with you in managing my affairs at present, Trustees of the Gift. In case of that child's

* মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কৃতকাযতা সম্বন্ধে মধুসূদন কীরূপ সন্দিহান এবং নিজের কৃতকাযতা সম্বন্ধে কীরূপ প্রত্যয়বান ছিলেন, এই পত্রাংশে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কাযক্ষেত্রে কিন্তু ইহার বিপরীত বলই লক্ষিত হইয়াছিল।

death, the money is to go to master Frederick Michael Milton Dutt and Heirs both of Versailles, in the Empire of France. In case of the latter's death to my wife Amelia Henrietta Sophia Dutt till her death and then to my other heirs. In case of my death before reaching Calcutta, the gift must be based on this letter. You, the Trustees are to remit the money to my wife in France to be laid out in the Education of the abovenamed H. E. S. Dutt or F. M. M. Dutt or her own use as the case may be.

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বুক্ষে কি কল কলিবে! But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid; but it's a serious thing to have a wife and little children, all, unable to help themselves, in case of any emergency.

মধুসূদন যে সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করেন, স্তম্ভাসিক বাবিরিধাব উন্মেষচক্ষু বন্দোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ, এবং খ্যাতনামা সিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও, সেই সময়, ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। ইহাদিগের তিনজনেবই সঙ্গে মধুসূদনের বিশেষ মশ্চরীতি ছিল। মধুসূদন ইহাদিগের অপেক্ষা বণোজোষ্ঠ ছিলেন, তিনি ইহাদিগকে জোষ্ঠভ্রাতার গায় মনেহে উপদেশ দান করিতেন এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাবা সকলে হৃদয়ে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ করাইয়া দিত। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিডল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মধুসূদনের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি, তাহাব মধ্যস্থে একটি কবিতা রচনা করিয়া, চতুর্দশপদী কবিতাবন্দীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে তিনি এই সময় যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা তাহার প্রবাসকালের অনেক কথা অবগত হই। আত্মোপাস্থ উদ্বৃত্ত না করিয়া, বিজ্ঞাসাগর মহাশয়কে লিখিত পত্রের গায়, মনোমোহন বাবুকে লিখিত পত্র হইতেও আমরা প্রয়োজনীয় অংশগুলি নির্বাচন পূর্বক সন্নিবিষ্ট

করিতেছি। মূল পত্রের কয়েকখানি ফরাসীভাষায় লিখিত; আমবা তাহাদিগের মনোমোহন বাবুর রুত ইংরাজী অন্তবাদ প্রদান করিলাম।

I feel very dull and sad, and have been so since my removal but I must accustom myself to this state of things, especially as both of you are going to leave town, in so short a time. I need scarcely say that I miss both of you very much.

Yesterday I went out of town by rail with a gentleman who is a fellow-lodger. We went to the famous Kewgardens, then to Richmond, and afterwards to the famous palace of Cardinal Wolsey—Hampton Court. I thought of you and of our dear Satyendra. I can scarcely describe to you the wonders I saw. What a pity you don't stir out of London and see these wonderful places. These places add an air of romantic reality to the dry historical facts we learnt in our younger days. I am quite in love with Hampton Court. It is as oriental as this rigorous climate would allow. The house is divided into what we would call mahals (মহল); each division has its courtyards or উঠান। The pictures and the gilded ceilings are wonderful.

I am very dull and melancholy and long to see you both.
The 16th September, 1862 Pray let me know if you have a quite, cheap, little inn near your place. I am glad you are getting reconciled to your present retreat.

Work on, my boys, and win all manner of honours;
The 14th November, 1862 We are all of us in for it. While the whole country is almost silent about that T—we three,* I dare say, are the theme, of frequent discourse among our countrymen.

London has been dreadfully foggy these two days.
The 8th January, 1863 What a brutal country this, by Jove! But as the poet says "To bear is to conquer our fate", I am glad you and our little India are getting on well. Remember, my boys, that the eyes of your nation are on you.

Send my best respects to your venerable father and tell him that if I should live to go back to the old country, I shall strive to do no discredit to the memory of the man whom he once loved and treated as a younger brother.—I mean my late father, Adieu ! If you will allow me I shall try to help you in your Shakespearian studies by sending you occasional papers of questions on his most famous plays. Tell me which of them you are up in.

After you left I had been laid up with an inflammation of the bowels and I believed that the
 Versailles of the bowels and I believed that the
 30th October, 1864, comedy was going to end, and the curtain
 Sunday fall ; but here I am, my part is not finished yet. “The torch lasts still” as Æneas said to Phædra.

As for my German studies I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy ! Fancy ! I am going to read Geathe, Schiller and Webber and ather authors whose good fame has filled the world. Do you know the song by Dryden ?

“None but the brave
 None but the brave
 None but the brave
 Deserves the fair.”

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf.

I do not believe I shall be able to go to London this
 Versailles year, but that does not matter. I have
 30th October, 1864 much here which can take up my attention,
 Sunday make my time pass pleasantly, and often make me forget the worries of which the life of man is heir to. I hope the course of my life will flow peacefully

I am very anxious to make the acquaintance of your good and learned friend, Mr. Martre, and that of Pundit Chooramoni (পণ্ডিত চূড়ামণি) Herr. Goldstucker. But I must have patience.

A few days ago I had the honour of saluting and of

being saluted in return by the famous Emperor of the French—a truly great man. I amused myself by shouting Vive l'Empereur Vive Napoleon (Long Live the Emperor, Long live Napoleon.) The Empress was with him on horse back. They exaggerate this imperial lady's beauty. She is gracetul than pretty.

My very best regard to Mr. Tagore. I thank him very much for having remembered me. Tell him that I find my exile useful. All well at home. Sarmistha and Milton* have begun to forget you ;—children like ladies are fickle in their love.

I go sometimes to the King's garden and think of you, when I feed the fish and swans that come like a band of pirates. But it has begun to be cold, and the rapid approach of winter is being felt everywhere.

Your praise is precious, because, I am sure, you think all that you say. I find German easy ; the syntax resembles that of the classical languages and obeys definite rules. Once you have pulled down the wall which is surrounded by a barbarous A. B. C. you find many words that you know. The handwriting is different but I have already mastered it.

এই সকল পত্র ও পত্রাংশের সঙ্গে বাবু গোবদাস বসাককে লিখিত দুইখানি পত্রও নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। গোবদাস বাবুর নিকট মধুসূদনকে যেকপ অসম্বোধে জ্ঞদেব ভাব ব্যক্ত কবিত্তে দেখি, আব কাহাবও নিকট সেরূপ দেখিতে পাউ ন। প্রথম পত্রখানির প্রাবস্তিক অংশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে যাহাবা প্রতিভা নষ্টয়া জন্মগ্রহণ করেন, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সম্প্রদায় যেমন তাঁহাদিগের অন্তরাগী অপর সম্প্রদায় তেমনই তাহাদের বিদ্বেষ্টা ও নিন্দক হইয়া থাকেন। মধুসূদনেব যুবোপপ্রবাস-কালে তাঁহাব কোন বিদ্বেষ্টা এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, তিনি, কোন চক্কর কবিবা যুরোপে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। মধুসূদনেব বন্ধুগণেব অনেকেই এ সংবাদে ব্যথিত হইয়াছিলেন। গোবদাস বাবু সেই অপবাদ সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লেখাতে মধুসূদন, তাহারই উল্লেখ করিয়া,

তাঁহা পত্র আবশ্য কবিগ ছিলেন। মধুসূদনের উচ্ছ্বাসলতা ও অমিতাচারেব উল্লেখ কবিত্তে আমবা কখনও সঙ্কচিত হই নাই। ত্রাযেব অন্তবোধে তাঁহাকে অনীক অপবাদ হইতে নিমুক্ত কবাও আমাদিগেব কৰ্তব্য। সেইজ্ঞা এই অপবাদ সঙ্কল্পে ননা আবশ্যক যে, ইহা সম্পূর্ণকপ ঈর্ষাকল্পিত। বাবু মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের জীবনের এই সময়কাব প্রত্যেক ঘটনা অলগত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবায তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা বিন্দুমাত্রও সত্য নহে। এ সঙ্কল্পে আব অধিক কথা না বলি। আমবা উল্লিখিত পত্র দুইখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট কবিত্তেছি।—

পঞ্চপঞ্চাশৎ পত্র।

Versailles, France,

12 Rue des Chantiers,

Wednesday, 25th October, 1864.

My dear Gour,

I have received your kind and welcome letter and would have replied to it earlier but for ill-health. You amuse me vastly, for the reports to which you allude are absolutely unfounded and evidently owe their birth to some busy brain highly poetical in its constitution! My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern "Bastille" but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed. The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me, of king Henry IV and I say to him, "Harry, the wish was father to the thought." The scoundrel, no doubt, wishes me all sorts of misfortunes; but I hope to disappoint him. I have too great a regard for myself to gratify his malignity. Can't afford, sir, to be charitable and generous in this affair! I hope this will satisfy you, my lad, and other friends who take some interest in me.

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a

place to live in as this country and its brulal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here, I have greater facilities for mastering French and Italian than there To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have aeready begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to work away seriously at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all, I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends ; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Rajah of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty ! This is the অমর্যবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from come here and subject race. Here, you are the master of your masters ! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, well treat you as a man and not a "d—d nigger " But this is Europe, my boy and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাগেব-হাট on the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own, dear native river ? I was born, you know at সাগরদাঁড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেবহাট ।* I dare say you are very dull there, for the gentry in the neighbourhood

* বাগেবহাট কপোতাক্ষীর কূলে বা সাগরদাঁড়ী হইতে দুই মাইলের মধ্যে নহে । অধুনা ব্রহ্মবৈ এইরূপ লিখিয়াছিলেন ।

are not educated enough to be fit companions for a man like you, but there are, and must continue to be for ages yet, the discomforts of a country-life in Bengal. I wish you a more lively station, my friend.

I have not written to Rajnarain for a long time, but he must not fancy that I have forgotten him or my other friends, such as our dear Hari Dass and Sham. I always think of them. You know, Gour, what a bad correspondent I am.

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vivat Empereur, Vive 'l' Empererice."

Mrs. Dutt thanks you for thinking of her and begs to be remembered to you. Sarmistha* is already quite French. If you should hear her prattle away, you would not believe that she was born on the muddy banks of the Hooghly. My son Milton (I suppose you have never seen him) is also getting on well. We had a beautiful daughter born here, but she did not live long. I am glad to hear that your son is getting on well. I wish to God, Gour, you would send him to Europe for his education. It would cost you about 2000 Rs. a year or less. The lad is sure to get into the Civil Service, but you must not delay longer. S. Tagore has succeeded, but take my word for it, no other native of India will get into the Service under similar circumstances. If you want your boy to get in, send him here, while he is young enough to be Europeanised. I am afraid the other young man, M. Ghose has but a poor chance before him. He works hard, but the examination is terrible. You ought to send your boy, especially, as I am going to leave my family behind, in Europe, for the education of my children. I am sure Mrs. Dutt will take great care of the little fellow. You know she talks Bengali. Think seriously over the matter and make

* মধুসূদন-দ্বিভা। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "শর্মিষ্ঠার" নামানুসারে মধুসূদন কস্তুর নাম শর্মিষ্ঠা রাখিয়াছিলেন।

a man of the lad. He will, if spared, thank you all the day of his life; what can you do for him in India? You are not going to leave him a great fortune, for a Deputy Magistrate is not likely to do that. Give him an European education. Let me know what you think on the subject in your next.

I intend to return to London soon to resume my legal studies, but when you write, address here, for I am going to leave my family in France.

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

Remember me to our good friends and believe me,

My Dear Gour,
Ever your affectionate
Michael M. S. Dutt.

P. S. I direct this, as desired by you, to the Asiatic Society. I forget the name of the Assistant secretary. Is our friend G. L. Dutt still there? Pray, where and how is ভবানী? Do you see রাজেন্দ্র now and then?—Adieu!

যে মধুসূদন, একদিন, “বাক্সালাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল” বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই মধুসূদন পরে বাক্সালা ভাষার প্রতি কিরূপ অম্মরাগী হইয়াছিলেন, নিম্ন সন্নিবিষ্ট পত্র হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

ষটপঞ্চাশৎ পত্র।

Versailles, France.
12, Rue des Chantiers,
26th January, 1865.

My Dear Gour,

I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though fathers and (myself) “bearded like a Pard”—we still have the same hearts beating in us. Is it not so, my good old friend? I pray you, whenever any rascal tells you anything unworthy of

your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool nor a mad man, and (as they say in England) “know what is what.” You can scarcely conceive how Europe has changed me, in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself, my boy ! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow ; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course, I am still romantic, for that you know is my nature ; for I am a bit of a Poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor “Man of the world.” I have my dreams and aspirations and vague longings, but I am growing wiser ; excuse this egotism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother ? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to d—d idle reports about me, when I am at too great a distance to defend myself. Let Truth frown Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my boy.

You ask me when I mean to return “homewards ;” If I had not been basely neglected by * * * * and * * * I should have been called to the Bar in the course of the present month ; but as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend, Ishwar Chandra Bidyasagar, has taken me by the hand ; if you ask him he will tell you how shabbily I have been treated. The subject is an important one, and I don’t like to enter into it. I have been for months like a ship becalmed in France, though thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, Viz, Italian, German, and French languages,—which are well

worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists ? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those, who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of “Lecture” for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays ! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called “educated” who is not master of his own language.

I am sorry for your little son for I am afraid, the mistaken kindness of your parents will not suffer him to be made a man ; of course, I am far from condemning your filial respect for their feelings.

You again date your letter from “Bagirhat”. Is this “Bagirhat” on the bank of my own native river ? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some “Sonnets” after his manner. There is one addressed to this very river কবিতা। I send you this and another—the latter has been very much liked by several

European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet “চতুর্দশ পদী” will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতবর্ষে never had such an *elegant* compliment paid to him. There’s variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge, Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মাস্থ; if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the “বড়মাস্থ” among us? The nobodies of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my boy, make money. If I haven’t done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done!

But let us turn to other subjects; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand rupees. Of course if you were left to yourself, you could not do it, but I can hope to be of great use to you. When you let me know that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more useful than any “guide” you can think of.

You want me to write you by *every mail*. My good soul, do you know that I should in that case have to write no less than four letters every blessed month. I am not an idle man and besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old friend, altogether, but give him a call, now and then.

You must remember me to all our old friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch-Behar and that of Trailakya Mohan Tagore, who I see, has been transported for 7 years. I feel for his poor mother! Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart!

Mrs. D and the little ones are all going on well, Thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards,

I remain, My Dear Gour,
Ever your affectionate
Michael M. S. Dutta.

মদুস্বদনেব যে সকল পত্র ও পত্রাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, ইংবাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে অবগত হইয়াছেন যে, ভাষা শিক্ষা।

কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত তিনি যুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল ভাষাব সাহায্যে স্বদেশীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য তাঁহাব একান্ত বাসনা ছিল। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন যে, এক একটি যুরোপীয় ভাষায় অধিকার লাভ করা, আর এক একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা সমান। আইন-অধ্যয়নের অল্পরোধে যদিও তিনি অধিক সময় কবিতা রচনায় ব্যয় করিতে পারিতেন না, স্বাভাবিক প্রবণতা বশত তথাপি তাহা হইতে একেবারে নিরস্ত থাকিতেও সক্ষম হইতেন না; ইংবাজী, ফরাসী, এবং ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় কবিতা-রচনা করিয়া তিনি অবকাশ কাল বিনোদন করিতেন। ফরাসী অথবা ইতালীয় ভাষায় প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থ রচনা করিব বলিয়া তিনি কখনও সঙ্কল্প

করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কোনও ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, একথা বলা যায় না। সেইজন্য নিজের ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষার্থ তিনি এই দুই ভাষায় কবিতা রচনার অভ্যাস করিতেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় কবিতা-রচনা সম্বন্ধে তাঁহার অল্প উদ্দেগু ছিল। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজ-কবিগণের সমকক্ষ হইব, বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই বাল্যসংস্কার যদিও অন্তর্হিত হইয়াছিল

তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে ভারতীয় কাব্য হইতে সীতাকাব্য।

দুই একটি রত্ন সংগ্রহ পূর্বক উপহার প্রদান করিব বলিয়া তাঁহার এই নূতন বাসনা জন্মিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় কাব্য-সমূহের গৌরবস্বরূপ সীতাচরিত্র অবলম্বনে ইংরাজী ভাষায় একখানি কাব্য রচনা কবিত্তে আবশ্য করিয়াছিলেন। সীতার বনবাস-ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহার কাব্য আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দুই তিন শত পঙ্ক্তি লিখিয়াই, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই অসম্পূর্ণ কাব্যের কয়েকটি পঙ্ক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে।

QUEEN SEETA

Prologue

“The golden chariot slowly rolled along
The woodland path, shedding, on all around,
A golden glory, like a setting sun ;
And as it rolled along, there came a voice,—
A voice of woe, athwart the murmuring stream.
Commingling with its own—low, soft and sweet :
And thus it said “Ah me ! O Royal Lord !
and dost thou forsake me ? Am I then
Abandoned ? Woe is me ! This is no dream,
No mockery of fancy ! Lo ! I see
The fading splendour of the golden chariot ;
Its silken banner fluttering midst the trees
Like a flash of lightning ! Lo ! I see
The skiff that ferried me from yonder bank
Deserted ! There it glides adown the stream,
How like the crescent moon along the sky !”

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর “সীতা-বনবাস” নামক কবিতাতে তিনি অবিকল এইকপ ভাব ব্যক্ত কবিয়াছেন। সেই কবিতাব “তাজিলা কি বঘুবাজ আজি এই ছলে” ইত্যাদি পঙ্ক্তিগুলি, উদ্ভূত ইংরাজী কবিতাটির অন্তর্বাদ স্বরূপ। ‘সীতা’ কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংরাজী খণ্ডকবিতাও তিনি যুরোপ-প্রবাসকালে, রচনা কবিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও স্তভদ্রা হরণ ও দ্রৌপদী স্বয়ম্বর নামক দুইখানি নূতন কাব্য আবিস্কৃত কবিয়াছিলেন। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর উদ্ভূত কবিতাব যোগ্য নয়, স্তভদ্রাহরণেব প্রাবল্য অংশ এইকপ,—

“স্তভদ্রা-হরণ

প্রথম-সর্গ

কেমনে ফাঙ্কনী শব স্বর্ণে লভিলা
পবাভবি যতবৃন্দে চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন চন্দ্রে সে মহাকাহিনী—
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেরি, দাসেরে যদি রূপা কব তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি, না জানি কি কবে
আরাধি হে বিশ্বাবাধ্যে। তোমায ; না জানি
কিভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে।
কিস্ত মাঝ প্রাণ কভু নাবে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? উর দেবি, উব গো আসবে।
আইস মা, এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিবহজালা বিহঙ্গম যথা—
কারাবন্ধ পিঙ্গবায় কভু কভু ভুলে
কারাগার দুঃখ, স্রবি নিকৃষ্টেব স্বরে।

ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চভাই পাঞ্চালীয়ে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আপনি ইন্দ্রিয়া—
(জগত-আনন্দময়ী) নব রাজ-পুবে
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজশ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে।

এ মঙ্গল-বার্তা পাষে নাবদেব মুখে
 শচী, ববাজনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
 কসিনা। জলিল পুন পর্বকথা শ্রাবি
 দানানলকপ বোম দিয়া কপ বনে,
 দগধি পবাণ তাপে। তা দিক। ভাবিলা,
 বিবলে মানিনী মনে—কি সাধ জীবনে ?
 আন বি মানিবে কেহ এ তিন জগতে
 অভাগিনী ইন্দ্রাণীবে ? কেন দিলি তাবে
 অনন্ত যৌবন-কাস্তি তুই পোড়া বিধি ?
 হায় কাবে কব দুখ। মোবে অপমানি,
 ভোজবাজ-বালা কুস্তী—কল কলঙ্কিনী
 পাপিয়সী—তাব মান বাড়ান কুলিনী
 যৌবন কুতকে দিক, যে ব্যাভিচারিণী
 মজাইল দেববাজে, মোবে লাজ দিয়া
 অজুর্ন জাবজ তার ; নাহি কি শকতি
 আমাব, ইন্দ্রাণী আমি, মারিতে পামবে
 এ পোড়া চোখেব বালি ? চরোধনে দিয়া
 গড়াইন্ত জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে—
 পাঞ্চালীবে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে,
 লক্ষ্য বিধি, লক্ষরাজে বিমুখি সংগ্রামে।
 অহিত সাধিতে, হায়। চিতাশী হইন্ত—
 আমি, ভাগ্যগুণে তাব। কি ভাগ্য। কে জানে
 কোন্ দেবতাব বলে বলী—এ ফাস্তনী ?
 বুঝি বা সহায় তাব আপনি গোপনে
 দেবেজ্ঞ। হে ধর্ম, তুমি পাব কি সহিতে
 এ আচাব চবাচবে ? কি বিচাব তব ?
 উপপত্নী কুস্তীর জাবজ পুত্র প্রতি
 এত যত্ন ? কারে কব এ চুখেব কথা
 কাব বা শবণ এবে লব এ বিপদে ?
 কঙ্কণ মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে

ললনা, রতনময় কাঁচলি ভিজায়ে
বহিল আঁখির জল ; শিশির যেমতি,
হিমকালে, পড়ি আত্রে' কমলের দলে ।”

মানসিক অশান্তির জন্ম মধুসূদন ‘স্বভদ্রাহরণ’ কাব্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাট। চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে সেই জন্ম, তিনি বিশদে লিখিয়াছিলেন ;—

“তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিন্তু স্বভদ্রা স্মরি !
কিস্ত ভাগ্যদোষে, শুভে ! আশার লহরী—
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে ।
কিস্ত (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি পূজি ঐশ্যপায়নে
ঋষিকুল-রত্ন বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণগীত, তুসি বিজ্ঞ জনে
লভিবে স্তম্ভ, সাক্ষি এ সঙ্গীত-ব্রতে ।”

মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে। মহর্ষি ঐশ্যপায়নের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র যে অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিবে।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের একটি নূতন সংস্করণ করিবার এবং বীরাস্ত্রনা-কাব্যের অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্মও মধুসূদন যুরোপে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। মধুসূদনকে যে অবস্থায় যুরোপ বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিকরূপে প্রণীত করিয়া কাব্য রচনা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তিনি এক একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু, তাহার পর, দূততার ও সহিষ্ণুতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আবার একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন। এই জন্ম একমাত্র চতুর্দশপদী কবিতাবলী ভিন্ন তাঁহার যুরোপে আরক প্রস্থসমূহের কোন-খানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। কবিতাবলীও, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কবিতায় প্রণীত না হইলে, সম্পূর্ণ হইত কিনা সন্দেহ। ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সেল্ নগরে অবস্থানকালে ইতালীয় কবি পেতরার্কীর অন্তর্যরণে মধুসূদন ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অমিত্রচন্দ্রের দ্বায়া চতুর্দশপদী-কবিতাও তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে। “চতুর্দশপদী-কবিতাবলী”

নানাবিধিগী—চুবনকইটি কবিতায় সঙ্গঠিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গুণিগণের প্রতি সমাদর, ভাবতীয়া কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা, এবং মধুসূদনের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি নানাবিধ অবলম্বনে বচিত কবিতা ইচ্ছাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। পবনদ-দলিতা জননী “ভাবত-ভূমি” হইতে আবস্ত করিয়া স্বদেশীয় “কেউটিয়া সাপ” এবং “বউকথা-পাখী” পর্যন্ত কবি ইচ্ছাতে কল্পনাবিষয়ীভূত কবিয়াছেন। চতুর্দশপদী-কবিতাবলী, সৌন্দর্যে মধুসূদনের অগাধ কাব্য অপেক্ষা নিরুপ্ত হইলেও, একটি কাবণে বিশেষ আলোচনার যোগ্য। মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীৰাঙ্গনা পাঠ এবং আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দশপদী পাঠ কবিবাব প্রয়োজন। ইহার অনেক কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং অনেকগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কবিয়াছেন। গ্রন্থের প্রাবল্লেখ্য গ্রন্থকর্তার পবিচয় দৃষ্ট হইবে। তাহার পব প্রথম বয়সে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের কিকপ বিবাগ ছিল, এবং “বঙ্গকললক্ষ্মীর” আদেশে তিনি কিকপে মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ কবিয়াছেন। শৈশবে যাহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তিনি আহাব, নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন এবং যাহাদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার পব তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সম্মাননা দৃষ্ট হইবে। রুতিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দবাম, ভারতচন্দ্র এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রত্যেকেরই প্রতি মধুসূদন উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কবিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় এই সকল কবি সম্বন্ধে তাহার সমকালবর্তী ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো এবং ইংলণ্ডীয় রাজকবি আলফ্রেড টেনিসনেরও প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শনে ক্রটি করেন মাই। কবিগুরু বাঙ্গালীকি, মধুবাসী জয়দেব, কবিকুল-তিলক কালিদাস, পণ্ডিতের গোল্ডস্মিথ এবং ইতালীয় কবি দান্তের সম্বন্ধেও এক একটি কবিতা বচিত হইয়াছে। মধুসূদন যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন, সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। যুবোপীয় অনেক কবি তদুপলক্ষে কবিতা-উপহার প্রেরণ কবিয়াছিলেন। মধুসূদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা কবিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অন্তর্বাদপূর্বক ইতালীভাষেব নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালী রাজ ভিক্তর ইমানুয়েল, তাহা পাঠ কবিয়া, প্রীতি প্রকাশ পূর্বক, মধুসূদনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, “আপনার

কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।” (It will be a ring which will connect the orient with the occident)* এই সকল করিতার সঙ্গে ভারতীয় কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা অবলম্বনেও অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের “কমলে-কামিনী” ও “শ্রীমন্তের টোপার,” ভারতচন্দ্রের “অন্নপূর্ণার কাঁপি,” রামায়ণের “সীতার বনবাস,” মহাভারতের “গদাযুদ্ধ” ও “সভদ্রাহরণ” প্রভৃতি অনেক বিষয় চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবাসে স্বদেশের স্মৃতি বড়ই মধুর; প্রত্যেক ‘সামগ্রীই যেন একটা অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হয়। মনোমুগ্ধকব ফরাসীভূমিতেও মধুসূদনের হৃদয় তাঁহার বাল্যের প্রিয়নদী কপোতাক্ষী, স্বদেশের নীলাকাশস্থিত তাবকা, জ্যোৎস্নাধৌত-রজনী, নক্ষত্র-মণ্ডিত ছায়াপথ এবং নদীকলস্থিত দেব-মন্দির স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি কবিতায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এষ্ট সকল কবিতার অপেক্ষা যেগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইগুলিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আমরা নিম্নে সেইরূপ দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রাজত্ব করিত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটা পঙ্ক্তিতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কবি “আশ্বিনমাস” নামক কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

“স্বস্ত্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।

এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,

মহিষ-মর্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে ;

* * *

কি আনন্দ ? পূর্বকথা কেন কয়ে স্মৃতি,

আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ?

ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি ?”

এইরূপ “কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা” “দেবদোল,” “বিজয়াদশমী” প্রভৃতি কবিতাতেও কবির হৃদয়ের হিন্দুভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। দুঃখ যন্ত্রণার নিপীড়নে মর্গাহত হইয়া তিনি, শাস্তির জন্ত, বাগদবীর চরণে কিরূপ শরণাপন্ন হইতেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন ;—

* মূল পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ স্মরণ করিয়া, গ্রন্থকারকে তাহা হইতে এই পঙ্ক্তি বলিয়াছিলেন।

“তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
 পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়াব চরণে ;
 তথাব জন যথা ছেবি জনবতী
 নদীরে, তাহাব পানে ধায় বাগ্র মনে,
 পিপাসা নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
 জলে যবে প্রাণ হাব ঢুখেব জলনে.
 ধরে বাণ্ডা পা ডুখানি, দেবি সরস্বতী ।”

মধুসূদন জীবনে অধিক শাস্তিভোগ কবিত্তে পাবেন নাই ; অশান্তি ও উদ্বেগ লটুয়াই তাঁহার দিন অতীত হইয়াছিল । হৃদয়ে যে সকল আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাব অধিকাংশই বিফল হইয়াছিল ; তিনি তাহাব উল্লেখ করিয়া, “নূতন বৎসব” নামক কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

* * * “হৃদয়-কাননে
 কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল,
 হায় বে কব তা কারে, কব তা কেমনে ?
 কি সাহসে আবাব বা রোপিব যতনে
 সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল ?
 বাড়িতে লাগিল বেলা, ডুবিলে সমুদ্রে
 তিমিরে জীবন-রবি :—আসিছে বজনী—?”

নিজের যুরোপ-প্রবাসের বিষাদময় অভিজ্ঞতা লটুয়াও মধুসূদন একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার প্রতিবাসিগণ, তাঁহার দুর্দশা অবগত হইয়া, তাঁহাব দ্বাবে আহাৰ্য ও শিশুগণেব জগ্ন দৃষ্ট রাখিয়া যাইতেন ; মধুসূদন “সাংসারিক জ্ঞান” নামক কবিতায় তাহাব উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

“কোন জন দিবে অন্ন অর্ধ মাত্র থায়ে,
 ক্ষুধায় কাতর তোবে দেখি বে তোরণে ?”

কিন্তু এত ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে, সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ;—

“উদাসীন দশা তাব সদা জীব-পুরে
 যে অভাগা রাঙাপদ ভজে, মা ভারতী !”

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের দয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ;—

“বিজ্ঞার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে !

করুণার শিক্ত তুমি, সেই জানে মনে,

দীন যে, দীনের বন্ধু !”

এইরূপ “ভারতভূমি,” “আমরা,” “যশ,” “অর্থ,” “কে কবি” ইত্যাদি কবিতা হইতে পাঠক মধুসূদনকে চিনিতে পারিবেন। বাহিরে উদাসীনের ছায় থাকিলেও অন্তরে, স্বদেশের জগ্ন, তিনি কিরূপ, বেদনা অল্পভব করিতেন, প্রথমোক্ত কবিতা দুইটি তাহার প্রমাণ। ‘আমরা’ শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন ;—

“আকাশ পবনা গিরি দমি গুণ-বলে

নির্মিল মন্দির যারা স্বন্দর, ভারতে

তাদের সম্ভান কিহে আমরা সকলে ?

আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে ;—

পরাদীন, হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে।”

তাঁহার যে প্রেমপিপাসু হৃদয়ের বিষয় আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, অনেকগুলি কবিতায় তাহাও উচ্ছ্বাস বাক্ত হইয়াছে। আত্মসংযমের অভাবে তাঁহার প্রেম ভোগাসক্তিতে পরিণত হইলেও তাহাতে প্রগাঢ়তার অভাব ছিল না। মধুসূদনের প্রেম-পিপাসাপূর্ণ একটা কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

“প্রফুল্ল কমল যথা স্নানমল জলে

আদিত্যের জ্যোতি দিয়া আঁকে স্মরতি ;

প্রেমের স্তবর্ণ বড়ে, স্তনেত্রা যুবতি,

চিত্রেছ কে ছবি তুমি, এ হৃদয়স্থলে,

মোছে তারে হেন কার আছে লো শক্তি ?

যত দিন ভ্রমি আমি এ ভবমণ্ডলে,—

সাগর-সঙ্কমে গঙ্গা কবেন যেমতি

চিরবাস, পরিমল কমলের দলে ;—

সেইরূপ থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,

যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;

যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।

প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আধারে।

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-স্মৃষ্ট ঘটে ;—

সত্যত সন্ধিনী মোর সংসার মাঝারে।”

নিজের অতীত জীবন যেকল্প অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে গত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি, অল্পতপ্ত হৃদয়ে, “ভূতকাল” নামক কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

“কোন মূল্য দিয়া পুনঃ কি নি ভূতকালে ;
—কোন মূল্য— এ মজ্জণা কারে লয়ে কবি ?
কোন ধন, কোন মুদ্রা, কোন মণি, জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য লাভ ? কোন দেবে স্মরি,
কোন যোগে, কোন তপে, কোন ধর্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ শিক্ষা দীক্ষার্থে যারে গুরুপদে ববি ?”

চতুর্দশপদী-কবিতাবলীর সঙ্গেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর আর তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি নাই। যুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সময়ে, সেই সকল ভাষার সাহায্যে, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিমতী করিবার জন্য, তাঁহার যে বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়াছিল। নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি বঙ্গভাষার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিষাদময়ী কবিতাটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া, আমরা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমালোচনা শেষ করিব। বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

“বিসর্জিব আজি মাগো, বিশ্বতির জলে
হৃদয়-মণ্ডপ, হায় ! অন্ধকার করি
ও প্রতিমা। নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে, অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুকাইল ছরদৃষ্ট, সে ফুল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিশ্বরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম ! ডুবিল সে তরি
কাবানদে খেলাইলু যাহে পদ্মতলে
অন্নদিন ! নারিলু, মা, চিন্তিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি ! ডাকিলা যোবনে
যদিও অধম পুত্র, মাকি ভুলে তারে ?
এবে ইঙ্গপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে ।”

মধুসূদনের যুরোপ-প্রবাসকাল এইরূপে সমাপ্ত হইল। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মধুসূদনের যুরোপ-প্রবাসকালীন, অনেকগুলি পত্র আমরা প্রবাসকাল সমাপ্তি উদ্ধৃত করিয়াছি; আর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। মধুসূদনের যুরোপ-প্রবাসকালে বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেন। মধুসূদনের পিতার সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ছিল। মধুসূদন, মনোমোহন বাবুর জননীকে সাস্থনাদানের জন্ত, এই পত্র লিখিয়াছিলেন। পাঠক ইহাতে একদিকে মধুসূদনের স্বভাব-কোমল, স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের, এবং অপরদিকে তাঁহার অলঙ্কার-বিশ্বাস ও শব্দাঙ্কুর প্রিয়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া, আমরা ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। মেঘনাদবধ ও বীরাক্ষনা-রচনার পরেও মধুসূদনকে এরূপ ভাষায় পত্র লিখিতে দেখিয়া আমাদেরিগেব মনে হয় যে, তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে তাঁহার বাঙ্গলাভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অপ্রকৃত নয়।* বাস্তবিকই ভাব ও কল্পনা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আনিত, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে হইত না।

ত্রীচরণ কমলেশু।

জেঠা মহাশয়ের স্বর্ণ-প্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্বস্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবা মাত্রই আমার জ্ঞী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া, তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যাযুসারে সাস্থনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, স্মৃতির ইহা কখনই আপনার নিকট অবিস্মৃত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন স্মৃতি প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশা-

* I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves;—words that I never thought that I knew. Here is a mystery.

লতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য হইয়া, দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব, এবং আমি কিস্তিকালের নিমিত্ত নির্বাণস্নেহাগ্নি পুনর্বীর পদ-সেবা করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এ দেশ হইতে অতি অরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোনমতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্বাদাকাজ্জ্বলী

দাস মধুসূদন দত্তস্বা।

শেষ জীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেষ্টিংসবধ

ও মায়াকানন ।

[১৮৬৭—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ]

১৬

পাঁচ বৎসর কাল প্রবাসের পর, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মধুসূদন য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । মাস্ত্রাজ প্রবাসকালের জায়
এবারও তিনি দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন
য়ুরোপ হইতে স্বদেশে করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার অবস্থা কতই বিভিন্ন !
প্রত্যাগমন ।

মাস্ত্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে, পিতামাতার মৃত্যুতে, এবং আত্মীয় বন্ধুগণের ব্যবহারে, তিনি আপনাকে প্রকৃতই অনাথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যয় থাকিলেও, তখন তাঁহার আশা প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল । বঙ্গীয় সমাজের নিকট তখন তিনি একরূপ মৃত ছিলেন বলিলেও হয় ; দুই একজন সহৃদয় সহৃদ ভিন্ন কেহ তখন তাঁহার সংবাদ রাখিতেন না । কিন্তু বিধাতার অন্তকূলতায় এখন তাঁহার জীবনেব এক নূতন দিন আরম্ভ হইয়াছিল । এখন তিনি মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি, ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং ভাবতের সর্বপ্রধান বিচাণালয়ের ব্যারিষ্টার । বিজ্ঞা, বুদ্ধি এবং পদমগাদা, এখন, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশের গৌরবস্থল কবিয়াছিল ; তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কাব্যসমুহের যশ-সৌভ সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । কত হৃদয় তাঁহার অগোচরে, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত, তাঁহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিত, এবং উৎসুকভাবে তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত । স্বদেশের এবং স্বজাতীয়গণের গৌরবস্থল ও কল্যাণভাজন হইয়া তিনি এইরূপে জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন । যে মহাত্মা, তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে অপবিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দয়ার বিরাম ছিল না । বিজ্ঞাসাগর মহাশয়, মধুসূদনের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য, পূর্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাঁহার এবং অগ্ৰাণ বন্ধুগণের সাহায্যে, নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন । তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার

প্রয়োজন নাই। তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্য নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায় ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়।

বিন্দুমাত্রও লাভবান হয় নাই। ব্যবহারশাস্ত্রে উন্নত করা দূরে থাকুক, তিনি নিজের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমকালীন দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি বস্তু যেকোন গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি কবি—কবির জায় কল্পনা-নেত্রে জগৎ দর্শন করিতেন। ভাবের তরঙ্গে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিমগ্ন হইয়া যাইত। ব্যবহার শাস্ত্রের কূটত্ব তাঁহার স্বভাব-সরল কবি-প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। হিন্দু-পেট্রিট-পত্রিকা তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে, *nursed on the lap of poetry he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law.** অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতি বাস্তবিকই এরূপ ছিল যে, তাহা ব্যবহারজীবের উপযুক্ত নহে। বিচারকদিগের সম্বন্ধি-সাধন করিয়া কারোঁক্কাব কবিবার কৌশল তিনি একেবারেই অবগত ছিলেন না। হাইকোর্টের তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিচারক, গর্বিতস্বভাব সার লুই জ্যাকসনের সহিত তাঁহার প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার অকৃতকার্যতা একটা প্রধান কারণ ছিল; বিচারকগণ তাঁহার বক্তৃতায় প্রীতিলাভ করিতেন না। এই সকল কারণে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তিনি একেবারেই অকৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা নয়; তবে তাঁহার জায় প্রতিভাবান ব্যক্তির নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা হয় নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার অকৃতকার্যতার কথা বলিতেছি। প্রথম, প্রথম তাহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ আশার চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া তাঁহার নাম, পূর্ব হইতেই, সকলের পরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক, অন্যান্য দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অপেক্ষা অন্তকালের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আয় মাসিক এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বড় উন্নতি হয় নাই; বরং তাঁহার প্রথমার্জিত প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। এবং শেষে, উপায়াস্ত্রের অভাবে, তিনি প্রিভিক্যাউন্সিলের অগ্রতম অগ্রবাদকের কার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। “চকলা ধনদার” প্রসাদলাভের জন্য

তিনি জননী বাগ্দেরীর আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মপত্নীর সেবা করিতে দেখিয়া বাগ্দেরী তাঁহাব হৃদয়মান্দ্রি হইতে অস্তর্ধান করিলেন; কিন্তু কমলাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। মধুসূদন, রত্ননাভের আশায়, রত্নাকরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু রত্ন প্রাপ্ত হইলেন না; তাঁহার মুখ কেবলই ক্ষারবারিতে পূর্ণ হইল।

যুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।
সাহিত্য-সেবা। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি, বাঙ্গালা সাহিত্যের জ্ঞাত,

বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থ উপার্জনের চেষ্টাতেই তাঁহার দিন গত হইত; বাগ্দেরীর মেবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তবে তাঁহার গায় আজন্ম-কবির পক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একেবারে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; সেই জন্ত, মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের সেবা না করিয়া, তিনি নিরন্তর থাকিতে পারিতেন না। যুরোপ-প্রবাসকালের গায়, এখনও তিনি, দুই একটি নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া, গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সকল অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে তিনখানির কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথম নীতিমূলক কবিতামালা, দ্বিতীয় হেক্টরবধ, ও তৃতীয় মায়াকানন। নীতিমূলক কবিতাগুলি, “Æsop’s Fables” (Aesop’s Fables) আদর্শে, বাঙ্গালা নীতিমূলক কবিতা। কথামালার প্রণালীতে, লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থ-

ভাবক্লেশ দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্ত, মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার মধ্যে অনেক গুলি অতি সুন্দর। বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের কয়েকটা সাধারণের স্পর্শিত হইয়াছে।* তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণী পত্রিকাতে কয়েকটা প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটা এখনও অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। শেষোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে একটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

অশ্ব, নবতরুণ দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।

নিভা নিশা অবশেষে শিশিরে সরস তরুণী অতি।

বড়ই সুন্দর স্থল, অদূবে নিখর জল,

তরু, গজা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলি কুল;

* রসাল ও স্বর্ণলতিকা, মেঘ ও চাতক, নৃপ ও মৈনাক ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ।

২

কিছুদিনে উজ্জল নয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন ।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাগানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
“হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাই ॥”

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরন্তিল কুরঙ্গ বিহার ;
থাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে করিল পান নির্ঝরে ;
পরে যুগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্থামী যথা বলী স্বত্ব বলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজ-বাজি কিম্বা স্বপ্ন ! নয়ন মুদ্রিলা ;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জলে ;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল ।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে যুগবর কহিলা, “ওরে বর্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সং পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত ।
কুরঙ্গের উজ্জল নয়ন ভাঙিল সযোষে যেন দুইটা তপন ॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় !
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বৃক্ষি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয় ?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত ;
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত ।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত ।
কিন্তু সোভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়াছলে
কছু না পড়িত ।

৮

কহিল তুরঙ্গ ;—পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাবী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি ঢই জনে চোর ॥”

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, “হা ! একি বিড়ম্বনা ।
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকূলে স্বামী,
শাছুলে, সিংহেরে নাশে, দক্ষে বন বিষম্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে দন্তবীণ অসি,
তা’হলে বিজয় লভা যায় ।”

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাকে পৃষ্ঠে তুষ্ট সাদী অমনি চড়িল ।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাড়কায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায় ।

মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্ত মতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায় ।

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে স্থলের নিকেতন ?

দিনান্তে হইলা বন্দী আধার শালায় ।

পরের অনিষ্ট হেতু বাগ্র যে দুর্মতি,

এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;

ছায়া সম জয় যায় ধর্মের সংহতি ।

উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে পাঠক অন্তরমান করিতে পারিবেন যে, বিষয়ের জ্ঞায় সহজ সরল বিষয়েও মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইত। নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হেক্টর বধ ।

রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হেক্টর বধও এই বৎসর প্রকাশিত হয়। যাহার সহিত বাল্যাবধি মধুসূদন “প্রণয়-সূত্রে চিরপ্রথিত” ছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-স্বহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে। হেক্টরবধ মধুসূদনের গ্রীকভাষার ও হোমরের প্রতি অনুরাগের ফল। ঐয়-রাজকুমার, মহাবীর হেক্টরের মৃত্যু ইহার প্রতিপাত্ত বিষয়। মধুসূদন ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইলিয়দের ষাদশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয় লইয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গদ্য রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগিনী ছিল না। যে অতিরিক্ত অলঙ্কার-বিজ্ঞান-প্রিয়তা তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থগুলিকেও, স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য ও কৃত্রিমতা-পূর্ণ করিয়াছে, গদ্যে তাহার আধিকা হইলে তাহা কখনই পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে না। হেক্টরবধের ভাষা ব্যাকরণভৃষ্ট, গ্রাম্যতা-পূর্ণ এবং আত্মোপাস্ত পাশ্চাত্য-ভাবান্তপ্রাণিত বলিয়া, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য। “পাণ্ডুগণ্ডশঙ্কা,” “পিত্তল-পদ,” “কুক্ষিত-ক্লান-কেশর-মণ্ডিত-অব,” “ভূ-কম্পকারী জলদলপতি” এবং “পাতালক্লতবসতি দেবগণ” ইত্যাদি পদগুলি, পাশ্চাত্যভাষাভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কোনরূপে অর্থবোধক হইলেও, সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। “রণিলে,” “নিবেদিলে” “প্রদানিবেন” ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি, পদ্যে বিশেষ আপত্তিজনক না হইলেও, গদ্যে কখনই প্রয়োগ-যোগ্য নয়। তবে হেক্টরবধের ভাষার এই একটি গুণ আছে যে, হোমরের ভাষার আদর্শে গঠিত বলিয়া, ইহা তেজোময় ও উৎসাহোদ্দীপক। দোষগুণ

সমস্ত লইয়া হেক্টরবধ সম্বন্ধে এ কথা বলিলে অসম্ভব হইবে না যে, মধুসূদন এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করিলেই ভাল করিতেন। নীতিমূলক কবিতামালায় জায় এখানিও বিজ্ঞানসম্মত হইলে তাঁহার অর্থাত্ত্ব ক্লেশ দূরীভূত হইবে, এই প্রত্যাশাতেই তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হেক্টরবধের সঙ্গে মধুসূদনের সাংগিতিক জীবন প্রায় শেষ হইয়াছিল, স্ত্রীত্যাগ এইবার আত্মা তাঁহান অস্তিমজীবনের বিবাদমণ্ডল উল্লিখিত বর্ণনায় অস্তিম জীবনের কথা। প্রবৃত্ত হইবে। তাঁহাও হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব মধুসূদন

ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহাও মধ্যে নানাধিক পাঁচ বৎসর তিনি তাইকোটে বাবিষ্টাবী কবেন। বাবিষ্টাবী ব্যবসায়ে তিনি কতদূর কল্যাণ হইতে পারিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাবিষ্টাবী দ্বারা তিনি যেকদর আশা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই, অথচ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবসে সন্তোষ ছিল না। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাশ্রী এবং পদমর্গদর্শক ও সম্ভবব্যবস্থা জ্ঞান তিনি পূর্ণ করিয়া, অবস্থাভিত্তিক ব্যবসা করিতেন। মান্যকরে “সুযোগ প্রবাসকালে অর্থভাবে নিদ্রাভাণ্ড ক্লেশ ভোগ করিয়া ও তাঁহার চৈতন্য হ্রাস নাই, অনেক সময় তিনি, নিশ্চিন্ত চিন্তিত আনন্দভোগে জাহ্নব, অকালে, অথবা সামান্য কারণে, প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। যে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি সুযোগ প্রবাসকালের ব্যয় নির্বাহার্থে ঋণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া ও তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। স্ত্রীত্যাগ ঋণভার স্বল্পে লইয়াই তাঁহাকে প্রথম হইতে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এদিকে ব্যয়েব অনুরূপ আয় ছিল না। স্ত্রীত্যাগ মধুসূদনের পূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অশান্তিও ক্রমাগত বর্ধিত হইতে লাগিল। কেবলই যে উচ্ছ্বাসময় অথবা বিনামিত্য অর্থব্যয় হইত, তাহা নয়, অনেক সদস্যগণের তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুগোচর ও মমতা ছিল না, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বলিতেন যে, কাশ্যাক ও সাহায্য কবিবাস সমগ্র, মধুসূদন কখনও গণনা করিয়া টাকা দিতেন না। একমুষ্টিতে বা দ্বিমুষ্টিতে যাহা উঠিত, তাহা দিয়া প্রাণিকের বিদায় করিতেন। একদা ব্যক্তির পরিচিত অর্থে সঙ্কলন হওয়া সম্ভবপর নয়। যতদূর কিছু সম্ভব থাকিত, সংকার্যেই হউক, আব অসং কার্যেই হউক ধর্ম্মমুষ্টির জায় মধুসূদন ব্যয় করিতেন, তাহার পর, অর্থাত্ত্ব হইলেই, ঋণের জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া বেড়াইতেন। নিজের সংসারনির্বাহের জগৎ, তবুও, তিনি কিছু ঋণ কবির আনিয়াতেন, সেই সময় কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় অথবা কোন

দারিত্র্যপীড়িত পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইলে, নিজের দুরবস্থা সবেও, মধুসূদন তাঁহাকে একবারে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পাবিতেন না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে বাল্মীকী ব্যারিষ্টার ও উকীল মাত্রই পরম আস্থা দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন, অপর সকলের জায় কেবলই, মৌখিক আনন্দ প্রকাশ কবিতা নিরন্তর থাকিতে পারেন নাই। সমবাসসায়ী ও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক স্নানভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কাবণেও মধ্যে মধ্যে বায় হইত। উদারতা ও দানশীলতা, কখনও কখনও মাত্রাধিক হইয়া দাঁড়াইত। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার মধুসূদনের এক বাল্যস্বহৃদ* তাঁহার কোন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া, মধুসূদনের নিকট একটা মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন পরামর্শ দান করিলে, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তাঁহার নির্দিষ্ট অর্থাত্মার ও উদারতা।

পারিশ্রমিক দিতে উত্তর হইলেন, কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ কবিলেন না। ভদ্রলোকটি বিদায় লইলে মধুসূদন তাঁহার বাল্যস্বহৃদকে বলিলেন, “ভাই ! তুমি যখন উঁহাকে আত্মীয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই উঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারি না। কিন্তু আমার গৃহে আজ একটি কপর্দকও নাই ; যদি তোমার নিজের টাকা সঙ্গে থাকে, তবে, পাঁচটা টাকা ঋণ দিয়া, আমার জীকে বলিয়া আইস, যেন উপযুক্ত সময়ে আমার আহাৰ্য প্রস্তুত হয়।” একদিকে তাঁহার এইরূপ উদারতা দেখিয়া যেমন আমাদের আনন্দ হয়, অপবদিকে গৃহীত ঋণ পরিশোধেব চেষ্টায় তাঁহার ঔদাসীন্যের বিষয় স্মরণ করিলে আমাদের ক্লেশ বোধ হয়। অর্থাত্মার হইলেই তিনি ঋণ করিতেন, কিন্তু কোথা হইতে যে সে ঋণ পরিশোধ হইবে, সে সম্বন্ধে একবারও চিন্তা করিতেন না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার যুরোপ প্রবাসকালে গৃহীত ঋণের কিয়দংশ অপরিশোধিত ছিল ; তাঁহার উপর আরও নূতন নূতন ঋণ হইয়াছিল। শেষাবস্থায় তিনি ঋণভারে একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সামান্য দোকানদার ও দাস, দাসী হইতে আরম্ভ কবিতা আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, নানাশ্রেণীর বহু ব্যক্তির নিকট ঋণ রাখিয়া পবলোক গমন করিয়াছিলেন। কাহাকেও বঞ্চনা করিব, মধুসূদন, কখন, স্থগেও সে কথা মনে করিতেন না। কিন্তু প্রবঞ্চক না হইলেও, বিষয়বুদ্ধির ও কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবে তাঁহার ব্যবহার,

সময়ে সময়ে, প্রবন্ধকেরই জায় প্রতীয়মান হইত। ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগও, ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছিল। বাল্যাবধি যে সকল কু-অভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে তাহা সংশোধিত হয় নাই। বরং ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার বিষময় ফল তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন। মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগ দ্বা কবিবার জ্ঞান তিনি, হয়, কবিতাব না হয় মদিবাব আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। একপ অবস্থায় বচিত কবিতা আব যে সেই পূর্ব প্রতিভাব অনুরূপ হইবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহাতে কবিত্ব বা সৌন্দর্য না থাকুক, তাহার দুই একটি স্থল কবিব তাৎকালিক মানসিক অবস্থাব স্ববাক্ত সাক্ষাদান কবে। ভগবতী বাগ্দেরী জায় কমলাবও অন্তগ্রহভাজন হইবেন, দূর্তাণ্য কবিব এই বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতাব প্রতিকূলতায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি, নিবাস-হৃদয়ে, কমলাকে সম্বোধনপূর্বক, লিখিয়াছিলেন;

“ভেবেছিহু, মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরি !

নিবাইবে সে বোঝা, লোকে যাহা বলে

ভ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জলে।

ভেবেছিহু, হায় ! দেখি ভ্রান্তি ভাব ধরি

ডুবাছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী ;

অদয়ে ! অতল দুঃখসাগরের জলে

ডুবিহু, কি যশ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?”

সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই যে তিনি বাগ্দেরী ক্রোড়ে বিশ্বামলাভের চেষ্টা করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অংশেই প্রদর্শন করিয়াছি। এ সময়েও তাঁহার কবিতাতত্ত্বশীলনের বিবাম ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ত এইরূপ;—কিন্তু তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন যে, “একদিন, এই সময়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলে, তাঁহার কোন উত্তমর্গ ও তাহার অন্তচরগণ কোলাহল করিতেছিল ও তাঁহার প্রতি কটুক্তি করিতেছিল, আর উপরিতলে বসিয়া মধুসূদন, অব্যাহত চিন্তে, দাস্তের কবিতাব অন্তকরণ করিতেছিলেন; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।” কিন্তু মধুসূদন এখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে, আত্মবিশ্বাসিতর জ্ঞান, কবিতার অপেক্ষা অধিকতর উদ্বেজক কোন সামগ্রীর আবশ্যক হইয়াছিল। কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের যে যজ্ঞা দূরীভূত হইত না, মদিরায় তিনি তাহা প্রশমিত করিবার

চেষ্টা পাইতেন। ঋণজনিত অপমান যখন অসহ্য হইত, তখন তিনি অবিশ্রান্ত মদিরা পান করিতেন। তাঁহার গ্রাম প্রতিভাবান ব্যক্তিকে এরূপে আত্মঘাতী হইতে দেখিলে যে কিরূপ ক্রেশ হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কবে না। মধুসূদন নিজেও জানিতেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন; কিন্তু আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই ভাবিয়াই তিনি, স্তরাচ্ছলে, লিপপান করিতেন। যুরোপ-প্রবাসকাল হইতে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মনোমোহনবাবু মধুসূদনকে এ অবস্থায়, যথাসাধ্য সাহায্যে ও সাহসনাদানে জুটি কবেন নাই। তিনি বলেন, “একদিন, এই সময়, মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, বেলা দ্বি-প্রহবেক সময়, তিনি, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া, অতি উগ্র, জলস্পর্শশীল স্তরাপান করিতেছেন। আমি নিকটে যাইয়া বলিলাম, ‘এ কি, আপনি এ কি করিতেছেন? তাঁহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?’ মধুসূদন বলিলেন, ‘মনোমোহন,

মানসিক যন্ত্রণা হইতে তুমি আমার কি তবে ইচ্ছা যে আমি নিজের কণ্ঠে নিজে অজ্ঞাঘাত করি?’ মনোমোহন বাবু বলিলেন, ‘সে কি, মুক্তি লাভের চেষ্টা।

আমি তাহা বলিব কেন?’ মধুসূদন বলিলেন, ‘এই দ্বি-প্রহরের সময়ে, এরূপ ভাবে, স্তরাপানের পরিণাম যে কি, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু আমার আর উপায় নাই। কণ্ঠে অজ্ঞাঘাত করিলেও যাহা, এইরূপ স্তরাপানের পরিণামও তাহাই ঘটিবে। তবে অজ্ঞাঘাত অপেক্ষা ইহাতে আপাততঃ, ক্রেশ অল্প বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্তে স্তরা ব্যবহার করিতেছি।’*

হতভাগ্য করিব শেষজীবন কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, এই একটা মাত্র ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এরূপ শারীরিক অবস্থা। অত্যাচারের ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণাম যেরূপ

হইবার সম্ভাবনা, ক্রমে সেইরূপই হইল। অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত লইলেন। দ্রোগ এক প্রকারের নয়। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, জুংপিণ্ডের ফ্রিয়াবাতিক্রম প্রভৃতি, নানাবিধ চক্ষিকিৎসা ব্যাধি, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিধাতা তাঁহাকে যে অনবণ্ড স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন, নিজের অত্যাচারের ফলে, তিনি তাহা হইতে

* মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের শেষকথাগুলি অবিকল এই :—This is a process equally sure but less painful.

এইরূপে বঞ্চিত হইলেন। যন্ত্রণাব্যাপ্ত পবিত্রীমা বহিল না। একে অর্থাত্তাব, তাহাব উপব পীড়ার যন্ত্রণা। মধুসূদন, ধীবতার সছিত যদিও এসকল সছ কাবতেন, কিন্তু তাঁহাব ঋণদাতাগণ যে, প্রতি পদে, তাঁহাকে কাবাগাবে প্রেবণেব ত্রীতি প্রদর্শন কবিত, তাহাট তাঁহান সর্বাপেক্ষা ক্লেশকল বোন হইত। ঋণদানে কাবাগাবে মৃত্যুব অপেক্ষা আত্মহত্যা কবাই তিনি শ্রেযঃ বলিগা মনে করিতেন। কবিজীবন দুঃখময় ইতা চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু এমন মমাস্থি দুঃখ বুকি পৃথিবীর অতি অল্প কবির জীবনেই ঘটিযাছে। ব্যাবিষ্টাবী ব্যবসায়ে আব কোন উন্নতিব আশা নাট দেখিগা, মধুসূদন, এই সময়, মানভূমেব অন্তর্গত

পঞ্চকোটের রাজাব
অধীনে কাগ।

পঞ্চকোটের বাজাব আইন উপদেষ্টাব (Legal adviser)

পদ গ্রহণ কবিতাছিলেন। কাষটি স্থায়ী হইলে আব

কিছু না হইত, তাঁহাব অন্নাতাব ক্লেশ দবীভূত হইত,

সন্দেহ নাহত কিন্তু বাজাব চপনতায় বিবক্ত হইয়া অল্পদিনেব মধো, তিনি এই কাষনাগ কবিতা বাদ্য হইযাছিলেন। তিনি যে অবস্তাতেই থাকুন, কোন অবস্তাতেই কবিতাশ্রমণনে পবাস্থ্য ছিলেন না। মানভূমে অবগান কাগে তিনি যে সকল কবিতা লিখিতাছিলেন, তাহাব মধ্যে তিনটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতৈছি। মধুসূদনের কবিতায় আব সেই পূর্বব হেজ ছিল না। সে সত্য অন্তর্গত হইযাছিল, এখন কেবল তাহাব দীপ্তিহীন প্রতিবিম্ব-মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তথাপি, মধুসূদনেব শেষজীবনেব রচনা বলিগা, আমবা তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটা পঞ্চকোট-শৈলদর্শনে, দ্বিতীয়টি পঞ্চকোট বাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য কবিতা এবং তৃতীয়টি, রাজাব ব্যবহাবে দুঃখিত হইয়া, কাষপরিভাগের সময়, লিখিত। শেষ কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি অসম্পূর্ণ বহিযাছে —

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মহো বজ্র গ্রহবণে

পর্বতকূলের পাথা ; কিন্তু ধীনগতি

সে জগত নহ তে তুমি, জানি আমি মনে,

পঞ্চকোট। রয়েছে যে,—লক্ষ্য যেমতি

কুন্তকর্ণ,—বক্ষ, নর, বানসেব লগে—

শুল্লপ্রাণ, শুল্লবল, তবু ভীমাক্রতি,—

বয়েছে যে পড়ে তেথা, অস্ত্র সে কারণে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যার স্বৰ্ণজ্যোতি
উজ্জলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভাস্কর কাস্তি । তেয়োগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে ! এ স্থলে,
মনোহুঃখে মোনভাব তোমাব ; কে পারে
বুঝিতে কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহার! ফনি তুমি রহেছ আধারে ॥

পঞ্চকোটস্থ রাজকী

হেরিষ্ঠ বমারে আমি নিশার স্বপনে ;
হাটু গাড়ি হাতী ছুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরি—
পদ্মাসন উজ্জলিত শত রত্ন করে,
দুই মেঘরাশিমাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন । রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ ; হেরিষ্ঠ নয়নে,
সে কমলাসন মাঝে ভূলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস সদনে ।
কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে)
বিবিধ আছিল পুণ্য তোমার জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যে রূপে করেন বাস চির রাজ-ধবে
পঞ্চকোট ;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি ।

পঞ্চকোটগিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিষ্ঠ, গিরিবর ! নিশাব স্বপনে, অভূত দর্শন
হাটু গাড়ি হাতী ছুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে ।
কমল-আসন এক দীপ্ত রত্ন করে দ্বিতীয় তপন ।
যেই রাজকুল খ্যাতি তুমি দিয়াছিল,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন ।

হে সখে ! পাষণ্ড তুমি তবু তব মনে
ভাব-রূপ উৎস, জানি, ওঠে সর্বক্ষণে ।
ভেবেছি, গিরিবর ! রমার প্রসাদে, তাঁর দয়া বলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জল পূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায় ; ধস্তর্বাণ ধরি ঞ্চারিগণ,
অতি কুতূহলে আবার রক্ষিবে দ্বার ।

১৮৭২
১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে, মধুসূদন মানভূম পরিত্যাগ পূর্বক, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব হইতেই নানাবিধ পীড়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল ; সুতরাং নিয়মমত নিজের ব্যবসায় চালাইতে তিনি সক্ষম ছিলেন না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।* মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল ; এই সময় তিনিও অতি কঠিন পীড়িতা হইলেন। পতিপত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসার ও পথোর অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার

ঃ মধুসূদন ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে কোন নগরে যাইলে আরই অভিনন্দন প্রাপ্ত হইতেন। ঢাকার জনসাধারণ পোগোজ ফুলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মধুসূদন তখন রোগে জীর্ণ এবং ঞ্ণভারে অবসন্ন ; নিজের দুর্দশার উল্লেখ করিয়া, একটি কবিতায়, তিনি ঢাকা নগরীর (প্রকারান্তরে ঢাকা নগরবাসীদিগের) নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অসহ্য ক্লেশ না হইলে অভিযানী মধুসূদন, সাধারণের নিকট, ঞ্ণগভাবে সাহায্যের ঞ্ণজ্ঞ দ্বিজিত করিতেন না। উল্লিখিত কবিতাটি এই ;—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বজ্র-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে । শোভ তুমি এ সূক্ষ্মর স্বানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী ॥
প্রতি ঘরে বাধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি ।
পীড়ায় দুর্বল অগ্নি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্গিলা মোরে (বিধির বিধান)
তব করে, হে সূক্ষ্মরি ! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি ।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
বৈপায়ন ব্রহ্মতলে কুক্কুল পতি ?
যুগে যুগে বহুকরা সাধেন সাধবে,
করিও না যুগা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি !

এবং তাহাব উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, স্বতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্যে এবং ঋণের দ্বাৰা সংসার নির্বাহ হইতেছিল, ক্রমশঃ উভয়ই দুস্ত্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃপ্রাপ্তিব আশা না থাকিলে কল জন ঋণ দান করিতে পারেন? গৃহসজ্জা, পবিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মধুসূদন দিনপাত কবিত্তে বাধ্য হইলেন; ক্রমশঃ তাহাও নিশেষ হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই, অন্নান্নাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে, কোন কোন দিন, অনশনে বা অর্ধাশনে থাকিতে হইত। স্তম্ভ থাকিলে, যে কোনরূপে ঠউক, তিনি কিছু কিছু উপাঙ্গন কবিত্তে পাবিতেন; কিন্তু শয্যাশায়ী

হইয়া তিনি আর কি কবিতেন? সে অবস্থায় যাহা সাংসারিক অবস্থা

সম্ভবপর, তিনি তাহার ক্রটি করেন নাই। স্মৃতিশেষ বঙ্গবঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ও অস্ত্রচাতুর্গণ, এই সময়, তাঁহাকে তাঁহাদিগের বঙ্গশালার জ্ঞা, একখানি নাটক রচনা করিতে অনুবোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের প্রত্যাশায়, মৃত্যুশয্যায় শয়ন কবিয়াও, তাঁহার শেষগ্রন্থ ‘মায়াকানন’ রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ-রচনা কবা সম্ভবপর ছিল না; নিজের বিবাদময় জীবনের প্রতিবিশ্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবনের জায় মায়াকাননও মর্মভেদী আত্মনাদের ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি মায়াকানন স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার অসম্বন্ধ কতকগুলি অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। বঙ্গবঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ, সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বচ্ছান্নরূপ সংযোজিত করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ কবিয়াছিলেন।^১

মধুসূদন স্বয়ং যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবিত্তে পাবেন নাই, তাহার দোষগুণ আলোচনা করিয়া কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। আমরা কেবল সংক্ষেপে তাহার অবলম্বনীয় বিষয় বিবৃত করিব। সিদ্ধুদেশে মায়াকানন নামে এক নিবিড় অরণ্যনানী বর্তমান ছিল। এবং তাহার অভাস্তরে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবীর এক পাখাণময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়াকানন সম্বন্ধে সিদ্ধুদেশে এইরূপ এক জনশ্রুতি প্রচারিত ছিল যে “যে লগ্নে দিনমণি

১। এ কথা ঠিক নয়। মধুসূদন আসলে ‘মায়াকানন’ সম্পূর্ণ ই করেছিলেন। প্রকাশিত ‘মায়াকানন’ গ্রন্থটি অল্প সম্পূর্ণত তাঁর রচনা নয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। —সম্পাদক

কণ্ঠাবাশিব স্তবর্গগৃহে প্রবেশ কবেন, সেই স্থানে যদি কোন পবিত্রসভাবা কুমারী, কি স্থপতি, অনুচ যবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা কবেন, তবে তিনি কুমারী হইলে প্ৰীত ভবিষ্যৎ পতিক, আর পুরুষ হইলে আপনাব পত্নীকে দেখিতে পান।” এই জনশ্রুতির উপর নিভব কবিয়া অনেক বিবাহপ্ৰার্থী পুরুষ ও বমণী মাযাকাননে উপস্থিত হইতেন। এক দিন সিদ্ধদেবে বাক্কুমার অজয় এবং গান্ধাব দেশের বাক্কুমারী ইন্দুমতী, উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পত্নী ও পতি সন্দর্শনের প্রত্যাশায়, পরস্পরবে অজ্ঞাতভাবে, মাযাকাননে প্রবেশ কবিয়া, উভকে সন্দর্শন কবেন। কিন্তু অজয় ও ইন্দুমতী সন্মিলন বিধাতাব অভিপ্রেত ছিল না। পরস্পরবে প্রথম সন্দর্শনের দুই বৎসব পবে, উভয়েই, নিবাস হ্রদয়ে, আত্মহতাব দ্বাবা দেবীর সন্মুখে যন্ত্রণার অবসান কবিত্তে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাট সংক্ষেপে মাযাকাননের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন তখন

মাযাকানন

যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা যন্ত্রণাব অবসান কবিবার ইচ্ছাট তাঁহাব হ্রদয়ে দিবারাত্রি জাগরক থাকিত। সেই জন্ম তাঁহাব বচিত্ত গ্রন্থে ও তাদৃশ ভাব পরিবাক্ত হইয়াছে। যে অবস্থায়, এই সময়, মধুসূদনকে দিনপাত কবিত্তে হইত, এবং যে অবস্থায় তিনি মাযাকানন রচনা কবিয়াছিলেন তাহা চিন্তা কবিলে ব্যথিত হইতে হয়। বোগেব যন্ত্রণায়, কখনও কখন, তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন; বক্ত-বমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া আসিত; অথচ তাহারই মধ্যে অর্থাভাব ক্লেষ কথঞ্চিৎ দূবীভূত হইবে ভাবিয়া, লেখনী হস্তে যখন যে ভাবটী হ্রদয়ে উদ্ভিত হইত, তাহা লিপিবদ্ধ কবিতেন। নিজের যখন লেখনী ধারণের সামর্থ্য না থাকিত, তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাঁহার দ্বাবা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন। এরূপ ভাবে বচিত্ত গ্রন্থ কতদূর নির্দোষ বা চিন্তাকবক হইতে পারে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন; সেই জন্মই আমবা বলিয়াছি যে, মাযাকাননের দোষগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করাই সঙ্গত।

নাটক-রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন আরক্ক হইয়াছিল, নাটক-বচনার সঙ্গেই তাহা এইরূপে সমাপ্ত হইল। মাযাকানন মধুসূদনের অগ্ৰাণ্ণ গ্রন্থেব জ্ঞায় বঙ্গসাহিত্যে স্তপরিচিত নয়; কিন্তু যিনি কবির জীবনের এই সময়কার ঘটনাবলী অবগত আছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার সময় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাব অনেক স্থল কবির হ্রদয়ের শোণিত দ্বারা লিখিত। হায়! প্রতিভায় সঙ্গে চরিত্র, নীতিজ্ঞান ও সাংসারিক বুদ্ধি মিলিত থাকিলে,

বোধ হয়, পৃথিবীর অনেক কবিরই জীবন তাঁহাদিগের কাব্যের ন্যায় শোকান্ত হইত না।

মায়াকাননের ন্যায়, “বিষ না ধনুর্গুণ” নামক আরও একখানি নাটক, মধুসূদন, এই সময়, বঙ্গরঙ্গভূমির জন্ত, লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ সাহায্য দ্বারা তাঁহার ক্লেশ স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বঙ্গদেশে সে সময় মধুসূদনের গুণ-পক্ষপাতী ব্যক্তির অভাব ছিল না; স্বতরাং মধুসূদনের দুঃবস্থা সাধারণের গোচর করিলে বঙ্গসমাজ যে তাঁহার দুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নিজের দুঃবস্থা নিজে সাধারণের গোচর করা মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; তিনি বরং সপরিবারে অনাহারে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও সন্তান ভিন্ন কাহারও নিকট কখনও নিজের দুঃবস্থা বাক্য করিতে পারিতেন না। যাহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ঋণ বা সাহায্য দান করিয়াছিলেন; স্বতরাং তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। নিজের দুর্দশার সূত্রপাত হইবার পরে মধুসূদনকে তাঁহার দুহিতা শর্মিষ্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল; জাষ্টিস্‌ ডারকানাথ মিত্র পত্নীত্ব অনেকেই সে সময় তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে একবার তাঁহার গ্রন্থাবলী উপহার প্রেরণ করিলে তিনিও মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় মধুসূদন যাহাদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক

পীড়িতাবস্থায় শেষ
সাহায্য।

উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষ, স্বদেশ-বৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের

নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্যে প্রশংসার প্রার্থী নহেন; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্যদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা, যত্নশয্যা পর্যন্ত, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের জ্ঞান বাবু মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে তাঁহার বিপদে সাহায্য কবিত্তে ক্রটি করেন নাই। ইহাদিগের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দশায় জীবন শেষ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাঁহার শিল্প

দুইটিকে প্রকৃতই রাজপথের ভিক্ষুক হইতে হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শেখাবস্থায় রোগের যন্ত্রণার অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, কিছুদিন, কলিকাতা হইতে অগ্রজ বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময় উত্তরপাড়ায় স্প্রসিদ্ধ জমীদার, স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার দুর্দশা অবগত হইয়া, সহৃদয়তার সহিত, তাঁহাকে

উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য, আহ্বান করেন।
উত্তরপাড়ায় বাস।

মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস উত্তরপাড়ায় গঙ্গাকূলবর্তী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীগৃহে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আরও একবার তিনি সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তাঁহার সংসাব নিবাহ হইত এবং জয়কৃষ্ণবাবু নিজে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন, এবং তাঁহার পবিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহায়ত্বে প্রাপ্ত হওয়াতে, মধুসূদনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বাবুর সহৃদয় ও পরদুঃখ-কাতর পৌত্র বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের নিকট সর্বদা অবস্থান কবিয়া তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায়, যতদূর সাহায্য-দান করা সম্ভবপর, তাহার কিছুই ক্ষতি করেন নাই। তাঁহার সম্ভাবনায় মধুসূদন পরম পবিত্রোষ লাভ করিয়াছিলেন।* উত্তরপাড়ায় মধুসূদন একরূপ মৃত্যুশয্যায়া শয়ান ছিলেন, বলিলেও হয়; কিন্তু সেখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিতাত্ত্বশীলনের বিরাম ছিল না। যে দিন একটু সুস্থ থাকিতেন, সে দিন, তাঁহার প্রিয় কবি মিল্টন ও দান্তে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিভ্রষ্ট করিতেন; এবং কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। মধুসূদনের শেষ জীবনের বিবরণ লেখক এবং পাঠক উভয়েরই পক্ষে ক্লেশকর। এক এক দিনের ঘটনা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শাস্তিতে প্রাণত্যাগ করে। এক দিনের একটা ঘটনা নিয়ে বিবৃত হইতেছে। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে গৌরদাস বাবু সর্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটা মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহূর্ত্ত বস্তু বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা, নিয়ে গৃহতলে পতিত

* মধুসূদনের উত্তরপাড়া-প্রবাসের বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন।

হইয়া, রোগের যত্নগার আর্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাসবাবু হেনরিয়েটাকে স্বর্জিতপ্রায় দেখিয়া তৎকালোচিত সাহায্য দানের জন্ত, অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিজের যত্নগার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেনরিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি, অতি কাতর স্বরে, গৌরদাস বাবুকে বলিলেন ; “আমার জন্ত চিন্তা নাট ; আমি মরিতে ভয় করি না ; যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।” গৃহের একদিকে এই দৃশ্য ! অপর দিকে একটি পায়ে কতকগুলি পর্ষুষিত অন্ন, ব্যঞ্জন পড়িয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটা, কিয়ৎক্ষণ পূর্বে, সেই পর্ষুষিত অঙ্গে উদরপূর্তি পীড়াকালীন ছরবহা। করিয়াছিল।* তাহাদিগেব ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আরুণ্ট হইয়া অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায় ! এই কি মেঘনাদবধের কবির উপযুক্ত অবস্থা ! যিনি কল্পনায়নে লঙ্কাপুরীর ঐশ্ব্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণনাগুণে, তাহা পাঠকের মনস্কর সম্মুখে অবতারণিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। আত্মক্লান্ত কাগেব পরিণাম অতিক্রম করা কাহাব সাধ্য ? মধুসূদন স্বহস্তে বিষতরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

উত্তরপাড়ায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া মধুসূদন, মৃত্যুর ৭৮ দিন পূর্বে, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া-
ছিলেন ; কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দকও আয়েব প্রত্যাশা ছিল না ;
ইহার উপর তাঁহার পত্নী, কতক্ষেণে পরলোক গমন করিবেন, এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্যাদিব ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবেন ? সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার হুহিতা শর্মিষ্ঠাব আশ্রয়ে বাখিয়া, তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য-
চিকিৎসালয়ে গমন। আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। হায় ! বন্ধের নবাকবি-শিবোমণির ভাগ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ছিল ! মধুসূদনের বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বন্দোপাধ্যায়

* নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর ‘মধুসূতি’ গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মধুসূদনের পুত্রের পর্ষুষিত অন্ন খাওয়ার কথা সত্য নয়। এ সবকে সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে বিপরীতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মহোদয় এবং মনোমোহন বাবু তাঁহার বোগশয্যায় সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ, তৎকাল, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ : কিন্তু তাঁহারা যদি, কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পরে, কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে না। যাহা হউক, উপায়ান্তরেব অভাবে, মধুসূদন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।* এতদিন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাহা চব্ব ম সীমায় উপনীত হইল। নিজের স্বথের জ্ঞাত, তিনি যে, জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া, স্বধর্ম ও স্বসমাজ পবিত্রাণ করিয়াছিলেন, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা, এতদিন পরে, তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মল্লস্থ যতই যন্ত্রণা ভোগ করুক, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলে তাঁহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। কিন্তু আত্মীয়, বন্ধুগণের মুখ দেখা দূবে থাকুক, তাঁহার মৃত্যু-শয্যাশায়িনী, হতভাগিনী পত্নী কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, মধুসূদনের পক্ষে তাহাও দর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন আগোপান্ত ভুখের কাহিনী বলিলেও অতুক্তি হইবে না। কিন্তু একরূপ মানসিক যন্ত্রণা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগেব মধ্যে যখন এক একবার তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নীর ও শিশু দুইটির কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। কখনও কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা বালকের জ্বায়, অধীরভাবে, ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার এবং পত্নীর পীড়া শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতিপত্নীর মধ্যে কে, অপরকে ফেলিয়া, অগ্রে পরলোক গমন করিবেন, ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকর্ষার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়া-ছিলেন, তথাপি বুঝি তাঁহার অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ;—তাই বিধাতা

* মধুসূদন বেখানে গেলেন, তা কলকাতার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। পরে এর নাম হয় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল (P. G. Hospital)। বর্তমানে এর নাম শেঠ হৃদয়াল কায়দানী হাসপাতাল। মধুসূদনের আরো এই হাসপাতালে কেবল ইটরোগীরাই ভর্তি হতে পেতেন। আসল কথা সে বুকে বাঙালী ছিলো। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ারকেই আপত্তিকর বলে করতেন। বোম্বাইর লোক এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

তাহার শিক্ষার জন্ত, শেষ দণ্ড বিধান করিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে, তাহার শেষজীবনের স্বথঃখতাগিনী, হেনরিয়েটা, হেনরিয়েটার মৃত্যু

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকগমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাঁতব্য-চিকিৎসালয়ে, মূৰ্ছা অবস্থায়, অবস্থান করিতেছিলেন ; তাহার এক পূর্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কাতরস্ববে বলিলেন, “জগদীশ ! আমাদিগেব দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ কবিলে না কেন ? কিন্তু আমাব আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই, হেনরিয়েটার অন্তবস্ত্রী হইব।” মধুসূদন যদিও বুঝিয়াছিলেন যে, তাহারও দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং অধিক দিন, সে অবস্থায়, তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না, তথাপি এই বিপৎপাতে তাহার হৃদয় একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান তাহার ছিল না ; বন্ধুবান্ধবগণের অল্পগ্রন্থে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। হতভাগিনী ‘পত্নীর সমাধিব উপব শেষ অশ্রুপাত করিয়া তিনি যে শাস্তিলাভ করিবেন, বিধাতা সে সৌভাগ্য হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত কবিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু ও মধুসূদনের আর দুই একটি স্বহৃদ হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ কবিয়া, দাঁতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে এই সংবাদ দিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি মনোমোহন বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, “কেমন মনোমোহন, সকলত ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে ? কোনও ক্রটিত হয় নাই ?” মনোমোহন বাবু বলিলেন, “না। আমাদিগেব এ অবস্থায় যাহা সম্ভবযোগ্য, তাহার কিছুই ক্রটি হয় নাই।”

মনোমোহন ঘোষ
সহশয্যের সহিত
কখোপকথন।

মধুসূদন তখন মনোমোহন বাবুকে বলিলেন, “মনোমোহন তুমি যত্নের সহিত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাকবেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয় ?” মনোমোহন বাবু বলিলেন, “কোন কয়টি পংক্তি ?” মধুসূদন বলিলেন, “লেডি-ম্যাকবেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাকবেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পংক্তি। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কোনও কথা আর আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই কয়টি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভ্রম হয় কিনা।” মধুসূদন, এই বলিয়া, ম্যাকবেথ হইতে স্পষ্টরূপে এই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন ;—

“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time ;
 And all our yesterdays have lighted fools
 The way to dusty death. Out, out, brief candle !
 Life's but a walking shadow ; a poor player,
 That struts and frets his hour upon the stage,
 And then is heard no more ; it is a tale
 Told by an idiot, full of sound and fury,
 Signifying nothing.”—

আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, “কেমন মনোমোহন, ঠিক হইয়াছে ত?” মনোমোহন বাবু বলিলেন, “ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সকল কথাগ প্রযোজন কি? আপনি আবোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।” মধুসূদন শুনিয়া একটু হাসিলেন। বোধ হয় সে হাসির অর্থ এই, আমি যে কিরূপ আবোগ্য লাভ করিব, আমার মনই তাহা বুঝিতেছে। পবে মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, “দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক এবং পাত্রীদিগকে পুষ্টাব দিতে পাবি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রণামী হতাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে, ইহা বা আমার একটু যত্ন কবিত। যদি প্রতিদিন একটা কবিতা টাকা ব্যয় কবিত পাবিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শাস্তি পাইতাম।” মনোমোহনবাবু বলিলেন, “প্রতিদিন একটা কবিতা টাকা? সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, যে উপায়েই হউক, তাহা সংগৃহীত হইবে।” তখন মধুসূদন বলিলেন; “মনোমোহন! তোমায় আব অধিক কি বলিব? আমার শিশুগুলি ঘেন অন্নভাবে প্রাণত্যাগ না কবে, এই দেখিও”। মনোমোহনবাবু বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজেব সন্তানগণের অন্নভাবে না হয়, তবে আপনার শিশুগুলির হইবে না।” * মধুসূদনের বিত্তক মুখ, ক্ষণ-কালের জন্য, প্রফুল্ল হইল; সন্মুখে মনোমোহন বাবু হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “মনোমোহন! জগদীশ্বর তোমাব কল্যাণ করুন।” মনোমোহনবাবু ইহার পব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মনোমোহনবাবুব সঙ্গে এই বিদায়ের পব মধুসূদন তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজেব অতীত জীবনের

* মনোমোহন বাবু সে সভ্য বিদ্বত হন নাই। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট মেনোজিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উত্তরে আলবার্ট, অধিকেন বিভাগের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে Sub-Deputy Opium Agent-এর কার্য করিতেছেন।

কার্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অবিস্মৃতকারিতার ফলেই যে তাঁহার হৃদয় ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্মান্তিক শেলের জ্বায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনায় ক্রটি স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া ও অসদাচারের পরিণাম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্বদিন, বেভারেণ্ড ক্লম্বমোহন নন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া

বলিয়াছিলেন, “আমি সেই দয়াময়ের ককণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি; তিনি যে, পানী, তাপীর উদ্ধারের ও প্রার্থনা।

জগৎ খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।” সংসার কেবল কর্মক্ষেত্র নয়, মানবাত্মার শিক্ষাক্ষেত্র। কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ সম্পদে, এবং কেহ বা বিপদে শিক্ষা লাভ করেন। রোগ, শোক এবং দরিদ্রতার কশাঘাত প্রাপ্ত না হইলে দুরন্ত মানব-সন্তানেব চেতনা হয় না। যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত, বিশ্ববিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে উষোধিত করেন। ভগবানের দুরন্ত সন্তান মধুসূদন এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; তাই সেই জ্বায়বান প্রভু, স্বীয় দয়াগুণে, তাঁহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্তে, তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন। আত্মরক্ত কার্যের অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিয়া, এবং যিনি চৈতন্যের প্রভু তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, মধুসূদন যে পৃথিবীর শিক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার প্রথম জীবনের দুর্নীতির কথা আমাদের আর স্মরণ থাকে না। যে দিন তিনি পরলোক গমন করেন, সেইদিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র, স্বর্গীয় জৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং বাঙালি শক্তির শক্তি তখন লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে বলিলেন, “জৈলোক্যমোহন! জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমার বলিবা।” কিন্তু আর বলা হইল না; প্রাণের বেদনা ভাব্য ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দান করিলেন না। সেইদিন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর ছইটার সময় তাঁহার

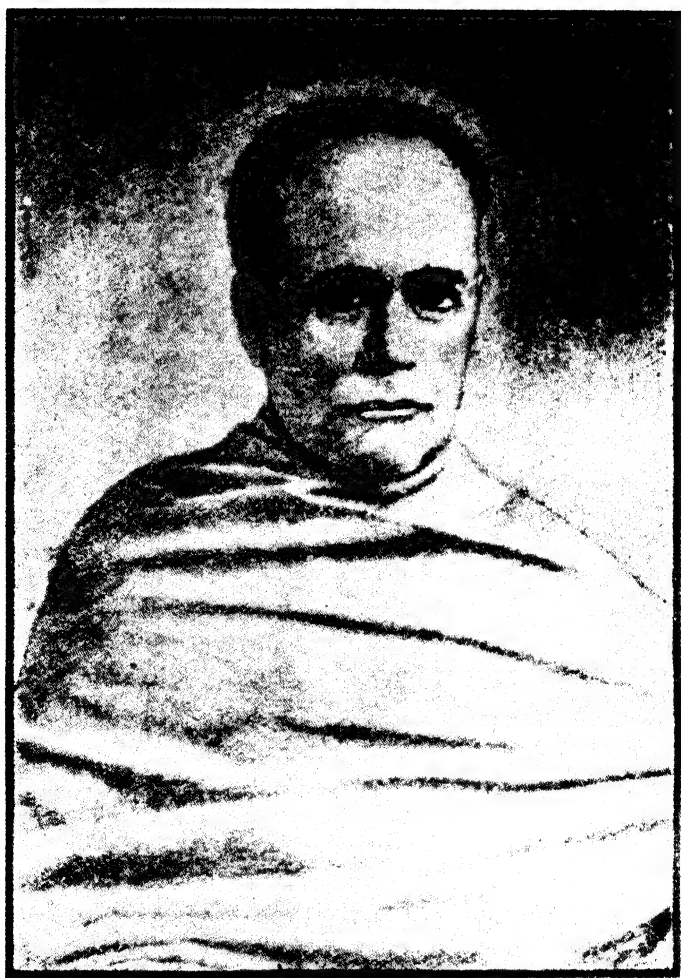
প্রাণবায়ু নিশ্বত হইল। বাংলা যাহার সেবার জন্ত দাসদাসীগণ ব্যগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্যার ক্রটি হয়, পরলোক গমন।

এই চিন্তায় যাহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভূতা ও স্তম্ভস্বাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডুষ দিবার জন্ত একজনও নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্কু ও অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এইরূপে পরলোকগমন করিলেন। যে কার্য সম্পাদনের জন্ত বিধাতা মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। জননীরূপিনী মাতৃভাষার সেবা করিয়া, এবং আত্মসংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা, প্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক, উর্ধ্বলোকে প্রস্থান করিল। সংসারের পিচ্ছিলবস্ত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি সংযত স্বভাব পুরুষকেও স্থলিতপদ হইতে হয়; মধুসূদনও হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে পৃথিবী হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ করিবে। স্থখে অথবা দুখে তাঁহার জীবন যেভাবে অতিবাহিত হউক, তাঁহার মানব-জন্ম ধারণ নিরর্থক হয় নাই; তিনি তাঁহার স্বদেশকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্ববিধাতা, তজ্জন্ত, অবশ্যই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। পরলোকে তাঁহার জ্ঞানপিপাসু আত্মা যেমন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহলোকেও তেমনই, তাঁহার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ, তাহার মাতৃভাষার সেবকগণ, কৃতজ্ঞচিত্তে, তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। যতদিন বাংলা-ভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ, সত্যই, তাঁহার কাব্যসমূহ হইতে

“জানন্দে করিবে পাম সুধা নিরবধি।”

উপসংহার

মধুসূদনের জীবনের বিবাদময়ী আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের সহিত তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া, মধুসূদনের গ্রন্থের ও জীবনের সৌন্দর্য্য। এবং তাঁহার অন্তর্স্থিত কার্যের সমালোচনা করিয়া, এইবার, আমরা, আমাদের গের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব। গ্রন্থ গ্রন্থ-কর্তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় তাহাতে গ্রন্থকারের মানস-মূর্তি প্রতিবিম্বিত থাকে। পৃথিবীর অন্তান্ত অনেক গ্রন্থকারের ন্যায় মধুসূদনেরও গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিলে আমরা তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পারি। একেই কি বলে সত্যতা ও চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। যে চিত্তবৃত্তি পারিবারিক ও সাহিত্যিক প্রত্যেক কার্যেই তাঁহাকে প্রণোদিত করিত; তাহারই ভাব-সাদৃশ্যের কথা বলিতেছি। মধুসূদনের প্রতিভা এবং তাঁহার চরিত্র, উভয়ই, পরস্পরের অনুরূপ। সংপথেই হউক, আর অসংপথেই হউক, পারিবারিক জীবনই হউক, আর সাহিত্য-সম্বন্ধেই হউক, কোনরূপ নিষেধ-বিধির বশবর্তী হইয়া কার্য কবা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। ইহারই ফলে, একদিকে, সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তিনি, অবলম্বিত ধর্মে, বৈবাহিক সম্বন্ধে, ও আশ্রমিক আচার, ব্যবহারে, স্বেচ্ছানুরূপ কার্য করিয়াছিলেন, এবং অপরদিকে, স্বদেশীয় সাহিত্যে, চিরপ্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া, তিনি নূতন, নূতন রীতি প্রবর্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য মেঘনাদবধ ও তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রুম্বকুমারী, উভয়ই, যেমন বিবাদান্ত, তাঁহার নিজের জীবনও তেমনি মর্যাস্তিক শোকাস্ত। নানাদেশীয় কাব্যসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তবৃত্তিও, তেমনি নানা জাতীয় মনুষ্যসমাজের চিত্তবৃত্তির আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। স্নেহপ্রবণতায় ও কোমলতায় তিনি বাঙ্গালী; আচারে ও ব্যবহারে তিনি ইংরাজ; বিলাসিতায় ও স্থখপ্রিয়তায় তিনি ফরাসী; অধ্যয়নশীলতায় ও ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি জার্মান। তাঁহার কাব্যসমূহ যেমন বাঙ্গালী, হোমার, ভার্জিল, মিল্টন, কালিদাস, দাস্তে, টাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানাদেশের কবিগণের প্রভাব



পণ্ডিতবর স্বর্গীয় জৈবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনই বহুজনের প্রকৃতির সম্মিলনে গঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে ও রচনার গাভীর্থে তিনি মিল্টন; প্রেম-পিপাসায় ও অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রণ; ঔদার্যে ও মহাপ্রাণতায় তিনি বরণ্স; অমিতব্যয়িতায় ও পরদিনের চিন্তায় ঔদাসীন্ধ্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ডস্মিথ। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা, ভাব এবং ঘটনা সমস্তই যেমন বীরোচিত; তাঁহার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিও তদনুরূপ। আদিরসসিক্ত, গীতিকবিতা-প্রাবিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া একদিকে, যেমন, তিনি বীরসম্রাট্ কাকা রচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালী হইয়াও, অপর দিকে, তেমনই, তিনি ফ্রান্সের নিদারুণ শীতে শীতল জলে স্নান করিতে, এবং সার লুই জ্যাক্সনের জায় চূর্ণধ ইংরাজের তীব্র কটাক্ষে প্রতিকটাক্ষপাত করিতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে, অনেক বিষয়ে, এইরূপ তাঁহার প্রতিভার ও প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। অনেক গ্রন্থকারের নিজের জীবনই তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক একটি চরিত্রের উপাদান। মিল্টন, নিজে তাঁহার স্যামসন (Samson); গেটে, নিজে তাঁহার (Werter) ওয়ার্টার; ডিকেন্স, নিজে তাঁহার কপারফিল্ড (Copperfield); এবং বায়রণ, নিজে তাঁহার হারোল্ড (Harold)। মধুসূদনের অবনতিত কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা তাঁহার মেঘনাদবধের রাবণের সহিত আছে। আমরা রামায়ণের সেই নব-শোণিত-পিপাস্ত রাবণের কথা বলিতেছি না; মধুসূদনের নিজের কল্পিত রাবণের কথাই বলিতেছি। মেঘনাদবধের রাবণ, মহামহিমাস্বিত সম্রাট, স্নেহবান পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী, সাগরপরিখা-বেষ্টিত লঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র; সাক্ষাৎ নগরলক্ষ্মী-রূপিণী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। রাবণের জায় কাহার বাহুতে তেমন অপরিমিত বল? কাহার হৃদয়ে তেমন অটল সঙ্কল্প? ইষ্টদেবতাকে কে তেমন করিয়া ভক্তিতে বোধিত পারিয়াছিল? মহামায়া কাহার পুরে পুরাধিষ্ঠাত্রী? শূলপাণি কাহার দ্বারে দ্বারপাল? কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতে দরিদ্র, অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অতি অল্পজনেরই, বুদ্ধি, তাঁহার জায় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যে বিকশিত কুহুম তাঁহার হৃদয় উত্তান স্বেশোভিত করিত, যে উজ্জল তারাবলী তাঁহার জীবনাকাশ জ্যোতির্ময় করিত, বিধিবশে নয়, তাঁহার নিজ দোষে, সে কুন্তম অকালে বিনষ্টচ্যুত, এবং সে তারকমালা অসময়ে অস্তমিত হইয়াছিল। পুত্র,

পৌত্র, ভ্রাতৃপুত্র, জাতি, হৃদয় তাঁহার অসংযত বাসনারূপ অনলে ভস্মীভূত হইয়াছিল ; তিনি একা, কেবল, সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন। তাঁহার কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলী ভেজে উজ্জলিত, নাট্যশালাসদৃশী পুরী অঙ্ককারময়ী প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বিষাদময়ী, শবধুম-ধূম্রা কঙ্কাল-বহুলা পুরীতে রাবণ, একা, অতীতের মর্য্যভিবাতিনী স্মৃতি লইয়া বাস করিতেন। পতিহীনা বিধবার এবং পুত্রহীনা মাতার ক্রন্দন, সমুদ্রকল্লোলেরও অপেক্ষা গভীরতর স্বরে, প্রতিমুহূর্তে, তাঁহাকে তাঁহার দুষ্কিয়ার পরিণাম বুঝাইয়া দিত। তিনি সমর-কোলাহলে তাহা নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। এইরূপেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল। রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পার্ঠক মধুসূদনেবও পরিণাম চিন্তা করুন। সকল পাইয়াও মধুসূদনের গায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর কেহ কি জয়গ্রহণ কবিয়াছেন ? সাংসারিক সুখ-সম্পদের জন্য মনুষ্য বিধাতার নিকট, সাধারণতঃ, যে সকল সামগ্রী কামনা করে, যাক্কা ব্যতিবেকেই তিনি তাহাব অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনক-জননী, মধ্যবিস্তরূপ ঐশ্বর্য, অনবন্ত স্বাস্থ্য, সবল উদার প্রাণ, অনন্তসাধারণ প্রতিভা—এই সকলেব অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারের কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গায় আত্মীয়, বন্ধুদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন কে ? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিতে জানিতেন কয়জন ? গুণবানের প্রতি সন্মান, উপকারীর প্রতি রূতজ্ঞতা, অপকারীর অপকারে উপেক্ষা প্রভৃতি গুণে ক্ষয়জন তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন ? তাঁহার সংখ্যায়ী বাবু ভোলানাথ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন, “ঈর্ষ বা বিশেষ কাহাকে বলে মধুসূদন তাহা জানিতেন না ; তাঁহার হৃদয় মধুময় ছিল।”

There was no gall, no acrimony in him, he was all মধু।

তাঁহার জীবনের প্রাতঃকাল কি মনোহর। কনক-কিরণ-রঞ্জিত উষার গায় তাহা কি অপূর্ব শোভাই বিকাশ করিয়াছিল। পিতা মাতার তিনি সর্বস্ব-ধন, লক্ষপতির সন্তানের গায় স্বথ, সজ্জদে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত। তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নও ইহার উপযুক্ত ; ভারতের সর্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি ব্যারিষ্টার ; পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহে তিনি সুপণ্ডিত, দেশের নীর্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার হৃদয় ও প্রতিভার উৎসাহদ্বাতা, সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য ; তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশবাসিগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত ! কিন্তু হায় ! এই মনোহর প্রভাতেব এবং এই সমুজ্জল

মধ্যাহ্নের পর কি ঘোরাঙ্ককারময়ী রজনী মধুসূদনের জীবনে সমুপস্থিত হইয়াছিল !
যে যন্ত্রণায় তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার পুনরুজ্জীবন
নিশ্চয়োজন। পৃথিবীর কীট-পতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে, কিন্তু
বঙ্গের নব্যকবি-শিরোমণির তাহা ছিল না। যে পরান্নভোজন ও পরাবসথ
শয়ন আমাদেরিগের নীতিশাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুলা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,
মধুসূদনের ভাগে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের
অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং নিজায়ের অভাবে তাঁহাকে পরদত্ত পিণ্ডে
জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র-কন্যাগণ, কখনও
উপবাসে, কখনও পরুষিত অগ্নে দিনপাত করিত ; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের
অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন, বিনা পথ্যে, বিনা
চিকিৎসায়, প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এ সমস্তই তাঁহাকে
দেখিতে হইয়াছিল। আর পরিশেষে, তিনি নিজে, রাজপথের ভিক্ষকের শ্রায়,
দাঁতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যাহার বচনা পাঠ করিয়া সহস্র
সহস্র নরনারী তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন,
মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের স্তম্ভধারিণী ভিন্ন আর কেহ যে তাঁহার মুখে
জলগণ্ড দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম
আর কি হইতে পারে ? সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদনের অবলম্বিত
কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার নিজের জীবনের তুলনা করা সম্ভব হয়,
তবে তাহা মেঘনাদবধের রাবণেরই সহিত হইতে পারে। উভয়ের সর্বনাশের
কারণও এক। যে আত্মসংযমের অভাব, সমস্ত সম্বন্ধে, রাবণকে অধঃপাতিত
করিয়াছিল, সেই আত্মসংযমের অভাব মধুসূদনেরও সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল।
উভয়ের প্রকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বুঝি, তিনি মেঘনাদবধ-কাব্যে
রাবণের ও তাঁহার পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সেরূপ পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া-
ছিলেন, এবং সেইজন্যই বুঝি, তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

**I hate Ram and his rabble ; the idea of Ravana elevates
and kindles my imagination. He was a grand fellow.**

কোথায় রামচন্দ্রের জায় সম্বন্ধপ্রধান মহাপুরুষ, আর কোথায় তমোগুণ-
প্রধান রাক্ষসরাজ। দেব-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, মধুসূদন যে অস্বভাব
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, প্রকৃতিগত সাদৃশ্যই, বোধ হয়, তাহার কারণ।

মধুসূদনের প্রতিভাবলে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমরা
কখনো তাহার আলোচনা করিয়াছি। তিনি সাধারণের নিকট অমিষ্টজন্মের,

প্রবর্তক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের জায় অভিনয়োপযোগী গ্রহসন, বিয়োগান্ত-নাটক এবং চতুর্দশপদী কবিতাও তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রবর্তিত

হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে, **বঙ্গালা সাহিত্যে**
মধুসূদনের কার্য। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক-রচনা

করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের আদর্শে

বঙ্গালা ভাষায়, প্রথমে কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের গোঁবব অপকুবোচ্চ ব্যক্তি কোন দেশেই বিরল নহে ; সুতরাং মধুসূদনের নিকটকের অভাব ছিল না। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে সম্বন্ধে তাঁহার কার্যের ফলাফল

অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিও, এক্ষণে, উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এখন বঙ্গালা

পক্ষে যে মূল বর্তমান আছে, তাহা মধুসূদনেরই যুগ ; ববীন্দ্রনাথ তাহার কেবল

আংশিক পরিবর্তন করিয়াছেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর দোষগুণ, স্বতন্ত্রভাবে,

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সাধারণ কার্য সম্বন্ধে এক্ষণে দুই

একটি কথা বলিব। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য,

ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্করণ। মেঘনাদ বধ রচনা অপেক্ষা ইহা আমরা

তাঁহার প্রতিভা অধিকতর পবিচায়ক ও গৌরবজনক কার্য বলিয়া বিবেচনা

করি। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ় শক্তি নিহিত ছিল, গল্পে বাবু অক্ষয়কুমার

দত্তের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জায়। পক্ষে তিনিও তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইহাদিগের দুইজনের গ্রন্থাবলী অপেক্ষা মধুসূদনের গ্রন্থে তাহা বরং আরও

সুন্দররূপ পরিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের

সহিত বিতর্ক করিয়া তিনি যে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা

বঙ্গভাষা যে কেবলই অমিত্রচ্ছন্দে উপযোগিনী, একথা প্রতিপন্ন হয় নাই ;

বঙ্গভাষা যে, যে কোনরূপ রচনার উপযোগিনী, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

চতুর্দশপদী হউক, আর দ্বাদশপদী হউক, অমিত্রচ্ছন্দ হউক, আর মিত্রচ্ছন্দ

হউক, গীতি-কবিতা হউক, আর বীণরস-প্রধান কাব্যই হউক, বঙ্গভাষা

কোন একটি রীতির অস্থপযোগিনী, এ কথা আর এখন কাহারও বিশ্বাস নাই।

প্রতিভাবান লেখকের হস্তে ইহা যে, যে কোনরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ,

মধুসূদনের প্রতিভা তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। “মাতৃভাষারূপ

-রত্নপূর্ণ খনির” দ্বারা তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ; যে কোন উজ্জ্বল

পুরুষ এক্ষণে তাহা হইতে রত্নাহরণে সমর্থ হইবেন।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের দ্বিতীয় কার্য, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আদর্শের

সম্মিলন। ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য, এক্ষণে, নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য আদর্শের

অথবা নিয়বচ্ছিন্ন প্রাচ্য আদর্শে গঠিত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী সাহিত্য ভারত-সম্মানকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান হইলেও, তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হইবে না। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় রীতির সম্মিলনেই ভাবী ভারত-সাহিত্য গঠিত হইবে। মধুসূদনের কাব্যে ইহাব সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারত-কবির মাদুর্য ও কৌমল্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিগণের ওজস্বিতার সম্মিলন করিয়া তিনি বাঙ্গালা পঞ্চকে সমুন্নত করিয়াছেন। ইতালীবাদ্ভিক্তব ইমানুয়েল মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপ-কথনই হইয়াছে। তাঁহার কবিতা, প্রকৃতই, গ্রন্থিকপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়াছে। মধুসূদনের গ্রন্থে বিজাতীয় ভাবের প্রাবল্যের জন্ম আনাদিগেব ক্লেশ হয় ; কিন্তু তিনি পথ-প্রদর্শক ; নূতন পথে পথ-প্রদর্শককে প্রায়ই স্থানিত-পদ হইতে হয়। মধুসূদনের অন্তবর্তিগণ, সাবধানতার সহিত, তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিলে, জাতীয়ভাব বিসর্জন না করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যকে আবও সমুন্নত করিতে পাবিবেন।

বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদনের তৃতীয় কার্য সাধারণের কচি-পরিবর্তন। এখন যে আর বিত্তাঙ্গদবের জায় কাব্য শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবে, সে সম্ভাবনা নাই। মেঘনাদবধ যে আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছে, তাহা এখন বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিবে। ইংরাজী সাহিত্যই যে এই কচি-পরিবর্তনের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মধুসূদনের কার্যও উপেক্ষণীয় নহে। তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বীরাঙ্গনার তারা-পত্রিকা ভিন্ন আর কোন স্থলেই অসং আদর্শের বা অসং নীতির সমর্থন করেন নাই। যে লঘুচিত্ততা অধিকাংশ বাঙ্গালি লেখকের রচনায় পরিব্যক্ত, মধুসূদনের রচনায়, কুত্রাপি, তাহা লক্ষিত হইবে না।

মধুসূদনের দোষ উল্লেখ করিতে আমরা কোন স্থলেই কুষ্ঠিত হই নাই। কিন্তু সেই সকল সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহার জায় প্রতিভাবান্ কবি এ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পদাবলীর লালিত্যে এবং পরকীয় নায়ক, নায়িকার চিত্তবৃত্তি বর্ণনে বিজ্ঞাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম তাঁহার অপেক্ষা নিপুণ ; ভাষার পরিপাট্যে ভারতচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা দক্ষ। কিন্তু সমস্ত বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলে মধুসূদন তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। বিভিন্ন রসের উদ্বীপনে আর কোন বাঙ্গালি কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তিনি অতি

অল্প দিনমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অল্প কাহারও কার্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায়, মধুসূদনের প্রতিভার বিশেষত্ব।

এবং প্রহসনে, সর্বত্র, তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী হউন, আর পরবর্তী হউন, একটি বিষয়ে, এ পর্যন্ত, কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষোচিত শক্তিতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে অতুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী।* মধুসূদনের সঙ্গীতে অনেক স্থলে তালভঙ্গ হইয়াছে, রাগ-রাগিনীর ব্যাভিচার হইয়াছে; তথাপি সে সঙ্গীত পুরুষকণ্ঠোচিত; সঙ্গায়িকা নটীর তানলয় বিম্বন্ধ কাকলিধ্বনি নহে। জলদ-নির্ঘোষের ও সাগর-গর্জনের ত্রায় মে সঙ্গীত আমাদিগকে চমকিত ও বিম্মিত করে। কোমলের সহিত গম্ভীরের এবং মধুরের সহিত ভীষণের সম্মিলন করিবার শিক্ষাও মধুসূদন প্রথমে বাঙ্গালি কবিকে প্রদান করিয়াছেন। বৃদ্ধসংহার, রৈবতক এবং কুরুক্ষেত্র, এক বিষয়ে তাঁহার মেঘনাদবধেরই অল্পক্লম মাত্র। মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে, অতি দুর্বল হৃদয়ও উৎসাহে উদ্দীপিত হয়। বঙ্গসমাজ তজ্জাবেশ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক; জ্যোৎস্নালোকে শয়ন করিয়া বংশীধ্বনি শ্রবণের পরিবর্তে, প্রথর দিবালোকে, রণভেরীর নিনাদে অভ্যস্ত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি; এবং সেইজন্ত মধুসূদনের ত্রায় কবির আমরা অল্পরাগী। পৌরুষ পুরুষোচিত ভাষার সহচর। মেঘনাদবধ বাঙ্গালিকে নিশ্চয়ই পৌরুষল্যে সাহায্য করিবে। মধুসূদন বঙ্গদেশে অনাদৃত হন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ত্রায় কবির যে সম্মান প্রাপ্য, তাঁহার স্বদেশীয়গণ, এখনও, তাঁহাকে তাহা প্রদান কবিবার উপযুক্ত হন নাই। যদি বঙ্গদেশ, কোন দিন, পুরুষোচিত শৌর্য লাভ করিতে পারে, তবেই এদেশে মধুসূদনের ত্রায় কবির প্রকৃত সমাদর হইবে।

যে সকল উপাদানে মধুসূদনের জীবন গঠিত হইয়াছিল এবং যে সকল দোষ, গুণ তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ, উপযুক্ত স্থলে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার আকৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, এবং সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে এক্ষণে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। মধুসূদন দেখিতে নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব ছিলেন। শ্রোত বয়সে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থূলক হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁহার

*কোনও সঙ্গের ব্যক্তি বখাৰ্ঘ ই বলিয়াছেন ;

মেঘনাদ বীরবাহু করিলে শ্রবণ,

বাঙ্গালা মহিলা ভ.বা না করে কখন।

শরীর বিশেষ সুগঠিত ও সবল ছিল। বর্ণ রুক্ষ হইলেও তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। যুখে এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল যে দেখিবামাত্র, লোকের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। প্রশস্ত লগাট, আকর্ষণবিশীল প্রতিভাব্যঞ্জক নেত্রদ্বয়, সতেজ সবল দেহ দেখিলেই তিনি যে একজন অ দৃষ্টি ও প্রকৃতি।

প্রতিভাবান পুরুষ তাহা স্পষ্ট পরিবাক্ত হইত। তাঁহার আকাব, ইঙ্গিত, প্রত্যেক কার্য, পুরুষোচিত ভাব প্রকাশ করিত; এবং যে ভাবপ্রবণতা কবি-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কার্যে লক্ষিত হইত। বাল্যকাল হইতে পূর্ণবয়স পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। নিজের অমিতাচারের ফলেই, শেষে, তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু মিতাচারী হইলে, সম্ভবতঃ, তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। মধুসূদনের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরূপ ভ্রম আছে। আহাৰ এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি জাতীয় ভাব বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ, কেহ তাঁহাকে স্বদেশে প্রতি অমুরাগশূন্য বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আচার, ব্যবহারে বৈদেশিক রীতির অনুকরণ করিলেও তাঁহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। তাঁহার লিখিত পত্রের অনেক স্থলে তাঁহার স্বদেশানুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত অনেকের জ্ঞায় তাঁহারও এই ভ্রান্ত সংস্কার ছিল যে যুরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে হইলে, আহাৰ, ব্যবহার প্রত্যেক বিষয়ে, তাঁহাদিগেরই সদৃশ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেন, “আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ যেমন মুসলমান রাজত্বকালে আহাৰ্য্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে মুসলমানী রীতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজ-রাজত্বে আমাদিগেবও তেমনই ইংরেজী প্রথার অনুকরণ করা কর্তব্য।” কেহ তাঁহাকে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধানের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, “ধৃতি চাদর কেন, কণ্ঠী কোপীন যাহ। বল, পরিতে রাজী আছি, কেবল সাহেবগুলাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পাবিলেই হয়।” একবার একটি সভাস্থলে, কতকগুলি লোক, তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া, তাঁহার বৈদেশিক ভাবপ্রিয়তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে মধুসূদন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন; “বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য, আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোন বুট যদি, কোনদিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে; আমার বর্ণই আমার জাতি স্বরণ করাইয়া দিবে।” আচার, ব্যবহারে সাহেবী রীতির অনুকরণ করিলেও মধুসূদন সাহেব-উপাসক ছিলেন না।

একবার তিনি ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে এক সবার্ভিনেট জজের আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশীয় জজের নিকট উকীল মহাশয়েরা অত্যন্ত অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু জজ-সাহেবকে দেখিবামাত্র একবারে সঙ্কুচিত ও তটস্থ প্রায় হইলেন। মধুসূদন ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলেন; জজ সাহেবেরও অপেক্ষা তিনি সবার্ভিনেট জজকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং অশিষ্ট উকীল মহাশয়দিগকে অহুযোগ করিয়া বলিলেন; “ইনি দেশীয় জজ, ইহার সম্মানেই আমরা দিগেব সম্মান; ইহারই প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন আপনাদিগেব কর্তব্য।” স্বদেশেব ও স্বজাতিব সম্বন্ধে মধুসূদনেব মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাঁহার এইরূপ ব্যবহাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

মধুসূদনের ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। খ্রীষ্ট-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ, কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন;—“খ্রীষ্টধর্ম জগতে সভ্যতা প্রচারের একটা বিশেষ উপায়; কেহ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রস্তুত আছি; কিন্তু

আমার মানসিক প্রবণতা হিন্দুধর্মেরই দিকে।”* বাস্তবিকও ধর্মবিশ্বাস

হিন্দুভাব তাঁহার মনে এরূপ প্রবল ছিল যে, বিজয়া-দশমী প্রভৃতি উৎসবের দিনে তিনি, কখনও কখনও, ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন। মধুসূদনের খিদিরপুরস্থ পৈত্রিকভবন তিনি তাঁহার কোন বাল্যবন্ধুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাল্যবন্ধু তাঁহার মাতাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। একবার জগদ্ধাত্রীপূজার নিমন্ত্রণে তাঁহার বাটাতে উপস্থিত হইয়া, দেবীমূর্তি দর্শনে, মধুসূদন এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আপনার শৈশবের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বর্গীয়া জননীর কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি মাতার উদ্দেশে বলিলেন; “মা, তোমার যোগ্য পুত্র তোমার গৃহ কেমন সাজাইয়াছে, আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বারা তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নাই; আমি কেবল তোমায় ক্লেশ দিয়াছি মাত্র।” বাহিরে কোট, হাটের কঠোর আবরণের অভ্যন্তরে বাঙ্গালি হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা মধুসূদনের অনেক কার্যে এইরূপ প্রকাশিত হইত। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর যে দুই একবার তিনি সাগরদাঁড়ীতে গিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারই, আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের

* তাঁহার কথাগুলি এই; Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak against it, but my real feeling is Hindu. পাঠক পরিশিষ্টে রাজস্বায়রূপ বাবুর লিখিত মন্তব্যও দেখিবেন।

† বাবু হরিশোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, অতি মধুর ব্যবহারে, সকলকে আশায়িত্ত করিয়াছিলেন । দেশেব কোন আত্মীয়, কলিকাতার আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি পবম যত্নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবিতেন । মধুসুদনের চরিত্রে নৈতিক দুর্বলতা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বার্থপরতা ক্রুরতা, পরজীকাতরতা প্রভৃতি নীচতাব একবাবেই ছিল না । উদার, সরলস্বভাব পুরুষ কুপথগামী হইলে তাঁহার চরিত্রে যে সকল দোষ থাকিবাব সম্ভাবনা, মধুসুদনের প্রকৃতিতে সেই সকল দোষই ছিল । মিতাচাবে ও ইন্দ্রিয় সংযমে অভাস্ত হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় গার্হস্থ্য-জীবনে অতি মধুময় ফল প্রসব করিত ।

মধুসুদনেব জীবনেব ইতিহাস অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ । প্রতিভা যতই সমুজ্জল হউক, আত্মসংযম না থাকিলে, তাহাব পবিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইতে পাবে, ইহা হইতে আমরা তাহা শিক্ষা করিতে পারি । মল্লয়া যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হউন, ধর্মভাব ব্যতীত যে জগতে শান্তির প্রত্যাশা নাই, তাঁহার জীবন তাহাবও দুষ্টান্ত-স্থল । যাহাবা প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের স্বথ ও স্বার্থেব জন্ত পিতা, মাতা, সমাজ সকলের প্রতি ঐদাসীজ্ঞ প্রদর্শন করেন, তাঁহাবা যেন মধুসুদনেব পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ কবেন । তরুণ বয়সে নীতিশিক্ষার ও সচপদেশের অভাবে আমাদিগের দেশেব কত প্রতিভাবান যুবক কিরূপ চরিত্রহীন ও আচার-জ্ঞে হইতেছেন, তাঁহার জীবন হইতে আমরা তাহাও অসুমান করিতে পারি । মধুসুদনের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার উন্ন্যার্গগামী স্বদেশীয়গণের উপকার করিবে । বঙ্গভাষা কাহাকে লইয়া গৌরবাস্থিত, বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে প্রতিভাশুণে স্বদেশের ও স্বসমাজেব মুখ কে উজ্জল করিয়াছেন, এবং গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও হৃদয়বান্ হইলেও বঙ্গীয় কোন কবিব পবিণাম সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, এই তিন প্রশ্নেরই উত্তরে ভবিষ্যৎবংশীগণ বলিবেন, “হতভাগ্য মধুসুদন ।”

মধুসুদনের নিজের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে । তাঁহার পত্নীর ও পুত্রকন্তাগণের সম্বন্ধে এইবার চই একটা কথা বলিব । মাদ্রাজে অবস্থান কালে মধুসুদনের যে দুইটি

মধুসুদনের পুত্রকন্তা-
গণের কথা ।

পুত্র ও দুইটি কন্তা হইয়াছিল, পত্নীর সঙ্গে পার্থক্যের পর তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না । ইহাদিগের মধ্যে একটা পুত্র ও একটা কন্তা পরলোক গমন করিয়াছেন, অবশিষ্ট পুত্র কন্তা দুইটি এখনও, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাস করিতেছেন । মধুসুদনের পুত্র

ম্যাক্টাভিস্ দত্ত* সেখানকার কোন আদালতে ওকালতী করেন। পিতার জ্ঞান ইনিও ভাগ্যলক্ষীর অল্পগ্রহে বঞ্চিত। বঙ্গবাসীগণ তাঁহাকে স্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন, অমুকম্পার হস্তে গ্রহণ করিবেন, ম্যাক্টাভিসের ইচ্ছাই একান্ত অভিলাষ। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত, যখন, বঙ্গবাসিদিগেব অগোচর। তখন, আপাততঃ, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মধুসূদনেব ৫৩তম বর্ষ পত্নী রেবেকা, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, পরলোক গমন করিয়াছেন। পত্নী প্রাতি ব্যবহারই মধুসূদনের জীবনেব মর্দাপেক্ষা অপকার্য : কিন্তু পতিপত্নীর মধ্যে কাহাব দোষ অধিক, যখন তাহা অবগত হইবাব উপায় নাই, তখন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা নিশ্চয়োজন। মধুসূদনেব শেষজীবনের সহচারিণী ও মৃত্যু-সঙ্গিনী হেনরিয়েটা কিরূপ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বর্ণন করিয়াছি। হেনরিয়েটার গর্ভে মধুসূদনেব যে কয়টি পুত্র, কন্যা হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু-কালে, তাহাদিগের মধ্যে তিনটি জীবিত ছিল। কন্যা শর্মিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র মিল্টন পরলোক গমন করিয়াছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ আলবর্ট নেপোলিয়ান, এক্ষণে, অফিসে বিভাগে কাৰ্য করিয়াছেন। মধুসূদনের পারিবারিক জীবন শান্তিতে অভিহিত হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক বোধ করি নাই। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে, কেবল, তাহার কয়েকটি স্থল ঘটনামাত্র উল্লেখ করিয়াছি।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর স্বদেশীয়গণ তাঁহার জ্ঞা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও আলোচনা করিয়া, এইবার আমরা আমাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের জ্ঞা মধুসূদন যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মধুসূদনের সম্বন্ধে
তাঁহার স্বদেশীয়গণের
কাৰ্য।

এ কথা বলিতে পারিলে, আমরা স্থখী হইতাম। কিন্তু হায়! সে কথা বলিবার সুযোগ কোথায়? তবে যে দেশে রাজা রামমোহন রায়েবও স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, মধুসূদন সে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা চিন্তা করিলে, মধুসূদনের জ্ঞা যাহা হইয়াছে, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার স্বদেশীয় সংবাদপত্রসমূহে যে শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশের অতি অল্পমাত্র সাহিত্যসেবকের মৃত্যুতে সেরূপ দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে, প্রকাশ্য সভায় এবং বঙ্গভূমিৰ মধ্যে, প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ তাঁহার

*পারিবারিক কারণে ম্যাক্টাভিস্, এক্ষণে, দত্তের পরিবারে, ভট্ট উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।



মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ।

জন্ম যে শোক-গাথা রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যভূরাগী মাত্রই তাহা অবগত আছেন। কি অবস্থায় মধুসূদন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পুত্র কন্তাগণেব জন্ত কোনরূপ সম্বল বাখিয়া যাওয়া দরে থাকুক, নিজের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ারও তাঁহাব সংস্থান ছিল না। মধুসূদনের বন্ধুগণ তাঁহাব শিশু দুইটির কথা বিস্মৃত হন নাট। তাঁহাদিগেব চেষ্টায় দেশেব অনেক সম্ভ্রান্ত ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিব দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল।* সেট কমিটি মধুসূদনেব শিশুগণেব শিক্ষাব ও গ্রাসাচ্ছাদনেব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। অর্থাভাবে মধুসূদনেব মৃতদেহ নিতান্ত হীনভাবে সমাহিত হইয়াছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাব সমাধির উপর কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত না হওয়ায় তাহা কমে লুপ্ত ও অগোচর হইবাব সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা একদেশকে সে কলঙ্ক হইতে বক্ষা কবিয়াছেন। সর্বাধিক সংকর্মে অল্পবাসী, বামাবোদিনিী সম্পাদক, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়েব উদযোগে, এবং যশোব খুলনা সম্মিলনেব চেষ্টায়, তাঁহাব সমাধিও উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র, অনেকেই, তজ্জন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।† সাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তজ্জন্ত, সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবির গৌরব বর্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সাধারণের সমক্ষে, এই সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। বঙ্গের সুশিক্ষিত নয়নারীগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে, সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মধুসূদন

* নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মহারাজা সার বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু জুসেব মুখোপাধ্যায়, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবিরকুমার ঘোষ এবং বাবু কৃষ্ণদাস গাল। ব্যারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

† মধুসূদনের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য বাহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভাওয়ালের সাহিত্যভূরাগী বর্গীর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

স্বয়ং তাঁহার যে সমাধিনিধি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মনোমোহন বাবু তাঁহার বক্তৃতায় যথার্থ-ই বলিয়াছিলেন ;—

“The poet has himself left behind him memorials far more precious and far more lasting than anything that either the wealth or the skill of his admiring countrymen could secure for him. His works will be read with admirations yet unborn, and his name will live so long as the Bengali language and the Bengali race will live.”

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, বঙ্গভাষামুবাগী মাইকেল তাহা অন্তমোদন করিবেন এবং বঙ্গীয় নব-নারীমাত্রেই প্রার্থনা করিবেন যে, “যেখানে কবিদিগের বৈকুণ্ঠে কবিকুলবাজ হোমাব, দাশে, মিল্টন এবং আমাদিগের কালিদাস, ভবভূতি স্বর্ণসিংহাসনে বিবাজিত বসিয়াছেন, আমাদিগের গৌরবান্বিত প্রিয় কবিও সেখানে স্বসম্মানে ও চিৎশান্তিতে বিবাজিত থাকুন।” তাঁহার সমাধি উপর যে প্রস্তবময় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালে, হয়ত, তাহা চূর্ণ হইবে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থাবলীরূপ যে অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিৎদিন তাঁহার গোবব ঘোষণা করিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালিজাতিব অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে “শ্রীমধুসূদন” নাম বিলুপ্ত হইবে না।*

* গ্রন্থকারের আত্মভাজন হৃদয় স্বর্গীয় হরলাল রায় মহাশয় মধুসূদনের সম্বন্ধে যথার্থ-ই বলিয়াছিলেন ;—

‘নামে মধু, ক্রমে মধু, বাক্যে মধু বার,
এ ছেন মধুরে ভুলে সাধা আছে কাব ?’

মিরর সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অধিনেতৃত্বে মধুসূদনের মৃত্যুর দিবস অনেক সাহিত্যসেবী, এক্ষণে, তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে মিলিত হইয়া থাকেন। মধুসূদনের জন্মদিবস তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতেও একটি উৎসব সস্তাতি আরম্ভ হইয়াছে। মধুসূদনের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হউক, সাগরদাঁড়ীবাসিগণ ইহা একান্ত আর্থনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণ কি তাঁহাদিগের এই আর্থনা পূর্ণ করিবেন না ?

REMINISCENCES OF MICHAEL M. S. DUTTA

by

BABU GOUR DAS BYSACK.

My Dear Jogindra,

You have asked me for a few reminiscences of Modhu. I am so full of them that I know not what to say, or where to begin. You are aware that since his death in 1873 it has been my anxious wish to see a *Life** of Modhu properly written. Your work, which has met with the approving co-operation of my friends Bhodeb and Rajnarain, and which is written in Bengali, the language in which Modhu wrote and sang—in which his genius is imperishably enshrined—and this not only because his poetry, and blank verse, the first of its kind in the Bengali literature, would not be duly appreciated except by those whose mother tongue it is, but because the life of a poet like Modhu is the common heritage of his nation—not of the English educated community of his countrymen alone, is sure to meet with the cordial acceptance and approbation of the nation and of posterity. You have been prompted by your admiration for Modhu's Muse alone, without any partiality of personal friendship for him, and have volunteered your kind and gratuitous services in this labour of love. We felt a peculiar pleasure, conscious as we were of your learning and ability to deal with the subject, to find our own work done for us by one of a later generation. It is therefore with sincere delight that I comply with your request in furnishing you with some of my reminiscences of Modhu.

My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th class† of the old Hindu College. It soon ripened

* Vide his letter to me page 60 line 10 of the Biography.

† 1st Class, Junior Department.

into worm friendship. After that, we were all along together (with Bhoodeb*, Sham and Buncoo†) in every class, in every promotion even in the long leap‡ that we (five) had from the 5th to the 2nd class, Senior Department.

Modhu used to keep us in a perpetual stir, in a literary ferment as it were, by surprising us everyday with a new sonnet or a fresh poem, D. I. R.§ our beloved Professor, and the guiding angel to his Muse, used to touch up his poetical exercises during the tiffin hours. Modhu started a MS. Periodical that was an eye-sore to the jealous senior students;—nevertheless he

* Bhoodeb Mukerjee, C. I. E., Sham Churn Law, brother of Maharaja Doorga Churn Law, C. I. E., Buncoo Behary Dutt, Sham's brother-in-law.

† Buncoo was no less distinguished in the College for his literary attainments. He used to write excellent prose articles in the journals, to match Modhu's poetical pieces. At an examination Buncoo returned the question papers in Mathematics and History blank, without answering or attempting to answer any of them. He however took up one question, that about the reign of Charles the Fifth, on which he wrote a long dissertation which so much pleased the examiners that he not only passed with flying colours, but was given a lift to the 2nd Class. My friend Bholanath Chunder, the "Hindu Traveller", with a few others of his father used to skulk away from the Mathematical examination. But under a peremptory message from Sir Edward Ryan, the President of the Public Instruction Committee, they formally went through the ordeal, and returned almost blank papers like Buncoo. Far from being affected by the consequences of failure, my friend Bholanath received the first prize of the College, then given to the best student in Literature. What a contrast this to the reign of "Ciam" in the present day!

‡ This unprecedented promotion was the result of the new system of examination that had been introduced that year. Two standards, the Senior Scholarship and the Junior Scholarship standards, were organised, the former for the first and second classes and the latter for the 3rd, 4th and the 5th. The examination of the first two classes was superintended by such high men as Sir Edward Ryan, Chief Justice, the Hon'ble Mr. Cameron, Member of the Supreme Council, and others. The examination of the last three classes was conducted by the Bengal Government Secretaries, headed by Mr. (afterwards Sir) Frederick Halliday.

§ Captain David Lester Richardson.

was undeniably the Jupiter among the bright stars of the College.

Modhu was given to taking us by surprise. One day he had cast off his usual apparel—*dhuti* and *chudder*, and appeared in boots, trowsers and an *achkan* that he soon changed into a regular English coat and stuck to this costume ever afterwards in his life. He started the এক ছোটের দল as a feeder to do away with the *urani*. Madhub Mittra, brother of the late Raja Degumber, one of our Class chums, threw off his *chudder*, and used to appear in the College and walk home in tight *jama* (জামা), *sans*, *urani*. But Modhu was a genius. Even his foibles and eccentricities had a touch of romance and a taste of “the attic salt” that made them savoury and sweet.

While we were in College, he used to see me frequently at my house. One day he pressed me to an invitation at his house at Kidderpore, which I cordially accepted. When I arrived here at dusk, his father received me with a paternal welcome. He was seated on a couch, in front of which Modhu and I took our seats on another. Old Rajnaram Dutt was smoking his *albola* (hooka). He passed the snake over to Modhu. This staggered me not a little. When we were alone, I asked Modhu how it was that he was indulged to a length quite out of example and custom. “My father”, replied Modhu, “minds not your common punctilios.” Indeed, it was giving his son, albeit an only son, a longer tether than he should have done. This over indulgence of his father was the rock on which was wrecked his domestic peace and happiness. Many dainties and delicacies prepared by his doating mother placed on several *rekabs*, formed the principal dishes that were set before us. It was the first time I partook of Kidpillau, food forbidden to a genuine Vaishnava.

One day in 1843, he disappeared all on a sudden, from our College. It not merely caused a surprise, but gave a shock, a terrible shock to his “dearest” Gour and Bhodeb, who instantly went down to the Fort to his rescue, if it were possible. Dr. Corhyne, in whose house he was lodged, made us wait down-

stairs for a while, when Raja Sutto Shurn Ghosal of Bhookylas, Kidderpore, happened to call. The Raja saw us waiting, but went straight upstairs and, after a while, coming down, said to us, "Modhu has not been allowed to see me. What a pity these cunning chaps have smuggled him into the Killa, otherwise they would have rued for what they have done." He advised us to leave, as they would not allow Modhu to be seen. As soon as the Raja drove out, a messenger came down, and told us to call on another day. A day or two after I went again, but alone. I was shown up into the drawing-room where Modhu received me with a smile, but avoided all discourse on the subject of his "new light" of which however, there was not the slightest glimmer previously. To cut short all reasoning or rebuke, he read out to me the song which he had composed, and which was to be sung at his baptism, "Sunk in Superstition, &c." Some body, Dr. Corbyne I believe, stepped into the room at this moment—a signal that I should retire, lest I should be tampering with his new faith. So I left him, much to my grief and despair.

After his baptism, I met him at Archdeacon Dealtry's or at Chaplain Vaughan's house, adjoining the old Mission Church. In what a change I found him! All the welcomings and caresses which greet a neophyte on his advent were now over. He was penned secure in the fold, and was left at sea to find out his way into the world. Like a waif* he did not know where to put

* I think it is meet to mention here that, in the course of conversation with Modhu, I gathered that in embracing Christianity he felt somewhat sanguine as to receiving certain facilities for attaining the object which he had nearest to his heart—a Voyage to England, and what confirmed me in my belief was that, during the whole course of our friendship, though I found him always having no great respect for the superstitions of Hinduism, I never found in him any great enthusiasm for Christianity. However uncharitable it may seem, one cannot help presuming, under such circumstances, that certain hopes must have been held out to him, directly or indirectly, for the attainment of this great object of his life, but how he fared after his baptism will be patent from the pages of your Biography. It is nevertheless a fact that the zealous interest which those who were

in his head. He now went to live with one Mr. Smith in Dacre's Lane. My visits to him there were frequent. Mr. Smith was a literary man, and would always ask me to join him and Modhu in reading Shakspeare.

While Modhu was at the Bishop's College, I used to see him every now and then. He was then moving in the congenial and charming company of the Revd. K. M. Banerjee and his wife and daughters, with all of whom he had been intimate before his conversion.* There were also Mr. Ganendia Mohun Tagore and his wife (Banerjee's eldest daughter), and a young Brahmin widow who had entered the fold of Christ, and who was afterwards married to the Revd. Gopal Lal Mitra, an eminent scholar.

You know all about Modhu's Madras life during his stay there. When in 1855 his paternal house at Kidderpore became

concerned in his baptism manifested towards him before his conversion, ceased the moment their object was accomplished. People could not avoid the impression, though an unfounded one, that it looked as if they chanced to get hold of a stray lamb which they were in too great a hurry to impound from the fold of Hinduism. Whether such really was their feeling or not it would certainly have redounded to the glory of the cause, if considering the high intelligence and merit of Modhu they had continued their interest in him to give a start in the world. It would at least have proved to the native public, intensely agitated as it was at the time, that he was really regarded, and not seemingly paraded, as a valuable accession to the fold of Christ, and not a stone to go down the "Swash of no ground".

* The late Revd. K. M. Banerjee has left a name, that will be revered and cherished for ever, for his learning and literary qualifications and the manly stand he made for the rights of the rate-payers of Calcutta in the debates of the Municipality of the city. Had it not been for two instances of his mistaken proselytising zeal, his memory would have been embalmed for ever in the grateful hearts of his Hindu countrymen. The two instances in which such zeal was manifested were in the cases of the conversion of Modhu Soodun Dutt (Datta) and Ganendra Mohun Tagore. The feats he accomplished in the interests of Christianity were no doubt, in his mind meritorious acts, but it is impossible for Hindus to believe that act to be meritorious or that zeal to be other than mistaken,

the subject of dispute, under Act IV* of 1840, and two parties were fighting over its possession before Mr. Fergusson, the Magistrate of 24 Parganas, I felt the necessity of having Modhu up here at once, to prevent further litigation, and to see that he entered into possession of the property as the only legal heir and rightful claimant. His patrimony was being frittered away by his uncles and cousins under a forged will, alleged to have been left by his father, who, as a matter of fact, had done nothing of the kind. When pressed on his death-bed to make a will, Modhu's father observed, *যাহার বিষয় সে এসে নেবে*, i.e., "he whose estate it is, will come and take it."

But I was not sure of the Modhu's whereabouts at the moment. I entrusted my letter to the Revd. K. M. Banerjee, who was then going to Madras, with a request to ferret Modhu out from wherever he might be, and to hand it to him personally. He kindly carried out my request. Modhu came up like a shot. The first thing I told him on his arrival† was to go and see the

which destroys for ever the peace and happiness of a whole family. Then in the case of Babu Ganendra Mohun Tagore he equally shut his eyes as he did in that of Modhu, to the awful consequences that would accrue both to Ganendra Mohun and to his father,—a wealthy and powerful man, one who was too fastidious to stand, as he chose to say, the cant of evangelisation in the mouth of a preacher of an intolerable and uncatholic religion which deals salvation to the Christian only, and eternal damnation to the heathen, however pious and virtuous he may be.

* Since re-enacted in the Criminal Procedure.

† As soon as he alighted from the steamer he ran to me. He then lived with me for a time. He had not a pice in his pocket. It was therefore, absolutely necessary that some provision should be made for him, I asked my friends, Kisory and Raja Degamber, to meet us at a dinner party given at my place. They wrote in reply, expressing delight at Modhu's return and readily accepting the invitation. Both were Modhu's intimate friends. I asked Kisory who appreciated his genius and who was then the Junior Magistrate of Calcutta, Northern Division, to use his best efforts to help Modhu by securing for him some employment. He promised to do so. The post of Interpreter in his Court soon after fell vacant, and Modhu was given the appointment.

people who were in his father's house. He went and returned somewhat crest-fallen, not so much at the peril in which he found his father's effects and his mother's jewellery involved, as at the sight of his unprotected, lone stepmother who, in the full bloom of her youth and beauty, was withering in the scorching blast of perpetual widowhood. The sight deeply saddened his heart, and opened his eyes to the dreary desolation which his desertion had spread round his paternal home and hearth, through the untimely death of his heart-broken father.

That Modhu was destined to be a poet was predicted by me, as early as 1841, and my prognostication has been verified. This fact was publicly noticed at the meeting that was held in the house of my young friend, the late Babu Kali Prasanna Singh, in honour of Modhu, to present him with an address and a silver vase.

Modhu's Muse created a new era. How a trifling incident roused her to warble to the tunes of our Vina has been described by you at length. It is one of the instances of what mighty things from trivial causes rise. The memorable Belgatchia Theatre, with Rajas Pratap Chunder Singh and Issur Chunder Singh, and Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, and myself, the decrepit Youngandharayan of the Ratnavali stage with tottering limbs, are inseparably associated with Modhu's writings. Blank-verse, once the target of wiscacre Pandits and carping critics, has, notwithstanding their ominous head-shakings and gloomy vaticinations, come forth bodied in "flesh and blood", to mark a new epoch in the annals of our literature—a literature that nurtured in its rich native soil, is destined like the gigantic banian to spread out its umbrageous branches over the vast Province of Bengal, though not to strew its leaves, like "the leaves of Vallombrosa", over the world. Blank verse, like the stately steed, has outstripped the trotting jennet of Rhyme that capered and cantered with jingling bells, for ages past.

It is not for me to speak of the Belgatchia Theatre. Having been an actor in it myself, and interested in its success from

the beginning, as Secretary of "Our Own Club", a debating club* established by the Paikpara Rajas, that used to meet weekly at first, in their Paikpara House, and afterwards in their Belgatchia Garden, and which, in time, led to the establishment of that theatre, it might perhaps be egotistical on my part to give an account of it. But as you have asked me to say something about the circumstances under which it sprang up and as to the performances in the Belgatchia Theatre, about all, is to be traced the important fact that Modhu's Muse took the cue of

* A splendid Laboratory attached to "Our Own Club" and a Charitable Dispensary from which Raja Issur Chunder Singh used to dispense medicines to the poor with his own hands, occupied a considerable portion of his time and attention. Gifted by nature with intelligence and intellectual parts of a rare order, his predilections naturally ran in the direction of scientific pursuits. He felt that they afforded the best means to promote the material good of his country. He studied medicine with the aid of his family doctor, the celebrated Doorga Churn Banerjee, and devoted himself to the cultivation of the arts of Photography, Electroplating, and Glass-manufacturing—arts that were then in their infancy in this country. From Mr. Newland he learned the process of producing daguerreotype pictures, but finding the results not to his satisfaction he sought the aid of Chemistry, in which he acquired with the aid of his associate Dr. Kannye Lal Dey, C. I. E., sufficient knowledge to enable him to produce photographs of the collodion process, photographs that were pronounced excellent in their way. In electroplating, his specimens were more successful, as the specimens which his friends still possess would show. His passion for chemistry increased with his practice. He made experiments in gases and other non-metallic elements. He also tried his hand at glass manufacture but the results in the absence of experts to teach and guide the process turned out not so satisfactory as he wished. The reverberatory which he had constructed in front of his mansion at Paikpara was abandoned. The stem of the chimney still exists there to attest the activity of his mind, and the interest he took to pave the way for the advancement of practical or technical education among his countrymen. The celebrated horsetamer, Rarey, was struck at Raja Issur Chunder Singh's tact, and the agility he had acquired, in managing the wildest horse. The picture you have given in your book is a fitting and faithful illustration of Raja Issur Chunder Singh with his favourite fiery horse "Eclipse".

singing in his native tongue, and finally eventuating the introduction of blank verse into our language it is with great pleasure I respond to your request. It was simply a desire to combine pastime with intellectual recreation, that "Our Own Club" at last expanded itself into, and took the name of, the Belgatchia Theatre. Diverted into this channel, it proved an unprecedented success. Nobody foresaw its marvellous effect; nobody anticipated the permanent mark it was to leave in the annals of our national amusements. The performances at the Belgatchia Theatre, originally, and at the Patluriaghatta Theatre, latterly, had revived our earliest dramas, have given a higher tone and an improved character to our dramatic representations (*jatras*), and have developed a national taste for the histrionic art.

It is perhaps scarcely known that the earliest attempt towards the revival of our Hindu Drama was made by the late Babu Prosonno Coomar Tagore. The Drama, *Uttara Rama Charita*, translated by Dr. Horace Hayman Wilson, from the original Sanskrit of Bhababhuti, was acted on the stage set up by the former, under the direction and personal superintendence of the Doctor.

Next during 1853-55, some of the ex students of the Oriental Seminary formed a Dramatic Corps under the drilling of Mr. Clinger who belonged to the old Sans-Souci Theatre, and opened a stage, called the "Oriental Theatre", in the premises of the Seminary, where they acted the plays of *Othello*, *Merchant of Venice*, &c., &c.

These novel amusements, though after the fashion of English amateur theatricals, were not without their effect on the development of the histrionic art among our countrymen. They paved the way for the establishment of a national theatre in our midst. The credit of organising the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayaram Bysack of Churruckdanga Street, Calcutta, who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was performed,

in March 1857, the sensational Bengali play of *Kulina-Kula-Sarvasva* by Pandit Ramnarayana. The success and popularity that attended this first experiment led the late Babu Gopal Das Sett to form a similar corps and set up a stage in his house in Rutton Sircar's Garden Street, on which the same play was repeated, before an enthusiastic audience. The unprecedented sensation into which the whole native community was thrown, after the celebration of the first widow marriage, under the aegis of that redoubtable apostle of social reform, Isvara Chandra Vidyasagara, accounted for the interest and excitement which these performances of a play representing a most important social reform, created at the time. As naturally expected, Vidyasagara and Babu Kali Prasanna Singha, always on the van of national progress, encouraged the actors in Babu Gadadhar Sett's house, by their presence and personal interest.

The late Babu Kali Prasanna Singha evidently drew his inspiration of a native theatre from these performances, for it was about this time that he set up a stage in his mansion, on which were produced in a superb native style, and before a large and influential audience composed of the elite of the European and native society, the Sanskrit plays of *Yenisamhara*, *Malati Madhava* and *Vikramorvasi*. These plays were translated into Bengali by him.

Then the grandsons of the late Babu Ashutosha Dey gave some dramatic performances in their house.

But it was not till our Barra and Chota Rajas of Paikpara, as Pratap Chunder and Issur Chunder Singhs were lovingly called and known, two Nature's noblemen, impregnated as they were with true patriotic zeal for the welfare and advancement of their country, appeared in the field, that the native theatre took deep root, and a native orchestra was organised. In the construction of this orchestra Khetter Mohun Gossain, a genius in music, and Babu Jadu Nath Paul had the principal hand.

The Gossain for the first time put into notation some of the native tunes and ragas, and thus created a native Band known

as the Belgatchia Amateur Band, headed by Babu Jadu Nath Paul.

It was expected that this Band which has won encomiums from unprejudiced and appreciative Europeans, naturally averse to Indian music, would continue to be the model for a pure national Band; but unfortunately the later pioneers of the Dramatic Art have introduced some European instrument, and made it a mongrel affair.

To say that the Belgatchia Theatre scored a brilliant success, is to repeat a truism that has passed into a proverb. It achieved a success unparalleled in the annals of Amateur Theatricals in this country. The graceful stage, the superb sceneries, the stirring orchestra, the gorgeous dresses, the costly appurtenances, the splendid get up of the whole concern, were worthy of the brother Rajas and the genius of their intimate friend Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, an accomplished connoisseur. The performance of a single play, *Ratnavali*, which alone cost the Rajas ten thousand rupees, realized the idea, and established the character, of the real Hindu Drama with the improvements, suited to the taste of an advanced age.

The Dramatic Corps was drawn from the flower of our educated youth. Among the actors, Babu Keshub Chunder Ganguli stood pre-eminent. Endowed by nature with histrionic talents of no mean order, he represented the *Vidushaka* (Jester) with such life-like reality, and so rich a fund of humour, as to be styled the Garrick of our Bengali stage. Raja Issur Chunder Singh, who looked a prince every inch, encased in mail coat armour, with a jewelled sword hanging by his side, acted his part, with wonderful effect, befitting the character of a generalissimo, Sagarika, the sea-rescued heroine, depicted in the play as a maiden of exemplary patience under suffering, extreme modesty, and a heart tender and susceptible to the influence of love, was represented by an intelligent fair Brahmin lad whose musical voice enchanted the audience. The Queen Vasavadatta, who is most queenly in her character, had her part admirably

acted by a handsome young lad, Mohendranath Goswami, even to the line in the original.

“প্রিয়মুগ্ধতয়া স্ফুটমসহনাজীবিতমসৌ”

“My Beloved resigns all hope of life which to her is now unbearable.” The scene in which the magician (Sreenath Sen) set fire to the house of Raja Udayana, King of Kashmir, by means of his wand and incantations (*mantras*), and the flashes of light that were produced by stormium red fire (then quite a rare and novel substance here) as well as the scene in which the full moon rose behind the plantain grove, were so affectingly enacted as to rivet the wonder and admiration of the audience. The manner in which the other actors, one and all, acquitted themselves, met with the warmest applause from the audience; —an audience composed of the elite of Calcutta, the cream of European and Native society. Eminent Government officials and high non-official gentlemen who witnessed the performances spoke of the “exquisite treat” they had enjoyed, as heightening their idea of our Indian music and of our Indian stage. The Lieutenant-Governor, Sir Frederick Halliday, who was present with his family, was so delighted with the acting of Babu Keshub Chunder that he complimented him on his extra-ordinary dramatic talents. He said that looking at his serious and sedate appearance one could hardly believe him capable of acting so capitally the part of the Jester.

Nor was the native audience less alive to the sensation that this novel and striking theatre had created in our Indian community, specially among the higher classes and the educated and intelligent ranks. There was literally a rage for the Belgatchia Theatre. As a mere incident, I might mention that a certain wealthy gentleman who had not the good fortune to receive an invitation from the Rajas offered a hundred rupees or more for the purchase even of a single ticket. The idea was no doubt preposterous, but it shows the eagerness evinced by the people at the time to witness the performance of the Belgatchia Amateurs. A respected old gentleman who had witnessed, half a

century ago, the famous performance of *Vidya Sundara* in which women were for the first time introduced on the stage to perform the part of female characters, in a theatre set up at a considerable expense by the late Babu Nabin Kissen Bose in his house at Bagbazar, one who had never seen an English performance, observed to me that it surpassed his highest anticipations, and that he had not the remotest idea that human actions and human manner could be so faithfully and vividly portrayed on the stage. Here it was, as I have already told you, that Modhu's Muse was roused to a sense of the duty that he owed his country, and here it was that Modhu received his first inspiration to sing in his mother tongue. After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation of the *Ratnavali*, Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his to see us introduce a wretched *Vidya Sundara* on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a homethrust and simply muttered, "We shall see, we shall see."

The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of his *Sarmistha* which struck me as having the ring of true metal. I wished to take the MS. with me to Bengatchia, but he said I must wait till he had finished the First Act. It was, I believe, the very next week that he handed over to me the MS., with a request to show it to my friends the Rajas and Babu (since Maharaja) Jotindra Mohun.† On my

* It was at my suggestion, that Modhu was engaged by the Rajas to translate the play

† Modhu was then living in a two-storied house close to the Police

reading to them the first few MS. leaves they were not a little astonished and delighted at the proofs of his poetical genius and power of writing in the Vernacular, and told me to encourage him in this attempt. But I shall not anticipate you as to what followed. You have given a graphic account of the circumstances that led to the production of Modhu's first work (*Sarmistha*) and the introduction of Blank verse into the Bengali language. The Belgatchia Theatre began with the play of *Ratnavali* in 1858, and closed with the performance of *Sarmistha*, the first production of Modhu, in 1859.

It was in 1866, that the Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, following in the wake of his friends the Rajas of Paikpara began to give a series of theatrical performances at his Pathuriaghata house, for the entertainment of his numerous friends, both native and European.

I need scarcely add that the Pathuriaghata theatre that had the magnificent Orchestra of the Belgatchia Theatre*, with some additions and alterations, formed a corps that was equally successful in achieving a reputation as high as that which had been attained by its prototype of Belgatchia. The performances held, at intervals, at his house were continued, for the period of 20

Court; on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works *Sarmistha*, *Tilottama* and *Meghnadbadha*. Had Bengal been England, this house would have been purchased and maintained, by the public, for being visited by the admirers of his genius.

* Special interest for Belgatchia Concert was evinced by Her Excellency the Lady Ripon. She used to scrutinize every instrument, and the manner in which each was played upon. She, more than once visited the Pathuriaghata Theatre. It was at her special request that the Maharaja deputed the Belgatchia Orchestra Company, headed by Babu Jadu Nath Paul, to Barrackpore, to entertain their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Connaught, who greatly appreciated the music. The Duke remarked that some of the airs were peculiarly delightful. Some of the Dramatic Pieces, Songs, Hymns Operas, and Farces that excited the thrilling interest and evoked the fervent applause of the audience, were composed by the Maharaja himself.

years, to afford a rare and rich treat to the elite of our Calcutta Society, from the Viceroy to the latest newcomer* and left a lasting mark on the annals of our Drama.

I should not omit to mention here that the sons and nephews of Maharshi Debendranath Tagore, already known to fame as a family of geniuses have been no less distinguished in their endeavours to resuscitate our Hindu Drama. The representations,

* An incident in connection with the Maharaja of Rewa may be noticed here. At the time when the Chief of Rewa was putting up as a guest of Maharaja Jotindra Mohun in his Emerald Bower Villa, the performance of the Vidya Sundara Natak was going on for several nights on the stage of the Pathuriaghatta Theatre. His Highness expressed a wish to be there on one of these occasions. The Maharaja came in state attended by a number of his Sardars and some of the Chief Officers of his Durbar, and highly enjoyed the music and the performance. Indeed, so highly pleased was His Highness that when the play was over, he caused two packages of Cashmere shawls and a bag of money to be brought, and offered for distribution to the actors. It was very courteously explained to him that all the actors being amateurs they could not accept the presents, though they were extremely thankful to His Highness for his appreciation of their performance. Different as was the mode in which the Viceroys and the Lieutenant-Governors gave vent to their gratification, for they contented themselves with personally complimenting the principal actors, after the play was over, the manner in which the Maharaja of Rewa expressed his pleasure was characteristic of the custom which prevails in his part of the country. Among the Hindustanis the idea of amateur music or of amateur singing seems to be somewhat different from that which obtains in Bengal. Those among the former who cultivate the art of music for the sake of pleasure do not care to exhibit their accomplishment before the public. They look to dancing girls, and professional songsters and musicians for their private or public entertainments. The King of Oudh, the late Wazid Ali Shah, had an amateur company, composed chiefly of his own aides-de-camp, and partly of his own court musicians and dancers, but they were not privileged to perform beyond his Majesty's palace. The Hindustani Ram Jatra and Ram Lila are performed with great *eclat* mostly by professional people. The Bengalis, on the other hand, have from time immemorial their amateur (সেবেব বলা) Kobis, Jatras, Full Akrais and Half Akrais, in the performance of which they take a delight and personal interest.

which they gave, from time to time, in their house, and in which they themselves took the part of actors could not be surpassed in respect of the excellence of acting, the exquisiteness of music, and the sweetness of the songs. Modhu, although he wrote no play for this theatre, had* an active hand in the success of the performances.

It was at some of these early performances in the Pathuria-ghatta Theatre that I recollect, while talking with the Maharaja on the æsthetic influence that theatre in general exercised on society, to have anxiously and earnestly dwelt on the desideratum of a permanent public Theatre in our midst to which the poorest as well as the richest could resort at pleasure, and regretted how our speculations on the subject always ended in unfulfilled expectations. At the time of such conversation how uncertain and doubtful we felt about the realization of our hopes, but we did not know how very near that realization we were at the time. This was in 1866 and in 1872 and 1873 two public theatre sprang up in Calcutta. The first was the National Theatre that had an itinerant career, for a short time, till it found itself housed in a building erected for the purpose. The next was the Bengal Theatre, subsequently named the Royal Bengal Theatre, since it had the honor of playing before His Royal Highness the late lamented Prince Albert Victor, at his Reception in Calcutta. It owed its establishment to the direct influence of Michael Modhu who induced the late Babu Sarat Chandra Ghose to open the theatre, with an assurance that he would write fresh dramatic pieces for its benefit, but Modhu, unfortunately, died before he could redeem his promise or see the theatre in full swing. The theatre was, however, opened on the 16th August 1873, with Modhu's *Maya Kanan* for its first performance.

History will not fail to register the fact that, for the first

* We have in Babu Robindro Nath Tagore not only a rare actor - true to the life, but a singer of superior order, Babu Jotindra Nath Tagore a brilliant musician and in Babu Akhoy Kumar Mozoomdar a jester of no less distinction than Babu Keshab Chunder Ganguly.

time since the down of English education in our country, the efforts of a few—scarcely half a dozen educated young men, in the quiet pursuit of innocent pleasure without professing to play the part of reformers, or attempting to bouleverse the country with outlandish innovations, gave a practical shape to the organisation of our dramatic representations, on an enlightened and rational basis. The example set by the Belgatchia, Pathuria-ghatta, and Jorasanko Theatres paved the way for the establishment of several permanent public Theatres that have now become standing institutions in our country for the amusement and instruction of the people.

I trust your readers will find the above account of the origin of the Bengali Theatre interesting, and therefore excuse us for its length; and although we were very desirous of preserving the account for the information and interest of posterity, we would not have given it in this book if the name of Modhu Soodun Dutt were not intimately connected with the Bengali Drama, and if he had not taken a prominent part in the promotion and success of the first Bengali Theatre, by composing plays for it, as well as attending the performances, and making suggestions to the actors for their improvement.

I now conclude my reminiscences with a description of Modhu's character. There, perhaps, had never existed a man of a more loving heart than he. His friendship was not an ordinary friendship. His heart always brimmed over with love. His love was like the impetuous torrent that bounds over field and dale irresistible in its course, and deep in its volume, carrying on its bosom the sympathetic and sentimental, and repelling to a distance the prosaic and the callous, who could not appreciate such love. There was no ebb-tide in his feelings; they were in perennial flood, without ever being sluggish. He was an ardent admirer of beauty, nor was beauty, less prone to reciprocate his feelings. Modhu had great faith in love at first sight.

“Who loved that did not love at first sight.”

Though he entertained this belief, though he was by nature impulsive, though "no sooner thought than done" was his motto, though inspired by love at first sight, he would not, supposing adult marriage to have been prevalent in Hindu Society, have acted with any precipitancy in the selection of a fit partner for his life. When his heart had been fixed, and it would not have been fixed until he found that his better half breathed equally responsive vows, he would, if circumstance had permitted, not have cared for the barriers of conventionalism or the trammels of caste. It is a fact that, before he became a Christian, his parents had elected for his bride a girl who was a cherub—a veritable Peri. But Modhu had not a heart to give away at the bidding of another, though that bidding was from a revered parent. He could not realise the idea of a wife without experiencing before marriage the mutual "flow of soul and feast of reason" that characterises true love between the sexes. Mere animal passion had no influence on his feelings in matters matrimonial. He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life. His emotions were not excited by the mere sight of physical beauty, without mutual play and interchange of feelings and sentiments in which grown up young people only can indulge. The infantile face gave rise in his mind to fraternal sensations such as a grown up brother feels for his little sister. He used always to tell me that he would rather die a Benedict than wed an "illiterate, uneducated, unsympathetic" girl, and in those days an educated female was a *rara avis* in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian Clergyman; but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud. By embracing Christianity, he was enabled to realize his idea of English Courtship before marriage. I had little intercourse with him when he was at Madras, except by means of occasional correspondence; but, for aught I know to the contrary. I can confidently say that Modhu was disappointed in his first wife. There was not that close unanimity of feelings and sentiments between them which

Modhu, and not only Modhu, but all, geniuses, expect from their wives. Hence the estrangement of feeling between them, and subsequent separation. I am glad to be able to state that he was not disappointed in this respect in his second wife. He was as happy in her company as possible in this world and she was as faithful as Savitri herself.

He, like Krishna of old, was dark in complexion, but handsome in features, with eyes beaming with expression. His sparkling wit and brilliant repartee were to him the flute, as it were, with which he charmed and enthralled. It was the poetry of his soul, the music in the fibres of his composition, that made everyone gravitate towards him. The magic of his conversation, the sweetness of his manners, acted like electricity upon those who associated with him. When he was in your presence you could never open your mouth, you would only hear him talk, laugh and break your sides with laughter. He was a universal favourite. Once met he was always and ever afterwards, "Hail fellow, well met."*

Modhu was generous and noble-hearted. There was no gall or acrimony in his soul. Without a trace of rancour or vindictiveness, his nature partook largely of the divine grace of forgiveness. The scurvy treatment that Degumber Mittra (Raja)† dealt out to him would, in any other case, have led not only to open rupture but to a mortal severance, but Modhu forgave and forgot, as if nothing had occurred. He was above all boyish bickerings and altercations even in early youth. There

* As an instance of his winning ways, I may mention that once, when I asked the late Raja Chunder Nath Ray of Nattore, the first Bengali political Attache, to pass an evening at my garden, he wrote to me, before coming, to ask my permission to bring Michael Modhu with him. He was not aware that Modhu was one of my oldest and dearest friends. When we met, Modhu, as usual, ran with open arms to embrace me. Chunder Nath told me how the chance acquaintance of an hour had given rise to a deep attachment between them, and how he felt that without him there could be no enjoyment, specially in a party like the one we had.

† Vide Some of Modhu's letters to Vidyasagar in the Text.

occurred not a single ripple to disturb the even course of our uninterrupted friendship during thirty-two years. The current of geniality and cordiality perennially flowed from his heart. I recollect that, when sorely vexed, on one occasion, at an instance of his recklessness, I took him to task so severely as to hurt his feelings, he kept quiet and did not speak to me for a while, but the moment we next met he was as sweet and serene as ever. He was never morose or moody, but always cheerful and lively, humorous and jocular. He was charitable to a fault.

He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream—a visit to England.

His 'Talook which one Mohadeb Chatterjee, with somewhat like unfair means, got out of him, and which yields to the present proprietor an annual income of six thousand rupees, was parted with for a song, in a moment of desperate need. He was improvident, unworldly, unbusiness-like in the extreme. His wife was helpless in his presence, quite powerless to restrain him from extravagance, or check him in his imprudence. Poor lady! What could she do? She forgot everything, as he stood by her side, as she looked up to his face, the face of the idol of her heart, the idol she adored and worshipped with all the fondness of womanhood. It is a pity that such a fortune as his parents, notwithstanding his apostasy and cruel desertion of them, left him, should have been dissipated and that he should have died a pauper's death in a public hospital! And my heart breaks to think of the scenes I saw before death closed her and his eyes. I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu shut up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and sufferings; "afflictions in battalions" were the words he uttered. I knelt

down to feel her pulse and temple; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone. I care not to die." Before I could insist on their immediate removal to Calcutta for better medical treatment, Modhu told me he had arranged to start on the morrow for Entally in the suburb of that city. She, an English woman verified, by her prior death by about 70 hours, the Hindu adage that no faithful wife (সাধবী-স্ত্রী) lives to be a widow. May her memory be perpetuated by her only surviving son, a promising young man, Albert Napoleon Dutta, Assistant Sub-Deputy Opium Agent.

Calcutta,
3 Bysack's Lane, May 1892.
Babu Jogindra Nath Bosc,
&c. &c.

Your sincerely,
Gour Das Bysack.

বাবু ভূদেব মৃধোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

শুভাশিষ্য: সন্তু।

চ'চুড়া।

১৭ই এপ্রিল, ১৮৯০।

স্নেহাল্পদ যোগীন্দ্র,

মধুসূদনের সাহিত্য আমার প্রথম আলাপ হিন্দুকলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দুকলেজে ৭ম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন, মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত-প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংবাজিওয়ালা মানেই, বিশেষতঃ ইংরাজ শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল, কিন্তু, ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী

সহিল না ; একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবা ! পৃথিবীর আকার কি রকম ?” তিনি বলিলেন, “কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।” এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পৃথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, “এ গোলাখ্যায় পৃথিবীখানির অমূলক স্থানটি দেখ দেখি।” আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—“করতল কলিতামলকবদমলং বিদান্ত যে গোলং।” বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, “আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোল স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তে পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন ; এই দেখুন তিনি বরং স্লেয়কটিও আমাকে পৃথিবীমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।” রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, “কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল ; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।” রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলের দৃষ্টিতে বেশ সূত্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল ; দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি ভীত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছটির পর একেবারে আমার নিকট আসিয়া, সেক্‌হ্যান্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার।” ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সন্মিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্ন-গদ্যলিঙ্গ উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহাব সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যल्पকাল মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমুদায়দিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন : গায়ে, মাথাষ ধুলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট প্রীতি জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুব বাড়ীতে যাই নাই ; মধু আমার তজ্জন্য কোন দিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল ; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জনাই, সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমার না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলে ১৬ মাসে ৮০ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন ; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাদা ছিল না ; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, “তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?” আমি বলিলাম, “হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা ত বদ্বিতেছে ; ৫ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।” এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, “কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মাযের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমাব টাকা হইতে তোমাব স্কুলের বেতন দেওয়া চালাতে পারিবে।” এই বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে ; আমি মধুকে এতই আপনাব বলিয়া মনে করিতাম।

৫ম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সমপাঠী আমরা একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্য পূর্ব্বেব ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু বাহা লিখিত বা নুতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত ; কিন্তু আচার ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্তা হইত না। সেসকল বিষয় আমার নিকটে সঘনাই গোপন রাখিত। কখনও কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, “দেখ দৌখ, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মাহের ব্যয় হইয়াছে।” মধু সে দিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাডেব চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, “এক করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস্ (genius) ; জিনিয়াস্ যারা, তাবা নুতন নুতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চুড়া, কি সাত চুড়া, কি ন’ চুড়া কাটিয়া আসিতে, তাহলে বাহোক একটা নুতন রকম কিছ হইত ; তা না করিয়া ফিরিঙ্গীর মতন চুল কাটিয়া আসিয়াছ। এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটী ভাল নয়।” আমাব কথাব মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছে ঘেসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। বাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুস্থানে জানিলাম, মধু খুঁটান হইতে গিয়াছে : শুনিয়া বড়ই বিস্ময়গ্ৰস্ত হইলাম। বিস্ময়গ্ৰস্ত হইলাম এই জন্য যে, মধুর সঙ্গে আমার

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ; মধু খুঁটান হইবে, খুঁটান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘৃণাক্ষরেও আমার কোন দিন বলে নাই ; তাহার ভাবগতিক দেখিয়াও আমি ইহার অনুমাত্র বুদ্ধিতে পারি নাই। একবার মনে হইল, কথা সত্য নহে ; আবার মনে হইল, যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে ত মধু আমাকে এ বিষয়ে একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েকজন মিলিয়া কলেজের ছুটির পর মধুকে দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনলাম, তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ামে রাখিয়াছে ; সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী গৌর একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যে দিন খুঁটান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপস কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে কিন্তু পদার্থের ন্যায় সে মধুর ভাব, সে চন্দ্রের জ্যোতিঃ কোথায় ? মধুর পদার্থ আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

বিশপস কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মান্দ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে বাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথা উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, “আমার প্রণীত ‘ক্যাপ্টিভ্ লেডী’ নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।” বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। তরল সৌন্দর্য তাহার ছিল না ; যে সৌন্দর্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অমপূর্ণা মূর্তিই তাঁহার ছিল।

আমি মধুর পত্রের জবাব দি ; কিন্তু ইহার পর হইতেই পবনপবে সন্ত্রস্ত বেশী না থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়া যায়। কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটী প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দি এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটী কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্যাল স্কুলেব উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাগালা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে ‘পৃথিবী’ লিখিতে ‘প্রাথিবী’ লিখিত ; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই আমার নর্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়ই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য, অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধুর সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিলেও উভয়ের স্নানভাবে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ; আর বোধ হয়, প্রকৃতিগত সেই প্রভেদ ছিল বলিয়াই ওরূপ বন্ধুত্ব জন্মিলে

পারিসাছিল। মধুর বৃক্ষ বিদ্যাতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত; আমার সেরূপ কিছু ছিল না। “উত্তর রামচরিতে” আশ্রয়ী ও বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে কবি ভবভূতি লিখিয়াছিলেন, “প্রভবতি শৃচির্বিষ্বোদ-গ্রাহে মণির্ন মদ্যং চরঃ।” আমাদের উভয়ের ঠিক তাই হইয়াছিল; মধুর বৃক্ষ বিশদ মণির ন্যায় ছিল—প্রতিবিশ্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।

মধু যে সকল বিষয় আমাকে খুলিয়া বলিত, তাহাবও অনেক বিষয় লইয়া আমাদের মতভেদ হইত; কিন্তু প্রায়ই ওৎপ স্থলে মধু শেষে আমারই মত গ্রাহ্য করিত। একবার কলেজে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা হইবার কথা হয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে বাদ্য রামগোপাল ঘোষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধু প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত মিনিয়া ঐ পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইল; বলিল, “বাঙ্গালীর দত্ত পুরস্কারের জন্য আবার পরীক্ষা দিব কি?” আমি বলিলাম, “মধু ও কথা ঠিক নয়, বাঙ্গালীর পুরস্কার বলিয়াই পরীক্ষায়-প্রবৃত্ত হইতে হইবে।” মধু শেষে স্বীকার পাইয়া উক্ত পরীক্ষা দেয় এবং পরীক্ষায় আমরা উভয়েই পারিতোষিক পাই। মধু পায় সোনার মেডেল, আমি পাই রূপার মেডেল।

ইন্দুকলেজে তখনকার অধ্যক্ষ কাপ্তেন বিচার্ডসন সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নামে একটি বৃত্তি সংস্থাপিত হয়। মধুও সাহেবের আভিপ্রায়ে পোষকতা করিয়াছিল; কিন্তু আমি বৃত্তি স্থাপনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাপনের প্রস্তাব ভাল বলিলে, মধু আমায় প্রস্তাবেই অনুমোদন করিয়াছিল।

মধু আপনার বিদ্যাবৃক্ষ খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে আমাদের বলিত, “তোমরা আমার জীবন চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।” আমি মধুকে এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিত পারিতাম। কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যান্য ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই। দৃগুতের বিষয় হয় অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং বিজাতীয়পথ অবলম্বন হেতু, মধুর সেই প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়া সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে বিকসিত হইতে পারে নাই; ফলতঃ অন্য পথে না বাইয়া দেশীয় পবিত্র নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া চলিলে মধু স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যোগিতাবলে স্বদেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারিত এবং সর্বতোভাবে আমার হৃদয়গ্রাহী হইত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু অল্প সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অনিয়ত খাষণ করিয়াছিল। ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক

সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, “আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।” এই সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মধু ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে প্রকৃতির হস্তবিনিমিস্ত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিস্ক, পবিত্র মানবরস ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অন্তঃকরণমধ্যে মালিনীকৃত এবং কবির চক্ষে “নিমেদন্তের” আদর্শীভূত।

ইহার কিছুদিন পরে মধু “হেক্টরবধ কাব্য” রচনা করে এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া, পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। এতদিন পরস্পরে সংস্রব রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ ব্যাপার তাহারই প্রমাণস্বরূপ বই আর কি?

শুভার্থী

শ্রীভদ্রদেব মুনোপাধ্যায়।

বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত।

দেবগৃহ, ১৯এ পৌষ,

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

প্রিয়তম বোগীন্দ্র.

তুমি আমার আমার বড়োয় সহাধ্যায়ী কবিবর মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছি। আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আমি যে তোমার অধিক কিছু লিখিয়া দিতে পারিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তোমাকে প্রায় সমস্তই মধুে বলিয়াছি। আমি যখন হিন্দুকলেজের শ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, মধুসূদন তখন আমার সঙ্গে পড়িতেন। তখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগে তিন শ্রেণী ও কলেজ বিভাগে দুই শ্রেণী মাত্র ছিল। এই দুই শ্রেণী এখনকার কলেজের চারি শ্রেণীর কাজ করিত। মধু যখন কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি অতি নিভৃত-স্বভাব ছিলেন। দুই একটি কথা ব্যতীত কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। আমারও সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইরূপই হইয়া থাকেন। আমার স্মরণ হয়, তিনি একদিন ভক্তিজ্ঞান রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় গিয়াছিলেন, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি মিল্টন হইতে এত

কবিতা উদ্ভূত করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, যে আমি, নিজে ইংরাজী কবিতা খোর ও অনেক ইংরাজী কবিতা মুদ্রণকারী হইয়াও, আশ্চর্য হইয়া গেলাম ও তাঁহার নিকট পরাভব মানিলাম। তিনি হিন্দুকলেজের সেকেন্ড ক্লাসে থাকিতে থাকিতে খৃষ্টীয়ান হইয়া যান, তৎপরে বিশপস কলেজে পড়েন ও তৎপর অনেক দিন মাস্ট্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি ১৮৬০ সালের শেষে যখন মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসি, তখন সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন, মাস্ট্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরী চাঁদ মিত্রের অধীনে হেডকোরগারী কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছু দিন পূর্বে হইতে তাঁহার কাবতার বিষয়ে আমাব সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। “বিবোধার্থ সংগ্রহ” নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি আরম্ভ হয়। আমি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে (তখন রাজা উপাধি প্রাপ্ত করেন নাই) ঐ বাক্য সম্বন্ধে লিখি যে, উহাতে মিল্টনের Gandeur and Sublimity আছে ; সেই চিঠি তিনি মধুকে পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে উক্ত রাজার সহিত পুনঃপুনঃ পত্র লেখালেখি হওয়াতে, মধু আর থাকিতে পারিলেন না ; আমার তাঁহাকে পত্র লিখিবার পূর্বেই তিনি আমাকে পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। আমি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামক পত্রে সমালোচনা করি। মধু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই ভিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহাকে দোষিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কলিকাতায় আসি এবং আসিবার পূর্বে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, “কবে আমি দোষিব” “মধুসূদন-বদন-সরোজং”। আমি জয়দেব হইতে ঐ সংস্কৃত বাক্য উদ্ভূত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সে দিন দোষিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের একটা প্রদূর দোষিতেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “My dear Raj, will not this make me immortal?” আমি বলিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক কবি আশ্চর্যসাধা, দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন;—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং।

শৃঙ্গু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥

আবার বলিয়াছেন:—

বন্দ্যধর্ম কলাসু কৌশল মনুধ্যানশু বৈষ্ণবং

যচ্ছংগারবিবেক তত্ত্বমপি স্ব কাব্যোদ্ লীল্যিতং

তৎ সর্বং জয়দেব পান্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাথ্যঃ

সানন্দ্যঃ পরিশোধয়ন্তু সৃষ্টিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দভঃ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশ মন্ডল তাহাতে

সম্মুখ হইয়া, তাহার উপর তারকা স্বরূপ মৃত্যুফল বর্ষণ করিতেছে। মধুর আশ্বলাঘা কিন্তু কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যৎশীঘ্র হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া, মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের পর বলিলাম, “যে আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমাব হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।” তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ; আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘোঁষিয়া না থাকিলে চলে না, এইজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘোঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘোঁষিয়া থাকা কর্তব্য।” তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহােরেব নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব, সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটী ফিরিঙ্গী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন ও বিদায় লইবার সময় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত মৃদু-চন্দন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক, তাঁহার হৃদয় প্রেম ও স্নেহে একেবারে পার্ণপূর্ণ ছিল।

এই সাক্ষাতের পর মধুর সহিত আমার যে সকল পত্র লেখালেখি হয়, তাহা পূর্বে সূরাভিতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তোমার গাথ্রেও তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার শেষ পত্র। তাহাতে আমাকে লেখেন, Take care of my fame! তুমি এই জীবনী প্রণয়ন দ্বারা তাঁহার যশ রক্ষা করিয়াছ। আমি এই জীবনী প্রণয়ন কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান দ্বারা তাঁহার যশোরক্ষা কার্যের ভাগী হইয়া, তাঁহার অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি; ইহা আমি শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করি। মধু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কলিকাতায় আমার সঙ্গে তাঁহার বড় দেখা হইত না। তখন আমি মাথাঘোরা পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িত। তবে প্রতিবাসী বন্ধুগণের বাটীতে কখন কখন দেখা হইত। একদিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু বসিয়া আছি, সেই সময় তিনি Wordsworth's Sonnet in praise of the Sonnet এমন করিয়া আবৃত্তি করিলেন, যে আমরা বিমোহিত হইলাম। মধুসূদনের সম্বন্ধে আমার সকল স্মৃতিই মধুময়।

সেনহশীল

প্রীরাজনারায়ণ বসু।

The Prasad
1st December, 1892.

My Dear Gour,

You have asked me to give a few reminiscences of our Poet, Michael Dutt. I wish I could give you many, for I am sure anything said of Michael will prove interesting. The difficulty however of bringing back to mind recollections of "auld lang sine" is great. Nevertheless there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgatchia Villa where the stage had been set up for the performance of the "Ratnavali". Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you" said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember", I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse

"কবিতা কল্পনা কলা পাক্স যেন কাঁদ, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।" in Bengali, beginning with the lines "Oh!" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But", I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in

it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow", he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True", said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass", said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added, "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then", I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." *** "Done", said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgatchia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his want, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like then?" said I, "why, they are simply charming; you have won the bet I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said, "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said, "Well, now our friend, Michael, must com-

plete his little poem as soon as possible." "Certainly", said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existencce. By way of a complaint the little volume was dedicated to my humble self and the original Manuscript was also handed over to me. This, as you know, is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rmecke and Co., the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the pose or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for sometime, and the idea went out of the poet's head.

I am afraid, I have spun a somewhat tediously long yarn about this incident but here my story ends.

Yours sincerely

Joteendro Mohun Tagore.

Babu

Gour Das Bysack.

Reminiscences of Michael Madhu Sudan Dutta

By

Raja Peary Mohan Mookerjee

My Dear Sir,

The few weeks that Mr. M. M. Datta was here he was in a very weak condition. He could not take any exercise or devote any time to reading. His disease was chronic Laryngites. I gave him Kali-Bich. 3rd and Hep. S. 6th but with no effect. He was

also for sometime under the treatment of the local Assistant Surgeon with no better success. He spent most of his time in bed or in a reclining chair and sometimes took a short walk on the terrace or on the varandah. He was then a complete wreck of his former self, but he did not even for a moment lose his natural cheerfulness of disposition or show any irritability of temper. On the contrary he was always ready to amuse his visitors with a smart anecdote or humorous saying. The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja the idea struck him that he could be happily compared to a street hydrant of the Calcutta Water-works. Anybody who chose had only to pull it by the car and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few month's service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he felt the Raja's service. He did not hope to survive the illness and was fully resigned to his fate. The only subject on which he sometime showed any anxiety was the future of his wife and children.

Uttarpara
The 10th September, '92. }

Yours very truly
Peary Mohan Mookerjee.

Babu

Gour Das Bysack.

My Recollections of Michael Modhu

I

With one foot in the grave in my 70th year, I gaze on the infinite prospect before me, but my view ends in a cul-de-sac.

Behind me lies the Retrospect, with scenes behind scenes in lengthened perspective. In it, I find the best resource to kill time till time kills me.

Turning my mental telescope, I see a far off, in 1840, Modhu “diminished into a boy” of 15 or 16. His white clothing deepening his complexion, he looks very like an Etniop boy. But see “Othello’s visage in his mind.” The light from within peers through his eyes. He approaches, and hands me a copy of the *Bengal Spectator*. We take our seat on the steps of the Sanskrit College, facing the Gol-digi, Modhu draws my eyes to a little poem of his—the first-born of his mental progeny. It is a sonnet, in which form a callow pupil is at first apt to court the Muse in imitation of his professor D. I. R. Here let me pay my humble tribute to that beloved tutor, who by his example incited many of us to literary adventures.

Modhu has taken up to describe a night scene, in which among other things he thus alludes to the starts—“Night holds her Parliament.” The happy expression at once becomes a “fond record in the tablet of my memory, and still holds a seat there”—fifty years have not been able to efface it.

Shakespeare has “the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold.” Byron addresses the stars as the “poetry of heaven.” Modhu in his teens, gives a proof of close poetic kinship. The Aryan by race, is Aryan, too, in thought and expression. I was Modhu’s senior. I too liked poetry. But I never knew the way to Castaline. My head was a prose quarry without a vein of poetic gold. Modhu’s was a Helicon quarry. There lies the distinction between genius and scholarship.

The next is a very different scene from Parnassus to “Pegasus in pound” at Modhu’s house, in Kidderpur. Gour and I set out for there on a summer day after sundown. Modhu has asked us to a treat. His *Pilau* was the Czar of dishes.

Long years then elapsed, making a gap. The friends of youth were dispersed in Life’s wide world. Modhu having strayed from his father’s roof into the Redeemer’s fold, was at one end of India, in Madras. I rusticated amidst the fens and bogs of Jessor.

Some twenty years after the last interview, we met again

at Belgatchia, in 1858. The Belgatchia Villa recalls a host of associations. But one circumstance is of itself enough to consecrate the spot—the rise there in our day of the Bengali theatre. The names of Rajas Pratap Chandra Singh and Issur Chandra Singh cannot die from the memory of those who took a part in the reproduction of Sriharsha's *Ratnavali*. *Sagarika* was losing charm by repetition, when Modhu came to the rescue with his *Sarmistha*.

My next recollection may come rapping at the door of memory, but I shall not find its way out to the world.

The last recollection, dated 1872, relates to a case in the Burdwan Judge's Court, in which Modhu was on one side, and Babu Romanauth Law on the other. It was a passage at arms between a barrister and an attorney, in which the Calcutta Old Post Office Street had the better of the Inner Temple. Law and letters bear no homogeneity. The poet and the lawyer are at each other's antipodes.

Modhu fully justified his name—he was all *স্ব*, all that endeared one to another. No gall or acrimony in him—he was never on stilts, and always in slippers. The smile was ever on his face. He seemed to be under inspiration for twenty-four hours. Not merely was he liked by all with whom he came across, but regarded with friendship and affection. His best friend wished only that he had known a little more of the art of making money. Necessity obliged him to take to law, in which he was out of his element.

I ought not to conclude my paper without a little say about Modhu's poetry. It is to be viewed from two stand-points. He first courted the outlandish English Muse. Next he courted the indigenous Sarasvati. In his 26th year, he entered upon his first poetic adventure—the *Captive Ladic*. It rose as an aurora borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets such as Kasiprosad Ghosh, Rajnarain Dutt, Guru Churn Dutt, O. C. Dutt and others. Modhu distances them all. He was to the Hindu community what Derozio was to the East Indian.

Both of them held out great promises that were destined to remain unfulfilled. It seems that the melodramatic tales in English poetry,—Scott's *Lady of the Lake*; Byron's *Giaour*, *The Bride of Abydos* and *Lara*; Southey's *Kehama*; and Moore's *Lalla Rookh* influenced their young minds to pour out their first effusions—the one in his *Fakeer of Jungheera*, and the other in his *Captive Ladie*. But they were eminently national in choosing national themes. The tale of the *Captive Ladie* is founded upon circumstances once common in the land, but unknown in our days. It relates to the abduction of Princess Sanjukta from her father's palace at Kanauj by the heroic Prithiraj of Delhi. The Hindu history of that period teems with instances of as heroic courage, as great love of country, and as patriotic devotion; as we read of in Grecian or Roman history. Modhu tells the tale with a little variation and historical inaccuracy. But he fails not to do justice to the ancient Chivalry of India—to the bucklered knights and barons bold of ancient Delhi.

His *Visions of the Past* is decidedly an imitation of Byron's *Dream*. Byron stands on "a gentle hill,"—Modhu stands in "a bower bosomed on a mount." Byron saw "two beings in the hues of youth"—Modhu saw "two beings pent in each other's arms in balmy rest." Changes come over the spirit of Byron's dream—so are there shiftings of the figures in Modhu's phantasmagoria, of course, Byron's concentration and energy of expression—his "thoughts that breathe and words that burn", are too much to expect from Modhu. But his pictures are not a little spirited, and "his beings" interest us more than Byron's "beings". Let us consider these efforts as imitative of what had caught the youthful ear and fancy. But if such were his early and immature productions, what might have been the fruits of his ripened talents,—how far he might have soared, had he continued in his courtship of the European Muse, it is not easy to say.

Modhu exchanged old Pegasus for the Indian Pakharaj. He gave up his addresses to Calliope, and turned an admirer of, and lost his heart to Saraswati. In plain words, Modhu took to writing in his native tongue.

There are four eras in Bengali literature. 1. That of Chaitanya's followers; 2. That of Raja Krishna Chandra Rai and his literary proteges; 3. That of Dr. Carey and his Serampur contemporaries; and 4. That of Ram Mohun Roy and the Tatwabodhini Sabha. Modhu created the 5th era. Pundit Iswara Chandra Vidyasagara did not create an era. He wrote practical, off hand, catch-penny books that have not left a mark. Modhu deserves the first rank among our Bengali poets. Vidyapati, Chandidas, Mukundaram, Bharat Chandra, Rampradasa, Nidhu, and others, have all written little better than brilliant common-places that are more the products of art than of inspiration—that show more constructiveness than enterprise and invention. Like Pope and his imitators, they are mostly clever versifiers,—good rhymers, but no true poets. They entertain us with fine metrical lines, but their writings, wanting in variety, resemble the entertainment given to Pompey, in which were a variety of dishes, but all made out of one hog—nothing but pork differently disguised. Taking their stand upon their ancient native soil, they all work out of the same mine—that of Hindu myth. Their hobby is broken to pace only in a certain groove. But Modhu's Pakharaj is an adventurous courser into new fields and pastures. It is because that not only he had been nursed in native milk, and been suckled by his mother geniuses Valmiki, Vyasa and Kalidasa; but that he had been the guest at the banquets of other illustrious hosts who regaled him with many foreign dainties and delicacies, and opened up to him new horizons from which streamed new light, with new tints of colouring. His taste was refined by those critical canons of the West, the like of which does not exist in Sanskrit rhetoric.

Modhu announced a new era to the Bengali lyre. He introduced the blank verse. Indeed, our Sanskrit has been so melted down, refined, and moulded that not only our laws, but also our dictionary, have been transmitted in the harmony of verse. Perhaps, they of old were of opinion, like Johnson, that blank verse was "verse only to the eye", and therefore loved to in-

dulge in the jangle of rhyme. Modhu has taken a new ground altogether and founded a new school. His *Meghnadbadha* is an "adventurous song"—a "thing unattempted in verse" by any bard of his native land. From an European point of view, he has achieved a remarkable triumph.

Modhu's English poems are to be regarded as proofs of his versatile powers. His fame rests upon his Bengali poems. There are many, among which *Meghnadbadha* holds the first rank. It is a chip of the epic-block—an epic torso, conceived without the beginning and the end. We are not to decide his merit by reference only to his originality. His Bengali words are cast upon the European model, and we are to see how far he has succeeded in introducing improvements borrowed from Western literature. I regret that I have not time for a leisurely review of his *Meghnadbadha* from this stand-point. I can, only, simply say that the story has great purity from the gross inventions and exaggerations of the Pauranic writers. Modhu has kept all the great epic authors of Europe in his view, and has very successfully imitated Dante and Milton in his description of the infernal regions. Ugolino gnawing the scalp of his enemy; the Stygian Council at Pandemonium, Sin in her formidable shape, Death wielding a dreadful dart, Night and Chaos holding eternal anarchy, have all been closely imitated. Orpheus and Ulysses revert to the mind as Rama, accompanied by Maya-Devi, visits our poets Inferno. The pictures are not plagiarisms,—they are sufficiently originally, graphic, and spirited.

Nothing could exceed the pleasure as his *Vrajaugana Kavya* afforded me. It is the production of a refined intellect. By the side of Jayadeva's spiritualized Radha, Modhu's Radha has a "more terrestrial mould." But his cloud, *Jamna-bank*, *Peacock-female*, *Echo*, *Usha*, and others, are pure and beautiful abstractions, that show that the sensibility of his nature was not blunted by the world. The poem is a charming pastoral, wanting only the rich harmony of the sonorous Sanskrit of the *Gita-Govinda*.

It is much to be regretted that his life-voyage was not smooth-

sailing, but a struggle with buffets and vicissitudes. Law must have dulled his sense of the sights and sounds of beauty around him, "Chill penury froze the genial current of his soul." And he must therefore be regarded to have died as it were an "in glorious Milton" leaving behind buds and blossoms, but no ripened fruit—the lucubration of ease and leisure. It were to be wished that with his spirit so gentle and meek, his mother-wit so deep, he had always warbled on the branch of Poesy, like the

"Sweet bird ! whose bower is ever green,
Whose sky is ever clear,
Who has no sorrow in his song,
No winter in his year !"

Calcutta,

Bholanauth Chunder.

5th June, 1892

II

One more recollection that comes to my mind, is the following—Kissory Chand Mitra was Magistrate when Modhu returned from Madras. He returned like a true poet, without a six-pence in his pocket. One Mr Tucker, choosing to go away from the Police to the Small Cause Court, made room for Modhu to be taken in as Interpreter by Kissory. Modhu's pay was Rs. 120 a month—just enough for his *dal-bhat*. Kissory treated Modhu in the spirit of a friend, and not of a superior. In this Kissory was an honourable exception to most Bengalees in power, who are generally tyrants over their nation. Poor fellow ! when he was in hot water, Modhu and Harish Mukerjee came to his help. They drew up all the necessary papers for him. They advised him to ask for a Commission. Ramgopal Ghosh very much condemned this step, and lamented Kissory's mistake in taking no better advice than from two flaming young spirits.

Modhu then lived close by the Police, and walked in a trice to his office. He lived in the small two-storied house on the

Chitpur Road, just to the east of the new Police building. Here, he wrote his *Sarmistha*, *Padmavati*, *Tilottama*, *Mcghnadbaddha*, *Krishnakumari* and others. The spot ought to be memorable in our literary annals. Modhu, I have been told, used to dictate to three or four amanuenses together. He moved about in the room, and told each in his turn what he was to write. To carry so many and so different matters in his head, all at the same time, is possible only for a genius.

Like every one else, I wished success to Modhu as a barrister. But I always thought he had made a mistake. He was a soul "guileless beyond imagining". No "cuteness" for his profession in him. His worldly experience was nil. He had a low, broken, husky voice that failed to make impression. He looked only at the bright side of things. The case he was engaged in at Burdwan, gave me the most convincing proofs of his failure from all these causes. He was a round man in a square hole not in respect of law only but every walk of life. The leaden dead-weight was of him only when he was on his wings to Muse-land. Like Gold-Smith's vicar, who "travelled from the blue bed to the brown", Modhu was good only for poetry to pleasure, and pleasure to poetry.

I very well remember Modhu's appearance at College. He was then a slim tallish youth, who won friends by an engaging smile and address. The last time I saw him at Burdwan in 1872, he looked a shorter man by his having grown sideways. His abdomen had bulged out, and his thick sensuous nether lip, hung out a little too much. Not only the heavy appearance was without vigour, but that he had lost also much of his sprightliness spirit. The effect of a bottomless appetite for fun, for frolic, and adventure had, told, and his way of life was "fallen into the sear and yellow leaf."

Modhu very much lacked control over his impulses. He cared little for the cold properties of the world, and thinking too much of himself, affected originality in all that he did. Conscious of his destiny, he spent his force in frivolity, and holding his true powers in reserve, waited only for a call to

action. Luckily that call came, and proving true to his promises, he justified himself.

Modhu had a regular field-day in the arena of Bengali literature, and over-came Himalaya-high prejudices against his Interloperism. Generally, he is considered to be the creator of an epoch simply by his introduction of the blank-verse and sonnet. But he has opened also an age of taste and correctness. He has taught us to leave off our native narrow invention, and to restrain our prurient imagination in conception and expression. He has put new blood into the veins of the Bengali Muse, and galvanized her with spirit. 'They say he has sinned by his not doing due justice to Rama. But the great Vidyasagara has not sinned the less, whose wailing, weeping, and would-not-be-comforted Rama in the *Sitarbanabasha*, appears to be a caricature, like that of Homer's heroes in Shakespeare's *Troilus and Cressida*. Milton's Adam was "unused to the melting mood." So far as my memory serves me at the present moment, I recollect Ravana to be a great fighting hero, and Lachmana a great moral hero. Rama performed no other heroic feat than having taken up and broken the ponderous *Haradhanuk*. He killed Ravana by stealth of the *Mritusara-bana*, which reads like an Anglo-Indian stratagem in the Punjab war. His heroism is taken upon assumption—it is an *apriori* conclusion based upon the idea of his incarnation. Rama is the great Brahmanical hero, but he did not come up to Modhu's ideal. By conservatism, he would have pleased his countrymen, but outraged his own instincts.

Calcutta,

2nd September, 1894.

Bholanath Chunder

Reminiscences of Michael Modhu Sudan Datta
by

Babu Rashbehari Mukerjee.

Mr. Michael Modhu Sudan Datta came twice to Uttarpara, once in 1870 and the second and last time in 1873, to live in

the first floor of the Public Library house. On both these occasions his wife and children accompanied him. During the first visit, and indeed, all through that sojourn of about three months, could be easily perceived, that his buoyant and cheerful spirit, and his gay, lively manner amid the wreck of his fortune and the pinch of poverty, had not for a moment left him. That frankness or enthusiasm of manner which the Frenchman calls abandon was then, as it had been before, pre-eminently his own. At that time, one often heard him repeat, with unbounded, blind admiration, passages from his favourite Dante and Milton, Shelly and Byron, and sing his never-to-be-stale song of Dave Carson's "Bengali Babu". But when, in 1873, disease had been hurrying him to an untimely grave, and the gradual and conscious waste of vital power had given him warning that his end was near, a far different picture of the man, the poet, and the *galantuomo* presented itself. Then all cheerfulness was gone, and those grand black eyes of his shone no more with the light of day, but were dimmed and dejected as it were by the sad thought of his long home, and if ever one glanced, on occasion, to find in them their former brightness, it was the sheen of the tear-drop, rather, where of they were then often so full. Like Dr. Johnson, Mr. Datta had a peculiar dread of death. He feared death not because the judgement day would be too severe for him, but because he, of all mortal men, was most unwilling to leave the world which he loved and liked so well. The thought of the fate of his wife and children, and, more especially, of the education of the latter distracted him. A fonder husband and a kinder father it is difficult to find anywhere I believe.

On a dark evening (it was about a week or ten days before his death), the two sons playing in the parlour, Mr. Datta himself lying on the broad of his back upon a bedstead, constantly pitting blood, Mrs. Datta lolling on a sofa, Sarmistha and myself squatting on the matting, and talking glibly of native medicines and the diseases of women, a low murmur, as of pain, was heard, and suddenly Mrs. Datta ceased to speak. The poor

lady had a swoon. Mr. D. who lay prostrate and incapable of moving tried to rise up, but could not. "Alas! Mrs. Datta is gone", he cried, "God bless you my boy, save her." Saying this he burst into a flood of tears. In about half an hour Sarmistha and I succeeded in restoring her to her senses. Thereupon, as the tears of joy and the tears of the grief and pain and anguish mingled together in his eyes, the fast dying poet waxed poetic, beginning, in the floweriest language, to recount his past deeds and misdeeds; and calling to me, and holding me by both the hands, imploringly said,—“My dear good fellow! Your Library garden, I fear, will be my grave, perhaps also my wife’s. But I pray you, take care of my boys and see that they are well educated; that is my last request. As your elder, I beg of you never to drink, never to eat ham or beef—there have been my ruin.” “Mr. Mukherji”, interrupted Mrs. Datta, “for Heaven’s sake put my two sons in some English School, and see that they receive good education.”

Mr. Datta was of so proud a nature that on days when he had literally no victuals he would ask us to send native dishes, saying he had not tasted them for many a year, but never for once so much as hinting that he went without food.

His gratefulness was boundless in fact he delighted to acknowledge services in the most glowing and enthusiastic terms. To three persons, Pandit Iswara Chandra Vidyasagara, Mr. W. C. Bonnerjee and Maharani Swarnamayi, he used daily and hourly to acknowledge that he was indebted beyond all hope of repayment.

Of his then attending physician and old chum, the late Dr. S. R. G. Chakravarti, he often said, in a tone of bitter contempt,—“Chuck has ruined me, he has not spared me a single fee.”

He was an admirer of Bharat Chandra the poet, but prided himself on being by far his superior as a poet.

He was open and frank enough to admit his own failings, and his sins, committed in youth. Money which he said he had

never cared to make, meant to him but as an effective means of enjoying life, than which he thought, there was no other use of it. He was a dutiful follower of *Charbaka* and *Epicurus*.

He never believed that as a lawyer and counsel he had been unsuccessful. The claims of poetry, he thought, were higher, and that it was not in his grain to gnaw the dry bones of law, of *Weekly Reporters* and such like.

Of his conversational powers one single instance is typical. Of an evening, a Mr. Alexander Allerdycce—then Sub-Editor of the *Serampur Friend of India*—paid him a visit. From 6 o'clock in the evening to half past nine Mr. Datta was engaged in describing to him his travels in Europe. For the time being, I really forgot that I was listening to a Bengali gentleman speaking the "Queen's English undefiled." The vivid and life-like pictures, too, of the scenes and places he had seen that he gave Mr. Allerdycce, seemed to me truly grand and sublime.

He was conscious and proud of his merits as a poet and a dramatist and had an ardent love of belles letters. He was an admirer of the Hamiltonian system of teaching languages. French which was the vehicle of conversation with his wife and children, he may be said to have completely mastered. To the best of my recollection, he spoke French for more fluently than English. Moliere, Racine, Fenelon, Lamartine, and Victor Hugo were his favourite French authors.

He was intensely fond of music. One afternoon Mr. D. wanted to have a little music. His wife played on the piano, and his daughter Sarmi (so he fondly called her) sang an English song based on Dicken's *Dombey and Son*. The mother who had a clear, sonorous, melodious voice, joined her. Mr. Datta who had been hitherto leaning against the piano, fell to dancing, till at last, he got so enraptured that big drops fell in torrents down his cheeks, and he hugged his darling Sarmi, and kissed her. Music over, asked him, in wonder, how English songs which to the run of natives of India sounded like articulate, rhythmic howls,

captivated him so mightily! "I am Europeanised", he replied. "as regards music; but of course. I like Bengali songs, if not so well, at least well enough to bear to hear them sung for hours, at a stretch."

I once proposed to him to place himself and his lady under the treatment of the late lamented Kaviraj Romanath Sen. "I beg your pardon", he said, "I consider it derogatory to submit to native treatment: that will be lowering myself in the eyes of the community I belong to."

At one time during his last illness, he was so utterly in want that he begged of me in the most delicate terms to get his wife's two best Paris gowns, worth £70, sold at any price.

Mr. Datta was greatly offended with any one who in the course of reading or conversation in English pronounced a Bengali name in the tame native fashion. "It mars the genius of the English language", he would complain, "you sacrifice the rhythm of it."

Sanskrit he considered a very stiff and unmelodious language. Of all sciences he was passionately fond of Astronomy (of course popular); and had a deep seated dislike of Mathematics. For the Germans as a nation of accurate scholars he had great admiration. The French, whom perhaps he loved more than his own nation, he estimated the most refined dilettantes in the world, The English he called boors.

Mr. Datta never forgave any Bengali man who did not know his mother-tongue thoroughly well. He was a great smoker especially of cigarettes. Of the Rev. G. C. Mitra he could not say in adequate terms how he considered him, far and away, the best Greek scholar in India. His motto in Sanskrit was

"शरीरं वा पाठयेन्न काया वा साधयेन्न।"

বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েৰ লিখিত ।

10

Babu Jogindra Nath Bose, B.A.

My dear Jogindra Babu,

I wish I had the satisfaction of having contributed my mite of information for the first edition of your *Life of Michael Modhu Soodan Dutt*, but unfortunately an opportunity for it did not come in my way in time. However, as you now wish to utilise, in the second edition of the life, the correspondence which passed between that eminent poet and my humble self, on the subject of the drama, I have great pleasure in sending you, herewith, 15 of Modhu's letters to my address, being his only letters with me now, (his other letters having been either destroyed or mislaid), a synopsis of Drama called "*Rizia*" which he intended to write, together with a copy of one of my letters to him, which seems to have been accidentally preserved. My other letters to him ought to be among his papers, which you have no doubt secured.

You ask me also to give you some of my recollections of our friend, the poet. From my close intimacy with him at a time when his genius was in its highest state of development, and having had innumerable opportunities, during that time, of coming in contact with him, I ought to be in a position to supply you with at least some anecdotes regarding him, which may be interesting in his biography; but unfortunately as I look back along the vista of nearly three score years and eight that I have passed, the farthest retrospect appears enveloped in a mist. There is no doubt a vivid fact here, or a bright event there, relating to Modhu, which peeps out of the dim scene, but in the narration of most of these I have been either forestalled in the text of the biography, and in the *Reminiscences* of the poet contained in the Appendix, or they are small trivialities, unworthy of being placed before your readers. Under these circumstances, there are only a few facts and observations, concerning the subject of

your biography, which I can offer for your acceptance. They are the following :—

My reminiscences of Michael M. S. Dutt begin from the year 1846. About the latter end of that year, on a Sunday, I, in company with some fellow teachers of the Scal's Free College, went on a pleasure trip down the river, in a boat, as far as the Botanical Garden, at Sibpore. After visiting the garden, we went to see the Bishop's College, which is close by. There we met Michael who seemed to be greatly rejoiced on seeing us. He very obligingly conducted us through the several apartments of the college, and then came with us to our boat, where he remained in our company for over an hour. We parted at night-fall. He was then about 22 or 23, and our interview, short as it was, enabled me even then to observe in him unmistakable signs of a great mind. His amiable and highly intelligent countenance, his fascinating manners, his lively conversation, his ready wit, and above all, his inexhaustible fund of information on literary subjects, all went to show him as one far above the ordinary run of the educated natives of the time, and made an impression in my mind, which time has not been able to efface. It was thus at the Bishop's College that I saw our friend Modhu for the first time. Since then we did not see each other, until his connection began with the Belgatchia Theatre in 1858.

There is little left for me to say regarding the performances of "Ratnaboli", and "Sharmistha" at the Belgatchia Theatre. After the last performance of the latter play that Theatre was virtually closed. It is true that the two farces "একেই কি বলে সভ্যতা" and "বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ" were written by our friend Michael for the Belgatchia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Jotindra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in the memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstances occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "Young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভা" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chunder Singh was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at Belgatchia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgatchia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of "Young Bengal", and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of the letters to me "Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!"

I may mention here *inter alia* that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Singh made every preparation for having some English farces* acted on the boards of the Belgatchia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who took parts in these farces were the Rajah himself, Babu,

* "Prince for an hour," "Power and Principle," and "Fast train, high pressure, express."

latterly Rajah, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Jotindra Mohun Tagore all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of the Bengal Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Singh on the 29th March, 1861 put an end to the project forever. Our Belgatchia Theatre was broken up.

Michael's "Pudmabatec" which was written immediately after his two farces, was not written, like his "Sharmistha", for the Belgatchia Theatre and was not acted in any theatre until after his return from England. It was produced on the boards of the Bengal Amateur Theatrical Society (now no more) at Burtola, No. 246 Chitpore Road, on the 14th September 1867. This performance was followed by a Jatra "পদ্মাবতী", based on the play, in the house of the Dutt's of Wellington Square.

Simultaneously with the two farces, or soon after, Michael commenced to write another play "সুভদ্রা হরণ" (vide his letter to me) but probably did not proceed beyond the second act, because he did not find any countenance from the Rajahs, who had then almost closed their Theatre.

The next play that he intended to write was "Rizia" a drama, partly in blank verse, with Mahomedan characters. He sent me a synopsis; but to this also I could not hold out any hope of success in acting, as would be seen from my letter to him. It was in this letter that I suggested to him to look for the subject of a drama in the history of the Rajputs. He took my suggestion, and found the plot for his "কক্কুমারী". He then wrote to me, "For two nights I sat up for hours, pouring over the tremendous pages of 'Tod, and about, one A. M. on Saturday the Muses smiled. As a true realiser of the Dramatists conceptions you ought to be quite in love with কক্কুমারী, as I am. Lord! what a romantic Tragedy it will make!" So fondly however, he clung to the idea of writing his "Rizia" in blank verse that when he had nearly finished his "কক্কুমারী", he wrote to me in one of his letters,—“We ought to take up Indo-Mussulman subjects.

The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunities for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours." In the same letter he wrote again, "After this we must look to 'Rizia'. I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up." Even after his return from England in 1867, he talked to me of "Rizia" and "Rizia" only, but he did not live to write it.*

I owe your readers one more explanation, that about "কুকুমাবী". Why was it not acted at either the Belgatchia or the Pathuriaghatta Theatre? This is my explanation :—

* মূলতঃ রিজিয়া সম্রাট আলতামাশের দুহিতা এবং কৃতবুদ্ধীর দৌহিত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই নিকট ইহার নাম সুপরিচিত। মুসলমান নব-নারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াব আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবে তিনি ইহা রচনা করিবেন বলিখা দ্বির করিয়াছিলেন, যখনস্থলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ কথোপকথন অংশ গদ্যে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভাবাত্মক অংশ অনিচ্ছাক্রমে লিখিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। রিজিয়ার পাণ্ডুলিপি দুই একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি অগত অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। রিজিয়ার বাগদত্ত স্বামী আন্টুনিয়া, রিজিয়ার অসং ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বলিতেছিলেন,—

“হা বিধি অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের ছালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব কথা করে,
যিগুণিহ এ আশুপ, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিবরন্ত ফলীকূপ ধরি,
মুহমুহ হংশে আজি জঙ্করি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টাঃনারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন ভোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাতুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ দেখে কি হুখে রাখিলি
এ হেন দুঃস্বপ্ন আত্মা, রে দুঃস্বপ্না বিধি!
এ হেন সুবর্ণের মন্দিরে ত্যাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কোড়াকৈ?
কোথা পাব হেন রত্ন বার বহা বলে
ভুলি তোরে, ভুলকাল, এমন বেরতি
বিশ্বয়ে (হার ভেঙ্গে, বা কিছ সে কবে)

After writing the first two or three acts of “ককুমারী” Modhu wrote to me several times to procure an assurance from Rajah I. C. Singh that he will have it acted at the Belgatchia Theatre, as otherwise it will be useless waste of his time and labour, but the Rajah was too ill at that time, and the Theatre was almost given up. I told Modhu so. He next asked me to induce Babu (now Maharaja) Jotindra Mohun Tagore, if possible, to give such an assurance, that he may be encouraged to proceed with the play. I applied to the Babu, and succeeded in getting him to promise that he will bear the charges of printing the play; but as to its being acted, he said that he could hold out no hopes then, as he had at that time no stage of his own. Modhu,

জানোদরে ? যে মনন, প্রমত্ত করিলি
 যোরে প্রেম-মদে ডুই ; ভুলা তবে এবে,
 ঘটিল যা কিছু, যবে হিহু জ্ঞান-হীনে ।
 এ যোর মনের চুঃখ কে আছে বুঝিবে ?
 বন্ধুমাত্র যোর ডুই, চলু সিঁছুবেশে,
 দেখিব কি থাকে ভাগ্যে ! হয়ত মারিব,
 এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহ শ্রোতে,
 নতুবা, যে বুড়া, তোর নীরব সদনে
 ভুলিব এ মহা জালা—দেখিব কি ঘটে ।
 কি কাজ জীবনে আর । কমল বিহনে
 ডুবে অভিমানে জলে মুগাল, যতপি
 হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে ।
 চূড়াশূন্ত রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ?
 কি সাধ জীবনে আর ? যে দাক্ষ্য বিধি,
 অন্ত যে ফলে, আজ বিবাক্ত করিলি
 সে ফলে ? অনন্ত আত্মদারিনী হুবারে
 না পেরে, কি হলহল লভিলু মথিরা
 অকুল সাগরে, হার হিয়া জালাইতে ?
 হা যিক্ । হা যিক্ তোরে নারীকুলাধরা ।
 চঞ্চালিনী ব্রহ্মকুলে ডুই পাণিরসা,
 আর তোর পোড়া মুখ কতু না হেরিব,
 যত দিন বাহি পারি তোর বসন্তপে
 আক্রমিতে রণে তোরে বীর-পরাক্রমে ।
 ভেবেছিহু লয়ে তোরে সোহাগে বাসনে
 কত বে লো জলধারি কব তোর কানে,
 বারু যথা ফুলদলে সারংকালে পেরে
 কাননে । সে প্রেমধারি কিছু জলাঞ্জলি ।
 সে হৃদয় আশালতা ডুই লো নিষ্ঠুরা
 দাবানল শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়মলি ।
 পশুরে বিবয়ে জোর, ডুই কাল কষ্ট ।

on hearing from me what the Babu had said, wrote to me thus :—Many thanks to you and to Jotindra Babu, though I was not particularly interested in getting the work printed. 'That I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted, and acted by such an actor as your noble self. The play would be an experiment, and unless well supported by great histrionic talents, could not be expected to create any very great sensation." Although he said this, he lost no time in completing the play, which was printed about the latter end of 1861, Maharaja J. M. Tagore, of course, paying the printing charges. Rajah Issur Chunder Singh had died before "কৃষ্ণকুমারী" was printed. Michael Dutt did not stay many months in Calcutta, after the publication of that play. He left for England about the middle of 1862. The Pathurighatta Theatre was opened in the early part of 1866, and continued in all its splendour for not less than 7 years. It was in 1869 or 1870 that Maharajah Jotindra Mohun, though not bound by a previous promise, made every arrangement for having "কৃষ্ণকুমারী" acted at the Pathurighatta Theatre, but the strong objection of his late revered old mother, to the tragic end of the heroine being represented within the sacred precincts of a Hindu dwelling, stood in his way, and he had to abandon the idea.* It is, however, a significant fact worthy of note, that the Bengalee language is no less indebted to the kind patronage of the Maharajah, than to the eminent genius of Michael M. S. Dutt, for its first tragedy properly so called, and its first poem in blank verse.

I must not omit to mention here that though "একেই কি বলে সভ্যতা" and "কৃষ্ণকুমারী" failed to find a favourable reception at the Belgatchia or the Pathurighatta Theatre, they met with an enthusiastic welcome from the "Shobha Bazar Theatrical Society". The farce was acted there in 1865, and the tragedy in 1866.

These are the only few incidents and remarks that I have

* It is on account of this superstitious dread of ill omens that the last tragic scene of *Dusse Joyno* is not allowed to be performed in Jattia in private Hindu houses.

to communicate to you. I must now take leave of my friend, Michael Modhu Sudan Dutt, with a few words about his intellectual capacities, and his general character, which, from my intimate acquaintance of him for a period of seven years of the most important stage of his life, I had ample opportunities of studying. His intellectual capacities were of a high order, and rose above the level of ordinary run. His clear judgment, his quackness of comprehension, and the marvellous rapidity with which he could compose a play or a poem, are proofs of the vigour of his transcendent intellect. From a trivial incident he could mature a gigantic plot, with the rapidity of lightning. Materials, how insignificant soever they might be, were to him sufficient to build up a stupendous structure. One would wonder how he could store up in his mind a *thesaurus* of literary information, such as he was master of. As a man he was often swayed by frantic impulses, which sometimes led him astray. These impulses never left him till his death, and may be said to have been the true cause of all miseries and their train, which visited him and his family. Added to these was his thoughtlessness for to-morrow which almost brought him to the brink of starvation. As a private man, his disposition was peaceful, and his manners were amiable and kind to a fault. Patiently he bore insults and abuses, but never offered them to others. He knew not to retaliate wrongs. Like Oliver Goldsmith he squandered his last pice to leave nothing for himself and family. Such was Mr. Michael Modhu Sudan Dutt. May his soul rest in peace. With kind wishes,

1. Gossain's Lane,
Calcutta.
November. 1894.

}

Yours very Truly,
Keshub Chunder Gangooly

সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পরে মধুসূদন সঙ্ক্ষে অনেক কথা অবিকৃত হয়েছে। তার ফলে যোগীন্দ্রনাথের কোন কোন উক্তি হল প্রামাণিত হয়েছে। আবার কোন কোন উক্তির সঙ্গক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের দেওয়া অশ্রুট উদ্ধৃতকে আমবা নবাবিষ্কৃত-এখানে মাতাঘো ফট করে তুলতে পারছি। এই জাতীয় বিষয়গুলির সঙ্ক্ষে নীচে বিশদভাবে আলোচনা করা হল। আগেই এদের মধ্যে কোন কোন বিষয় সঙ্ক্ষে আমবা এই-এব পাঠটীকাঃ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছি।

মধুসূদন ও হেনরিয়েট

(জঃ পৃঃ ১১৬)

হেনরিয়েট যে মধুসূদনের বিবাহিতা স্ত্রী নন, প্রজেক্টর নাথ বন্দোপাধ্যায় তা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুসূদন গৌরদাস বশাককে এক চিঠিতে লিখেছেন, “I have a fine English wife (অর্থাৎ বেবেকা) and four children”। কিন্তু, ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে তিনি হেনরিয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ‘বেঙ্গল’ জাহাজে চড়ে কলকাতার দিকে রওনা হন। মাত্র এক মাসের মধ্যে বেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও হেনরিয়েটাব সঙ্গে পরিণয় হওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদনের সঙ্গে হেনরিয়েটাব আনুষ্ঠানিক বিবাহ যে হয়নি, তার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রজেক্টর বাবু সংগ্রহ করেছেন ২৪ নভেম্বর ১৮৮২ তারিখে গৌরদাস বশাককে লেখা বাজনারায়ণ বহুর একটি চিঠি থেকে। তাতে বাজনারায়ণ লিখেছেন,

“The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as [man and] wife but this, myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life. You did not tell me anything about it.”

(সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, মধুসূদন—পৃঃ ২২, সংশোধন ও সংযোজন—পৃঃ ৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য।)

এই তথ্য আমাদের কাছে নবাবিষ্কৃত বলে মনে হলেও, এটি যে যোগীন্দ্রনাথ বসুর অবদিত ছিল না, তা বর্তমান গ্রন্থ (পৃঃ ১১৬—২০) থেকে পরিষ্কার

বোঝা যায়। মধুসূদন যে হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেছিলেন, এ কথা যোগীন্দ্রনাথ লেখেন নি ; তিনি লিখেছেন, “পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সেই মহিলাকে (হেনরিয়েটাকে) পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন।” বেবেকাকে মধুসূদনের “পত্নী” বলে যোগীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট করেছেন ; হেনরিয়েটা যে তাঁর “সহচারিণী”(পৃ: ৪৯৮) এ কথা বলে যোগীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত রেখেছেন যে, হেনরিয়েটা মধুসূদনের পরিণীতা পত্নী নন। যোগীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, “তাঁহার (মধুসূদনের) বৈবাহিক জীবনের ব্যবহাবও তাঁহার সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীনতার ফল।” এবং “হতভাগ্য কবি বায়রণের জায় হতভাগ্য কবি মধুসূদনেরও জীবন অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবি-জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।”

মধুসূদন-কাজিকৃত খ্রীষ্টান কুমারী কে ?

(জ: পৃ: ৯৬)

মধুসূদন কেন খ্রীষ্টান হলেন, তাব অগ্রতম কারণ যোগীন্দ্রনাথ বস্তু এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

“তাঁহার পরিচিতি কোন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কাবণেই হউক, তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল।”

যোগীন্দ্রনাথের এই কথা সত্য কিনা, তা বলা যায় না। এর স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণও দেননি। এই “খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকা” কে হতে পারেন। তা অজ্ঞান করার মত কোন তথ্যও আমাদের হাতে নেই। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়, যোগীন্দ্রনাথ এই খ্রীষ্টান কুমারীকে বাঙালী বলেন নি।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর ‘মধুসূতি’ বই-এ এট খ্রীষ্টান কুমারীর পরিচয় খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, ইনি হলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা “দেবকী”। এই মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তা আমি অগ্রহাশ্রয় ১৩৭৩ অব ‘সমকালীন’ পত্রিকায় (পৃ: ৩৮২—৩৪) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম। নীচে ঐ প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলাম। প্রবন্ধটি (পাদটীকাগুলি সমেত) কোথাও কোন পরিবর্তন করা হয় নি। কেবল সর্বশেষ পাদটীকাটি নতুন।

মধুসূদন ও “দেবকী”

অন্ধ্রীয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্পে পড়েছিলাম—“কারণ”-রসিক এক জমিদার ঘটা করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আসলে তাঁর কোন মেয়েই ছিল না।

এটা নিছক গল্প। শুধু গল্প নয়, হাসির গল্প। কিন্তু গুরুগম্ভীর গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেকটা এই ধরনের একটি বিষয় অবতারণিত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। বিষয়টি এই—মধুসূদন দত্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা “দেবকী”-র প্রেমে পড়ে জ্বীষ্টান হয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন; শেষ অবধি অবশ্য এ বিবাহ হয়নি। (কেন হয়নি, সে সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন মজাপান ভাগ করতে রাজী না হওয়ায় কৃষ্ণমোহন তাঁকে কন্যাদান করতে সম্মত হন নি; আবার কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী জ্বীষ্টান হয়েও ব্রাহ্মণস্বের গৌরব ছাড়তে পারেন নি, তাই তিনি কায়স্থের পুত্র মধুসূদনকে জামাতা করার প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হতে দেন নি)।

এই বিষয়টি নগেন্দ্রনাথ সোম প্রথম লিপিবদ্ধ করেন তাঁর ‘মধুস্মৃতি’ গ্রন্থে। মধুসূদনের ধর্মাস্তর গ্রহণের তিনটি কারণ নগেন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন; তার মধ্যে একটি এই—

“রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী, বিদূষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপশুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। এ বিবাহে কন্যার পিতারও আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে স্তরা-পান ভাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পান-দোষ ভাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।” (মধুস্মৃতি, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৪৪-৪৫)

এর বহু পরে বনফুল তাঁর ‘শ্রীমধুসূদন’ নাটকে এই বিষয়টিকে অল্পতম উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। বনফুলের পরে আরও কয়েকজন নাট্যকার মধুসূদনের জীবনী নিয়ে নাটক লেখেন, তাঁরাও দেবকীকে ও মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর প্রেমকে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন।

সম্প্রতি মধুসূদন-দেবকীর প্রেম ‘সিরিয়াস’ গবেষণার মধ্যেও স্থান লাভ করেছে এবং কয়েকজন মনস্বী গবেষকের কাছে এই প্রেম ঐতিহাসিক ব্যাপার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী রায় (মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা, পৃ: ১০০-১০১ দ্রষ্টব্য), ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত (কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্নাবলী, পৃ: ২৫ ২৯ দ্রষ্টব্য) ও শ্রীযুক্ত গৌরাক্ষগোপাল সেনগুপ্তের (সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ,

১৩৭৩, পৃ: ৯৭ দ্রষ্টব্য) নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে কলকাতাব একটি বিশিষ্ট প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান ‘মধুসূদন-রচনাবলী’ প্রকাশ কবেছেন, তারও সম্পাদক পূর্বোক্ত ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত। এই ‘রচনাবলী’র সম্পাদকীয় ভূমিকায় (পৃ: চৌদ্দ) ক্ষেত্রবাবু লিখেছেন, ‘মধুসূদনেব ঐষ্টান হবাব অগত্যম শক্তিশালী কারণ যে দেবকী, তাতে সন্দেহ নেই।’

ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তির গুরুত্ব মোটেই খর্ব করা চলে না। কারণ হাজাব হাজাব পাঠক পাঠিকা ‘মধুসূদন-রচনাবলী’ পড়বেন, তাঁদের অনেকেই যে ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মধুসূদন দেবকীর প্রেম-কাহিনীকে নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নেবেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

কিন্তু আসলে এই ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বিভূতিভূষণের গল্পে বর্ণিত “কারণ”-বসিক জমিদারের “মেয়ের বিয়ে” যতটা সত্য, মধুসূদন-দেবকীর প্রণয়-প্রসঙ্গও ঠিক ততখানিই সত্য। নীচেব আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

মধুসূদন ১৮৪৩ ঐষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐষ্টান হন। ঐ সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েব (জন্ম ২৪শে মে, ১৮১৩ ঐ:) বয়স মাত্র ৩০ বছব। তাঁর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর (জন্ম সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ঐ:)^২ বয়স মাত্র ২৩ বছব। ১৮২৯ ঐষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন ও বিন্দুবাসিনীয খে সমস্ত সন্তান হয়েছিল, তাঁদের সম্বন্ধে দুর্গাদাস নাতিডীর লেখা ‘স্বাদর্শ-চবিত। কৃষ্ণমোহন’ (১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত) বইয়ে (পৃ: ২৬-২৭) এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক বিববণ পাওয়া যায়।

“...কৃষ্ণমোহনের চারিকন্যা। ইতিপূর্বে তাঁহাব একটি পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছিল; কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কন্যাচতুষ্টয়েব জ্যেষ্ঠাব নাম কমলমণি ও মধ্যমার নাম দৈবকী।...অপব কন্যাষয়ের তৃতীয় কন্যাব নাম

১। কৃষ্ণমোহনের স্ত্রীর নামকে বহু লেখক ভুল করে ‘বিন্দুবাসিনী দেবী’ লিখেছেন।

২। বিন্দুবাসিনী দেবীর এই জন্মতারিখ তাঁর সমাধি-কলক থেকে সংগ্রহ করেছি। বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর মৃত্যুর পর শিবপুরের বিশপ্‌স কলেজের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে এই সমাধি-প্রাঙ্গণ বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সীমার মধ্যে—রুক টাওয়ারের উত্তরে অবস্থিত। এই সমাধি-প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের দেওয়ালের ধারে বিন্দুবাসিনী দেবীর সমাধি রয়েছে (কৃষ্ণমোহনের সমাধি এর পাশেই); এর উপরে মর্মর-কলকে লেখা আছে—

‘IN MEMORY OF
BINDU BASHINI DABEE
WIFE OF REV. DR., KRISHNAMOHUN BANERJEE. D.L.
BORN SEPTEMBER 1820, DIED 8th MARCH 1860,
AGED 45 YEARS, 6 MONTHS.

মনমোহিনী ও চতুর্থ কন্যাব নাম মিলি। ‘‘কৃষ্ণমোহনের এই কন্যাগুলি সমগ্রিক লাবণ্যবতী। জ্যোষ্ঠা কমলমণিও লাবণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁতাকে বিবাহ করেন।’’ অপৰ কন্যাত্রয়ও মধ্যমা দৈবকী সের সাহেবের, তৃতীয় কন্যা মনমোহনী প্রসিদ্ধ ছইলাব সাহেবের, এবং চতুর্থ কন্যা মিলি ষ্টুবার্ট সাহেবের সন্তিত পরিণীতা হন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কয়টিই সুশিক্ষিত। ওয়াশো মনমোহিনী ‘শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা, স্ত্রী বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরিদর্শিক।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের আশোচ্য কন্যাব প্রক.
‘ম ‘দৈবকী’—দেবকী’ নং। তিনি কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় কন্যা ৭০ জন্মক
‘সের সাহেবের’ সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

এখন দেখা যাক, দৈবকীও সঙ্গে মনমোহনের প্রেম সংক্রান্ত কাহিনীটি ইতিহাসের বিচারে টেকে কিনা।

কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আগে গড়ে সন্তান ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণমোহনের কাছে ছিলেন না, পিতৃগৃহে ছিলেন, ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীও সঙ্গে তাঁর মিলে কোন গতেই সম্ভব ছিল না, কারণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু-সমাজের বিবাগ উদ্ভব করে সমাজচ্যুত ও আত্মবিসর্গ কণ্ঠে পরিত্যক্ত হন। এও এক বছর দু’মাস পরে—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁরও তিন বছর বাদে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের সাহায্য নিয়ে বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন ও তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন।*

৩। পরম আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর ক্ষেত্রমুণ্ড লিখেছেন, ‘জ্ঞানেন্দ্রমোহনের (খ্রীষ্টান হয়ে কৃষ্ণমোহনের কন্যাক বিবাহ করার ব্যাপারে) সাফল্য এ বিষয়ে তাঁকে (অর্থাৎ মনমোহনকে) উৎসাহ যুগিয়েছে।’ কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন মনমোহনের ন’ বছর পরে—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান হন এবং তাঁরও এক বছর পরে—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং তাঁর সাফল্য এ বিষয়ে মনমোহনকে উৎসাহিত করতে পারে না। গবেষণায় রত হবার আগে বিভিন্ন ঘটনার সাল-তারিখগুলো একবার দেখে নিলে ক্ষেত্রমুণ্ড ভুল করতেন।

৪। কৃষ্ণমোহনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার যে সময় সাল-তারিখ এখানে ও এই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি এই তিনটি প্রামাণিক বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

(ক) ‘আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন’ ছর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত (১২২২ বঙ্গাব্দ)।

(খ) A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee, by Ramachandra Ghosh (1898).

(গ) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৭২ নংখ্যক গ্রন্থ, বঙ্গদেশের বাঙ্গাল প্রণীত (২য় সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

স্বতরাং দেখা যাচ্ছে, রুক্ষমোহন ও তাঁর স্ত্রী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একত্র বাস করতে শুরু করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণিই যদি তাঁদের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই আগে তার জন্ম হতে পারে না। যদি ধরা যায়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই কমলমণির জন্ম হয়েছিল এবং তার ঠিক পরের বছর (১৮৩৭ খ্রীঃ) দৈবকীর জন্ম হয়েছিল, তা হলে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময় (১৮৪৩ খ্রীঃ) দৈবকীর বয়স হয় মাত্র ছ'বছর। বলা বাহুল্য, মধুসূদন ছ'বছরের মেয়েকে প্রেমের পড়ে খ্রীষ্টান হতে পাবেন না।

আসলে, দৈবকী যে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও পরে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ আছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত রুক্ষমোহন বন্দোপাধ্যায়ের একটি পত্রের* (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য) সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, রুক্ষমোহনের প্রথম সন্তানই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিল। ঐ পত্রে রুক্ষমোহন—ভারতীয়রা নারীদের সন্তান প্রসবের সময় ইউরোপীয় ডাক্তারদের, এমনকি 'অনভিজ্ঞ কপিরাঙ্কেরও' সাহায্য না নিয়ে মূর্খ দাইদের সাহায্য নেয় বলে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন—

“ক’এক দিবস হইল আমার ভার্যার অপতাপ্রসব কাল প্রাপ্তে কি কর্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই।”

এরপর রুক্ষমোহন লিখেছেন যে, স্ত্রী আসন্ন প্রসবা জেনে তিনি ‘মাকটন’ নামে জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তারকে সাহায্য নেন, এবং ঐ ডাক্তারের স্বচিকিৎসার গুণে “দশদিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি স্বস্থ হইয়াছিল।”

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের “ক’এক দিবস” আগে রুক্ষমোহনের এই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে; সন্তানটি যে কন্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ রুক্ষমোহন তাকে ‘প্রসূতিকা’ বলে অভিহিত করেছেন! এর মাত্র বছর দেড়েক আগে রুক্ষমোহনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম মিলন ঘটে। স্বতরাং এইটিই যে রুক্ষমোহনের প্রথম সন্তান, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রুক্ষমোহনের এই সন্তানটি যে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি, তার আরও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৮৫২ খ্রীঃ) কমলমণির সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিবাহ হয় (সাহিত্য-

৫। অধ্যাপক নীতিগুরুদাস বসু তাঁর ‘মধুসূদন হইতে শ্রীমধুসূদন’ বইয়ে সর্বপ্রথম পত্রটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাধক চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৪৪, পাদটীকা)। কমলমণি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ কবে থাকলে বিবাহের সময় তাব বয়স হয় পনেরো বছর এক বা দুই মাস। কমলমণি যে তখন ঠিক এই বয়সই ছিল, তা জানা যায় তাব বিবাহ উপলক্ষে লেখা এবং বিবাহের সময় প্রকাশিত তাবাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের (চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌতিজ) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা থেকে। কবিতাটির কয়েকটি চরণ আমবা নীচে উদ্ধৃত করছি—

ভূতির মা বলে দিদি বয়েছিল কি স্তম্ভে
বড় হলো মিসি বাবা * * উঠলো বৃকে ॥
বিবি বলে সাহেব কি মোব বয়েছে চূপ কবে।
জ্ঞানেবে অজ্ঞান কবে আনিগাছে হবে ॥

(মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মন্থনাথ ঘোষ প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৬১ থেকে উদ্ধৃত।)

বাংলা বাহুল্য, এই কবিতায় উল্লিখিত ‘মিসি বাবা’=কমলমণি, ‘বিবি’=বিন্দুবাসিনী দেবী, ‘সাহেব’=রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ‘জ্ঞান’=জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবিতাটির ‘বড় হলো মিসি বাবা * * উঠলো বৃকে’—চরণটিতে * * দিয়ে যে শব্দটি উচ্চ বাংলা হয়েছে, সেটি অনুমান কবে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এই চরণটি থেকে বোঝা যায়, কমলমণির দেহে তখন সবেমাত্র যৌবনসঞ্চার হয়েছে অর্থাৎ বিবাহের সময় কমলমণির বয়স পনেরো বছরের মত।

সুতরাং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমলমণির জন্ম হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব তাব অন্তজা দৈবকীর জন্মসাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়।

রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর ‘আদর্শ-চরিত। রুক্ষমোহন’ বইয়ে (পৃ: ২৬) লিখেছেন যে দৈবকীর এবং রুক্ষমোহনের আরও কোন কোন সম্বন্ধে জন্মস্থান ‘হেতুয়ার ধর্মালয়’ অর্থাৎ ক্রাইস্ট চার্চ। ক্রাইস্ট চার্চ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় (সাহিত্য সাধক-চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃ: ৪২ প্রস্তাব্য) এবং রুক্ষমোহন ১৮৩২ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাব অধীশ ছিলেন, চার্চের সংলগ্ন বাসাতেই তিনি থাকতেন। সুতরাং দুর্গাদাস লাহিড়ীর উক্তি অনুসারে ১৮৩২ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে দৈবকীর জন্ম হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী যখন ‘আদর্শ-চরিত।

কৃষ্ণমোহন' লেখেন (১৮৮৫ খ্রী:) তখন দৈবকী সশবীবে জীবিত* । স্ত্রতঃ দৈবকীর জন্মস্থান এবং জন্মসময় সম্বন্ধে দুর্গাদাস ভুল কথা লিখিতে পারেন বলে ভাবা যায় না ।

এ পূর্ণস্তু আমবা যে আলোচনা কলাম, তা'র থেকে পণিকাব বোঝা যায় যে, মধুসূদনের ঐষ্টদর্ম গ্রহণের সময়ে দৈবকীর বয়স তিন চার বছরের বেশি ছিল না । এই সময়ে দৈবকীর জন্ম হয়েছিল কিনা, তা-ই স্পষ্টরূপে বিষয় ।

যাঁবা 'দৈবকীর প্রেমে পড়ে মধুসূদনের ঐষ্টান ভগ্ন্যাব ব্যাপারে বিশ্বাস করেন, তাঁবা গোবদাস বশাক' ও যোগীন্দ্রনাথ বসু'র কোন কোন উক্তি-নিজেদের মতেই সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন । কিন্তু গোবদাস ও যোগীন্দ্রনাথ কোথাও একথা লেখেন নি যে, মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের কন্যা'র প্রেমে পড়েছিলেন ; এবংকম অসম্ভব কথা লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁবা মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন ও দৈবকীর সমসাময়িক ব্যক্তি । 'দৈবকী'-বাদীবা গোবদাস ও যোগীন্দ্রনাথের উক্তিকে নিজেদের খেয়ালখশিম'ত ব্যাখ্যা কবেছেন । এঁরা একটা কথা ভুলে যান যে, মধুসূদন যদি সত্যি

১ । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee বইয়ে রামচন্দ্র ঘোষ (Ramachandra Ghosha) কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'By his wife he had several children of whom three are still living. His eldest daughter preceded him last in his departure to another world.' এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণমোহনের জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি পরলোক গমন করেছিলেন, কিন্তু তখন তিনজন কন্যা—দৈবকী, মনোমোহিনী ও মিলি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন । কমলমণির মৃত্যুর কথা দুর্গাদাস লাহিড়ীও উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন হইল...কমলমণির কাল হইয়াছে।' ('অদর্শ চরিত । কৃষ্ণমোহন' পৃ: ২৬ পাদটিকা) ।

২ । গৌরদাস বশাক লিখেছেন, "He (মধুসূদন) used to tell me that he would rather die a Benedict than wed an 'illiterate, uneducated, unsympathetic' girl, and in those days an educated female was a *rara avis* in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian Clergyman . but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud. "এই উক্তির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোক্ত উক্তিকে মিলিয়েই নগেন্দ্রনাথ সোম "দৈবকী"কে পেয়েছেন বলে আমার মনে হয় । কিন্তু "Native Christian Clergyman" বলতে গৌরদাস যে একেত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বুঝিয়েছেন, এরকম ধরে নেওয়া খুবই অসঙ্গত । সে যুগে আরও বাঙালী খ্রীষ্টান পাত্রী ছিলেন, যেমন রেভারেন্ড খন্নাথ । মধুসূদন ও গৌরদাস উভয়েরই সঙ্গে এর পরিচয় ছিল । মধুসূদনকে লেখা গৌরদাসের চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় ('মধুসূতি', ২য় সং, পৃ: ৭১ খ্র:) ।

রুমমোহনের মেয়েও প্রেমে পড়ে ঐষ্টান হতেন, তাহলে তিনি রুমমোহনের কাছেই দীক্ষা নিতেন, কিন্তু তিনি ঐষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন আর্চডীকন ডীলট্রিওর কাছে। মধুসূদনের দীক্ষা গ্রহণের সময় রুমমোহন মাঝী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। রুমমোহন মধুসূদনের যে স্থিতিকথা লিখেছিলেন তা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মধুসূদনের ঐষ্টান হওয়ায় বাপায়ে রুমমোহনের ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ এবং এখানে ঐষ্টান হওয়ায় আগে যে মধুসূদন কোন বাড়ালী মেয়েকে বিবাহ করেন অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং ‘বাঙালী’ মেয়ে কপে গুলে কখনও ইংরেজ মেয়ের শতাংশের এক অংশ হতে পারে না’ বলতেন তা যোগীন্দ্রনাথ বসু ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এখ থেকেও বোঝা যায়, ঐষ্টান হবার আগে মধুসূদন দৈবকীর বা আপ কোন বাড়ালী মেয়েও প্রেমে পড়েননি। আরও একটি জিনিস ভেবে দেখতে হবে যে রুমমোহন যদি সত্যি মধুসূদনের সঙ্গে তার মেয়েও বিবাহ দিতে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে মধুসূদনের সঙ্গে রুমমোহনের সৌহার্দ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যু পর্যন্ত সে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি ঐষ্টান হবার কয়েক বছর পরে একবার মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে মধুসূদন রুমমোহনের বাড়িতেই উঠছিলেন। এর অল্পকাল আগে এই রুমমোহনই যদি মধুসূদনকে কল্যা দান করেন কল্যা স্বীকার করতেন, তাহলে মধুসূদন কখনও তাঁর বাড়িতে উঠেন না।

যা হোক, দৈবকীর জন্মসময় সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, সেগুলি থেকে স্থানিষ্ঠভাবে বোঝা যায় যে দৈবকীর প্রেমে পড়ে মধুসূদনের ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করার প্রসঙ্গ অলীক রূপকথা মাত্র। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই অলীক রূপকথাই আজ জীবনীকার, নাট্যকার ও গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে চলেছে।

হেনরিয়েটা কি বাংলা জানতেন ?

(জ: পৃ: ২৪২)

১৫ মে ১৮৬০ তারিখে লেখা চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন, “Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author’s wife claims to have read it before her.”

এর থেকে স্বতই মনে হয় হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন।

এই ধারণার বিপক্ষে একটি কথা বলা যায়। মধুসূদন ‘তিলোত্তমা-সম্ভব’ কাব্যের কতকাংশ ইংরেজীতে অন্তবাদ করেছিলেন; সেটিই হয়ত হেনরিয়েটা পড়েছিলেন এবং তারই কথা হয়ত মধুসূদন রাজনারায়ণকে ঐ চিঠিতে লিখেছেন।

কিন্তু তা যদি হত, তা হলে মধুসূদন রাজনারায়ণ বস্তুর জীবর আগে হেনরিয়েটা ‘তিলোত্তমা’ পড়েছিলেন—এমন কথা কখনও লিখতেন না। কাব্যে রাজনারায়ণের জীব মূল ‘তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য’ সম্পূর্ণভাবে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর কাব্যও ঐ কাব্যের অসম্পূর্ণ ইংরেজী অন্তবাদ পড়াকে এক পর্যায়ে স্থাপন করা যায় না। অতএব হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন এবং শুধু তা’ নয়—বাংলা কাব্যও পড়তে পারতেন এবং মূল তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যই তিনি পড়েছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

মধুসূদন কি ‘মায়াকানন’ সম্পূর্ণ করেছিলেন ?

(জ: পৃ: ৪৭৮)

‘মায়াকানন’ নাটকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের যে ভূমিকা ছিল, তাব থেকে জানা যায় যে মধুসূদন নাটকটি শেষ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ভূমিকা থেকেই আবার জানা যায় যে, প্রকাশের আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘মায়াকানন’-কে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ফলে ‘মায়াকাননে’ এখন মধুসূদনের লেখনীর পাশাপাশি ভুবনচন্দ্রের লেখনীরও স্পর্শ এসে গিয়েছে। ‘মায়াকানন’-এর শেষ দিকটি খুবই দুর্বল এবং তার মধ্যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। মধুসূদনের গোড়ার দিকের নাটকেও এমনটি দেখা যাবে না। এ সবই ভুবনচন্দ্রের কীর্তি বলে মনে হয়।

। নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত ৯, ৭৯, ১৪৮, ৪৯
১৫০, ৪৯২

অমৃতলাল মিত্র ২৩ *

আনন্দকৃষ্ণ বসু ৩৬, ৬০

আর্কিস্টটলের লাইসিয়ম ২৫

আলবার্ট নেপোলিয়ান ৪৮৫*, ৪৯৮

আলেকজান্ডার ডফ ২৯, ৯১

আশুতোষ দেব ১৬৬-৭

ইংরাজী ভাষা...শিক্ষায় ভ্রম ৩১

ইংরাজীশিক্ষাপ্রচারের ফল...২৮-৩০

ইংরাজী শিক্ষা বিপ্লবকালের অবস্থা ৩১

ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী...১৫৩-৪

ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ২২৭, ৩৭৭ *

ইয়ং বেঙ্গল ১৫৩

ইস্ট ইণ্ডিয়ান ২৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৯, ১৫১-২, ১৫৫-৫৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর ৭৯, ১৪৮-৯,
১৭৩*, ৪২০-১, ৪৬০-১

—পত্র : মধুসূদন লিখিত (দ্রষ্টব্য : পত্র)

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১০৩, ১৬৭, ১৬৯*,
১৭৩, ১৭৬-৭, ১৯৯, ২০১, ২৩২,
৩৪১-২

—পত্র : (গৌরদাস বসাককে লিখিত)
১৭১-২*, ১৮০-৮২

—পত্র : মধুসূদন লিখিত
(দ্রষ্টব্য : পত্র)

উইলিয়াম বেট্টিফ ২৮, ৫৮

উত্তরপাড়া বাস ৪৮১

উমেশচন্দ্র দত্ত ৪৯৯

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬*, ৪৪২,
৪৮২-৩, ৪৯৯

একেই কি বলে সভ্যতা ২৩২-৬১,
৩৪২

এজ অফ রিজিন ৯১

এনকোয়ারার ২৩

ওয়ার্ডম ইন্সটিটিউশন ২৫

ওয়ার্ডম ওয়ার্থ ২২৬

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ২৭*

কবিকল্প ১৫৫

কলিকাতা রিভিউ ৩৪২*

কার ৪২-৩

কালিদাস ৩৩

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৬৭

কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৫১, ১৬৬, ২২৬,
৪২১

—মধুসূদনকে অভিনন্দন ৩৯৯

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৩২

কাশীরাম দাস ১২

কিশোরীচাঁদ মিত্র ৩৬, ১৪৯, ১৬১,
২৪২*, ৩৭৭*

কিশোরীমোহন হালদার ৯৭*

কুলীনকুলসর্বশ ১৬৬, ১৬৭*, ২৩২

কুন্তিবাস ১২

কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩৩১, ৩৪১-৮৮,
৪৮৮

—অলঙ্কার বিষয় ৩৪৬

—উৎপত্তি ৩৪৫

—উদয়পুরের রাজপরিবার ৩৪৮

- ঐতিহাসিক মূল্য ৩৪৬-২
 — বিলাসবতী-ধনদাস ৩৫২
 — মৃত্যু (কৃষ্ণকুমারী) ৩৫১
 কৃষ্ণচন্দ্র ২০১
 কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩, ২৬-৭,
 ১০৭, ১৫০-১, ১৫৩
 কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৭১-২*,
 ৩৪১-২, ৩৪৫
 কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত পত্র
 : (দ্রষ্টব্য : পত্র)
 — স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট) ৭৫-৫২
 কেশবচন্দ্র সেন ৩৮
 — নববৃন্দাবন অভিনয় ১৭৩*
 কাপটিভ লেডী ১০৯-১৩, ১১৫*,
 ১১৭-১৯, ১৩০, ১৩৪-৪৩
 ক্লিণ্ট ৩৫
 ক্লিকার ১৬৫
 ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ৩৮
 ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৬৭
 ক্রীষ্ণধর্ম গ্রন্থ উপলক্ষে রচিত স্তোত্র
 ৯৯-১০০
 গঙ্গাচরণ সেন ১৬৫
 গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৯
 গেটে ৪৮৯
 গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ৩৬, ৬০, ৮১
 গোবিন্দচন্দ্র বশাক ২৩*
 গৌরীচরণ ঘোষ ৫
 গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (সংবাদ
 রসরাজ) ১৫৯*
 গৌরদাস বশাক ৪১-২, ৮৫, ১২৪-৬,
 ১২৯-৩০, ১৬১, ১৭০*, ১৭৬-৭,
 ১৮০-৮২*, ৪৪৫, ৪৮১
 গৌরদাস বশাক লিখিত পত্র
 : (দ্রষ্টব্য : পত্র)
 গৌবদাস বশাক স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট)
 ১-২১
 গ্রেগ (মিসেস) ১৬৫
 চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৪১৭-৬৭,
 ৪২২
 — রচনারস্ত ৪৫৭
 জগদীশনাথ রায় ৩৬
 জগদীশনাথ রায় ৪৮১
 জর্জ নবটন ১১৫
 জাহ্নবী দাসী ৫, ১২
 — কাব্যানুবাদ ১২
 — প্রকৃতি ৬-৮
 জেমস টড ৩৪৫
 জোন্স ৩৫, ৬১
 জ্ঞানান্বেষণ ৪০
 জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩৬
 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১
 টমাস পেন ৯১
 টবেন্স ১৬৩
 ডিকেন্স ৪৮৯
 ডিরোজিগো ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৫৪, ১
 ৫৭, ৬১-৩, ৯১
 ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের উচ্ছ্বলত
 ২৭
 ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষা ২২, ২৬
 ডিরোজিয়োর শিক্ষার সময়কালীন
 ঘটনাবলী ২৭-৮
 ডিরোজিয়োর শিক্ষার বিশেষত্ব ২৫-৬
 ডিরোজিয়োর শিষ্টাঙ্গ ২৩

ডিসরেলী ৪২

ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন ৩৫, ৪০

৪৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৯২, ৯৩*

ডেভিড হেয়ার ১৪৯, ১৫০

ঔষবোধিনী পত্রিকা ১৫৩

—আত্মবিলাপ ৩৮২-২০

তারাক্ষর তর্করত্ন ১৫১

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ১৯৯-২৩১

৪৫৭

তুলসীদাস ১৩

থিয়োডোর পার্কার ৯১

জ্ঞানারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৩, ৬০

দয়ারাম ১

দাস্তে ১২, ৩২, ৪৮১

দিগম্বর মিত্র ২৬০

দীননাথ ঘোষ ১৭৩*

দেবীপ্রসাদ ১, ৩, ৪

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬১*, ১৫০

১৫৪

দ্বারকানাথ অধিকারী ১৫৬

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৬৩, ১৬৭

দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ ২৩০

দ্বারকানাথ মিত্র ৪৭২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪*

অগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি ৪৮২*

নবজীবন ৩৬*

নবীনচন্দ্র বসু ১৬৩

নবীনচন্দ্র সেন ৩২, ৪৯৮

নরেন্দ্রনাথ সেন ৪৯৯, ৫০০*

নিউটন ৩৯

নেপোলিয়ন ৯

পত্র : বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে—

—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর ৪২২, ৪২৪,
৪২৭, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৪

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫৩,
৩৫৬-৮, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৭,
৩৬৯

—গোবদাস বশাক ৪৩, ৪৫-৭, ৭৯,
৫০, ৯৪, ১৩১, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০,
১৪১, ১৪৫, ১৭৮, ১৯০, ৪১৭,
৪৪৬, ৪৪৯

—ভৃদেব মুখোপাধ্যায় ১৩৭

—মনোমোহন ঘোষ ৪৪৩-৪৫

—রাজনারায়ণ বসু ২৪০, ২৪৬, ২৫১,
২৫৪, ২৫৮, ২৫৯, ৩৭০, ৩৭৩,
৩৭৬-৭৮, ৩৮০-১, ৩৮৩, ৩৮৫,
৩৮৭, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫

পদ্মাবতী (রচনা) ১৭৬-৯৮

পদ্মাবতী ১৯২-৮, ২০০, ২৪২*

পার্কার, এইচ. এম. ১৬৩

পার্থিন ২৬

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব ২৬২-৩৩১

প্যারীচরণ সন্ন্যাস ৩৬, ৬০, ২২৬

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৮১

—স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট) ৩১-৩২

প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১০৩, ১৬৭, ১৬৯*,
১৯৯, ২০১, ২৩২

প্রতাপাদিত্য ১

প্রসন্নকুমার ১

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৬৫

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৩৬

প্রসন্নময়ী ৫

- প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব ১৯৯-২৩১
- প্রিয়নাথ দত্ত ১৭৩*
- প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ১৭৩*, ১৭৭
- প্রেটোব একাডিমিস ২৫
- ফকীর অব জঙ্গির ২২, ২৪*
- ফটুঙ্গী ২৯
- ফ্রেডারিক জেমস হেলিডে ১৭০
- বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯, ১৫৬, ৪৯৮
- বঙ্কলিঙ্গারী দত্ত ৩৫*, ৬১*
- বঙ্কভান্সর উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব ৩২
- বঙ্কীয় নাট্যশালায় নানা অভিনয় ১৬২-৬৭
- বাংলা অমিত্রচন্দ্র ১৯৯-২৩১
- বাংলাদেশ : উনিশশতক ৭৯-৮১
- বাংলা সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা : তরপ্রসাদ ২৩৬
- বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ১৭*, ২১
- বায়রণ ৪২, ৫১, ৪৮৯
- বার্ড সাহেব ৯৭, ১০৭
- বান্দ্রীকি ১২, ১৬, ৩০
- বিক্রমোর্বশা ১৬৬
- বিজ্ঞাপতি ৪৯৭
- বিজ্ঞানন্দর ৪৯৩
- বিজ্ঞানন্দর অভিনয় ১৬৩-৪
- বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৫২, ৩৩০*
- বীরাঙ্গনা কাব্য ১৩, ১৭, ৩৮৯-৪১৬, ৪৫৭, ৪৯৩
- অতিরিক্ত পত্রিকা ৪০২-৫
- অনুবোধ পত্রিকা ৪০০
- আদর্শ ৩৯২
- কাব্যবিভাগ ৩৯৩
- গভীর কোমল ভাবসমন্বয় ৩৯১
- দোষ ৪০০
- প্রত্যাখ্যান পত্রিকা ৩৯৬
- প্রেম-পত্রিকা ৩৯৪
- ভাষা ৪০৫
- বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ২৩২-৬১
- বেগীসংহার নাটক ১৬৬
- বেটলিস মিসেলেনী ৮৯, ৯০
- বেথুনের উপদেশ ও পত্র ১২৩-৬
- বেলগাছিয়া নাট্যশালা ১৬২-৭৫, ৩৪১
- বাস ৩০
- ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৩৩১-৬৮
- কাব্যের রচনাদর্শ ৩৩৩
- বৈচিত্র্যের ভাব ৩৩৯
- ভাষা ৩৪০
- রাধিকার প্রকৃতিগত মাদুর্য ৩৩৬
- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৪০১*
- ভাজি ১২, ৩২
- ভাবতচন্দ্র ৩২, ১৫৫-৬, ১৫৮, ২০১, ৪৯৩
- ভারতী ২১
- ভিক্টর জর্জো ২২৬
- ভিসনস অফ দি পার্ট ১০৯-১৪
- ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩৬-৭, ৪১, ৫২, ৬০, ১৭৬*
- স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট) ১২১-২৬
- মধুসূদন লিখিত পত্র (দ্রষ্টব্য : পত্র)
- ভোলানাথ চন্দ্র ৩৬, ৪০, ১১৪*, ৪৯০
- স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট) ৩২-৪০

- মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৫০
- মধুসূদন :
- অধ্যয়ন শীলতা ১২৮
- অস্তিত্ব অপবাধ স্বীকার ৪৮৬
- আকৃতি প্রকৃতি (শেয়াবস্থায়) ৪২৪-৫
- আত্মসংযম, স্ত্রীনীতির অভাব ৫৩-৪
- আদর্শ পুরুষ—বাইবল ১৫-৬
- আলিপুত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪৮২
- ইংলণ্ড গমনের আকাঙ্ক্ষা ৮৫
- ইংলণ্ড যাত্রা ৪১১
- ইংলণ্ডে উপস্থিতি, গ্রেস ইনে ভর্তি ৪১২
- ইয়ং বেঙ্গল ২১-২
- ইউরোপ প্রত্যাবতনের পথ সাহিত্য-সেবা ৪৬৭
- ইউরোপ প্রবাস ৪১৭-৬৪
- ইউরোপীয়-ইংবাজী কবিদের প্রভাব ৩২
- ইউরোপে ভাষা শিক্ষা ৪৫৩
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৫২
- উচ্চাভিলাষ ১০-১১
- উত্তরপাড়া বাস ৪৮১
- উপসংহার ৪৮৮-৫০০
- কপোতাক্ষী/কবিতাক্ষ ১, ২
- কাব্যাত্মরক্তি ১২-১৩
- কলকাতায় অর্থভাব (শেষ জীবনে) ৪৭২
- কলকাতায় আগমন (বাল্যকাল) ১৮-১
- কলকাতায় প্রত্যাগমনে মধুসূদনের অবস্থা (মাজাজ ফেরৎ) ১৬০-১
- কাবাদোষের কারণ ২১
- কাব্যের দোষ ২১
- কলকামাগত দোষ ২১
- কলকামাগত দোষ গুণ ৩
- কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাকে লিখিত পত্র (দ্রষ্টব্য : কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)
- ক্রীষ্টিধর্ম গ্রন্থ ২১-১০৭
- ক্রীষ্টিধর্ম গ্রন্থ উপলক্ষে বচন ২২ ১০০
- ক্রীষ্টিধর্ম গ্রন্থাঙ্কুরের অবস্থা ১০০-১৭
- গৃহে বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার অভাব ৫৪
- গাহিত্য অশাস্তি মাস্ত্রাজে ১১২
- গৌবদাস বশাককে লিখিত পত্র (দ্রষ্টব্য : গৌবদাস বশাক)
- গ্রন্থ ও জীবনের সৌন্দর্য ৪৮৮-২
- চান্দাবস্থায় লিখিত কবিতাবলী
- চান্দাবস্থায় লিখিত পত্র ৪৩
- জন্মভূমি ১
- জন্মভূমির প্রতি অত্মবাগ ১৬
- জন্মভূমির সৌন্দর্য ১৫-৬
- জন্মভূমি সাগর দাঁড়ি ১৬
- জন্মবৎসব নির্ণয় ৫
- জাতীয় ভাব ও সাহেবিয়ানা ৩৩
- ধর্মবিশ্বাস ৪২৬
- পঞ্চকোট-রাজ ম্যানেজার ৪৭৫
- পত্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- গৌরদাস বশাক
- ভূদেব মুখোপাধ্যায়

- মনোমোহন ঘোষ
রাজনারায়ণ বসু
(দ্রষ্টব্য, সংশ্লিষ্ট পর্যায়)
- পবলোক গমন ৪৮৭
—পারিবারিক কথা ৩৮২
—পিতা-মাতা ৭, ৮
—পিতা-পিতৃবাগণ ২
—পিতা-পিতৃষোব প্রকৃতি ৪
—পিতা-মাতাব বিবাহ প্রস্তাব ২০-২৪
—পিতাব দোষগুণ ৪
—পিতৃগৃহ ত্যাগ ২৮
—পুত্র কণ্ঠাদেব কথা ৪২-৭৮
—পীড়াকালীন অবস্থা ৪৮২
—পীড়ার প্রাক্কালীন অবস্থা ৪৭৮
—পীড়িতাবস্থায় শেষ সাহায্য ৪৮০
—প্রথম বাংলা কবিতা ৭৮ ২
—প্রেম প্রবণতা ৪৫
—বংশ বিবরণ ২
—বাংলা সাহিত্যে দান ৪২২
—বাংলা সাহিত্যে নাটক সমূহের কার্য
৩৫৩
—বাল্যকথা ৫, ৬
—বাল্যজীবন ১ ১২
—বাল্যজীবনে রচিত কবিতা ৬৩-৭৭
—বাল্যবন্ধুগণ ৪১
—বাল্যস্বভাব ৮
—বিচ্ছিন্নরাগ ১০, ১১
—বিস্তারিত ২-১০
—বিসপস কলেজে অধ্যয়ন ২১ ১০৭
—ব্যান্সিটারি ব্যবসা ৪৬৫
—মনোনীত পত্নীলাভের আশা ২৬
- মাতা-বিমাতৃগণ ৫
মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ চেষ্টা
৪৭৪
—মাত্রাজ গমন ১০৭
—মাত্রাজ হইতে প্রত্যাগমন ১৪৬-৬১
—মাত্রাজ ত্যাগ ১২২
—মাত্রাজে সাংসারিক অবস্থা ১২২
—মাত্রাজে সাহিত্যসেবা ১০২
—মধুসূদন : রচনাবলী
—একেই কি বলে সভ্যতা ? ২৩২-৬১,
৩৪২
—রুষ্কুমারী নাটক ৩৩১, ৩৪১-৬৮-
৪৮৮
—ক্যাপটিভ লেডী ১০২-১৩, ১১৫*,
১১৭-২, ১৩০, ১৩৪-৪৩
—ক্যাপটিভ লেডী অনাদর ১২১-২২
—ঐ অনাদরে কবির মনোভাব ১২৩
—প্রশংসা
—চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৪১৭-৬৪,
৪২১
—তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ১২২-২৩১,
৪৫৭
—পদ্মাবতী ১২২-৮, ২০০, ২৪২*
—বীবাঙ্কনা কাব্য ১৩, ১৭, ৬৮২,
৪১৬, ৪৫৭, ৪২৩
—বুড়োশালিকের ঘাড়ে ঘোঁ ২৩২-৬১
—ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৩৩১-৬৮
—মাতৃলাভায় রচনাকল্পে বেধুনের
উপদেশ ও পত্র : ১২৩-১২৬
—মেঘনাদবধ কাব্য
(দ্রষ্টব্য : মেঘনাদবধ কাব্য)

মধুসূদন । বিবিধ রচনাবলী :

- অনিকঙ্কে প্রতি উষা ৪০৩
- অশ্ব ও কুরঙ্গ ৪৬৭-৭০
- আত্মবিলাপ ৩৮২ ২১
- কবি মাতৃভাষা ৩৭৪
- ঢাকায় রচিত কবিতা ৪৭৭*
- ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী ৪০২
- নলের প্রতি দময়ন্তী ৪০৫
- নীতিমূলক কবিতা ৪৬৭-৭০
- পঞ্চকোটগিরি ৪৭৫
- পঞ্চকোটগিরি বিজয় সংগীত ৪৭৬
- পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী ৪৭৬
- বঙ্গভূমির প্রতি ৪১৬
- ভিসনস অফ দি পাস্ট ১, ১১৪
- যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা ৪০৪
- রামায়ণ মহাভাবত ১২-১৪
- রামায়ণ-মহাভারতের ফল ১৩
- শিক্ষাবস্তায় কবিতা রচনা ৬৩-২০
- শিক্ষাবস্থায় হিন্দু কলেজে কবিতা রচনা ৫৭
- শেষ-জীবন ৪৬৫-৫০০
- শৈশব শিক্ষা ১৪
- শৈশব শিক্ষার ফল ১৭
- সিংহল বিজয় ৪০৬*-০৭
- সংগীত প্রিয়তা ১৪
- সমসাময়িক ইংরাজি শিক্ষিতগণের অবস্থা ২০-৩৪
- সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১৪৭-৬১
- সমাধিস্তম্ব প্রতিষ্ঠা ৪২২
- সমাধিস্তম্ব প্রতিষ্ঠা ৫০০*

- সহাধ্যায়ী ছাত্রগণ ৩৬
- সাংসারিক কথা ৪১১
- সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ্য ৩৩
- সাধারণ প্রকৃতি ১৭-১৮
- সীতা কাব্য ৪৫৪
- স্বভাৱ হরণ ৪৫৫-৭
- স্ট্রীশিক্ষার প্রবন্ধ ৮১-৪
- স্বদেশাত্মবোধ ৮১
- স্বদেশীয়গণের গুণগ্রোহিতা ৪২৮
- হিন্দু কলেজে শিক্ষার নির্যর্থ ২০
- হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার ফল ৩২-৩
- হিন্দু কলেজের...পূর্বাবস্থা ২০
- হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা ৩৫
- মনোমোহন ঘোষ ৪৪১-৩, ৪৪৬, ৪৬৩, ৪৭৪*, ৪৮৩, ৪২২
- বহুতা (সমাধিস্তম্ব প্রতিষ্ঠায়) ৫০০
- মাতাকে পত্র ৪৬৩
- শেষ কথা ৪৮৪-৫
- মনোমোহন বসু ১৫৬
- মহেন্দ্রনারায়ণ ২
- মহেশচন্দ্র ঘোষ ২৩*
- মানিকরাম ৩
- মানকুমারী বসু ৩, ২৩*
- মায়াকানন ৪৭৮-২
- মিল ২
- মিল্টন (কবি) ৩২-৩, ৬২, ৪৮১, ৪৮২
- মিল্টন (পুত্র) ৪৮২
- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় ৮০
- মেকলে ২, ২২

- মেঘনাদবধ কাব্য ১৩, ১৭, ২১, — মেঘনাদ যজ্ঞাগারে ৩০৫
 ২৬২-৩৩১, ৪১০, ৪৬৫, ৪৯০-২ — মেঘনাদেব চরিত্র ৩০১
 — ইলিয়াড-কুমারসম্ভব ২৭৬ — মধুসূদনেব কল্পিত স্বর্গ ও নবক ৩১৬
 — ইলিয়াড-রামায়ণেব ঘটনাবলী ৩১৫ — মেঘনাদেব মাতা-পত্নীব নিকট বিদায়
 — কাব্যবচনার সময় ৩৩২* ২৯৯
 — কাব্যে অনার্থ প্রীতি ১২৫ — মেঘনাদেব মৃত্যু ৩২৩
 — কাব্যে অবলম্বনীয় বিষয় ২৬২ — মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ৩১০
 — কাব্যে কৰুণরসের প্রাধান্ত ৩১৭ — বাক্স চবিত্তের আদর্শ ২৭৮
 — কাব্যের দোষগুণ ৩২৪ — বাক্সসবাজ-চিত্রাঙ্গদা ২৬৬
 — কাব্যের প্রধান দোষ ২৮৯ — বাক্সসবাজেব বর্ণসজ্জা ২৭০
 — কাব্যের ভাষা ৩২৭ — বাক্সসবাজের সভা ২৬৪
 — কাব্যের মৌলিকতা ৩২৬ — বাবণ ও মন্দোদরী ৩১২
 — কাব্যের শ্রেণী নির্ণয় ৩২৫ — রাবণেব অদৃষ্টচক্র পরিবর্তন ৩১৯
 — কাব্যেব সমাদর ৩২৮ — বামচন্দ্রের হীনতা ৩১৪
 — কাব্যের সর্গ-বিভাগ ২৬৩ — লক্ষ্মণ-চরিত্তের হীনতা ৩০৬
 — কাব্যের সার্থকতা ৩২২ — কারণ ৩০৮
 — কালীপ্রসন্ন সিংহের অভিনন্দন ৩২৯ — লক্ষাপুরী বর্ণক্ষেত্র ২৬৫
 — কুমারসম্ভবের আদর্শ-বিচ্যুতি ২৭৭ — সীতাচরিত্র ২৯১-৫
 — কুমারসম্ভবের উচ্চ আদর্শ ২৭৬ — সীতা-দেবীর দণ্ডকাবাস ২৯২
 — চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র ২৬৮ স্বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০৩, ১৬৭, ১৭৩,
 — জুনে-জুপিটার-পার্বতী-হর ২৭৪ ২০২-৩, ৩৪১-২, ৩৪৫
 — প্রমীলা চরিত্র ২৭৯ — অমিত্রাক্ষর রচনা সম্পর্কে আলোচনা
 — প্রমীলা : স্থান ভূমিতে ৩২০ ১৯৯
 — প্রমীলার চরিত্তেব উৎপত্তি ২৮৩ — পত্র : ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে ২০৩, ২০৭
 — প্রমীলার চরিত্তের সার্থকতা ২৮৭ — স্মৃতি-চারণ (পরিশিষ্ট) ২৯-৩১
 — প্রমীলার বৈশিষ্ট্য ২৮২ যত্ননাথ পাল ১৭৩*
 — প্রমীলার বর্ণসজ্জা, লক্ষ্যপ্রবেশ ২৮১ রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১, ১৫২-৬০
 — প্রমীলার স্বর্গারোহণ ৩২৩ রত্নলাল শাস্ত্রী ৪৩
 — বাকুণী চরিত্র ২৭০ রত্নাবলী : ইংরাজী অনুবাদ ১৬২-৭৫
 — বিবিধার্থ সংগ্রহে সমালোচনা ৩৩০* রত্নাবলী ১৮৮
 — বৃত্ত ও বাক্সসবাজ ২৭৩ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২, ৪৯২

- রমাপ্রসাদ ১৭৩*
- রসিককৃষ্ণ মল্লিক ২৩, ৬০
- রেবেকা ম্যাকটাভিস ১১৫
- মৃত্যু ৪২৭
- রাজকিশোর দত্ত ১
- রাজনারায়ণ দত্ত ১, ৩, ৪, ৬, ৭,
১০-১২, ৫৪, ৬১, ১৫৭, ২২৭
- রাজনারায়ণ বসু ২১, ৩৬, ৩৭*, ২৭,
৫৭*, ৬০, ১৫০, ১৫২, ১৫৫,
২০১, ৩৩০
- রাজনারায়ণ বসু : স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট)
২৬-২৮
- পত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে) ২৭২
- পত্র : মধুসূদন লিখিত : দৃষ্টবা : পত্র
- সিংহল বিজয় সম্পর্কে পত্র ২৪২-৫
- রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ৭২২
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৫৩, ১৭৩, ১৮২,
২০০, ২১০, ২৩৫, ২৫৫* ২৭২*,
২২৬-২২
- রাজনারায়ণের পত্র (সিংহল বিজয়)
২৪২-৫
- রাধানাথ শিকদার ২৬
- রাধামোহন ১, ২, ৩*
- রামকমল সেন ২৮
- রামগতি জায়রত্ন ১৭, ২৩৬
- রামগোপাল ঘোষ ২৩, ৬০, ১৪৮
- রামচন্দ্র মিত্র ৩৫, ৭০, ১৩৫, ১৮৬
- রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৬৬-৬৮
- নাট্যগ্রন্থাবলী ১৬৭*
- রামতত্ত্ব লাহিড়ী ২৩, ৩৫, ৬০
- রামনিধি ১, ২
- রামমোহন রায় ২৪, ২৮, ১৫৮
- রামরাম বসু ৭২
- রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ৪০১
- স্মৃতিচারণ (পরিশিষ্ট) ৪০-৪৪
- রিজ ৩৫, ৩৮
- রিজিয়া ৩৪২. (পরিশিষ্ট) ৪২-৫১
- রিজিয়া : সংক্ষিপ্ত আদর্শ ৩৪২-৪৪
- রিচার্ডসন (দৃষ্টবা : ডেভিড নিস্টার
রিচার্ডসন)
- রিচার্ডসন-ডিবোজিয়া শিক্ষায় পার্থক্য
৫৮-৬২
- রিচার্ডসন ও হিন্দুকালজীয় শিক্ষা ৫৭-৮
- রিচার্ডসন : হিন্দু কলেজীয় শিক্ষায়
৫৭৮, ৬১, ৬২
- রিচার্ডসনকে অনুকরণ ৬
- লিটারেচি ঘিনার ৭৩
- শান্তমুখা ১৬৬
- শমিষ্ঠা (কণ্ঠ) ৭২৮
- শমিষ্ঠা ৪০২
- অভিনয় ১৮০
- প্রচনা ১৭৬-২৮
- শিবচন্দ্র দেব ২৩, ৬০
- শিবচন্দ্রদেবী ৫
- শিবাজী ১৩
- শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ১৭৩, ১৭৭*
- ষ্টক্লার ১৬৩
- সংবাদ প্রভাকর ১৫১-২, ১৫৬-৭,
- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৭, ৪৪২-৩
- সম্পাদকীয় : ৫৩ ৬২
- সাঁইচি থিয়েটার ১৬২-৩, ১৬৫
- সিংহল বিজয় ২৪২-৫

সিসিলি বিডন ১৬৬

সোমপ্রকাশ ২৩০

সেক্সপীয়ার ৩৯, ৫৮

স্কট ১৬

হরকামিনী ৫

হরচন্দ্র ঘোষ ২৩

হরপ্রসাদ রায় ৮০*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৩৭

হরলাল রায় ৫০০*

হরিশোহন গুপ্ত ১৫৬

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫, ১৪৮

হার্মান জেক্স ১৩৪

হালফোর্ড ৩৫

হিউম ২১, ১৬৩

হিন্দুকলেজ ১৪, ১৮, ২৭*, ৩৪, ৫৬,

হিন্দু কলেজে মধুসূদনের শিক্ষা ৩৫

হিন্দু কলেজের শিক্ষা বিবরণ ৩০

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্জসন

৫৭-৮, ৬১-৬২

হিন্দু পেট্রিয়ট ৫, ২২৭*

হেনরিয়েটা ৪৮২, ৪৮৪

হেনরিয়েটা : মৃত্যু ৪৯৮

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২, ৩৩০, ৪৯৮

হেক্টর বধ ৩৪*, ৪৬৫, ৪৭১

হোমর ১২, ২১, ৩২

হোবস হেম্যান উইলসন ২৮, ২৬৩, ১৬৫

